ভ্রমণসমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ





হুমায়ূন আহমেদ বেড়াতে ভালোবাসতেন। বেড়ানোর জন্য সঙ্গী হিসেবে চাইতেন পরিবার কিংবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের। তিনি মনে করতেন বেড়ানোর আনন্দ এককভাবে উপভোগের নয়।

দেশ-বিদেশের বহু জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। এইসব ভ্রমণের কিছু কিছু গল্প তিনি লিখেছেন তাঁর ছয়টি ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থে। গ্রন্থগুলো হলো 'পায়ের তলায় খড়ম', 'রাবণের দেশে আমি এবং আমরা', 'দেখা না-দেখা', 'হোটেল গ্রেভার ইন', 'মে ফ্লাওয়ার' ও 'যশোহা বৃক্ষের দেশে'।

হুমায়ূন আহমেদের গল্প-উপন্যাসের মতো তাঁর ভ্রমণোপাখ্যানগুলোও পাঠকপ্রিয়তায় ধন্য। তাই আশা করা যাচ্ছে, তাঁর ভ্রমণবিষয়ক সমস্ত রচনার সংকলন এই ভ্রমণসমগ্র পাঠকদের ভালো লাগবে।



কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নন্দিত নরকের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ। এই উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত এক পরিবারের যাপিত জীবনের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন, মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি মূর্ত হয়ে উঠেছে। নগরজীবনের পটভূমিতেই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস রচিত। তবে গ্রামীণ জীবনের চিত্রও গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন এই কথাশিল্পী। এর উজ্জ্বল উদাহরণ মধ্যাহ্ন, অচিনপুর, ফেরা। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর লেখায় ফুঠে উঠেছে বারবার। এই কথার উজ্জ্বল স্বাক্ষর জোছনা ও জননীর গল্প, ১৯৭১, আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, নির্বাসন প্রভৃতি উপন্যাস। গৌরীপুর জংশন, যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক-এ জীবন ও চারপাশকে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাদশাহ নামদার ও মাতাল হাওয়ায় অতীত ও নিকট-অতীতের রাজরাজড়া ও সাধারণ মানুষের গল্প ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে।

গল্পকার হিসেবেও হুমায়ূন আহমেদ ভিন্ন দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। ভ্রমণকাহিনি, রূপকথা, শিশুতোষ, কল্পবিজ্ঞান, আত্মজৈবনিক, কলামসহ সাহিত্যের বহু শাখায় তাঁর বিচরণ ও সিদ্ধি।

হুমায়ূন আহমেদের জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ এবং মৃত্যু ১৯ জুলাই ২০১২।

ভ্রমণসমগ্র

ভ্রমণসমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ



অন্যপ্রকাশ

ভূমিকা

প্রিয়জনদের নিয়ে বেড়াতে পছন্দ করতেন হুমায়ূন আহমেদ। বেড়ানোর সময়কার খুব সাধারণ গল্পকেও অসাধারণভাবে বর্ণনা করতেন তিনি। আর উদ্ভট কিছু ঘটনাও যেন অপেক্ষা করত হুমায়ূন আহমেদের জন্যে। তাঁর অনেকগুলি ভ্রমণের সঙ্গী আমি। পরে যুক্ত হয়েছে একে একে নিষাদ ও নিনিত।

ভ্রমণ থেকে ফিরে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, আর তাঁর বন্ধুশ্রোতারা কখনো হেসে গড়িয়ে পড়ছে আবার কখনো দেখা যাচ্ছে তাদের চোখের কোনায় পানি; এটি ছিল 'দখিন হাওয়া'র অতি পরিচিত দৃশ্য। যারা কাছ থেকে তাঁর বেড়ানোর গল্প শুনেছেন শুধু তারাই জানেন কত চমৎকার করেই না সেসব গল্প বলতেন হুমায়ূন আহমেদ।

তাঁর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা বইগুলি একত্রিত হচ্ছে। আর হুমায়ূন আহমেদ চলে গেছেন এক অচেনা ভ্রমণে। প্রিয়জনদের ছাড়াই, একা। তাঁব এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যদি তাঁব কাছ থেকে জানতে পারতাম!

মেহের আফরোজ শাওন
দখিন হাওয়া
১৩. ০১. ২০১৩

সূচি

পায়ের তলায় খড়ম

আন্নির গল্প

মেয়েটির বয়স সাড়ে সাত বছর। তার গায়ে টকটকে লাল রঙের ফ্রক। মাথার চুলে লাল রিবন। হাতে লাল রঙের ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগ। মেয়েটি ঢাকা এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। একটু দূরে তার বাবা-মা। এই দু'জনও মেয়ের কান্না দেখে চোখ মুছছেন।

মেয়েটি সবাইকে ছেড়ে একা একা যাচ্ছে ইস্তাম্বুল। কামাল আতাতুর্কের জন্মদিনে সারা বিশ্বের শিশুরা নাচগান করবে। মেয়েটি বাংলাদেশের প্রতিনিধি।

বালিকার কান্না দেখে একপর্যায়ে তার মা বললেন, আমার মেয়ে যাবে না। আমি তাকে ছাড়ব না।

শেষ মুহূর্তে এ ধরনের কথা বলে কোনো লাভ হয় না। মেয়েটিকে প্লেনে উঠতে হলো। তার বাবা মেয়েটির লাল ব্যাগে দু'টা এক শ' ডলারের নোট দিয়ে বললেন, তোমাকে অনেক টাকা দিলাম। তুমি ইচ্ছামতো খরচ করবে।

মেয়েটি জীবনে প্রথম প্লেনে ওঠার উত্তেজনায়, বাবা-মা ছেড়ে এত দূরে যাওয়ার দুশ্চিন্তায়, তার লালব্যাগ ফেলে নিঃস্ব অবস্থায় প্লেনে উঠল।

ইস্তাম্বুলে তাকে থাকতে দেওয়া হলো এক তুর্কি পরিবারের সঙ্গে। সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা চার। বাবা-মা, এক ছেলে এবং ভয়ালদর্শন এক বিড়াল।

তুর্কি পরিবারের মহিলা বললেন, তুমি আমাকে ডাকবে 'আন্নি'। তুর্কি ভাষায় আন্নি হলো মা। মহিলা কথা বলছেন ইংরেজিতে। বাচ্চামেয়েটি কিছুই বুঝতে পারছে না। মহিলা নিজের দিকে আঙুলে ইশারা করে বললেন, বলো আন্নি।

বাচ্চামেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আন্নি।

মহিলা শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, একবার তুমি আমাকে আন্নি ডেকেছ, আমি সারা জীবন তোমার আন্নি হয়ে থাকব।

বাচ্চামেয়েটির পরিচয়—তার নাম মেহের আফরোজ শাওন।

বিয়ের পর শাওনকে নিয়ে প্রথম দেশের বাইরে যাচ্ছি। গন্তব্য ইউরোপের কয়েকটি দেশ। শাওন লজ্জিত গলায় বলল, তুরস্কে যাওয়া যায় না ? ইস্তাম্বুল।

আমি বললাম, ফ্রান্স-ইটালি বাদ দিয়ে ইস্তাম্বুল কেন ?

আমার অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না, ইস্তাম্বুল যেতে ইচ্ছা করছে।

কেন ?

সেখানে আমার আন্নি থাকেন।

আন্নিটা কী ?

তখনই তার শৈশবের গল্পটি শুনলাম। প্রবাসে অপরিচিত এক পরিবারের সঙ্গে তার দুঃখের দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনীর গল্প শুনে যথেষ্টই ব্যথিত হলাম। এই বাড়ির বিড়ালটার ভয়ে সে নাকি সারাক্ষণ তটস্থ থাকত। কুকুরের মতো সাইজের মোটা লেজের এই বিড়াল সুযোগ পেলেই লাফ দিয়ে কোলে উঠত। (*পুফি* নামে আমার একটি বই আছে। বইটিতে ভয়ঙ্কর এক বিড়ালের গল্প বলা হয়েছে। পাঠক, এখন নিশ্চয়ই নামকরণের শানে নজুল বুঝতে পারছেন।)

যাই হোক, আমি শাওনকে বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে ইস্তাম্বুল নিয়ে যাব; তবে এবার না।

তারপর কেটে গেল ছয় বছর। আমার আর ইস্তাম্বুল যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমেরিকায় যাই, ইংল্যান্ডে যাই, শ্রীলংকায় যাই। শুধু ইস্তাম্বুল বাদ। কারণটা বলি, আমি মানুষকে চমকে দিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করতে পছন্দ করি। শাওনের জন্যে একটি বিস্ময়ের ব্যবস্থা করতে গিয়েই দেরি হলো।

আমি চাচ্ছিলাম তুরস্কের ওই মহিলার সামনে শাওনকে উপস্থিত করতে।

ওই মহিলা কোথায় থাকেন, তার কী ঠিকানা, তাও জানি না। শিশু একাডেমীতে (যারা বাংলাদেশের শিশুশিল্পী নির্বাচন করেছেন) একুশ বছর আগের কোনো রেকর্ড নেই। একুশ বছর তো অনেক পরের ব্যাপার, এদেশে এক বছর আগের রেকর্ডপত্রও থাকে না।

আমি যোগাযোগ করলাম কামাল আতাতুর্ক ফাউন্ডেশনের সঙ্গে। এরা কয়েক বছর পরপর কামাল আতাতুর্ক স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। সবই সারা পৃথিবীর শিশুদের নিয়ে। এদের কাছে রেকর্ড থাকার কথা।

আমি তাদের সাহায্যে এবং খানিকটা ইন্টারনেট নামক প্রযুক্তির সাহায্যে শাওনের আন্নির খবর বের করে ফেললাম। আমি শাওনকে বললাম, চলো ইস্তাম্বুল যাই। সেখানে আমার পরিচিত এক মহিলা আছেন, তাঁর জন্যে একটা শাড়ি গিফট হিসেবে নিয়ে যাব। তুমি সুন্দর একটা জামদানি শাড়ি কিনে নিয়ো।

শাওন চোখ সরু করে বলল, জীবনে প্রথম শুনলাম তুমি কোনো এক মহিলার জন্যে শাড়ি নিয়ে যেতে চাচ্ছ। মহিলা কে ঠিক করে বলো তো ? তাঁর সঙ্গে পরিচয় কীভাবে ? তোমার ছাত্রী ছিল ?

আমি শাওনের কৌতূহল বাড়ানোর জন্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলাম। এই হাসির অর্থ—তোমাকে খোলাসা করে কিছুই বলব না। তবে তোমার অনুমান সত্যি হতেও পারে।

বাংলা ভাষায় 'শুভসূচনা' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। আমি ইস্তাম্বুল ভ্রমণে শুভসূচনা শব্দটি ব্যবহার করতে পারলাম না। এয়ারপোর্ট থেকেই আমার ইস্তাম্বুল ভ্রমণের অশুভ সূচনা। যারা ভবিষ্যতে ইস্তাম্বুল যাবেন তাদের জন্যে অশুভ সূচনা ব্যাখ্যা করছি। তারাও অবশ্যই আমার মতো শুরুতেই বিপদে পড়বেন।

এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যাব। ট্যাক্সি ভাড়া স্থানীয় মুদ্রায় দিতে হবে। আমি এক শ' ডলার ভাঙালাম। তিনটা পঞ্চাশ লীরার মুদ্রা পাওয়া গেল। ভাড়ার ব্যবস্থা করে আমি ট্যাক্সিতে উঠলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে হোটেলের সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াল। হোটেলের নাম 'গ্র্যান্ড ইয়াভুজ'। মিটারে ৩০ লীরা উঠল। আমি ক্যাবচালককে একটা পঞ্চাশ লীরার নোট দিলাম। ক্যাবচালক সঙ্গে সঙ্গে বলল, তুমি আমাকে পাঁচ লীরা দিয়েছ। বাকি টাকা কোথায়?

আমি হতভম্ব। সত্যিই ক্যাবচালকের হাতে একটা পাঁচ লীরার নোট। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি বিভ্রান্ত হলাম। পঞ্চাশ লীরা ও পাঁচ লীরা দেখতে অবিকল একরকম। একবার মনে হলো, মানিচেঞ্জার কি আমাকে পঞ্চাশের বদলে পাঁচ লীরা দিয়েছে?

ক্যাবচালককে আরেকটি নোট দিলাম।

সেদিন দুপুরে ক্যাব নিয়ে শহর দেখতে বের হয়েছি। আমি আবারও একটা পঞ্চাশ লীরার নোট বের করলাম। ক্যাবচালকের হাতে দিতেই সে বলল, পাঁচ লীরা কেন দিলে? সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, বিদেশিদের ঠকানোতে এটা এদের বহুল ব্যবহৃত টেকনিক।

এই ক্যাবচালকের সঙ্গে কথা চালাচালি অর্থহীন। সে চোখ-মুখ শক্ত করে একটি পাঁচ লীরার নোট ধরে আছে। শাওন বলল, তোমাকে পঞ্চাশ লীরার নোট দেওয়া হয়েছে, আমি দেখেছি।

ক্যাবচালক বলল, এই দেখো তোমাদের দেওয়া নোট তো হাতে ধরে আছি।

আমি বললাম, তোমার হাতসাফাই দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তোমাকে আবারও টাকা দিচ্ছি। আমি একটা তথ্য জানতে চাচ্ছি, তুমি কি মুসলমান?

সে বলল, হ্যাঁ।

আমরাও মুসলমান।

সে বলল, সালামালেকুম।

আমি বললাম, ওয়ালাইকুম সালাম। মুসলমান হিসেবে তুমি আমার ভাই। ভাই হয়ে একটা উপদেশ দেই—তুমি মানুষ ঠকিয়ে বেশি দূর যেতে পারবে না।

আমি আরেকটি পঞ্চাশ লীরার নোট বের করলাম। ক্যাবচালক বলল, ঠিক আছে, তোমাদের আর টাকা দিতে হবে না।

তুমি কি স্বীকার করছ যে হাতসাফাই করেছ?

ক্যাবচালক বিড়বিড় করে তুর্কি ভাষায় কী যেন বলল। তার চোখ আগের মতোই শক্ত হয়ে আছে।

শাওন বলল, এই বদ লোকটার সঙ্গে কথা বলে কেন সময় নষ্ট করছ? নামো তো।

মাজহারের 'অন্যমেলা' থেকে কেনা (অন্যমেলার ফ্রি বিজ্ঞাপন করে ফেললাম। অন্যমেলার শুরু হয়েছিল শাওনের ফিতা কাটার মাধ্যমে।) আকাশি রঙের চমৎকার

একটা জামদানি শাড়ির প্যাকেট নিয়ে আমরা একটি হলুদ রঙের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়ির বাইরে গোলাপ বাগান। গোলাপগুলি অদ্ভুত, প্রকাণ্ড বড় দেখতে, অনেকটাই জবা ফুলের মতো।

শাওন বলল, এটা কার বাড়ি ?

আমি বললাম, একুশ বছর আগে তুমি এই বাড়িতে কিছুদিন ছিলে। মারিয়াম নামের একজন মহিলা তোমাকে মায়ের মতো আদর করেছিলেন। তুমি তাঁকে ডাকতে 'আন্নি'।

শাওন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বিড়বিড় করে বলল, Oh God! Oh God!

রাজপুত্রের মতো রূপবান এক যুবক দরজা খুলল। আমরা কী জন্যে এসেছি শুনে যুবকও শাওনের মতোই বিস্ময়ে অভিভূত হলো।

শাওন বলল, আন্নি কোথায় ? আমি আন্নির জন্যে একটা উপহার এনেছি।

যুবক বলল, আমার মা দশ বছর আগে মারা গেছেন। আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি বাড়িতে যতক্ষণ থাকতে ততক্ষণই কাঁদতে। তুমি আসো আমার সঙ্গে, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।

যুবক শাওনকে তার মা'র ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের দেয়ালে অনেক ছবির সঙ্গে একটি ছবি আছে—মাথায় স্কার্ফ দেওয়া এক মহিলা ছোট্ট শাওনকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই ছবি দেখে শাওন কেঁদে ফেলল। যুবক বলল, ছোটবেলায় তুমি যেমন কাঁদতে, এখনো তো দেখি কাঁদো। তোমার কান্নার অভ্যাস এতদিনেও নষ্ট হয় নি।

যুবকের নাম ইয়াসির কিংবা ইয়াসিব। সে বিবাহিত। এক সন্তানের জনক। তার স্ত্রীর নাম আর্দা। সেও স্বামীর মতোই রূপে সৌন্দর্যে ঝলমল করছে।

দু'মিনিটও পার হয় নি, ইয়াসির বলল, দীর্ঘ ভ্রমণে নিশ্চয়ই তোমরা ক্লান্ত। চলো তোমাদের হোটেলে দিয়ে আসি। তোমরা বিশ্রাম করো।

আমি বিস্মিত হয়ে শাওনের দিকে তাকালাম। এরা তো আমাদের বসতেও বলে নি। মায়ের শোবার ঘর থেকেই বিদায় করে দিচ্ছে।

শাওন শুকনো গলায় বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

ইয়াসিব তার স্ত্রী আর্দাকে নিয়ে আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিতে এল। আমি খানিকটা বিস্মিতই হলাম। এমন বিস্ময়কর পুনর্মিলনীর পরে এরা আমাদের এক কাপ চা খেতেও বলল না ? এই ভদ্রতা তো আমাদের প্রাপ্য ছিল।

হোটেলে আমাদের রুমে ঢুকে ইয়াসির ও তার স্ত্রী হাতে আমাদের ব্যাগ-স্যুটকেস তুলে বলল, চলো। যে কদিন ইস্তাম্বুল থাকবে আমাদের সঙ্গে থাকবে। কোনো কথা শুনব না। তোমরা যেতে না চাইলে তোমাদের ব্যাগ-স্যুটকেস নিয়ে যাব। পাসপোর্ট জব্দ করব।

আমি বললাম, আগামীকাল দুপুর তিনটায় আমার ফ্লাইট।

ইয়াসির বলল, তুমি বললে তো হবে না। আমি বলব কখন তোমার ফ্লাইট।

ইয়াসিরের স্ত্রী তুর্কি ভাষায় কী যেন বলল। ছড়ার ছন্দে অন্ত্যমিল দিয়ে বলা। ইয়াসিব স্ত্রীর কথা ব্যাখ্যা করল। সে গম্ভীর গলায় বলল, আমার স্ত্রী একটি তুর্কি প্রবাদ বলেছে। প্রবাদের অর্থ—

'স্বেচ্ছায় যে আসে, স্বেচ্ছায় চলে যায়, সে অতিথি না।
স্বেচ্ছায় যে আসে, স্বেচ্ছায় যেতে পারে না,
সে-ই প্রিয় অতিথি।'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। বুঝতেই পারছি, ভালোবাসার অত্যাচারে জর্জরিত হতে হবে। কারও বাড়িতে বাস করা আমার জন্যে অতি কষ্টকর বিষয়। অন্যের বাড়িতে ওঠা মানেই তাদের নিয়মকানুনে বন্দি হয়ে যাওয়া। আমার প্রধান চিন্তা, যে ঘরে আমাদের থাকতে দেবে তার সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম কি আছে? নাকি গণবাথরুম ব্যবহার করতে হবে! ইস্তাম্বুল ইউরোপের শহর। ইউরোপের বেশিরভাগ বাড়িতে একটা বাথরুম।

মুখ ভোঁতা করে ইয়াসিরের গাড়িতে বসে আছি। ছোটপুত্র নিনিত আর্দার কোলে। নিনিত তার নিজের ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে। তার কথা শেষ হওয়ামাত্র আর্দা বলছে, 'গুলে গুলে'।

আমি জানতে চাইলাম, গুলে গুলে শব্দের মানে কী?

আর্দা বলল, বাই বাই।

আমি আবারও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। আগামী কয়েকদিনের জন্যে ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি গুলে গুলে।

গাড়ি উঁচু-নিচু রাস্তা দিয়ে চলছে। শাওন কৌতূহলী হয়ে দেখছে। বিদেশের ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয়ও তার কাছে মোহনীয়। সে জানতে চাইল, ইস্তাম্বুলে দেখার কী আছে?

ইয়াসির বলল, ইস্তাম্বুলে দেখার কিছু নাই।

শাওন বলল, সে-কি! টপকাপি প্যালেস?

ইয়াসির কঠিন মুখ করে বলল, ফালতু! তবে একরাতে তোমাদের বেলিড্যান্স দেখাতে নিয়ে যাব। এটা দেখার মতো।

ভ্রমণকাহিনি লেখার কিছু 'ফর্মুলা' আছে। এই ফর্মুলায় যে শহরে যাওয়া হয়, তার ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়। বিশেষ বিশেষ স্থাপনার উল্লেখ করতে হয়। তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে হয়। পাঠক যেন পড়েই বুঝে নেন লেখক অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং জ্ঞানী। লেখককে জ্ঞানী হতে তেমন পরিশ্রম করতে হয় না। ট্যুরিস্টদের জন্যে বের করা চটি চটি বুকলেটে অনেক কিছু লেখা থাকে। সেখান থেকে 'টুকলিফাই' করলেই হয়। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন অবশ্যি চটি বইও লাগে না। কম্পিউটারের সামনে বসে ইস্তাম্বুলের গুগুল সার্চ দিলেই হলো।

ভ্রমণকাহিনিকে রসালো করার বিষয়টির প্রতিও লেখককে লক্ষ রাখতে হয়। ভ্রমণে মজার ঘটনা (বেশির ভাগই বানানো) এবং দুর্ঘটনা (এটাও বানানো) বিতং করে লেখা হয়। অতি অবশ্য বিদেশিনী কোনো তরুণীর (রূপবতী) সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে কথাবার্তা থাকে। রূপবতী বাংলাদেশ বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন। তাকে জ্ঞান দেওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য স্থাপনার সামনে লেখকের ছবি ছাপা হয়। ছবির নিচে ক্যাপশন থাকে। উদাহরণ—'হায়া সুফিয়া। মুগ্ধ হয়ে দেখছেন লেখক। বাম থেকে দ্বিতীয়জন।' এই বিবেচনায় ভ্রমণকাহিনি লেখায় আমি মোটামুটি ব্যর্থ। কোথাও বেড়াতে গেলে নিজের ভালো লাগার অংশটিই আমার লেখায় প্রাধান্য পায়। শহরের বিশেষত্ব বা রহস্য ব্যাখ্যায় আমি কখনো ব্যস্ত হই না। একটি শহর বুঝতে হলে দিনের পর দিন সেখানে থাকতে হয়। দুই দিন থেকে ভ্রমণকাহিনির লেখক লিখতে পারেন 'ইস্তাম্বুলে আটচল্লিশ ঘণ্টা' কিংবা 'ইস্তাম্বুলে দুই হাজার নয় শ' আঠাশ মিনিট'। আমি কখনো লিখব না।

ইস্তাম্বুল ভ্রমণের একপর্যায়ে শাওন জিজ্ঞেস করল, এই শহরের বিশেষত্ব কী?

আমি বললাম, এই শহরের বিশেষত্ব হচ্ছে পথেঘাটে অনেক লেজ-মোটা বিড়াল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাওন বলল, এত বড় শহরে এই বিড়াল তোমার চোখে পড়ল?

আমি বললাম, হ্যাঁ। ঢাকার পথেঘাটে অনেক কুকুর ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, বিড়াল দেখা যায় না।

শাওন বলল, তুমি বিরক্ত হয়ে আছ কেন?

আমি বললাম, তোমার আন্নি পরিবারের চক্করে পড়ে বিরক্ত হয়ে আছি। চক্কর থেকে বের করার ব্যবস্থা করো, আনন্দ নিয়ে ইস্তাম্বুল দেখব।

চক্কর থেকে বের হওয়ার কোনো লক্ষণই টের পাচ্ছি না। ইয়াসির তুর্কি খাবারদাবারের আয়োজন ও পরিকল্পনা করেই যাচ্ছে। আমাদের জন্যে তিনবেলা 'পিলাউ' (পোলাও?) রান্না হচ্ছে। পিলাউ মোটামুটি অখাদ্য একটি খাদ্যদ্রব্য। প্রচুর জিরা ও কিসমিস দিয়ে আধাসেদ্ধ ঘি মাখানো ভাত। খেতে বিয়েবাড়ির জর্দার মতো। মাংসও রান্নার গুণে খেতে মিষ্টি। লাঞ্চ ও ডিনারে যখন বসি, তখন প্রতিটি আইটেমই আমার কাছে ডেজার্টের মতো লাগে। শুধু একটা খাবার কিছুটা মুখে দেওয়া যাচ্ছে, শিমের বিচি জাতীয় খাবার। এক শিমের বিচি খেয়ে কত দিন থাকা যায়?

ইয়াসিরের মধ্যে বাবুর্চিভাব অত্যন্ত প্রবল। সারাক্ষণই কিছু-না-কিছু রান্না করছে। বাড়ির পেছনে লম্বা কানের একটা রামছাগল জাতীয় ছাগল বাঁধা। ইয়াসির জানাল—আমাদের বিদায়ের দিন এই রামছাগলকে রোস্ট করা হবে। সেই বিদায় দিনটি কবে তা ছাগল যেমন জানে না, আমরাও জানি না।

শাওনের চাপাচাপিতে ইয়াসির এক বিকেলে (বিরক্তমুখে) আমাদের টপকাপি প্যালেসে নিয়ে গেল। এই প্যালেসে (দৌলতখানা) অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতানেরা থাকতেন।

অটোমান সাম্রাজ্য বিষয়ে যারা জানেন না, তাঁরা প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর *ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র* পড়ে দেখতে পারেন। সাম্প্রতিক সময়ের ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাস আমাদের শাকুর মজিদের *সুলতানের শহর* বইটিও পড়তে পারেন। বই দুটি জোগাড় করতে না পারলে ইন্টারনেটের সামনে বসে পড়ুন।

আমি অতি সারসংক্ষেপে অটোমান সাম্রাজ্যের বিষয়টা বলছি। জ্ঞান বিতরণের জন্যে না, জ্ঞান বিতরণে আমার অনীহা আছে।

মুসলমানদের স্বর্ণযুগে আরবের এক অসীম সাহসী যোদ্ধা ওসমান বেগ তুরস্ক জয় করেন (১২৯৯ সন)। তিনি সেখানেই থেকে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার। তাঁকে দিয়েই শুরু হয় নতুন এক সাম্রাজ্য। ওসমান ইংরেজিতে হয় অটোমান। অতি ক্ষমতাধর এই সাম্রাজ্য ছিল পবিত্র কাবা শরিফেরও রক্ষক। দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, অটোমান ডায়নাস্টির কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমান স্বর্ণযুগের সমাপ্তি হয়। অটোমান শাসকগোষ্ঠীর নজর ছিল—ধর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে গবেষণা। কোরান-হাদিসের নতুন নতুন ব্যাখ্যাতেই জ্ঞানচর্চা আটকে যায়। ছয় শত বছরের এই সাম্রাজ্য শেষ হয় কামাল আতাতুর্কের সময় (১৯৩৫)। কামাল আতাতুর্ক আমাদের পরিচিত এবং প্রিয় নাম। কবি নজরুলের বিখ্যাত কবিতা আছে তাঁকে নিয়ে—

> "ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে
> কামাল ভাই
> অসুরপুরে সুর উঠেছে
> জোরসে সামাল সামাল তাই
> কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই।"

টিকিট কেটে টপকাপি প্যালেসের মূল তোরণ দিয়ে ঢুকেছি। কত করে টিকিট জানা নেই। ইয়াসির টিকিট কাটতে দিচ্ছে না। গেট দিয়ে ঢুকেই সম্রাটদের বাগানে পড়লাম। অতিকায় দানবাকৃতির সব বৃক্ষ। বৃক্ষবিষয়ে আমার কৌতূহলের সীমা নেই। আমি ইয়াসিরের কাছে নাম জানতে চাইলাম। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, নাম ? নামের দরকার কী ?

তুমি নাম জানো না ?

না। জানার আগ্রহও নেই।

কারও কাছ থেকে জেনে দিতে পারবে ?

বাদ দাও তো। এখানে ভালো টার্কিশ কফি পাওয়া যায়। আমি কফি আর মিষ্টি রুটি নিয়ে আসছি। মিষ্টি রুটি দিয়ে টার্কিশ কফি—অসাধারণ।

মানব প্রজাতিকে ইয়াসির অনেকটা গরুর মতো ভাবে বলে আমার ধারণা। গরুকে যেমন সারা দিন ঘাস খেতে হয়, ইয়াসিরের ধারণা মানুষকেও সারা দিন কিছু-না-কিছু খেতে দিতে হয়।

আমি পুত্র নিনিতকে নিয়ে রাজকীয় প্রথম উদ্যানে বসে আছি। এ রকম তিনটা উদ্যান আছে। সম্রাটরা নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রথম উদ্যানে আসতেন না। ভিনদেশের

রাজদূত বা রাজা-মহারাজাদের প্রথম উদ্যানের পুরোটা হাঁটিয়ে অটোমান সম্রাটদের সামনে হাজির করা হতো। তাঁরা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হতেন এবং মনে মনে ভাবতেন—বাপরে, কত বড় সম্রাট! যার কাছে যেতে হলে এতটা পথ হাঁটতে হয়।

আমি এক-তৃতীয়াংশ হেঁটেই ক্লান্ত। কারণ পুত্র নিনিত বাঁদরের মতো আমার গলা ধরে আছে। ঘরের বাইরে পা দিলেই সে বাঁদরস্বভাব প্রাপ্ত হয়। বাঁদরের সঙ্গে তার একটা প্রভেদ। বাঁদররা মায়ের গলা ধরে ঝুলে। সে বাবার গলা ধরে ঝুলে।

ঘাসে পা ছড়িয়ে আমি ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছি। নিনিত ঘাস ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে। অন্য সময় হলে তার হাত থেকে ঘাস নিয়ে নিতাম। এখন নিচ্ছি না। মনে মনে বললাম, খা ব্যাটা, ঘাস খা। নিনিতের মা তার বড় পুত্রকে নিয়ে সুলতানদের হারেম দেখতে গিয়েছে। হারেমে ঢুকতে হলে আলাদা টিকিট কাটতে হয়। তৃতীয় বাগিচা হারেমের সঙ্গে।

হারেম দেখার ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করছি না। রক্ষিতাদের বাসস্থান, তাদের সাজঘর, হাম্মামখানা—এইসব দেখে কী হবে?

চীনের মিং রাজাদের ফরবিডেন সিটিতে আমি উপপত্নীদের জন্য বানানো শত শত পায়রার খুপড়ি দেখেছি। প্রবল বিতৃষ্ণা ও ঘেন্নাবোধ ছাড়া আর কিছুই হয় নি। মিং রাজাদের সময় নিয়ম ছিল রাজার মৃত্যুর পর সব রক্ষিতাকে পুড়িয়ে মারা। নতুন রাজা নতুনভাবে উপপত্নী সংগ্রহ করতেন।

শত শত রূপবতীকে ধরে এনে পশুর মতোই আটকে রাখা। এদের প্রধান কাজ সম্রাটের বিকৃত রুচির বলি হওয়া।

রাজা মানেই হারেম। মোঘল সম্রাটদের হারেম। জয়পুরের মানসিংহের হাওয়া মহল। জিনিস একই। রাজকীয় বেশ্যালয়। বেশ্যাদের তাও কিছুটা স্বাধীনতা আছে, খদ্দের ফিরিয়ে দিতে পারে। এদের তাও নেই। তাদের খদ্দের যে মহান সুলতান।

অটোমান সুলতানরা ছিলেন পবিত্র কাবা শরিফের রক্ষক। তাঁদের প্যালেসে কোরানের অসংখ্য পবিত্র বাণী। আর তাদের এই অনাচার?

হারেমের প্রধান ফটকে কোরান শরিফের যে আয়াতটি উদ্ধৃত—

> 'বিশ্বাসীগণ, তোমরা নবির কক্ষে প্রবেশ কোরো না, যখন তোমরা
> চাও। কেবলমাত্র অনুমতি নিয়েই এই ঘরে প্রবেশ কোরো।'
>
> (সূরা আজাব, আয়াত ৫০)

তাঁদের সময়ে অটোমান সুলতানরা ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিমান সম্রাট। তাঁরা তাঁদের শক্তি প্রকাশ করবেন, ঔদ্ধত্য দেখাবেন, এটাই স্বাভাবিক। হারেমের দরজায় কোরানের বাণী লিখবেন যে বাণী নবিজি (সঃ)-এর জন্যই শুধু প্রযোজ্য। তারা কি নিজেদের নবি ভাবতেন?

হারেম পরিচালনা করত নপুংসক করে দেওয়া খোজারা। তুরস্কে তখন দু'ধরনের খোজা পাওয়া যেত। সাদা চামড়ার খোজা আর আফ্রিকার কালো চামড়ার খোজা। হারেমের দায়িত্বে ছিল কালোরা। সাদারা ছিল প্রহরী।

খোজা করার বিভৎস প্রক্রিয়া সংগ্রহ করেছি। পাঠকদের জানানোর ইচ্ছা বোধ করছি না। সে সময়ে অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না। জটিল অপারেশনে জীবাণু সংক্রমণে খোজা করার প্রক্রিয়ায় বেশিরভাগ মারা যেত। যারা মারা যেত তারা ভাগ্যবান। দুর্ভাগ্য তাদের যারা বেঁচে থেকে লাস্যময়ী তরুণীদের মাঝখানে স্থান পেত। তরুণীরা তাদের সামনেই নগ্ন হয়ে টার্কিশ বাথে স্নান করত। সাজসজ্জা করত। খোজাদের সামনে দেহপ্রদর্শনে অস্বস্তির কিছু নেই। তারা তো মানুষ না। তারা পশু। পশুদের সামনে লজ্জা কিসের ?

সুলতানদের হারেমের দুই ভগ্নির গল্প বলে হারেম প্রসঙ্গের ইতি করি।

এই দুই বোন অটোমান সুলতানের হাতে পরাজিত নৃপতির দুই কন্যা। রক্ষিতা হিসেবে হারেমে তাদের স্থান হলো। তখন নিয়ম ছিল নির্দিষ্ট সময়ে মুক্তিপণ দিয়ে হারেম-কন্যাদের মুক্ত করা যেত।

দুই বোন অপেক্ষা করে আছে, তাদের পলাতক বাবা যেভাবেই হোক মুক্তিপণ দিয়ে তাদের উদ্ধার করবে।

সুলতানের নিয়ম অনুযায়ী ভোরবেলায় তাদের কোরান-পাঠ শেখানো হতো। বাকি দিন ছিল গানবাজনার ট্রেনিং। এই দুই বোন কোরান পাঠ করত, কিন্তু গানবাজনার ট্রেনিং নিত না। তাদের কথা একটাই, মুক্তিপণ দিয়ে আমরা মুক্তি পাব।

সুলতানের আদেশ অগ্রাহ্য করায় সুলতান দুই বোনকে শেষ সুযোগ দিলেন।

সাত দিনের মধ্যে মুক্তিপণ এলে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে, তবে সাত দিন পর থেকে তারা যদি গানবাজনা-নৃত্য শেখা শুরু না করে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ শাস্তি।

দুই বোন সাত দিন পরেও হুকুম মানল না। সুলতানের নির্দেশে চামড়ার থলেতে ভরে তাদের নিক্ষেপ করা হলো বসফরাস প্রণালীতে।

গল্পের শেষ অংশ আছে। সাগরে নিক্ষেপের পরপরই হতভাগিনী দুটির বাবা নিজে মুক্তিপণ নিয়ে উপস্থিত হলেন।

অটোমান সুলতানেরা রাজত্ব করেছেন প্রায় সাড়ে ছয় শ' বছর। সুলতান ছিলেন সর্বমোট ৩৬ জন। একজন-মাত্র সাত বছর বয়সে সুলতান হন। তাঁর নাম মাহমুদ (Mahmood the fourth)।

একজন সুলতানের কথা আমি আনন্দের সঙ্গে বলব। আমি লজ্জিত তাঁর নাম মনে করতে পারছি না। যে বই পড়ে তাঁর সম্পর্কে জেনেছিলাম, সেই বই নিউইয়র্কে ফেলে এসেছি। গায়ক এস আই টুটুলের ওপর দায়িত্ব ছিল বইটি নিয়ে আসার। সে বলেছিল, স্যার, আপনার এই বই না নিয়ে আমি প্লেনে উঠব না। আমার ওয়াদা। সে বই ফেলে গিটার নিয়ে বিমানে উঠেছে।

যাই হোক, আমার পছন্দের এই সুলতানের কথা বলি। তিনি কখনো হারেম সুন্দরীদের দিকে চোখ তুলে তাকান নি। তিনি লোহা বসানো জুতা পরতেন। যখন

হাঁটতেন ঠকঠক শব্দ হতো। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, হারেমের মেয়েরা জুতার ঠকঠক শব্দ শুনে যেন লুকিয়ে যায়। তাদের সাবধান করার জন্যেই আমি এই জুতা পরছি।

এই সুলতান মিনিয়েচার পেইন্টিংয়ের মহা ভক্ত ছিলেন। পারস্য সম্রাট শাহ তামাস্প-এর কাছে তিনিই মিনিয়েচার পেইন্টার পাঠান।

সম্রাট হুমায়ূন পারস্য থেকে এদের নিয়ে আসেন তাঁর দরবারে।

বাদশাহ নামদার নামে আমার একটি উপন্যাসের প্রচ্ছদে মিনিয়েচার পেইন্টিং ব্যবহার করা হয়েছে।

হারেম দেখে শাওন ফিরেছে। তার মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। পুত্র নিষাদ ক্লান্ত এবং বিরক্ত। আমি পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললাম, বাবা! কী দেখেছ ?

সে তোঁতা মুখ করে বলল, কিছু দেখি নাই, শুধু হেঁটেছি। আর হাঁটব না। এখন বাবার মতো বসে থাকব।

শাওন দেখবে সুলতানদের ধনরত্ন। ধনরত্ন আবার একা দেখা যায় না। বিস্ময়ের 'আহ্ উহ' ধ্বনি অন্যরা না শুনলে মজা কী!

বাধ্য হয়ে ধনরত্ন দেখার জন্যে আমাকেও যেতে হলো। আর্দা তার পুত্র নিয়ে স্বামীর পাশে বসল। ধনরত্ন সে অনেক অতিথিকে নিয়ে অনেকবার দেখেছে। আর না।

ইয়াসির বলল, অন্যের ধনরত্ন দেখার প্রয়োজন কী ? নিজের থাকলে প্রতিদিন দেখতাম।

ধনরত্নের মিউজিয়াম যথেষ্ট গোছানো। সব সংগ্রহের ইতিহাস লেখা আছে। কোন সম্রাট বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে কী পাঠিয়েছেন সব লেখা।

মুগ্ধ হলাম চামচ হীরা দেখে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরার নাম 'কোহিনূর', এটি আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। দ্বিতীয় বড় হীরার নাম 'দ্যা হোপ'। এটি আছে নিউইয়র্কের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে। তৃতীয় বড় হীরার নাম 'দ্যা স্পুন' অর্থাৎ চামচ। চামচ আকৃতির এই হীরা অটোমান সুলতানদের সম্পত্তি। এখন টপকাপি প্যালেসের মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। দেখে মনে হলো আগুনের গোলা। রূপকথার বইয়ে 'সাত রাজার ধনের' কথা পাওয়া যায়। এই হীরা সাত রাজার ধন, এতে সন্দেহ নেই।

ধনরত্নের গল্প থাকুক, বরং পবিত্র নিদর্শন সংগ্রহশালার কথা বলা যাক। অটোমান সুলতানেরা মুসলমানদের অতি পবিত্র নিদর্শন একটা বড় হলঘরে জমা করেছিলেন। সেই হলঘরে তিন শ' বছর দিবারাত্র হাফেজরা ক্রমাগত কোরান পাঠ করে গেছেন।

এই পবিত্র কক্ষ সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার পর এখন শুধু দিনের বেলায় কোরান পাঠ করা হয়। ক্যাসেট বাজানো হয় না, হাফেজরা কোরান পাঠ করেন। আমি ইয়াসিরকে বললাম, চলো পবিত্র ঘরে ঢুকি। সে বলল, না।

আমি বললাম, না কেন ?

ইয়াসির বলল, অজু নাই, তাই যাব না।

এখানে ঢুকতে অজু করতে হয়?

অনেক অমুসলমানও যায়। তারা অজু করে না। তবে মুসলমানের অজু করে ঢোকা উচিত।

আমি অজু ছাড়াই ঢুকলাম। একটু অস্বস্তি লাগতে লাগল। জুতা পরে ঢোকা যায় না এমন জায়গায় কেউ যদি জুতা পরে ঢোকে তার যেমন লাগে সে রকম। পবিত্র নিদর্শন কক্ষে যেসব নিদর্শন আছে তার কয়েকটি বলি।

মুসা (আঃ)-এর লাঠি

এই সেই লাঠি যা মেঝেতে ফেলে দিতেই সাপ হয়ে যায়। ফেরাউনের জাদুকরদের সব সাপ গিলে ফেলে। লাঠিটা পেয়ারাগাছের সরু ডালের মতো। লাঠিটার শেষ প্রান্ত বাঁকা না, সোজা। লাঠির মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি নিচে গাছের কাণ্ড থেকে শাখা বের হয়েছে। মনে হয় মুসা (আঃ) এইখানেই হাত রাখতেন।

এখন আমার কিছু প্রশ্ন আছে। এত পুরনো লাঠি ঘুণ ধরে ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়ার কথা। এখনো ঝকঝক করছে কীভাবে?

মানুষ লাঠি ব্যবহার করে হাঁটার সুবিধার জন্যে। এই লাঠিতে সেই সুবিধা পাওয়া যাবে না।

এটিই যে সেই লাঠি তার পক্ষে প্রমাণ কী কী আছে?

নবি ইউসুফ (আঃ)-এর পাগড়ি

ইউসুফ-জুলেখার ইউসুফ নবি। পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবান পুরুষ হিসেবে যিনি স্বীকৃত। গান গাওয়ার অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে বেহেশতিরা তার গান শুনতে পাবেন। আমাদের লোকগানে এই নবি এসেছেন—

'প্রেম কইরাছে ইউসুফ নবি
তাঁর প্রেমে জুলেখা বিবি গো....'

আমি শাওনের কানে কানে বললাম, ইউসুফ নবির পাগড়ি এখনো নতুনের মতো।

শাওন বলল, তুমি পবিত্র ঘরে ঢুকেছ, এটা মনে রাখবে। মন থেকে অবিশ্বাস দূর করো।

আমি বললাম, অবশ্যই। মনের অবিশ্বাসের জন্যে 'সরি'।

নবিজির (সঃ) কক্ষ

এখানে আছে তাঁর ভাঙা দাঁতের একটি অংশ। একটি দাড়ি। তাঁর নিজের স্বাক্ষর করা আরবিতে লেখা একটি চিঠি। তাঁর পবিত্র

পদচিহ্ন (সোনা দিয়ে বাঁধানো)।

পদচিহ্ন বিষয়ে আমার কিছু কথা আছে। নবিজির পায়ের ছাপ পৃথিবীর বেশ কিছু বড় বড় মিউজিয়ামে আছে। এই মুহূর্তে কায়রোর মিউজিয়ামের একটির কথা মনে পড়ছে। সমস্যা হচ্ছে, পদচিহ্নের একটির সঙ্গে আরেকটির মিল নেই। তাহলে সমস্যা কোথায় ?

নবিজির পরিধেয় একটি আস্তিন আছে। নবিজিকে এই আস্তিন উপহার দিয়েছিলেন একজন কবি। কবির নাম কা'ব বিন জুহেইর। এই কবি নবিজিকে নিয়ে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেই কবিতাও উৎকীর্ণ করা আছে।

আমি আস্তিনের সামনে কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়ালাম। কারণ আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরান শরিফে কবিদের নগণ্য করেই দেখা হয়েছে—

সূরা ২৬ আয়াত ২২৪

And the poets it is those staying in evil, who follow them.

সূরা ২১ আয়াত ৫

No they say these are medleys of dreams—No he forged it—No he is but a poet.

সূরা ৩৭ আয়াত ৩৬

And say, what! Shall we give up our gods for the sake of a poet possessed ?

সূরা ৫২ আয়াত ৩০

Or do they say—"A poet! We await for him some calamity by time."

নবিজির আস্তিনটিতে রমজান মাসে অটোমান সুলতানেরা একবার চুমু খেতেন। আস্তিন যেন নষ্ট না হয় তার জন্য আস্তিনের ওপরে মসলিনের রুমাল বিছিয়ে চুমু খাওয়া হতো। আস্তিনটি কালো উলজাতীয় সুতায় তৈরি।

হযরত আলি (রাঃ)-র তরবারি

তরবারির যে আকৃতি যে বিশালত্ব তাতে কারও পক্ষেই তরবারি উঁচু করা সম্ভব না বলে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। হযরত আলির শরীরে অবশ্যই অতিমানবীয় শক্তি ছিল।

নবিজির কন্যা ফাতেমার (রাঃ)-এর জায়নামাজ

জায়নামাজটি বেশ বড়। তিনি যে জামা পরে নামাজ পড়তেন, সেই জামাটিও সংরক্ষিত আছে।

পবিত্র কক্ষে ঢুকে মুসলমানমাত্রই আবেগে অভিভূত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। এই আবেগ যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে তা পবিত্র কক্ষে উপস্থিত না হলে বোঝার উপায় নেই। একপর্যায়ে সবাই কাঁদতে শুরু করে। ধর্ম সম্ভবত আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে কাজ করে। একসময় দেখি, শাওনের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। অশ্রুজল ছোঁয়াচে রোগের মতো, আমার চোখও ভিজে উঠল। পুত্র নিষাদ অবাক হয়ে বলল, বাবা, সবাই কাঁদছে কেন? আমি এখানে থাকব না। আমার ভয় লাগছে।

আমি অভিভূত হৃদয়ে পুত্রের হাত ধরে বের হয়ে এলাম।

বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দিনের শেষ এবং রাতের শুরুর মধ্যবর্তী সময়টা আমার জন্যে খারাপ। এই সময়ে আমি এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করি।

ইয়াসিরদের বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে তুর্কি কফির মগ নিয়ে বসেছি। বিচিত্র অস্থিরতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। তখন মনে হলো, মস্ত ভুল করেছি। সুলতানের হারেম আমার দেখা উচিত ছিল। এই হারেমে কত তরুণীর দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ভাসছে। তার একটি দীর্ঘশ্বাস যদি শুনতে পেতাম। তাদের পায়ের নূপুরের রিনঝিন শব্দ, গানের একটি কলি!

আমি পরের দিন হারেম দেখতে যেতে চাই এবং সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে চাই শুনে ইয়াসিরের চোখ কপালে উঠে গেল। সে বলল, কেন?

আমি বললাম, হারেম-কন্যাদের ফিসফিসানি শুনতে চাই, দু'একটা গানের কলি শুনতে চাই।

ইয়াসির বলল, ওদের তুমি পাবে কোথায়? শূন্য হারেম খাঁ খাঁ করছে।

আমি বললাম, ইয়াসির! আমি একজন লেখক। লেখকেরা অলৌকিক সুর শুনতে পায়।

শাওন বলল, ব্রাদার ইয়াসির। আমার স্বামীর মাথায় গল্প ঘুরছে। সে মনে হয় হারেম-কন্যাদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস কিছু লিখতে চায়।

শাওন ঠিকই ধরেছে। হারেমের দুই বোনের গল্প আমি অন্যভাবে লিখতে চাই। এই দুই বোন বড় হলো অটোমান সুলতানের হারেমে। তাদের উপহার হিসেবে পাঠানো হলো পারস্য সম্রাটের কাছে। সেখান থেকে তাদের পাঠানো হলো সম্রাট আকবরের দরবারে।

পরপর দু'দিন আমার কাটল হারেমে ঘুরে ঘুরে। ইয়াসির সারাক্ষণ আমার পাশে রইল। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাকে দেখে মাঝে মাঝে বলে, কোনো কথাবার্তা কি শুনতে পাচ্ছ ?

হারেমে ঘুরে ঘুরে আমি অনেক কিছুই জানলাম। জানার উৎস গাইড এবং বইপত্র। কিছু উল্লেখ করছি।

কান্নাঘর

কোনো হারেম-কন্যার যদি প্রাণখুলে কাঁদতে ইচ্ছা হতো, এই ঘরে ঢুকে কাঁদত। একজন কেরানি (খোজা) এই ঘরের রোস্টার রাখতেন। কোন মেয়ে কখন এই ঘরে ঢুকেছে, কতক্ষণ কেঁদেছে—তার হিসাব।

নির্বাচিতা ঘর

সুলতান কোন ভাগ্যবতীর সঙ্গে রাত কাটাবেন তা একদিন আগে ঠিক করা হতো। কে ঠিক করতেন ? সম্রাট স্বয়ং, না অন্য কেউ—তা জানতে পারি নি। প্রধান নির্বাচিতার সঙ্গে আরও কয়েকজনকে রাখা হতো। যদি শেষ মুহূর্তে মূল নির্বাচিতাকে সুলতানের পছন্দ না হয়।

কেরানি ঘর

এই ঘর সুলতানের শোবার ঘরের কাছেই। তিনজন খোজা কেরানি খাতাপত্র নিয়ে এই ঘরে থাকত। তাদের কাজ, কোন মেয়ে সুলতানের সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছে, কখন বের হয়েছে, তার হিসাব রাখা।

রাতের অভিজ্ঞতা নিয়ে মেয়েগুলো কারও সঙ্গে গল্পগুজব করছে কি না, তাও কঠিনভাবে লক্ষ রাখা হতো। রাতের অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প করার শাস্তি—চামড়ার ব্যাগে সেলাই করে বসফরাসে ফেলে দেওয়া।

হারেমে সময় কাটানোর জন্যে ইস্তাম্বুলের দর্শনীয় কিছুই আমার দেখা হয় নি। শাওন দেখেছে।

হায়া সুফিয়া (হাজিয়া সুফিয়া)
নীল মসজিদ
হিপোড্রাম
মিশরের আবলিস্ক
সারপেনটাইন কলাম

ইস্তাম্বুল বিষয়ে জানার জন্যে আমি একটা বই কিনলাম। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তুর্কি লেখক ওরহান পামুকের *Istanbul : Hatiralar Ve Sehir*।

অর্থ হলো—*ইস্তাম্বুল : স্মৃতির শহর*।

ইয়াসিরের বজ্র আঁটুনি থেকে মুক্তি পেতে এই বইটি আমাকে সাহায্য করেছে। কীভাবে করেছে বলি। আমি ইয়াসিরকে বললাম, এই বইটি আমি মূল টার্কি ভাষায় পড়তে চাই। তুমি আমাকে ভালোমতো এই ভাষা শেখাও, যাতে আমি লিখতে ও পড়তে পারি।

ইয়াসির বলল, সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার। কম করে হলেও এক বছর লাগবে।

আমি বললাম, এক বছর তো তুমি আমাদের রাখবে, তাই না?

ইয়াসিব হো হো করে হেসে ফেলে বলল, তুমি রসিক আছ। ঠিক আছে তোমাদের প্লেনের টিকিট কনফার্ম করছি। তোমাকে আমি একটা উপহার দিতে চাই। কী চাও বলো?

আমি বললাম, সস্তা ধরনের উপহার, নাকি দামি?

ইয়াসির বলল, অবশ্যই দামি। বলো কী চাও?

আমি বললাম, দামি উপহার হলে তোমার হৃদয়টা দিতে পারো।

ইয়াসির অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বন্ধু! আমার হৃদয় তো প্রথম দিনেই তোমাকে এবং তোমার পরিবারকে দিয়ে দিয়েছি।

ইয়াসিরের চোখ ছলছল করছে। তার এই বাড়িতে নিশ্চয়ই হারেমের মতো আলাদা কান্নাঘর নেই। সে কি আমার সামনেই কাঁদবে?

> 'The life of this world is but play and amusement.'
> 'এই জগৎ হলো খেলা এবং আনন্দের।'
>
> [সূরা ৪৭, আয়াত ৩৬।]

শহরে ভবঘুরে

আমার দশজন প্রিয় লেখকের মধ্যে একজন হলেন ন্যুট হামসুন। *ভ্যাগাবন্ড* তাঁর একটি উপন্যাসের নাম। লসঅ্যাঞ্জেলসে আমি যে হোটেলে উঠেছি, তার নাম 'ভ্যাগাবন্ড ইন'। যে যুবক আমার ভ্রমণ-সংক্রান্ত বিষয় দেখছে বাঙালি সমাজে ভ্যাগাবন্ড হিসেবে তার ভালো পরিচিতি আছে।

যুবকের নাম শংকু আইচ। জাদুর রাজ্যের বরপুত্র জুয়েল আইচের ছোটভাই। হলিউডে তার একটা দোকান আছে। কর্মচারীরা সেই দোকান দেখাশোনা করে। সে ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশের অনেক লেখকই একাধিকবার তার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। আমার আগের জন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

শংকু আইচ এই লেখককে পরম আদরে নিজের বাড়িতে রেখেছে। শীর্ষেন্দু স্বপাক আহার করেন, অন্যের হাতের ছোঁয়া খান না। শংকু নিরামিষ কাটা ধোয়া করে লেখকের হাতে তুলে দিয়েছে, লেখক নিজে রান্না করেছেন।

আমি শুরুতেই বলে দিয়েছি, কারও অতিথি নারায়ণ হওয়ার কোনো বাসনা আমার নেই এবং আমি কোনো বাঙালির (সে আমার যত কাছেরই হোক) সঙ্গে দেখা করতে চাই না। কারও বাসায় দাওয়াত খেতে চাই না। কারও গাড়িতে লিফট নিতে চাই না। আমেরিকায় রেন্ট-এ-কার পাওয়া যায়। যে সাত দিন লসঅ্যাঞ্জেলস থাকব, সেই সাত দিন একটা গাড়ি থাকবে আমার সঙ্গে।

শংকু সবই মানল।

বাস্তব চিত্র ভিন্ন। আমাকে ঘুরতে হলো তার গাড়িতে। অনেক নিমন্ত্রণ খেতে হলো এবং লসঅ্যাঞ্জেলসের সব বাঙালির সঙ্গে আমার দেখাও করিয়ে দিল। জয় বাবা শংকুনাথ!

এলএ-তে আমার দশ দিন থাকার পরিকল্পনা। পায়ের তলায় সর্ষে নিয়ে ঘুরব না। পায়ের তলায় থাকবে খড়ম। খড়ম পায়ের মন্দাক্রান্তা ছন্দে ভ্রমণ।

এলএ ভ্রমণের পরিকল্পনা শুনে আমার এক বন্ধু ('মাঝে মাঝে তব দেখা পাই'-টাইপ বন্ধু, একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক) বললেন, আপনার এলএ ভ্রমণের দায়-দায়িত্ব আমাব। আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলে যাবেন। এয়ারপোর্ট থেকে আমার মেয়ে আপনাকে রিসিভ করবে। তার বিশাল বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। আপনি যেখানে যেতে চান সে আপনাকে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, সব ব্যবস্থা শংকু আইচ করে রেখেছে।

কোন শংকু, জুয়েলের ভাই?

হুঁ।

শংকু তো ভ্যাগাবন্ড। দেখবেন এয়ারপোর্টে আপনাকে নিতে আসবে না। সব ভুলে অন্যকোথাও চলে যাবে। দশ দিন পর ফিরবে।

আমি বললাম, কথা দিয়ে ফেলেছি, এখন তো আর বদলানো যাবে না।

আপনি আমার মেয়ের টেলিফোন নম্বর রেখে দিন। শংকুর কারণে বিপদে পড়লে আমার মেয়ে ছুটে আসবে।

এয়ারপোর্টে নেমে মনে হলো, গোলাম সারওয়ার ভাইয়ের উপদেশ শোনা উচিত ছিল। থুক্কু, নাম বলে ফেললাম। শংকু আইচ আমাদের নিতে আসে নি। মালামাল নিয়ে বের হয়ে এসেছি। অন্য যাত্রীরা চলে যাচ্ছে। সময় কাটানোর জন্যে কফি খেলাম, সিগারেট খেলাম।

শাওন কিছুক্ষণ পরপর টেলিফোন করছে এবং শুকনো মুখ করে বলছে, কেউ টেলিফোন ধরছে না। অতএব আবার কফি পান, আবার সিগারেট।

পুত্র নিষাদ বলল, বাবা, আমরা কি এয়ারপোর্টেই থাকব?

আমি বললাম, অবস্থা সে রকমই মনে হচ্ছে।

ঘুমাব কোথায়?

বেঞ্চে ঘুমাব। দেখছ না বেঞ্চ আছে!

বেঞ্চ থেকে আমি পড়ে যাব, তখন ব্যথা পাব।

আমি বললাম, বিদেশে বেড়াতে এলে শুধু আনন্দ পেলে হয় না, ব্যথাও পেতে হয়।

পুত্রের সঙ্গে দার্শনিক কথাবার্তা বলছি, তখন শাওন এসে বলল, শংকু আইচের মুখ কি চারকোনা?

আমি বললাম, মুখের কোনা গুনে দেখি নি। কেন বলো তো?

চারকোনা মুখের এক বাঙালি ভদ্রলোক কুকুর কোলে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। একটু এসে দেখো তো ইনি শংকু আইচ কি না।

আমি বললাম, শংকু আইচ আর যা-ই করুক, কুকুর কোলে নিয়ে ঘুরবে না। ফুলের তোড়া নিয়ে আসবে। এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না, ভেনডিং মেশিন থেকে কফি নিয়ে এসে কফি খাও।

কুকুর কোলে যে ভদ্রলোক ঘোরাঘুরি করছিল সে-ই শংকু। তার কোলের বস্তু কুকুর না, ফুলের তোড়া। ফুলের তোড়া এমনভাবে বানানো যে, দেখে মনে হয় কোলে থাকার কুকুর (ল্যাপ ডগ)। বিশেষ এই ফুলের তোড়া শংকু কিনেছে নিষাদের জন্যে।

'কুকুর ফুল' দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলো শাওন। সে বারবার বলছে, কী চমৎকার আইডিয়া! এই জিনিস একমাত্র আমেরিকাতেই সম্ভব।

গাড়িতে উঠে শংকুকে বললাম, তোমার মধ্যে ভ্যাগাবন্ড স্বভাব কী আছে?

শংকু বলল, আমি ভুলোমন, কিন্তু ভ্যাগাবন্ড না।

আমি বললাম, ভ্যাগাবন্ড হওয়া খারাপ কিছু না। বাংলা ভাষায় 'ভবঘুরে' শব্দটি আদর ও মমতার সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। ভবঘুরের একটি প্রতিশব্দ অবশ্যি তুচ্ছার্থে ব্যবহার করা হয়। তুমি কি 'বাদাইম্যা' শব্দটি শুনেছ ?

শংকু বলল, সর্বনাশ!

আমার প্রশ্নের উত্তর সর্বনাশ কখনো হতে পারে না। আমি বললাম কী সর্বনাশ ?

আপনার কথা শুনতে শুনতে যাচ্ছিলাম। রাস্তা ভুল করে ফেলেছি। হোটেলে ফিরতে দেরি হবে, এইজন্যে বলেছি, সর্বনাশ।

প্রথম দিনেই শংকুর ভুলো মনের আরও দু'টি পরিচয় পাওয়া গেল। নিষাদ বলল, ম্যাকডোনাল্ডের বার্গার খাব।

শংকু বলল, বার্গার আনতে বিশ মিনিট লাগবে। যেতে দশ মিনিট, আসতে দশ মিনিট। কুড়ি মিনিটের মাথায় চাচ্চু তোমার বার্গার চলে আসবে। কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে না ?

নিষাদ বলল, পারব।

শংকু কুড়ি মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। তার হাতে বার্গার নেই। সে হাসিমুখে গল্প করছে। আমি অস্বস্তির কারণে কিছু বলতে পারছি না। নিষাদ বলল, চাচা, আমার বার্গার ?

হতভম্ব শংকু বলল, তাই তো! তার কাছে জানা গেল, সে ম্যাকডোনাল্ড থেকে 'কিডস মিল' কিনেছে। কাউন্টারে দাম শোধ করে আবার না নিয়েই চলে এসেছে।

এখন দ্বিতীয় ঘটনা। ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট থেকে সে আমাদের জন্য প্রচুর খাবারদাবার নিয়ে এসেছে। সে জানে আমার ভাতপ্রীতি আছে। ভাত ছাড়া অন্য যে-কোনো খাবারই আমার কাছে নাশতার মতো লাগে।

অনেক রাত। বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে আমি আর শাওন খেতে বসেছি। নানান রকমের ভর্তা, ভাজি। কয়েক পদের মাছ। গরুর মাংস, মুরগির মাংস। দু'পদের ডাল। কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, টক আচার, মিষ্টি আচার। শুধু ভাত নেই। শংকু নিশ্চয়ই ভাত আনতে ভুলে গেছে।

আমি ডাল দিয়ে মেখে মাছ খাচ্ছি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও ফেলতে পারছি না।

শাওন বলল, যে রকম ভুলোমনের মানুষ, একদিন দেখা যাবে আমাদের বেড়াতে নিয়ে ফেলে রেখে চলে আসবেন।

আমি বললাম, এই সম্ভাবনা একেবারেই যে নেই তা না।

বলো কী ?

আমি বললাম, তোমার শঙ্কা দূর করি। মানুষ হিসেবে জুয়েল আইচ কেমন ?

শাওন বলল, অতি ভালো মানুষ।

আমি বললাম, এই অতি ভালো মানুষকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে যা হয় তার নাম শংকু আইচ। চার বছর আগে শংকুর সঙ্গে আমার দু'দিনের জন্য পরিচয় হয়েছিল। মাত্র দু'দিনের পরিচয়ে আমি তাকে একটা বই উৎসর্গ করি। এমন ঘটনা আগে ঘটে নি।

শাওন বলল, উৎসর্গপত্রে তুমি কী লিখেছিলে তা আমার মনে আছে।

আমি বললাম, নিশ্চিন্ত মনে ভর্তা মাখিয়ে মুরগির মাংস খাও, তোমার ভালো লাগবে। কল্পনা করে নিলেই হলো, ভাত দিয়ে মাংস খাচ্ছ।

তুমি কি তা-ই করছ ?

আমি বললাম, অবশ্যই তা-ই করছি। কল্পনা করছি গরম কালিজিরা চালের ধোঁয়া ওঠা ভাত।

শাওন বলল, তোমাদের লেখকদের অনেক সুবিধা। ধন্য কল্পনাশক্তি।

ভোরবেলা শংকু গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছি ?

শংকু বলল, আপনার পছন্দ হবে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের এলএ ভ্রমণের প্রথমদিন শুরু হলো।

শংকু আমাদের নিয়ে গেল এক কবরখানায়। আমি এবং শাওন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। শংকু বলল, আপনার বই পড়ে জেনেছি, মৃত্যু-বিষয়ে আপনার বিরাট কৌতূহল। এইজন্যই কবরখানায় নিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, খুব ভালো করেছ।

এই কবরখানার নাম Forest lawn।

আমি বললাম, সুন্দর নাম।

মাইকেল জ্যাকসনের কবর এইখানে। তবে কোথায় কবর তা গোপন। ভক্তরা খবর পেলে হাড়গোড় নিয়ে যাবে। হুমায়ূন ভাই, গাড়ি থেকে নামুন।

নিতান্ত অনিচ্ছায় গাড়ি থেকে নামলাম।

শংকু বলল, কবর ব্যবসা আমেরিকানদের খুব ভালো ব্যবসা। খাবারের দোকান, হোটেলের চেইন থাকে। ম্যাকডোনাল্ডের চেইন, বারগার কিং-এর চেইন। কবরখানারও চেইন আছে। Forest lawn-এর চেইন সারা আমেরিকা জুড়ে আছে।

এটা নতুন তথ্য। শুনে ভালো লাগল। কবরখানা দেখেও ভালো লাগল। সবুজ ঘাসের চাদর, ঘাস কাটার মেশিনে চমৎকার করে কাটা। প্রতিটি কবরের নামফলকের পাশে রঙ-বেরঙের ফুল। পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর। তারচেয়েও অবাক কাণ্ড—গানবাজনা হচ্ছে, একপাশে ছবির এক্সিবিশন। অতি স্বল্প বয়স্ক দুই তরুণী গিটার হাতে নাচানাচি করছে।

শংকু বলল, কবরস্থান একটি ভীতিপ্রদ জায়গা—এই কনসেপ্ট এরা বদলে দিতে চাচ্ছে। এখানে নাচ হয়, গানবাজনা হয়, মেলা হয়। সবাই আনন্দ করে।

আমেরিকানরা ফান লাভিং জাতি। কবরখানায় নর্তন কুর্দন করবে, এটাই স্বাভাবিক।

আমরা থাকতে থাকতেই শবযাত্রার বিশাল গাড়িবহর ঢুকল। নিয়ম অনুসারে দিনের বেলাতেও প্রতিটি গাড়ির হেডলাইট জ্বালানো। প্রতিটি গাড়িতে হলুদ রঙের কাপড়ের পতাকা। পতাকায় লেখা—Funeral (শবযাত্রা)।

শংকুর কাছে শুনলাম শবযাত্রার গাড়িবহর যখন যায়, তখন আশপাশের সব গাড়িকে থেমে যেতে হয়। একমাত্র শবযাত্রার গাড়ি রাস্তার লাল স্টপ সিগনালেও না থেমে চলে।

রেড সিগনালে গাড়ি না থেমে চলে যাওয়ার অনুমতি আমেরিকানদের কাছে বিশাল ব্যাপার।

মৃত আমেরিকানরা এই সম্মান পায়। যারা এই দুর্লভ সম্মান পায়, তারা সম্মানের বিষয়টা জানতে পারে না।

আমেরিকান কবরস্থান নিয়ে আমার মায়ের একটি সুন্দর গল্প আছে। তিনি একবার কিছুদিনের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন। উঠেছেন আমার ছোটভাই জাফর ইকবালের নিউ জার্সির বাসায়।

সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তিনি একা। ছেলে-ছেলের বউ চলে যায় কাজে। নাতি-নাতনি যায় স্কুলে। মা খুবই একা হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর একাকিত্ব দূর করার ব্যবস্থা করলেন। একদিন বেড়াতে বের হয়ে কবরখানা আবিষ্কার করে ফেললেন। ঝকঝকে কবরস্থান, ফুলে ফুলে ভরা। তিনি রোজ সেখানে যান। কবরে শায়িতদের জন্য দোয়া খায়ের করেন। অজিফা পাঠ করেন।

একদিন জাফর ইকবাল জিজ্ঞেস করল, রোজ আপনি কোথায় বেড়াতে যান?

মা বললেন, কবরস্থানে। দোয়া খায়ের করি, অজিফা পাঠ করি, আমার ভালো লাগে।

আপনার হাঁটার দূরত্বে তো কোনো কবরস্থান নেই। আপনি কোথায় যাচ্ছেন কে জানে! আমি আজ আপনার সঙ্গে যাব।

মা উৎসাহ নিয়ে ছেলেকে কবরস্থান দেখাতে নিয়ে গেলেন। জাফর ইকবাল স্তম্ভিত হয়ে দেখল কবরস্থানটি কুকুরদের জন্য। আমেরিকানদের প্রিয় কুকুর এখানে সমাহিত হয়।

মায়ের দোয়া খায়ের অজিফা পাঠ সবই বিফলে গেল। কুকুরদের পরকালে ত্রাণ পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। যতদূর জানি, একটি মাত্র কুকুর ত্রাণ পাবে, তার নাম 'কিতমির', যে তার প্রভুদের সঙ্গে গুহায় ঘুমন্ত। তার ঘুম ভাঙবে রোজহাশরের ভয়ংকর দিনে।

আমরা দ্বিতীয় দিনের ভ্রমণে বের হয়েছি। খানিকটা শংকিত, কবরস্থানের মতো কোথাও উপস্থিত হই কি না! এবার হয়তো শংকু নিয়ে যাবে মানুষকে যেখানে দাহ করা হয় সেখানে।

আমেরিকানদের শ্মশান দর্শনীয় হতে পারে।

শংকু শ্মশানে নিয়ে গেল না, আমাদের এক মানমন্দিরে নিয়ে গেল। অতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, হুমায়ূন ভাই! আপনি আকাশ দেখতে ভালোবাসেন বলে আপনাকে মানমন্দিরে নিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, অ।

শাওন বলল, অ!

হতাশার কারণে শাওনের 'অ' ধ্বনিও মিয়ানো।

আমি শংকুকে বললাম, তোমার মানমন্দির দেখার আইডিয়া অসাধারণ। তবে আজ কেন জানি খুব ক্লান্ত লাগছে। জেট লেগ তৃতীয় দিনে ভালোমতো জানান দেয়। আরেকদিন এসে মানমন্দির দেখলে কেমন হয়?

শংকু বলল, আপনারা রেস্ট নিন। আমরা আরেকদিন আসব। মানমন্দির পালিয়ে যাচ্ছে না।

তৃতীয় দিনের কথা। আমাদের কিছু বোঝার আগেই শংকুর গাড়ি এসে মানমন্দিরে থামল। আমি শাওনকে কানে কানে বললাম, মানমন্দির না দেখা পর্যন্ত শংকু রোজ আমাদের এখানে আনতে থাকবে। তারচেয়ে চলো মানমন্দির দেখি।

শাওন মুখ কালো করে মানমন্দিরে ঢুকল। কোথায় হলিউড, ডিজনিল্যান্ড আর কোথায় বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড, অবজারভেটরিতে ছায়াপথ দর্শন!

আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে শাওনকে জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে মুগ্ধ কী দেখে হয়েছ?

সে বলল, গ্রিফিথ মানমন্দির।

শাওন সত্য ভাষণ করেছে। যে মানুষটির নামে এই মানমন্দির তাঁর প্রসঙ্গে কিছু বলে নেই।

হিন্দু মিথলজিতে স্বর্গের ধনভাণ্ডারির নাম কুবের। সেই থেকে ধনবানদের আমরা আদর (?) করে বলি 'ধনকুবের'।

আমেরিকানরা মিথলজির ধার ধারে না। তারা ধনসম্পদ সংখ্যায় প্রকাশ করে। কেউ মিলিয়নিয়ার, কেউ বিলিয়নিয়ার। গ্রিফিথ জেনকিংস গ্রিফিথ ছিলেন বিলিয়নিয়ারেরও উপরে, ট্রিলিয়নিয়ার।

অর্থোপার্জন করেছেন খনি ব্যবসা করে। নিঃসন্তান মানুষ। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বিষাক্ত।

তিনি ঠান্ডা মাথায় স্ত্রীকে খুন করার পরিকল্পনা করলেন। বেড়ানোর কথা বলে স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন সমুদ্রপাড়ের এক রিসোর্টে। স্ত্রীর মাথায় খুব কাছ থেকে পিস্তলের গুলি করে

পুলিশকে জানালেন, The bitch is dead. Arrest me. কুকুরী মারা গেছে। আমাকে গ্রেফতার করো।

স্ত্রী কিন্তু মারা যায় নি। পিস্তলের গুলিতে একটা চোখ শুধু নষ্ট হয়েছে।

হত্যাচেষ্টার অভিযোগে গ্রিফিথের সাজা হয়ে গেল। স্ত্রীর বিষাক্ত সঙ্গ থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে আনন্দিত হয়ে জেলে ঢুকলেন।

ব্যাংকে তার ডলারের পর্বত, এভারেস্টের কাছাকাছি পৌঁছল। মেয়াদ শেষ করে গ্রিফিথ জেলখানা থেকে বের হলেন। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটকে জানালেন, তিনি তাঁর সব সম্পদ সরকারকে দান করতে চান। একটি শর্ত আছে। মানমন্দির স্থাপন করতে হবে। এমন মানমন্দির যেখানে সাধারণ মানুষ যাবে। আকাশ দেখবে। মানমন্দির স্থাপনের সমস্ত খরচও তাঁর।

লুফে নেওয়ার মতো প্রস্তাব, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। কারণ কোনো স্টেট অপরাধীর দান নিতে পারে না।

মৃত্যুর পর আর গ্রিফিথ অপরাধী রইলেন না। মৃত মানুষ অপরাধী না। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট গ্রিফিথের দান গ্রহণ করল। এই দানে নগদ অর্থ ছাড়াও আছে সাত হাজার একর জমি। এই জমিতে এখন আছে—

> গ্রিক থিয়েটার। (গ্রিফিথ জেনকিংস গ্রিফিথ গ্রিক ছিলেন, সেই সম্মানে গ্রিক থিয়েটার।)
> গলফ ক্লাব।
> ক্যাম্পিংয়ের জায়গা।
> ঘোড়া চড়ার জায়গা।
> অতি দৃষ্টিনন্দন পার্ক।
> প্রথম শ্রেণীর এক মানমন্দির।

গ্রিফিথের মানমন্দির নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কারণটা মজার।

তিনি যৌবনে একবার কোনো-এক অবজারভেটরি থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বিস্ময় সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে।

মানমন্দিরে ঢোকার মুখেই গ্রিফিথের একটি বাণী।

> 'পৃথিবীর সব মানুষ যদি একবার মাত্র মানমন্দির থেকে দুরবিন দিয়ে আকাশ দেখত তাহলে সবাই তাদের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা ধরতে পারত। সবার মানসিকতাই যেত পাল্টে।'

গ্রিফিথের মানমন্দির সাধারণকে আকাশ দেখার অতি আধুনিক এক মানমন্দির।

আমি শাওনকে নিয়ে মানমন্দিরের প্রতিটি ঘর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস পুরোটাই ধরা আছে। সে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

মানমন্দির প্রসঙ্গে বাংলাদেশের এক মন্ত্রীর গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছি না। আওয়ামী লীগের মন্ত্রী নাকি বিএনপির মন্ত্রী, সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। জিনিস একই; একই মদ, বোতল শুধু ভিন্ন।

এস্ট্রলজারদের এক সভায় মন্ত্রী উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, সরকার তাদের জন্য একটি মানমন্দির তৈরি করে দেবেন। এস্ট্রলজাররা খাবি খেলেন। কারণ তারা আকাশ দেখেন না। তারা ভাগ্য গণনা করেন। মানুষের জন্মতারিখ দিয়ে ঠিকুজি তৈরি করেন। কার কোন রত্ন ব্যবহার করতে হবে সেই নিদান দেন। মানমন্দির দিয়ে তারা করবেন কী?

আমি গ্রিফিথ মানমন্দির দেখে কী পরিমাণ মুগ্ধ হয়েছি তার উদাহরণ দেই। অবজারভেটরির বিক্রয়কেন্দ্র থেকে আমি একটা টেলিস্কোপ কিনে ফেলি। আমার তিনটি টেলিস্কোপ নুহাশপল্লীতে পড়ে আছে, তাতে কী? গ্রিফিথ মানমন্দিরের স্মৃতিচিহ্ন।

গ্রিফিথ মানমন্দিরে আমার পুত্র নিষাদের একটি ঘটনা আছে। ঘটনা বয়ান করছি।

এই অবজারভেটরিতে একটি প্লানেটোরিয়ামও আছে। সেখানে নানান শো হয়। পনের মিনিটের শো। এই শোতে আকাশ দেখানো হয়। জীবনে একবারই প্লানেটোরিয়ামে ঢুকেছি—কলকাতায়। এখন ঢাকায়ও হয়েছে। শুনেছি ঢাকার প্লানেটোরিয়ামও দর্শনীয়।

গ্রিফিথ মানমন্দিরের প্লানেটোরিয়াম নিশ্চয়ই অন্য রকম কিছু হবে। বিজ্ঞপ্তি পড়ে তা-ই মনে হলো। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হচ্ছে, তুমি যদি অস্বস্তি বোধ করো, তোমার যদি মাথায় চক্কর দিতে থাকে, তাহলে চোখ বন্ধ করে ফেলবে।

একটা সমস্যা দেখা দিল। নিষাদ গোঁ ধরল সেও আকাশ দেখবে। চার বছরের নিচের বাচ্চাদের প্রবেশ নিষেধ। কারণ তারা ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করে। শংকু বলল, হুমায়ূন ভাই! মিথ্যা করে কি বলতে পারবেন নিষাদের বয়স চার না, পাঁচ?

আমি বললাম, জ্ঞান অর্জনের জন্য মিথ্যা অবশ্যই বলতে পারব। শাওন বলল সেও পারবে। দুজন কয়েকবার রিহার্সেল দিলাম। যেই বলবে, ছেলের বয়স কত?—আমরা বলব, পাঁচ। রোগা বলে ছোট ছোট লাগছে। নিষাদের জন্য টিকিট কেনা হলো।

গার্ড আমাদের আটকাল। মুখ গম্ভীর করে বলল, এই ছেলের বয়স কত?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, চার। রোগা বলে ছোট লাগছে। বলেই বুঝলাম ভুল হয়ে গেছে। হতাশ চোখে শাওনের দিকে তাকালাম। তার মাথায়ও জট লেগে গেল। সে বলল, ওর বয়স আসলেই চার। রোগা বলে ছোট লাগছে।

গার্ড বলল, চার বছর বয়েসী বাচ্চা নিয়ে ঢুকতে পারবে না। কাউন্টারে গিয়ে ওর টিকিট জমা দিয়ে ডলার নিয়ে নাও।

আমার সংবিত ফিরল। আমি কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম, আমার এই ছেলের বয়স চার, তবে সে অতি শান্ত ছেলে। সে কখনো ভয় পেয়ে কাঁদবে না। আমি আমার ছেলেকে চিনি। তুমি চেনো না।

গার্ড বলল, ঠিক আছে, তাকে নিয়ে ঢোকো।

শো শুরু হলো।

পর্দায় থ্রি ডাইমেনশন ছবি। আমার কাছে মনে হলো ঘরভর্তি সব মানুষ অকল্পনীয় গতিতে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছি। ধারাভাষ্য শুনে জানলাম, আমরা যাচ্ছি মঙ্গল গ্রহের দিকে। লাল মঙ্গল গ্রহ ক্রমেই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

নিষাদ কেঁদে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা, আমাকে আকাশ থেকে নামাও। বাবা, তুমি মাকেও আকাশ থেকে নামাও। আমি আকাশে থাকব না।

সব দর্শক মঙ্গল গ্রহের দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি পুত্রকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। দরজায় গার্ডের সঙ্গে দেখা। সে ভুরু কুঁচকে বলল, তুমি বলেছিলে তোমার ছেলে কাঁদবে না।

আমি বললাম, জীবনের প্রথম মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছে বলেই সামান্য ভয় পেয়েছে। এত দূরের গ্রহে তো আগে কখনো যায় নি।

গার্ড হেসে ফেলল। আমেরিকানরা জাতি হিসেবে রসিক।

বাবা, মাকে বাঁচাও

শাওনের মুখে পূর্ণচন্দ্রের হাসি। এই হাসি বলে দিচ্ছে, আনন্দময় কিছু তার জীবনে ঘটেছে, কিংবা ঘটতে যাচ্ছে। কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। শংকু গাড়ি নিয়ে আমাদের নিতে এসেছে, এইটুকু জানি। রোজই কোথাও-না-কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি। আজও যাব। পুরনো রুটিন। আমার কাছে খানিকটা একঘেয়ে। আনন্দভ্রমণ যখন রুটিনে পড়ে যায় তখন একঘেয়ে হয়ে যায়।

চীন সরকারের আমন্ত্রণে লেখকদের একটি দল বেইজিং গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সেই দলে ছিলাম। ভোর সাতটার মধ্যে আমাদের বের হতে হতো। গাইড (মহিলা, খাণ্ডারনি) গাড়ি নিয়ে আসত ছ'টায়। শুরু করত চেঁচামেচি—'গাড়িতে ওঠো', 'গাড়িতে ওঠো'। সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত টানা প্রোগ্রাম—এই দেখো, সেই দেখো। আমি হোটেলে ফিরতাম সীমাহীন ক্লান্তি নিয়ে। আমাদের ভ্রমণের মেয়াদ ছিল এক মাস। এই এক মাসে বেড়ানো বিষয়টি আমার কাছে বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, পরিবারের সকল সদস্য এবং দু'একজন বন্ধুবান্ধব না নিয়ে আমি এই জীবনে আর কখনো দেশের বাইরে যাব না। সিদ্ধান্তের কোনো রদবদল হয় নি। আমি পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব না নিয়ে দেশের বাইরে যাই নি।

সবচেয়ে বড় দল নিয়ে গিয়েছিলাম কাঠমুণ্ডু। দলের সদস্য সংখ্যা তেত্রিশ। নিজে আনন্দ করেছি, ভ্রমণসখাদের আনন্দ দেখেও আনন্দ পেয়েছি।

এবারও পরিবার নিয়ে বের হয়েছি। বয়সের কারণে আগের মতো ছোটাছুটি করে আনন্দ করতে পারি না। মনে হয় নতুন দেশ দেখার আনন্দ পাইও না, তবে শাওন ও তার দুই পুত্রের আনন্দ দেখে ভালো লাগে। মনে হয় একজীবনে অনেক পেয়েছি, আর না হলেও চলে। এখন অনন্ত নক্ষত্রবীথির দিকে শেষ ভ্রমণের প্রতীক্ষা করা যেতে পারে।

গাড়িতে উঠে শাওনের আনন্দময় ঝলমলে মুখের রহস্য বের হলো। আজ আমরা যাচ্ছি 'ডিজনিল্যান্ডে'। আজকের ভ্রমণ জ্ঞান আহরণমূলক ভ্রমণ না, আনন্দ আহরণমূলক ভ্রমণ।

ডিজনিল্যান্ডে ঢুকে পুত্র নিষাদ আধাপাগলের মতো হয়ে গেল। তার স্বপ্নের মিকিমাউস বাস্তবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মিকিমাউস এসে নিষাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করল। তার সঙ্গে ছবি তুলল। পুরনো এক স্মৃতি মনে পড়ল। ১৯৭৬ সাল। প্রথম আমেরিকায় এসেছি। উঠেছি ছোটভাই জাফর ইকবালের সিয়াটলের অ্যাপার্টমেন্টে। সে বড়ভাইকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে কোনো-এক শিশুবিনোদনকেন্দ্রে নিয়ে গেল। সেখানে মিকিমাউস ছিল। আমি মিকিমাউসের সঙ্গে আগ্রহ নিয়ে ছবি তুললাম। সাতাশ বছরের যুবক যদি আনন্দ নিয়ে মিকিমাউসের সঙ্গে ছবি তোলে তাহলে শিশুর দল তো আধাপাগল হবেই।

পুত্র নিষাদ এবং নিষাদ-মাতার আনন্দ এভারেস্টের চূড়া স্পর্শ করল যখন ডিজনি শোভাযাত্রা বের হলো। ডিজনি ক্যারেক্টাররা নাচতে নাচতে, গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। এই আসছে সাত বামুন এবং তুষারকন্যা। তার পেছনেই জাঙ্গল বুকের বাঁদরের দল। শাওন ক্লান্তিহীন ছবি তুলে যাচ্ছে। আমি পুত্রকে ঘাড়ে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। নাচ-গান করতে করতে ডিজনির চরিত্ররা এগুচ্ছে। পুত্র নিষাদ ঘাড়ে বসে প্রত্যেকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে—বাবা! দেখো দেখো গুফি। বাবা, এই দেখো লিটল মারমেইড। .

ধূমপায়ীরা যে-কোনো আনন্দের সঙ্গে সিগারেট যুক্ত করে। ডিজনিল্যান্ড দেখতে দেখতে প্রবল সিগারেটের তৃষ্ণা পেল। স্মোকিং জোনে গিয়ে যে সিগারেট ধরাব তার উপায় নেই। পুত্র নিষাদ আমার হাত ছাড়ছে না। সারাক্ষণ তার সঙ্গে থাকতে হবে। সে যা দেখছে তা আমাকেও দেখতে হবে।

রাত অনেক হয়ে গেল। শুরু হলো আতশবাজির খেলা। আলোর অপূর্ব খেলা দেখতে দেখতে পুত্র নিষাদ ঘোষণা করল, সে হোটেলে ফিরবে না। রাত এখানেই কাটাবে।

আনন্দেরও ক্লান্তি আছে। সেই ক্লান্তি সারা শরীরে নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। শংকু ঘোষণা করল, আগামীকাল আমরা যাব 'ইউনিভার্সেল স্টুডিও'। ডিজনিল্যান্ডের চেয়েও মনকাড়া।

ইউনিভার্সেল স্টুডিওতে আগেও এসেছি। পরিবার নিয়েই এসেছি। আগের সেটআপ। তিন কন্যা—নোভা, শীলা, বিপাশা এবং তাদের মা। তারা কেমন আনন্দ করেছিল তা মনে নেই। বর্তমান পরিবারের আনন্দ দেখে কিছুটা হয়তোবা মনে পড়বে।

ইউনিভার্সেল স্টুডিওতে ঢুকে সবার আনন্দ হলো বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো। শুরুতেই চমক—এক লোক শূন্যে ভাসছে। কী কায়দায় এটা সম্ভব হলো জানি না, তবে কাচের এক ঘরে মানুষটা যে শূন্যে ভাসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টিকিট কাটলে দর্শনার্থীরাও শূন্যে ভাসতে পারবে। শাওন বলল, আমি শূন্যে ভাসব।

মা যা বলে পুত্র নিষাদ তা-ই বলে। সে বলল, আমিও মা'র সঙ্গে শূন্যে ভাসব।

আমি বললাম, Ok, ফেরার পথে মাতা-পুত্রের শূন্যে ভ্রমণ।

আমরা শুরু করলাম ইউনিভার্সেল স্টুডিওর বিখ্যাত মনোরেল রাইড দিয়ে। মনোরেল এগুবে এবং নানান ঘটনা ঘটতে থাকবে। ঝড়-বৃষ্টি প্লাবণ হবে, ছবিতে কার রেস যেমন হয় তা হবে। ফিল্মের বাস্তবতা কেমন এবং তা কীভাবে করা হয়, তা-ই দেখানো। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ থ্রিডিতে কিংকং দেখা।

আমরা আনন্দের ইনজেকশন নিতে নিতে এগুচ্ছি—একসময় বলা হলো, থ্রিডি চশমা পরে নিতে হবে। আমরা চশমা পরলাম। ঘোষণা দেওয়া হলো, ভয় পেলে চোখ বন্ধ করলেই হবে। আমরা ভয় পাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছি। ভয় নামক আবেগও যে আনন্দের উৎস হতে পারে তা এই রাইড নিলেই বোঝা যায়। থ্রিডির কিংকং এতই বাস্তব যে ভয়ে আমার নিজের কলজে শুকিয়ে গেল।

কিংকং একা থাকলে পার পাওয়া যেত, তার সঙ্গী প্রকাণ্ড এক মাকড়সা ঝাঁপ দিয়ে শাওনের মাথায় পড়ল। শাওন 'মাগো!' বলে চিৎকার দিয়ে হাতের দামি ক্যামেরা ফেলে দিল। নিষাদ চেঁচাতে লাগল, বাবা! মাকে তুমি বাঁচাও। বাবা, মা'কে বাঁচাও।

মা'কে কী করে বাঁচাব ? বদ মাকড়সাটা শাওনের মাথা থেকে এখন আমার দিকে আসছে। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম এবং মনে মনে ভাবলাম—টেকনোলজি কোন পর্যায়ে গেলে এই জিনিস সম্ভব! বর্তমান টেকনোলজি পরাবাস্তব তৈরিতে সক্ষম।

শাওনের দামি ডিজিটাল ক্যামেরা এই রাইডে হারিয়ে গেল। এই ক্যামেরায় সে ইস্তাম্বুল এবং আমেরিকার প্রায় তিন শ' ছবি তুলেছে। ক্যামেরার সঙ্গে ছবিও চলে গেছে। এই দুঃখে সে কাতর। তাকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না। ছবিগুলো হচ্ছে স্মৃতি। ছবি হারিয়ে যাওয়া মানে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া।

আমি শাওনের হাতে হাত রেখে বললাম, শাওন শোনো, ছবি যখন তুমি তুলেছ তখন মনের ক্যামেরাতেও ছবি উঠেছে। এই ছবি কখনো হারাবে না। চোখ বন্ধ করলেই মনের ক্যামেরায় প্রতিটি ছবি দেখবে। এটা ভালো না ? হাছন রাজা তো বলেই গেছেন—'আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপরে'।

শাওনকে সান্ত্বনা দেওয়ার আমার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হলো। সে যখন চোখের পানি ফেলার উপক্রম করছে তখন এগিয়ে এল পুত্র নিষাদ। সে তার মা'কে বলল, আমি বন্দুক দিয়ে গুলি করে কিংকংকে মেরে ফেলব। আর যে মাকড়সাটা তোমার মাথায় বসেছিল তাকেও মারব। আর তোমাকে একটা লাল ক্যামেরা কিনে দেব।

শাওন মনে হয় পুত্রের কথায় আনন্দ পেয়েছে। তার ঠোঁটের কোণে হাসি।

সে তার পুত্রকে জড়িয়ে ধরেছে। পুত্র তার মায়ের গালে চুমু খাচ্ছে।

সঙ্গে ক্যামেরা থাকলে এই পবিত্র ছবি তোলা যেতে পারত। হায়রে, ক্যামেরা নেই।

ঈশ্বরের দীর্ঘশ্বাস

বিখ্যাত লেখক মার্ক টোয়েন *(টম স্যয়ার, হাকলবারি ফিনের দুঃসাহসিক অভিযান)* আমেরিকার একটি জায়গা সম্পর্কে বলেছেন—ঘোর নাস্তিক যদি এখানে আসে, সেও ঈশ্বরে বিশ্বাসী হবে।

জায়গাটা গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন।

আমেরিকার আরেক মহান লেখক জন স্টেইনবেক গ্র্যান্ড ক্যানিয়নকে বলেছেন 'ঈশ্বরের দীর্ঘশ্বাস'।

আমরা এলএ থেকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের দিকে যাচ্ছি। গাইড শংকু, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মোরশেদ। মোবশেদ, শংকুর জিগরি দোস্ত। লম্বা ভ্রমণে শংকুর মোরশেদকে প্রয়োজন হয়।

নিবিড় নামের একটি বালকও যাচ্ছে। নিবিড় যাচ্ছে লোভে পড়ে। তার লোভ আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র নিনিতকে কোলে নেওয়া এবং আদর করার সুযোগ। শিশু নিনিত বালক নিবিড়ের মন হরণ করেছে। নিবিড় বলছে, নিনিত ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আমেরিকায় আসবে, কিন্তু তখন সে বড় হয়ে যাবে। যত বেশি সময় নিনিতের সঙ্গে থাকা যায়, এখন নিবিড়ের সেই চেষ্টা। নিবিড়ের পরিচয়, সে শংকুর একমাত্র পুত্র।

যাত্রার শুরুতেই বিপত্তি। পুলিশ গাড়ি থামাল। হাসিমুখে জানতে চাইল, কত স্পিডে গাড়ি চলছে তা কি জানো?

শংকু বলল, অফিসার, স্পিড মনে হয় বেশি হয়েছে। রেন্ট-এ-কার থেকে এই গাড়ি নিয়েছি। এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠি নি।

পুলিশ বলল, এটা স্বাভাবিক। তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে।

আগে দেখো নি?

আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি, আমার বন্ধুরা দেখে নি। তাদের নিয়ে যাচ্ছি।

পুলিশের অন্তরঙ্গ কথাবার্তা শুনে আমার ধারণা হলো, শংকু মনে হয় এ যাত্রা পার পেয়ে গেল। মোরশেদকে কানে কানে তা-ই বললাম।

মোরশেদ বলল, অসম্ভব। তিন শ' ডলার ফাইন করবে। পয়েন্ট কাটবে। সব করবে হাসিমুখে।

পুলিশের কাছ থেকে নিস্তার পেয়ে শংকুর কাছে জানলাম, তাকে পাঁচ শ' ডলার জরিমানা করেছে। দুই পয়েন্ট কেটেছে। ড্রাইভিং লাইসেন্সের সঙ্গে দশ পয়েন্ট দেওয়া হয়। সব পয়েন্ট কাটা গেলে ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল।

গাড়ি হাইওয়েতে উঠেছে। আমি শংকু এবং মোরশেদের কথাবার্তা শুনছি। পুলিশের টিকিট খাওয়া বিষয়ক গল্প। সব দেশের মানুষেরই গল্পের প্রিয় প্রসঙ্গ থাকে। বাংলাদেশের মানুষদের প্রিয় প্রসঙ্গ রাজনীতি নিয়ে আলাপ। আমেরিকানদের প্রিয় প্রসঙ্গ পুলিশের টিকিট খাওয়ার গল্প। তাদের জীবনের অনেকখানি পুলিশের টিকিটে ধরা খাওয়া।

আমরা যাচ্ছি মরুভূমির ভেতর দিয়ে। বৃক্ষশূন্য কঠিন মরুভূমি। ক্যাকটাস জাতীয় কিছু গাছ মাঝে মধ্যে চোখে পড়ছে। মরুভূমির সঙ্গে উটের নাড়ির বাঁধন। আমেরিকার এই মরুভূমি (মাহাবি ডেজার্ট) উটশূন্য। যতদূর চোখ যায় বালি আর বালি। হঠাৎ হঠাৎ কিছু বাড়িঘর দেখা যায়। শাওন বলল, এই বিজনভূমিতে কারা থাকে?

মোরশেদ বলল, মানসিক রোগীরা থাকে। মেন্টাল পেশেন্ট ছাড়া কারা এভাবে থাকবে?

শুনলাম ঘটনা নাকি আসলেই তাই। পুলিশ মাঝে মাঝে এইসব বাড়িঘরে অভিযান চালিয়ে বিচিত্র মানসিকতার লোকজন ধরে নিয়ে আসে।

বাবা নিজের মেয়েকে বছরের পর বছর মেঝের নিচের ঘরে (বেসমেন্ট) আটকে রাখে এবং...

এবং ব্যাখ্যা করলাম না।

দুর্বোধ্য মানসিকতার লোকজন বাংলাদেশেও আছে। মা তার সন্তানদের হত্যা করেছে—এ ধরনের খবর বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোতেও ছাপা হয়। শুধু আমেরিকাকে দোষ দিয়ে লাভ কী?

আমি আমেরিকায় থাকতে থাকতেই পত্রপত্রিকায় অতি রূপবতী ২৯ বছর বয়সী মায়ের গল্প ছাপা হলো। তার নাম কা ইয়াং (Ka Yang), সে তার ছয় সপ্তাহ বয়সের সন্তানকে মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ঢুকিয়ে, ওভেন চালু করে হত্যা করেছে। হত্যাকাণ্ডে সে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে, বাংলাদেশি মায়ের সঙ্গে তার পার্থক্য এইটুকুই।

যে মরুভূমির ওপর দিয়ে যাচ্ছি তাকে নিয়ে অদ্ভুত সব গল্পগাথা আছে। আমি দেখেছি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে। বড় বড় পাথর কোনো কারণ ছাড়াই স্থান পরিবর্তন করে।

বালিয়াড়িতে মাঝে মাঝেই অদ্ভুত সুরধ্বনি ওঠে। ক্যালটেকের পদার্থবিদ্যার একদল ছাত্র নানান যন্ত্রপাতি বসিয়ে সুরধ্বনির উৎস বের করার চেষ্টায় আছে।

এই মরুভূমিতেই জীববিজ্ঞানীরা কিছু জীবাণু শনাক্ত করেছেন, যাদের খাদ্য লৌহজাতীয় বস্তু। তারা সন্দেহ করছেন, এই জীবাণু কার্বনঘটিত না।

এই মরুভূমির নিচেই লুকানো পৃথিবীর বৃহত্তম জলভাণ্ডার। মাটির নিচে বিশাল হ্রদ। এর পানি মিষ্টি এবং বিশুদ্ধের চেয়েও বিশুদ্ধ (Purest of the pure)।

আমেরিকানরা এই জলভাণ্ডারের এক ফোঁটা পানিও খরচ করছে না। তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে রেখে দিয়েছে। একসময় সুপেয় পানির তীব্র অভাব দেখা দেবে, তখনই শুধু গোপন জলভাণ্ডার ব্যবহার করা হবে।

পৃথিবীর মিষ্টি পানির দশ ভাগের মালিক একটি দরিদ্র দেশ। দেশের নাম বাংলাদেশ। তবে আমরা জাতি হিসেবে কামেল। আমরা প্রকৃতির এই উপহার বিষাক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সাফল্য আসতে খুব বেশি দেরি নেই।

মাহাবি ডেজার্টের একটি অংশ নিয়ে আমেরিকানদের জল্পনা-কল্পনা এবং কৌতূহল সীমাহীন। এখানে অনেকটা জায়গা নিয়ে একটি সামরিক স্থাপনা আছে, নাম খুব সম্ভব 'ডিসট্রিক ফিফটিওয়ান'। স্থাপনার নিরাপত্তা দুর্ভেদ্য। সেখানে কী আছে বা কী কবা হচ্ছে তা গোপন। এই গোপনীয়তাও বিস্ময়কর। আমেরিকানদের একটি বড় অংশ বিশ্বাস করে, মহাকাশযানে করে আসা একদল ভিনগ্রহবাসীকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে। আমেরিকানরা তাদের কাছ থেকে টেকনোলজি হাতিয়ে নিতে চাচ্ছে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ মুখ খোলেন না। নাছোড়বান্দা সাংবাদিকদের বলেন, রিসার্চের কাজে এই স্থাপনা ব্যবহার করা হয়।

কী রিসার্চ ?

রিসার্চের বিষয় গোপন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যে প্রকাশ করা যাবে না।

আপনাদের হাতে কি ভিনগ্রহের কেউ বন্দি ?

নো কমেন্ট।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

সন্ধ্যা নামল এবং আমাকে অভিভূত করে থালার মতো চাঁদ উঠল। কোনো ভাঙা চাঁদ না। আস্ত চাঁদমামা। সুযোগ হয়েছে মরুভূমিতে পূর্ণ চাঁদের দৃশ্য দেখা।

দৃশ্য কেমন ?

পুরোপুরি বর্ণনা করতে পারব না। গদ্যের ভাষায় এই বর্ণনা দেওয়া যাবে না, কাব্যভাষা লাগবে, যার ওপর আমার কোনো দখল নেই।

দৃশ্যটা ইহজাগতিক মনে হয় না। মনে হয় অন্য কোনো ভুবনের দৃশ্য। কিছুটা হলেও ভৌতিক। চাঁদের আলো মরুভূমির পাথরের কালো পাহাড়ে পড়ছে। পাহাড়গুলোকে আরও কালো করে দিচ্ছে। কালো বস্তু আলো বিকিরণ করে না, প্রতিফলিতও করে না, কিন্তু কালো পাহাড়গুলো অদ্ভুত এক আলো ছড়াচ্ছে। আমি বেশ কয়েকবার বললাম, কী দেখছি এইসব ? শাওনকে বললাম, তোমার কেমন লাগছে বলো তো ?

সে বলল, শরীর ঝিমঝিম করছে।

শংকু বলল, গাড়ি থামাই। আপনারা গাড়ি থেকে নামুন।

আমি শাওনকে নিয়ে নামলাম। সে ক্যামেরা হাতে নামল। এই ক্যামেরা নতুন কেনা হয়েছে। আমি বললাম, ক্যামেরা রেখে আসো।

সে বলল, কেন ?

কারণ আছে।

কারণটা কী ?

প্রকৃতির এই দৃশ্য মানব-মানবীকে হাত ধরাধরি করে দেখতে হয়। ক্যামেরা রেখে আমার হাত ধরো। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখানোর জন্যে আমরা দুজন একসঙ্গে পরম করুণাময়কে ধন্যবাদ দেব।

আমরা অনেক রাতে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কাছেই একটা বিশাল র‍্যাঞ্চে ঢুকলাম। র‍্যাঞ্চের নাম Quality Inn। খুবই আধুনিক ব্যবস্থা। শুধু ঘোড়ার গায়ের বিকট গন্ধে জীবন যাওয়ার উপক্রম হলো।

র‍্যাঞ্চে প্রচুর ঘোড়া। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দর্শনার্থীরা ঘোড়ায় চড়েন। প্রচুর খচ্চরও আছে। অতি সাহসীরা খচ্চরের পিঠে চড়ে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন গহ্বরে ঢুকে যান। হেলিকপ্টার সার্ভিসও আছে। বিত্তবানরা হেলিকপ্টারে চড়ে ক্যানিয়নে নামেন। এটি হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র জায়গা যেখানে হেলিকপ্টার ভূমি থেকে ওপরে উঠে না। নিচে নেমে যায়। আর নামবেই না কেন ? গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের গভীরতা এক মাইল। এমন গভীর খাদ কীভাবে সৃষ্টি হলো সেই রহস্যের সমাধান হয় নি।

একদল বলেন, কলোরাডো নদী ভূমিক্ষয় করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

আরেকদল বলেন, ভূমিকম্পের কারণে এমন হয়েছে।

তৃতীয় একদল বলেন, এই খাদ ভিনগ্রহবাসীদের তৈরি। তারা বিশেষ কোনো খনিজের অনুসন্ধানের জন্যে এক মাইল গভীর খাল কেটেছে। আমেরিকানরা UFO ভক্ত জাতি। কোনো-না-কোনোভাবে তারা [illegible] নিয়ে আসবে, এটাই স্বাভাবিক।

রাত দশটা, র‍্যাঞ্চের বাইরে বসে চাঁদের আলোয় স্নান করতে করতে চা খাচ্ছি। মোরশেদ বলল, স্যার, আজ আমার জন্মদিন।

আমি বললাম, শুভ জন্মদিন।

মোরশেদ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, জন্মদিন উপলক্ষে একটু বেয়াদবি করতে চাই, যদি অনুমতি দেন।

অনুমতি দিলাম।

মোরশেদ ব্যাগ খুলে তিনটা রেড ওয়াইনের বোতল বের করল এবং অতি দ্রুততায় দুই বোতল একাই শেষ করল। সে একেকবার গ্লাস হাতে নেয়, আবেগমথিত গলায় বলে, শুভ জন্মদিন মোরশেদ। তারপর গ্লাসে চুমুক। এক চুমুকেই গ্লাসের বস্তু নেমে যায়।

কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না, ভালোমানুষের পেটে অ্যালকোহল সহ্য হয় না। মোরশেদ সম্ভবত ভালোমানুষ—তার শুরু হলো বমি। শুধু বমিতে ঘটনার সমাপ্তি হলো না, এর সঙ্গে যুক্ত হলো দাস্ত।

মোরশেদ ও শংকু আমার পাশের ঘরে। তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।

মোরশেদ : শংকু, মারা যাচ্ছি।

শংকু : হাগতে হাগতে কেউ মারা যায় না।

মোরশেদ : নোংরা কথা বলছ কেন ?

শংকু : তুমি সারা ঘর, বিছানা, বালিশ নোংরা করে ফেলেছ, আমি নোংরা কথা বলতে পারব না ?

মোরশেদ : তোমার সঙ্গে আসা ভুল হয়েছে।

শংকু : আমার সঙ্গে আসা ভুল হয় নি। তুমি যে ভাবিকে গোপন করে বোতল এনেছ, এটাই ভুল হয়েছে।

মোরশেদ : তোমার ভাবি যেন কিছু না জানে।

শংকু : আমি ভাবিকে কিছু বলব না, হুমায়ূন ভাইকে নিয়ে ভয়।

মোরশেদ : স্যারের সঙ্গে তো তোমার ভাবির দেখা হবে না।

শংকু : তা হবে না, কিন্তু বইয়ে যদি লিখে ফেলেন...।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকাল।

আমরা গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দর্শনে বের হয়েছি। আমরা বলা ভুল হবে। মোরশেদ সঙ্গে নেই, সে বাথরুমে আটক। আমি নিজেও দলের সঙ্গে নেই। অনেকটা দূরে একা বসে আছি। আমার উচ্চতা-ভীতি আছে। দোতলার বারান্দা থেকে নিচে তাকালে মাথায় চক্কর দিয়ে ওঠে। আমার পক্ষে এক মাইল গভীর খাদের দিকে তাকানোর প্রশ্নই ওঠে না। আমি এর আগেও দু'বার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে এসেছিলাম, সেই দু'বারও দূরে বসে সময় কেটেছে।

প্রকৃতি সবাইকে সব দৃশ্য দেখায় না। এটি প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব।

এলাচি বেগমের স্বদেশযাত্রা

মোরশেদের গল্প বলা হয়েছে। এখন তার মায়ের গল্প বলা যাক। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীতে একই সময় একই চেহারার পাঁচজন মানুষ বাস করে। তাদের চেহারাই যে শুধু একরকম তা না, আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনাও এক।

এলাচি বেগমের সঙ্গে অন্যপ্রকাশের কর্ণধার মাজহারুল ইসলামের মা'র চেহারার অস্বাভাবিক মিল দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। মাজহার এবং তার ভাইদের এলাচি বেগমের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, কার ছবি ?

সবাই বলেছে, মা'র ছবি।

এখন মূল গল্প।

এলাচি বেগমের বয়স পঁয়ষট্টি। একটি মাত্র ইংরেজি শব্দ সম্বল করে বরিশাল থেকে লসঅ্যাঞ্জেলস চলে এসেছেন। শব্দটি হলো ওয়াটার। তিনি উচ্চারণ করেন ওয়াটর। ট-এর আকার বাদ দেন। মাঝে মাঝে নিজের মনে ওয়াটর উচ্চারণ করতে তাঁর ভালো লাগে। প্লেন থেকে নামার পরপর তাঁর ছেলে মোরশেদ বলল, মা, ভালো আছ ?

তিনি বললেন, হুঁ।

কোনো অসুবিধা হয়েছিল মা ?

তিনি বললেন, না।

এখানে প্রথম কিছুদিন অসুবিধা হবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।

তিনি লজ্জিত গলায় বললেন, ওয়াটর ?

মোরশেদ বলল, ওয়াটর কী ?

তিনি বললেন, ওয়াটর হইল পানি।

মা, পানি খাবে ?

তিনি বললেন, না।

মার্সিডিজ গাড়িতে করে মোরশেদ তার মাকে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি মোরশেদ চালাচ্ছে, মাকে বসিয়েছে ড্রাইভিং সিটের পাশে। মহিলা আগ্রহ নিয়ে নতুন দেশের শহর দেখছেন। মোরশেদ বলল, এখানে পান, সুপারি, জর্দা সবই পাওয়া যায়। যত ইচ্ছা জর্দা দিয়ে পান খাবে।

তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, আচ্ছা।

মোরশেদ বলল, তোমার সামনের ডালাটা খোলো। এখানে বানানো পান নিয়ে এসেছি। একটা পান মুখে দাও। এলাচি বেগম পান মুখে দিয়ে বললেন, ওয়াটর।

ওয়াটর কোথায় শিখেছ ?

বিমানে।

বিমানে কি কোনো অসুবিধা হয়েছে ?

নামাজে অসুবিধা হয়েছে। আর কোনো অসুবিধা নাই।

নামাজে অসুবিধা হয়েছিল কেন ?

অজুর ব্যবস্থা ছিল না।

কোনো সমস্যা নাই মা। কাজা নামাজ পড়বে।

আচ্ছা।

গ্রামের বাড়ির জন্য খারাপ লাগছে মা ?

না। তোর বাপের জন্য খারাপ লাগতেছে।

মোরশেদ খানিকটা বিস্মিত হলো। তার বাবা ছয় বছর হলো মারা গেছেন। মা'র কি স্মৃতিশক্তি বিষয়ক সমস্যা হচ্ছে ? আলঝেইমার্স।

মা! বাবা তো মারা গেছেন ?

জানি। উনার 'কব্বর' আছে। কব্বরের জন্যে খারাপ লাগতেছে। রোজ জিয়ারত করতাম।

জিয়ারত দূর থেকেও করা যায় মা। আমার বাসা থেকে জিয়ারত করবে।

আচ্ছা।

আরেকটা পান খেতে ইচ্ছা হলে খাও। এই কাপে পানের পিক ফেলবে। গাড়িতে ফেলবে না।

আচ্ছা।

যখন বেড়াতে বের হবে তখন রাস্তাঘাটে পিক ফেলবে না।

আচ্ছা ফেলব না। পিক গিলে ফেলব।

এলাচি বেগম পুত্রের ফ্ল্যাটবাড়ি দেখে মুগ্ধ হলেন। তাঁর দুই নাতি গ্র্যান্ডমা গ্র্যান্ডমা বলে অনেক চেঁচামেচি করল। তাঁর বৌমা বাথটাবে পানি ঢেলে ফেনা তুলে তাঁকে বসিয়ে দিল।

মা, ভালো লাগছে ?

হুঁ।

গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে শুয়ে থাকুন। দীর্ঘ প্লেন জার্নি। ক্লান্ত হয়ে এসেছেন। খাবার তৈরি আছে। আপনার গোসল শেষ হলেই খাবার দিয়ে দিব।

আচ্ছা।

আপনার ছেলে ভর্তা-ভাজি করতে বলেছে। আমি তা-ই করেছি। আলু ভর্তা করেছি, শিমের ভর্তা করেছি। চ্যাপা শুঁটকি করেছি। আমেরিকায় এখন সবকিছু পাওয়া যায়। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না মা।

এলাচি বেগম আনন্দের হাসি হাসলেন।

কতদিন পরে ছেলেকে দেখলেন মা ?

তের বছর তিন মাস।

এখন সবসময় ছেলেকে দেখবেন। আপনার ছেলে আর চোখের আড়াল হবে না।

আচ্ছা।

আপনার জন্যে আলাদা ঘর রেডি হয়েছে। সেখানে এসি দেওয়া আছে। গরম লাগলে এসি ছেড়ে দিবেন। ঘর ঠান্ডা হয়ে যাবে।

এলাচি বেগম বললেন, আচ্ছা।

আপনার ছেলে কী যে খুশি! আমরা সবাই আপনাকে আনার জন্য এয়ারপোর্টে যেতে চেয়েছিলাম। সে বলেছে, না। আমি একা যাব। এয়ারপোর্টে মাকে জড়িয়ে ধরে আমি কাঁদব। তোমরা থাকলে লজ্জা লাগবে। মা, এয়ারপোর্টে আপনার ছেলে কি কেঁদেছিল ?

কানছে।

মা, আপনি কেঁদেছিলেন ?

না। তোমার শ্বশুরের মৃত্যুর পর আমার কইলজা শক্ত হয়া গেছে। চউক্ষে পানি আসে না।

পানি না আসাই ভালো মা। চোখের পানি দিয়া কী হয়! কিছুই হয় না।

এলাচি বেগম নিজের আলাদা ঘরে ঘুমাতে গেছেন। ছেলে এসে মাখনের মতো নরম একটা চাদর গায়ের ওপর জড়িয়ে দিল। মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আরাম করে ঘুমাও মা।

এলাচি বেগম আরাম করেই ঘুমালেন, তবে ঘুমুবার আগে আগে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন, সকালে ঘুম ভাঙলে তিনি বাংলাদেশের দিকে রওনা হবেন। ছেলেকে কিছু জানানো যাবে না। ছেলে মনে কষ্ট পাবে। বিমানে যাবেন না। হেঁটে রওনা হবেন। সময় লাগবে, তাতে অসুবিধা নাই। সময় লাগুক। মানুষকে জিজ্ঞেস করে করে যাবেন। বলবেন, বরিশাল। বরিশাল সবাই চিনে। পিঁপড়াও চিনে।

আগের মানুষ হেঁটে হেঁটে মক্কায় হজ্ব করতে যেত। আমেরিকা তো মক্কার মতো দূরে না।

পরদিনের কথা। এলাচি বেগমের দুই নাতি স্কুলে গেছে। তার বৌমা এবং ছেলে গেছে কাজে। ছেলে বলল, মা, আমি অফিসে হাজিরা দিয়েই চলে আসব। দুই ঘণ্টা একা থাকতে পারবে না ?

এলাচি বেগম বললেন, পারবেন। মোরশেদ সকাল সাড়ে ন'টায় বাসায় ফিরে দেখে মা নেই।

এলাচি বেগমের পুত্র মোরশেদের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে লসঅ্যাঞ্জেলসের একটা মোটেলে। মোটেলের নাম 'ভ্যাগাবন্ড ইন'। মোরশেদ এখানকার কম্পিউটার-বিষয়ক

এক কোম্পানির বড় কর্মকর্তা। দেশের বাড়িতে তার মা একা থাকতেন। সে অনেক ঝামেলা করে মা'র আমেরিকার কাগজপত্র জোগাড় করেছে।

আমি বললাম, তোমার মা একবস্ত্রে বঙ্গযাত্রা করলেন ?

জি স্যার। শুধু যে একবস্ত্রে তা না, খালি পায়ে।

খালি পায়ে কেন ?

অনেক দূর হাঁটতে হবে, জুতা বা স্যান্ডেল পরে এত দূর হাঁটা কষ্ট হবে তেবে খালি পায়ে। তবে তার শাড়ির ভাঁজে ছিল মিনিয়েচার বোতল। একটা ভদকার আরেকটা জ্যাক ডেনিয়েলের। আমার একটা মিনি বার আছে। মা সেখান থেকে নিয়েছেন।

কেন ?

মা'র সেবা করে এক মেয়ে, নাম সুরাইয়া। তার জন্যে নিয়েছেন। মা ভেবেছেন সেন্টের বোতল।

তারপর কী হলো বলো।

আমার পরিচিত সব বাঙালি মা'র অনুসন্ধানে নেমে পড়ল। বাসার আশপাশে প্রতিটা রাস্তা অনেকবার করে দেখা হলো। বেলা বারোটার সময় মা'র বর্ণনা দিয়ে পুলিশে খবর দিলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন তার খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন আমার বাসায় কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। শীতের সময় টেম্পারেচার রাতে দ্রুত নামতে শুরু করবে।

তারপর ?

রাত একটায় পুলিশ মা'র অনুসন্ধানের জন্যে হেলিকপ্টার নামাল। রাত সাড়ে তিনটায় তারা মাকে খুঁজে পেল বাসা থেকে তেইশ মাইল দূরে।

পুলিশের কাছে জানলাম, যাকে পান তিনি তাকেই বলেন বরিশাল। কেউ জবাব না দিলে বলেন 'ওয়াটর'। ভিক্ষুক মনে করে এক আমেরিকান তাঁকে এক ডলারের একটি নোট দিয়েছিল। তিনি আগ্রহ করে নোট গ্রহণ করেছেন।

আমি বললাম, তোমার মার সঙ্গে আমার দেখা করার খুব শখ। তাঁকে একবার নিয়ে এসো তো।

মোরশেদ বলল, স্যার, মা আমার সঙ্গেই আছেন। তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি। মাকে কখনো একা রাখি না। আমি বা আমার স্ত্রী সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকি।

মোরশেদ তার মাকে নিয়ে এল। সাধাসিধা সরল মহিলা। মাথায় হিজাব। আমি বললাম, কেমন আছেন ?

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, বাবা, আমি ভালো আছি।

আমি আপনার হেঁটে বাংলাদেশে রওনা হওয়ার গল্প শুনছিলাম। তিনি বললেন, উপায়ান্তর না পেয়ে রওনা হয়েছিলাম। বাড়িতে বিরাট ঝামেলা। আমার তেরোটা হাঁস। এর মধ্যে দুইটা পাগলা। যেখানে-সেখানে ডিম পাইড়া থোয়। ডিম খুঁইজ্যা আনতে হবে না ?

আনতে তো হবেই।

পেয়ারাগাছ আছে ছয়টা। এর মধ্যে একটা সৈয়দি পেয়েরা, ভেতরে লাল টুকটুকা। কলমের ব্যবস্থা করেছি। সেই অবস্থায় চইলা আসছি। কলম কাটা হয় নাই। সমস্যা না?

অবশ্যই সমস্যা।

সুরাইয়া বইলা একটা এতিম মেয়ে আমারে সেবা করে। দাদি ডাকে। তারে বলেছি, চিন্তা করিস না, আমি তোরে শাদি দিয়া দিব। এখন তার শাদি কে দিবে? আমি কথার বরখেলাপ হয়েছি না?

তা হয়েছেন।

তের বছর বয়সে আমি স্বামীর ঘর করতে আসছি, তখন থাইকা পুষ্কনিতে মাথা ডুবাইয়া সিনান করা অভ্যাস। এইখানেও সিনান করি। সিনান কি হয়? হয় না।

না হওয়ারই কথা।

বাড়ির সাথেই মোরশেদের বাপের 'কব্বর'। আমি কোরান তেলাওয়াত করি। আগরবাত্তি জ্বালাই। এই কাজগুলো কে করবে? এইখানে আমার ঘুমও হয় না। বাবা, বলেন নিজের দেশের মাটি ছাড়া ঘুম হয়? নিজের দেশের মাটি দবদবায়া হাঁটি। ঠিক বলেছি না বাবা?

অবশ্যই ঠিক বলেছেন।

এই কথাগুলো আপনি আমার ছেলেরে বুঝায়া বলেন। সে আপনারে স্যার স্যার বলতেছে। আপনারে মান্য করে। একটা ধমক দিয়া দেন। ছেলের বাপ বাঁইচা নাই। বাপ বাঁইচা থাকলে, তারে দিয়া একটা ধমক দেওয়াইতাম।

মোরশেদকে কিছু বলার আগেই সে বলল, স্যার, আমি মাকে দেশে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আমার স্ত্রী এবং দুই পুত্রকেও রাজি করিয়েছি। অনেকদিন আমেরিকায় থাকলাম, আর কত!

আমি বললাম, তোমার দুই পুত্রকে নিয়ে যাওয়া অবশ্যই জরুরি। যে পাগলা হাঁসের কথা শুনেছি, তাদের ডিম খুঁজে বের করতে হবে না?

এলাচি বেগমের দিকে তাকিয়ে শাওন বলল, আপনি কি আমাদের সঙ্গে একটা ছবি তুলবেন।

এলাচি বেগম আগ্রহ নিয়ে ছবি তুললেন।

হে বন্ধু হে প্রিয়

আমেরিকানরা স্মার্ট শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করে আমরা তা করি না। আমাদের কাছে স্মার্ট মানে পোশাক-আশাক ভালো। ইস্ত্রি করা। ফট ফট করে কথা বলতে পারে। বাংলা যেমন পারে, ইংরেজিও পারে। ইংরেজি বলার সময় ঘনঘন 'Oh sheet' বলে, শ্রাগ করতেও পারে।

আমেরিকানদের কাছে স্মার্ট হলো বিদ্যা-বুদ্ধিতে স্মার্ট। আলবার্ট আইনস্টাইন আমাদের কাছে স্মার্ট বলে গণ্য হবেন না, লেবেনডিস সায়েনটিস্ট হিসেবে গণ্য হবেন। আমেরিকায় তাঁকে বলা হয়, স্মার্ট, ভেরি স্মার্ট।

স্কুলজীবনে আমার একজন স্মার্ট বন্ধু ছিল। বঙ্গদেশীয় স্মার্ট না, আমেরিকান অর্থে স্মার্ট। তার নাম আহসান হাবীব। ডাক নাম সেলিম। আমরা স্কুল শেষ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে এসেছি। আমাদের সঙ্গে বগুড়া জিলা স্কুলের আরও চারজন ছাত্র আছে। কলেজের ফরম ফিলাপ করতে হবে। স্মার্ট আহসান হাবীব আমাদের লিডার। সে ফরমে যা লিখছে, আমরা সবাই তা-ই লিখছি। কারণ আহসান হাবীব ভুল করবে না।

ফরমে একটি প্রশ্ন হলো, Identification Mark.

আহসান লিখল, Six fingers in right hand.

আমরা সবাই লিখলাম Six fingers in right hand. অথচ আহসান ছাড়া আমাদের কারও ডান হাতেই ছয় আঙুল নেই।

কলেজ কর্তৃপক্ষ এইসব ফরম কখনো পড়ে দেখে না। পড়লে আঁতকে উঠে ভাবত, বগুড়া জেলা স্কুল থেকে আসা এই ছয়জন ছাত্রের প্রত্যেকের ডান হাতে ছ'টা করে আঙুল! ঘটনা কী?

আহসানের স্মার্ট বিষয়টা আমার কত পছন্দ ছিল তার একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। আগেও কোনো-একটা বইয়ে লিখেছি। আরেকবার লেখা দোষণীয় হবে না। সংস্কৃত আপ্ত বাক্যে আছে 'অধিকন্তু ন দোষায়'। এখন ঘটনা বলি—

আমার বাবার অনেক বিচিত্র স্বভাবের একটি ছিল, কিছুদিন পর পর ছেলেমেয়েদের নাম বদলে নতুন নাম রাখা। আমার নাম শুরুতে ছিল 'শামসুর রহমান'। বাবার নাম ফয়জুর রহমান, মিল দিয়ে শামসুর রহমান।

সাত বছর আমি 'শামসুর রহমান' হিসেবে বড় হলাম। অষ্টম জন্মদিনে হয়ে গেলাম হুমায়ূন আহমেদ। আরও আট বছর পর হলে হয়তো বাবা অন্য নাম দিতেন, কিন্তু ইতিমধ্যে S.S.C পরীক্ষার জন্য হুমায়ূন আহমেদ নাম বোর্ডে চলে গেছে। নাম আর বদলানো যাচ্ছে না।

নামের এই জটিলতা আমার মা'কে বড় সমস্যায় ফেলেছিল। বাবা তার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পুত্র শামসুর রহমানকে নমিনি করে গিয়েছিলেন। ছেলের নাম বদলালেও নমিনিতে বদলাতে ভুলে গেছেন।

বাবার মৃত্যুর পর মা আর্থিক চরম সংকটে পড়লেন। বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলতে পারেন না। এই টাকা তুলবে শামসুর রহমান। মা'র কাছে এই নামে কোনো পুত্র নেই।

যাই হোক, আহসান হাবীব প্রসঙ্গটায় ফিরে আসি। আমার বাবা তার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখেন কুদরতে খোদা। সে এই নামেই বড় হচ্ছে। 'খোদা' বলে তাকে ডাকলে সে স্বাভাবিকভাবেই সাড়া দেয়। একদিন আমি অনেক সাহস সঞ্চয় করে বাবাকে বললাম, কুদরতে খোদা নামটা বদলানো যায় না ?

বাবা বললেন, কেন ? এই নাম তো সুন্দর নাম। বাংলাদেশের বিখ্যাত একজন বিজ্ঞানীর নামে নাম।

আমি বললাম, সে বড় হলে এই নামটা তার পছন্দ হবে না। মন খারাপ করবে। সবাই তাকে ডাকবে খোদা! কিংবা কুদরত।

বাবা বললেন, ঠিক আছে যা। তুই একটা নাম দিয়ে দে। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, আমি তার নাম দিলাম আহসান হাবীব।

বাবা বললেন, এই নামটাও ভালো। বাংলাদেশের বিখ্যাত কবির নামে নাম।

আমি বললাম, বাংলাদেশের কবির নামে তার নাম রাখি নাই বাবা। আমার এক বন্ধুর নামে রেখেছি।

বাবা বললেন, ঠিক আছে। এখন থেকে সে কুদরতে খোদা না, আহসান হাবীব। তোর ওই বন্ধু ছেলে ভালো তো ? কারণ নামের আছর পড়ে।

আমি বললাম, শুধু ভালো না, সে অসাধারণ ছেলে!

সারা জীবন ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া আমার অতি মেধাবী বন্ধু কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে চলে যায় আমেরিকার মিশিগানে প্রায় গ্রামের এক জায়গায়। সেখানে মাঝারি মানের এক কলেজে শিক্ষকতা শুরু করে। তার মতো মেধাবী ছেলে আমেরিকায় প্রথম শ্রেণীর যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার যোগ্যতা রাখে। সে কেন মিশিগানের এক গ্রামে নির্বাসিত ?

তাকে নিয়ে নানান উদ্ভট খবরও পাচ্ছি। সে নাকি তালেবান লাইন ধরেছে। মিশিগানের বাঙালি বাড়িতে মিলাদ পড়ায়। নামাজে ইমামতি করে। একইসঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কর্মকাণ্ডও করে। কেউ যখন গান করে সে তবলা বাজায়, বেংগো বাজায়।

প্রতি শনিবারে তার বাড়িতে গানের জলসা বসে। গানের জলসার ফাঁকে ফাঁকে আমার বন্ধু নাকি জোকস বলে। স্থানীয় বাংলা সমিতির যে-কোনো অনুষ্ঠানে তাকে বিশেষ আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় জোকস বলার জন্যে।

ঘটনা কী দেখার জন্যে আমি স্ত্রী এবং দুই পুত্র নিয়ে মিশিগানে উপস্থিত হলাম।

তার বিশাল বাড়ি দেখে আমি মুগ্ধ। আমি বললাম, বাহ্!

আহসান বলল, বাড়ির ডিজাইন আমার। বানিয়েছিও আমি। আমেরিকায় ঘর বানানোর ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং মেটেরিয়েল পাওয়া যায়।

আমি আবারও বললাম, বাহ্।

তার বাড়িতে ঢুকে তৃতীয়বার বললাম বাহ্। কারণ তার ড্রয়িংরুমে পাশাপাশি চারটা বিশাল টিভি। তিনটা টিভিতে বাংলাদেশের তিনটা চ্যানেল একসঙ্গে চলছে। চ্যানেলগুলো হলো—চ্যানেল আই, এটিএন, একুশে টিভি।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তিনটা একসঙ্গে চললে দেখবে কী করে!

আহসানের স্ত্রী কিঞ্চিৎ হতাশ গলায় বললেন, হুমায়ূন ভাই। সব অনুষ্ঠান রেকর্ড হচ্ছে। আপনার বন্ধু আপনাকে আনতে গেছে, অনুষ্ঠান মিস করছে, তাই সব রেকর্ড করা। কিছুই যেন মিস না হয়।

আহসানের বাড়িতে পাঁচটা শোবার ঘর। প্রতিটিতে পবিত্র কাবা শরিফের ছবি। একটা করে জায়নামাজ। জায়নামাজের ওপরে তসবি। দানার তসবি না। ডিজিটাল তসবি। প্রতি ঘরে ছোট্ট কম্পিউটারের মতো এক বস্তু। সেখানে এই দিনকার জন্যে পবিত্র কোরান শরিফের বাণী পর্দায় ভাসছে। আমাদের ঘরের জন্যে প্রথম দিনের বাণী ছিল—

O Children of Adam!
Wear your beautiful apparel
At every time and place of prayer.
(7.31)

আহসানের গ্রামে পড়ে থাকার রহস্য তার কাছেই শুনলাম। তার জবানিতেই বলি।

আমি আনন্দে আমার মতো থাকতে চাই। বড় ইউনিভার্সিটির চাকরির টেনশন নিতে চাই না। টেনিউরের দুশ্চিন্তা, রিসার্চের দুশ্চিন্তা। কী দরকার? আমি সুখে থাকতে চাই।

আমি বললাম, সুখে আছ?

আহসান বলল, সাত দিন তুমি আছ, এই সাত দিনে বুঝে ফেলবে সুখে আছি কি না।

সাত দিন পার হতে হলো না, দ্বিতীয় দিনেই বোঝা গেল। সন্ধ্যাবেলা অতিথিরা আসতে শুরু করল। আহসান তার বেসমেন্টের দরজা খুলে দিল। সেখানে হই হই কাণ্ড রই রই ব্যাপার!

আমেরিকার সব বেজমেন্ট হলো আবর্জনা জমা রাখার গুদামঘর। আহসানের বেজমেন্টে স্থায়ী স্টেজ। লম্বা এক টেবিলে চারটা মাইক। মাইকের পাশে বাদ্যযন্ত্র। সামনে পঞ্চাশজন অতিথি বসার জায়গা, তবে "লাড়কা আলাগ, লাড়কি আলাগ।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল বাদ্যবাজনা শুরু হয়ে গেল। বাদ্যবাজনার ফাঁকে ফাঁকে ফিলার হিসাবে আহসানের জোক বর্ণনা। জোক শুনে অতিথি মহিলারা হেসে একে অন্যের গায়ে তেঙে পড়ে যাচ্ছে; 'ওয়ান মোর, 'ওয়ান মোর' করছে। আমি মনে মনে বললাম 'হলি কাউ'। আহসান হাতের ঘড়ি দেখে হঠাৎ চমকে উঠে বলল, এশার নামাজের টাইম, গানবাজনা বন্ধ। আসো নামাজ পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষরা আহসানের পেছনে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ভাবির (আহসানের স্ত্রী হেলেন) দিকে তাকিয়ে বললাম, তাবি! মেয়েদের নামাজ কি আপনি পড়াবেন? ভাবি প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপার চেষ্টা করলেন।

আমি বললাম, তাবি! আমার বন্ধু তো মনে হয় সুখেই আছে।

তাবি বললেন, হ্যাঁ। আমাদের দু'টা মেয়ে। দুজনই ডাক্তার। প্রচুর টাকা আয় করে। আপনার বন্ধুর যখনই কিছু দরকার হয়, মেয়েদের খবর দেয়। তারা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। মেয়ে দু'টা তার বাবাকে যতটা পছন্দ করে, আমাকে তার দশ ভাগের এক তাগও পছন্দ করে না।

আমি বললাম, আপনি আমার বন্ধুকে কতটা পছন্দ করেন?

অনেক। তবে আপনার বন্ধু কিন্তু অন্য রকম। তার জগৎ টিতি অনুষ্ঠান, গানবাজনা ও জোকস-এ সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে গভীর রাতে আমার ঘুম তাঙিয়ে সে আমাকে জোকস শুনিয়েছে। আপনি যাঁর নামে আপনার ছোটভাইয়ের নাম রেখেছেন। তার নামের প্রতাব আপনার ছোটভাইয়ের ওপর নিশ্চয়ই পড়ে নি। আমার ধারণা উল্টোটা হয়েছে। আপনার ছোটভাইয়ের প্রতাব তার ওপর পড়েছে বলে জোকস নিয়ে মাতামাতি। অনেকের ধারণা সে আপনার ছোটতাই আহসান হাবীব। জোকসের বইগুলো তারই লেখা। আপনার বন্ধু এই ভুল কখনো তাঙায় না।

আহসানের বাড়ির পেছনে প্রকাণ্ড এক মেপল গাছ। আমি দিনের বেশিরতাগ সময় এই গাছের নিচে বসে থাকি। কিংবা ঘাসের ওপর শুয়ে থাকি। পরিপূর্ণ বিশ্রাম যাকে বলে।

বন্ধুপত্নী আমেরিকান ব্যাংকের একজন বড় কর্মকর্তা। এই ধরনের কেরিয়ারিস্ট মহিলারা রান্নাবান্না নামক কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়ান না। কিন্তু হেলেন তাবি দেখলাম রন্ধনশিল্পের আধুনিক দ্রৌপদী। আমি তাদের সঙ্গে সাত দিন ছিলাম, সাত দিন তিনি কোনো আইটেম রিপিট করেন নি। প্রতিদিনই নতুন খাবার।

আমেরিকায় প্রবাসী মহিলারা কোনো-এক বিচিত্র মিষ্টি বানানোর কারিগর হয়ে দাঁড়ান (সস্তা দুধ একটি কারণ হতে পারে।), হেলেন ভাবির বানানো মিষ্টি খেয়ে আমি হতভম্ব।

যে সাত দিন ছিলাম শাওন হেলেন ভাবির পেছনে লেগে রইল মিষ্টি বানানোর কৌশল শেখার জন্যে। কৌশল মোটামুটি শিখেছে বলে আমার ধারণা।

একদিনের কথা। আমি যথারীতি মেপলগাছের নিচে শুয়ে আছি—হাতে বই Robert Moss-এর লেখা *The Secret History of Dreaming*. বিজ্ঞানী Puli (Puli's exclusion principle)-র জীবনের অদ্ভুত কর্মকাণ্ড পড়ছি। তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই নাকি ভয়াবহ অঘটন ঘটত। তিনি প্রিন্সটনে আসেন ১৯৫০ সনে। পদার্থবিদ্যার এক ল্যাবরেটরিতে পা দেওয়ামাত্র সেখানের অতি দামি Cyclotron কোনো কারণ ছাড়াই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সবচেয়ে কম বয়সে ইনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নিউট্রিনো তাঁর আবিষ্কার। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় বইয়ে নিবদ্ধ।

হেলেন ভাবি এই সময় পাশে এসে বসতে বসতে বললেন, আপনি তো দিনগুলি গাছের নিচে কাটিয়ে দিলেন। অবশ্যি আমাদের এখানে দেখারও কিছু নেই।

আমি বললাম, আমি এখানে বন্ধুকে দেখতে এসেছি। অন্য কিছু দেখতে আসি নি।

ভাবি বললেন, Mystery House বলে একটা বাড়ি আছে। যারা মিশিগানে আসে তারা সবাই সেই বাড়ি দেখতে যায়। আপনি যাবেন?

আমি বললাম, কী আছে সেই বাড়িতে?

মধ্যাকর্ষণ শক্তির কী যেন সমস্যা। বাড়ির এক জায়গায় মধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রায় নেই, অন্য জায়গায় অস্বাভাবিক, Gravitational Pull.

আমি বললাম, বলেন কী! চলুন আজই যাব।

সাত ডলার করে টিকিট কেটে আমি Mystery House-এ ঢুকলাম। আমার যতটা চমকানোর দরকার তারচেয়ে বেশি চমকালাম।

কী অদ্ভুত কাণ্ড! বাড়ির মাঝখানে দাঁড়ানো যায় না। প্রবল শক্তিতে একদিকে টান পড়ে। মেঝেতে পানি ঢেলে দিলে সেই পানি পদার্থবিদ্যার সূত্র অগ্রাহ্য করে নিচু থেকে উঁচুতে যেতে থাকে।

বাড়ির ছাদ থেকে দু'টা গোলক ঝুলছে। একটা কাঠের এবং একটা ধাতুর। দু'টা গোলকই Vertical থাকার কথা। দু'টাই ত্রিশ ডিগ্রি সরে আছে।

সব দেখে শুনে আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল। কেন এ রকম হচ্ছে? রহস্য কী? প্রকৃতি কখনো পদার্থবিদ্যার সূত্রের বাইরে যাবে না। এই বাড়িতে কীভাবে গেল!

পরের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা আমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলাম। যেদিন মিশিগান থেকে নিউইয়র্ক রওনা হব, সেদিন ভোরবেলায় রহস্য উদ্ধার করলাম।

পাঠকদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, আমি নুহাশপল্লীতে এরকম একটা ঘর বানিয়েছি। নাম দিয়েছি House of Kabala. ঘরটি এখনো উদ্বোধন করা হয় নি। আহসান হাবীব তার স্ত্রীকে নিয়ে বাংলাদেশে বেড়াতে এলেই House of Kabala উদ্বোধন হবে।

পুনশ্চ

মিশিগান থেকে ফেরার তিন মাসের মাথায় আমাকে আবারও আমেরিকা যেতে হলো। দেশ দেখার জন্যে না, চিকিৎসার জন্যে। দুরন্ত কোলন ক্যানসারকে বাগ মানানোর চেষ্টা।

খবর পেয়ে বন্ধু আহসান হাবীব মিশিগান থেকে নিউইয়র্কে উপস্থিত হলো আমাকে দেখার জন্যে। তার সঙ্গে তার স্ত্রী এবং ডাক্তার কন্যা পলা।

জ্যামাইকায় আমার বাড়ির সামনে আহসান তার পরিবার নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে, ঘরে ঢুকছে না। পলা বলল, বাবা! তোমার সমস্যা কী?

আহসান বলল, হুমায়ূনকে দেখে আমি কী বলব তেবে ভয় লাগছে।

ডাক্তার কন্যা বলল, তোমাকে Anxiety কমানোর ট্যাবলেট দিচ্ছি। ট্যাবলেট খেয়ে ভয় কমাও। তারপর আমরা বাড়িতে ঢুকব।

আহসান দুটা ট্যাবলেট গিলে আধ ঘণ্টা গাড়িতে বসে ভয় কমাল। তারপর আমার ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটা ipad। এখানে সে দুই হাজার গান ঢুকিয়ে এনেছে, যেন আমি গান শুনে সময় কাটাতে পারি।

ipad-এ পঁচিশটি গান আলাদা করা। শিরোনাম সর্বাধিক শ্রুত গান (Top 25 most played song)। সেখানে শাওনের গাওয়া চারটি গান আছে। আহসান মনে হয় আমাকে খুশি করার জন্যে কাজটা করেছে।

এই মুহূর্তে ipad-এ শাওনের গান হচ্ছে— 'যদি মন কাঁদে চলে এসো এক বরষায়'।

কলোরাডো রকি মাউনটেইন হাই

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন চিত্রপরিচালকের নাম আলাদা করলে সেখানে স্টানলি কুবরিক অবশ্যই থাকবেন। সত্যজিৎ রায়ের এক লেখায় পড়েছি, তিনি ছবি বানানোর কায়দা-কৌশল শেখার জন্যে কুবরিকের একটি ছবি কুড়িবার দেখেছেন। ছবির নাম '2001 : A Space Odyssey'. কুবরিক ছবির গল্প নিয়েছেন আর্থার সি ক্লার্কের উপন্যাস থেকে।

পৃথিবীশ্রেষ্ঠ পরিচালকেরা অতি বিচিত্র কারণে অন্যের গল্প নিয়ে ছবি করতে পছন্দ করেন না। ছবির গল্প নিজেই তৈরি করেন। কুবরিক তার ব্যতিক্রম। ছবি বানানোর সময় তিনি বিখ্যাত গল্পকারদের কাছে যান।

তাঁর একবার শখ হলো, ভূতের ছবি বানাবেন। আমেরিকায় ভৌতিক গল্পের দু'জন গ্র্যান্ডমাস্টার আছেন। একজনের নাম এডগার এলেন পো, অন্যজন স্টিফান কিং।

কুবরিক ছবি বানালেন স্টিফান কিং-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'সাইনিং' নিয়ে। গল্পের কাহিনি এক হোটেল নিয়ে। হোটেলের নাম ওবেরি। ডেনভারের দুর্গম পর্বতমালায় হোটেলের অবস্থান। শীতের তিন মাস এই হোটেলে যাওয়ার সব রাস্তাঘাট বরফে ঢেকে যায়। এই তিন মাস হোটেল থাকে বন্ধ।

বন্ধ হোটেল দেখভাল করার জন্যে একজন লেখককে চাকরি দেওয়া হলো। লেখক তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্র নিয়ে হোটেলে স্থায়ী হলেন। শুরু হলো ভয়ংকর এক গল্প।

স্টিফান কিং-এর উপন্যাস নিয়ে যখন কুবরিকের মতো পরিচালক ছবি বানাবেন সে ছবি ভালো হবে বলাই বাহুল্য। ঘটনা তা না, ঘটনা হলো যে ওবেরি হোটেলে শুটিং হয়েছিল, সেই হোটেল এখন জাদুঘর। লোকজন টিকিট কেটে 'সাইনিং'-এর শুটিং যে হোটেলে হয়েছিল সেখানে যায়; হোটেল ঘুরে ঘুরে দেখে।

আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি, একজন পরিচালকের কী ক্ষমতা! একটা সাধারণ হোটেলকে তিনি মিউজিয়াম বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

আমি ঠিক করলাম, ওই জাদুঘর দেখতে যাব। বিশাল দল নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে ট্রেনে উঠলাম। যাব ডেনভার (ওই যে রকি মাউনটেইন হাই। কলোরাডো)। আমার সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র ছাড়াও, আমার শাশুড়ি ও শ্যালিকা আছে। তাদের দুজনের মুখই বেজার। এত টাকাপয়সা (ডলার সেন্ট খরচ হবে। লেখার তোড়ে টাকাপয়সা চলে এ ক্ষেত্রে) খরচ করে হোটেল দেখার কী আছে তা তারা বুঝতে পারছেন না।

ডেনভারে গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের প্রাসাদের মতো বাড়ি। আমাদের থাকা-খাওয়ার সমস্যা নেই। জ্যোতিপ্রকাশের স্ত্রী পূরবী বসুও একজন গল্পকার। স্বামীর সঙ্গে সমান তালে লেখেন। কলকাতা থেকে পূরবী বসুর অনেকগুলি বইও বের হয়েছে।

পূরবী বসু আমাকে লজ্জায় ফেলে তাঁর ব্যক্তিগত শোবার ঘর ছেড়ে দিলেন। যেখানে আমি নিজের ভাইবোনদের শোবার ঘরেও উঁকি দেই না, সেখানে আমি স্বল্পপরিচয়ের লেখক-দম্পতির শোবার ঘর দখল করব ? প্রশ্নই ওঠে না।

আমি আমার আপত্তি সুন্দর করে জানালাম। পূরবী শুধু বললেন, হুমায়ূনকে আমি আমার শোবার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও রাখব না। যাই হোক, সাত রাত লেখক-দম্পতির শোবারঘরে কাটালাম। আমার দুই পুত্র ক্ষতিসাধন-কর্মে নিয়োজিত হইল। শোবার ঘরের ঘড়ি, ফুলদানি, চায়ের কাপ এসব শেষ। নিনিতকে একবার দেখা গেল গভীর আনন্দ নিয়ে কী যেন চাবাচ্ছে। তার মুখে আঙুল ঢুকিয়ে খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করা গেল। দেখা গেল সেটা দম্পতির হীরার আংটি।

লেখক-দম্পতির পরিবারের সদস্য সংখ্যা চার। স্বামী-স্ত্রী, পুত্র এবং একটি কুকুর। জেরোম কে জেরোমের বিখ্যাত উপন্যাস, *এক নায়ে তিন জন* (কুকুরটা ফাউ)। কুকুরের নাম 'বাবলস'। সমস্যা হচ্ছে, আমি সেই অর্থে পশুপ্রেমিক না। গরু-ছাগল ভেড়া ঠিক আছে, কিন্তু কুকুর-বিড়ালের গায়ে হাত বুলানো আমার কর্ম না।

কুকুর বিষয়ে আমার প্রবল ভীতিও আছে। ভীতির কারণ আমার নিজের বোকামি। অনেক কাল আগে সেন্টমার্টিন থেকে একটা কুকুরছানা (সেন্টমার্টিন ডগ) নিয়ে এসেছিলাম। দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছা করে এমন। কিছুদিনের মধ্যেই এই কুকুর গায়ে গতরে কুস্তিগীর আসলাম হয়ে দাঁড়াল। কুকুর মালিক চেনে বা মালিকদের গায়ের গন্ধ চেনে বলে সবাই জানে। এই কুকুরটার ঘ্রাণশক্তি-সংক্রান্ত কোনো সমস্যা ছিল বলে আমার ধারণা। যতবারই আমি বাসায় যেতাম সে ঝাঁপ দিয়ে দু'পা তুলে আমাকে ধরত, অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুজি করত। একসময় হতাশ হয়ে ছেড়ে দিত।

তখন আমি ধানমণ্ডি ১০ নম্বর রোডের বাসায় থাকি। দুটি তলা ভাড়া দেওয়া। একটিতে কোরিয়ান এক ভদ্রলোক থাকেন। তিনি মনে হয় Dog lover, আমার কুকুরটাকে বিসকিট-টিসকিট খেতে দেন। এক সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে দেখি কোরিয়ান ভদ্রলোক সিঁড়িতে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। সেন্টমার্টিন ডগ তাঁকে চেপে ধরে ভয়ংকর গর্জন করছে। যে-কোনো মুহূর্তে ভদ্রলোকের টুঁটি চেপে ধরবে এমন অবস্থা। অবস্থা বেগতিক দেখে বাসার দারোয়ান গেট খোলা রেখে পালিয়েছে।

অনেক কষ্টে ভদ্রলোককে উদ্ধার করা হলো। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এই কুকুরকে গেটের বাইরে ছেড়ে দেওয়া হবে। নোভা-বিপাশার মা বললেন, তুমি এই কাজ করতে পারো না। তুমি কুকুরটাকে তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে তুলে নিয়ে এসেছ। তোমার শখ মিটে গেছে বলে তাকে এখন 'disown' করতে পারো না। তাকে রাস্তায় না ফেলে সেন্টমার্টিন পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

এই দানবকে সেন্টমার্টিন নিয়ে যেতে কেউ রাজি হলো না। প্রত্যেকের ধারণা, সেন্টমার্টিন পৌছার আগেই এই কুকুর তাকে খেয়ে ফেলবে। আশঙ্কা অমূলক না।

আমার কুকুর-ভীতির কারণ ব্যাখা করা হলো। এখন 'বাবলস' প্রসঙ্গ। এ দেখতে মোটেই ভয়ংকর না। চেহারা অবিকল নোয়ানের মতো। মাতৃভূমি জাপান। তার পবিত্র

রক্তে নাকি অন্য কোনো প্রজাতির রক্তের সংক্রমণ হয় নি। সে কাউকে কামড়ায় না, আদর নিতে পছন্দ করে।

আমি খুব আশ্বস্ত হলাম তা-না। প্রথম পরিচয়ে সে আমার কাছাকাছি এগিয়ে এল এবং আমি কিছু বোঝার আগেই জিভ বের করে আমার ঠোঁট চেটে দিল। কষে লাথি মারার বাসনা আটকালাম, কারণ পূরবী আনন্দে উল্লসিত মুখে বলল, বাবলস হুমায়ূনকে খুবই পছন্দ করেছে।

বাবলস আমাকে ত্যাগ করে এখন এগুলো আমার শাশুড়ির দিকে। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করা মানুষ। কোন পরিস্থিতিতে কী আচরণ করতে হয় তা জানেন। তিনি হাসিমুখে (নকল হাসি) কুকুরের পিঠে হাত রেখে বললেন, বাহ্ কী সুইট!

কুকুর লাই পেয়ে তাঁর কোলে উঠে গাল চাটতে লাগল। তিনি মনে মনে বলছেন, দূর হ হারামজাদা। উচ্চকণ্ঠে বলছেন, কী লক্ষ্মী! কী লক্ষ্মী! রাজনৈতিক ট্রেনিং অনেক সময় খুব কাজে লাগে।

বাবলস প্রসঙ্গ থাক, এখন ভ্রমণ প্রসঙ্গ। জ্যোতি দা বিশাল এক গাড়ি ভাড়া করলেন। প্রতিদিন ভোরে আমরা এই গাড়িতে দলবেঁধে উঠি এবং রকি পর্বতমালার দিকে ছুটে যাই।

ভ্রমণকাহিনির লেখকের দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি কী দেখলেন তা পাঠককে জানানো। এই কাজটি কোনো ভ্রমণকাহিনির লেখক করতে পারেন বলে আমি মনে করি না।

সৌন্দর্য কাগজে কলমে ব্যাখ্যা করা যায় না। সৌন্দর্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। ট্রয় নগরীর হেলেনের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে কবি হোমার অনেক পাতা খরচ করেন। কিন্তু সেই হেলেনকে পাঠক হিসেবে কি আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি? কখনো না। যে দৃশ্য আগে কখনো দেখা হয় নি, মস্তিষ্ক সেই দৃশ্য দেখাতে পারে না। হেলেনকে আমরা কল্পনায় পরিচিত কোনো রূপবতীর আদলেই দেখব।

বরফে ঢাকা রকি পর্বতমালার সৌন্দর্যও তাই লিখিত ভাষার ক্ষমতায় নেই। বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া, এর মধ্যে হঠাৎ দেখি একটিতে একদানা বরফও জমে নেই। লাল রঙের আকাশস্পর্শী পর্বত। কী রহস্যময়!

সন্ধ্যাবেলা আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ উঠল। চাঁদের আলো বরফে পড়ে বরফ হয়ে গেল হীরকখণ্ড। আলো বিকিরণ করা শুরু করল। চাঁদের আলো এমনিতেই ঠান্ডা। বরফ থেকে প্রতিফলিত হয়ে তা হয়ে গেল আরও কোমল। অলৌকিক এক দৃশ্যের অবতারণা হলো। যে দৃশ্যের সঙ্গে সচরাচর দেখা পৃথিবীর কোনো দৃশ্যের মিল নেই। বলতে ইচ্ছা করল—

'এমন চাঁদের আলো
মরি যদি তাও ভালো।
সে মরণও স্বর্গসমান।'

আমরা কুবরিকের স্টানলি হোটেল দেখলাম। আমাদের টিকিট কাটতে হলো না। হোটেল সবসময় খোলা থাকে, এখন বন্ধ। যা দেখার বাইরে থেকে দেখতে হবে।

স্টানলি হোটেল ভ্রমণের বিষয়টা আমার অনেকদিন মনে থাকবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কারণে।

ভ্রমণ শেষে ডিনার করে ফিরব। আমার শাশুড়ি ঘোষণা দিয়েছেন, ডিনারের খরচ তিনি দেবেন। আমরা ব্যাকুল হয়ে দামি কোনো রেস্টুরেন্ট খুঁজছি। সস্তার ম্যাকডোনাল্ড থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দেই আমি অভিভূত।

মেক্সিকান এক রেস্টুরেন্ট খুঁজে পাওয়া গেল। নাম ক্যানটিনা গ্রীল। ডিনারের আগে আমি গোপনে শাশুড়ির চোখের আড়াল হয়ে পর পর দুটা মার্গারিটা খেলাম। মেক্সিকানরা এই পানীয়ের আবিষ্কারক। আমি এ যাবৎকাল যত মার্গারিটা খেয়েছি ক্যানটিনা গ্রীলের মার্গারিটার ধারেকাছে কোনোটা আসতে পারবে না।

ট্যুরিস্টরা দু'ধরনের জিনিস দেখে—প্রাকৃতিক বিস্ময়, মানুষের তৈরি বিস্ময়। ট্যুরিস্ট প্রাকৃতিক বিস্ময় গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন যতটা আগ্রহ নিয়ে দেখতে যায় ততটা আগ্রহ নিয়েই লুভ মিউজিয়ামে মোনালিসার ছবি দেখতে যায়।

কলোরাডোতে দেখলাম প্রকৃতি ও মানুষের যৌথ প্রযোজনা—প্রাকৃতিক অ্যাম্ফিথিয়েটার। দু'পাশে দু'টি লাল পাথরের প্রকাণ্ড পাহাড়। মাঝখানে বসার জন্যে সিঁড়ি কাটা হয়েছে। এই কাজটি করেছে শত শত শ্রমিক।

দেখার মতো একটি বিষয়। আমি এর আগে কখনো মানুষ ও প্রকৃতির যৌথ প্রযোজনা সেভাবে দেখি নি।

রকি পর্বতমালা ভ্রমণ পূরবীর কুকুর বাবলস দিয়ে শেষ করি। অ্যাম্ফিথিয়েটার দেখে রাত আটটায় পূরবীর বাড়িতে ফিরলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পূরবী কাঁদতে শুরু করলেন। কারণ কুকুর বাবলস বাড়ি থেকে পালিয়েছে। কুকুরের সন্ধানে জ্যোতি দা পুত্রকে নিয়ে বের হলেন।

মরা বাড়ির মতো অবস্থা। পূরবী শোকে অধীর হয়ে অশ্রুবর্ষণ করছেন। সন্তানহারা গ্রাম্য জননীর মতো বিলাপও করছেন—ও আমার সোনামণিরে! আমার সোনামণি কোথায় গেল রে! ইত্যাদি।

'Pet' একটি উচ্চবিত্ত বিষয়। আমরা হতদরিদ্র বাঙালিরা নিজেরাই খেতে পারি না, পোষা কুকুর বা বিড়ালকে খাওয়াব কী? যাদের খাদ্যের অভাব নেই তারাই পশুপ্রেম দেখাতে পারে।

যে ভালোবাসা মানুষ পশুদের প্রতি দেখায় পশুরা কি তা দেখায়?

আমার ধারণা দেখায়।

আমি আমার সেন্টমার্টিন ডগ রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। সে স্থানীয়ভাবে জীবন কাটাচ্ছিল। মৃত্যুর আগে আগে সে ধানমণ্ডিতে ফিরে এল। গেটের বাইরে শেষ শয্যা পাতল। তার মৃত্যু হলো প্রভুর বাড়ির সামনে।

ডেনভার থেকে নিউইয়র্ক ফিরছি। পুত্র নিষাদের চোখে অশ্রুবিন্দু।

আমি বললাম, বাবা, কাঁদছ কেন?

নিষাদ বলল, বাবলসের জন্যে খারাপ লাগছে। তার জন্যে কাঁদছি।

মানুষ নিজ প্রজাতির বাইরে অন্য প্রজাতির প্রাণীকে ভালোবাসার ক্ষমতা রাখে। মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক আনন্দের এটিও একটি আনন্দ।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জ্ঞাতার্থে জানাই, বলা হয়েছে, একটি কুকুর বেহেশতে যাবে। এই কুকুরের নাম 'কিতমির'।

এখন কুইজ টাইম। কিতমির কেন বেহেশতে যাবে?

অনুরোধে ঢেঁকি গেলা বাঙালিদের জন্যে নতুন কিছু না। নতুন হলো অনুরোধে 'রাইস মিল' গিলে ফেলা। এই কাজটি একজীবনে বেশ ক'বার করতে হয়েছে। লেখালেখির প্রথম যৌবনে রাইস মিল গিলে প্রত্যন্ত এক গ্রামে উপস্থিত হলাম। উদ্যোক্তারা এমন ভাব করতে লাগলেন যেন দাড়িবিহীন খাটো রবীন্দ্রনাথ এসে নেমেছেন। বিনয়ে তারা ভেঙে পড়ে যাচ্ছেন। আমি ভেঙে পড়ে যাচ্ছি ক্ষুধায়। পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত দশটা বেজে গেছে। খাবার দিতে দেরি হবে। মাত্র রান্না বসেছে। একজন আমাকে কানে কানে আশ্বস্ত করল, 'খাসি কাটা হয়েছে। খাসির মাংস-পোলাও হবে। একটু ধৈর্য ধরতে হবে।'

আমি বললাম, ধৈর্য ধরেছি। মূল খাবারের আগে কি বিস্কুট পাওয়া যাবে?

'অবশ্যই অবশ্যই' বলে উদ্যোক্তা ছুটে গেলেন। তাঁর ছুটে যাওয়াই দেখলাম, ফিরে আসা দেখলাম না। এর মধ্যে উদ্যোক্তাদের একজন (বলশালী, কুস্তিগীর টাইপ চেহারা, চক্ষু যে-কোনো কারণে রক্তবর্ণ) কঠিন গলায় বলা শুরু করলেন, প্রয়োজনে ভুঁড়ি গালায়ে ফেলব।

কার ভুঁড়ি গালানো হবে বুঝতে পারছি না। আমার না তো?

যেখানে রান্না হচ্ছে সেখানেও গণ্ডগোলের আভাস পাচ্ছি। মনে হয় রান্না বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়েছে। দাড়িওয়ালা কুস্তিগীর বললেন, এত বড় সাহস! অনেক সহ্য করেছি। আজ ডেড বডি দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলব।

আমাকে লাইব্রেরি ঘরে বসানো হয়েছিল। আমি এসেছি লাইব্রেরি উদ্বোধনে, সঙ্গে কিছু বইপত্র নিয়ে এসেছি। লাইব্রেরি ঘর ফাঁকা। মনে হয় সবাই মারামারিতে অংশগ্রহণ করতে গেছে। আমি চুপচাপ বসে থাকব নাকি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব তাও বুঝতে পারছি না। পালিয়ে যাবই-বা কোথায়? রাস্তাঘাট চিনি না। বর্ষাকালের চলাচলে রাস্তায় একহাঁটু কাদা।

এর মধ্যে উদ্যোক্তাদের একজন প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা এবং পোশাক মফস্বলের ছড়াকারদের মতো। ঘরে আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই, তারপরও তিনি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, স্যার! অবস্থা কেরোসিন। আপনি এক কাজ করুন, থানায় চলে যান। ওরা আপনাকে প্রটেকশান দিবে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, থানায় কেন যাব? আমি কী করেছি!

থানায় আপনি সেফ থাকবেন।

পাঠকদের কাছে ঘটনা নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। ঘটনা ১০২ পারসেন্ট সত্যি। সেবার থানার সেকেন্ড অফিসারের সৌজন্যে পুলিশের জিপে করে ঢাকায় ফিরি রাত তিনটায়।

ঘটনার স্থান, লাইব্রেরির নাম গোপন রাখলাম।

যাই হোক, এখন দ্বিতীয় রাইস মিল গেলার গল্প। জনৈক যুবকের গভীর আগ্রহে আমি এক পুত্র এবং তার মা'কে নিয়ে সুইডেন উপস্থিত হলাম। যুবকের নাম মাসুদ আখন্দ। সে সুইডিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের গ্র্যাজুয়েট। বাংলাদেশে চ্যানেল আইয়ের অনুদানে 'পিতা' নামে একটি ছবি বানাচ্ছে। ছবির গল্প তার লেখা, গান তার লেখা। চিত্রনাট্য তার। সে ক্যামেরাম্যান এবং পরিচালক। প্রধান চরিত্রটিতেও সে অভিনয় করছে। তাকে মাল্টিচ্যানেল পার্সোনালিটি বলা চলে। স্টকহোমে প্লেন থেকে নেমে মনে হলো, এখানে কেন এসেছি!

আমার বিবেক তখন কথা বলল, তুই রাইস মিল গেলার কারণে এসেছিস। এখন পস্তা।

বাইরের তাপমাত্রা শূন্যের কুড়ি ডিগ্রি নিচে। মনে হচ্ছে আমি এভারেস্টের চূড়ার কাছাকাছি আছি। গরম কাপড় থাকা সত্ত্বেও শরীর এবং শরীরের ভেতর যন্ত্রপাতি সব জমে গেছে। আমার মাথায় টুপি ছিল না বলেই মনে হলো দু'টা কানই জমে বরফ হয়ে গেছে। টোকা দিলেই দু'টা কান ঝুরঝুর করে খসে পড়বে। বাকি জীবন আর চশমা পরতে পারব না।

অনুরোধে ঢেঁকি গিলে সুইডেনে এসেছি ভালো কথা, গরমের সময় আসা যেত। ভয়ংকর ঠান্ডায় কেন?

কারণ বিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক লেরি নিতেন। তিনি সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা একটি গ্রহের কথা লিখেছেন। সেখানে মানুষের তৈরি বরফসভ্যতার কথা অপূর্ব ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। লেরি নিতেন উপন্যাসটি লিখেছেন সুইডেনে বসে। প্রচণ্ড শীতের গল্প তো সুইডেনে বসেই লেখার কথা। আমি এসেছি লেরি নিতেনের অভিজ্ঞতা কিছুটা নিজের মধ্যে ঢুকাতে। এখন পড়েছি বেকায়দা অবস্থায়। সবচেয়ে সমস্যা সিগারেট টানা। ঘরের ভেতর আইন করে সিগারেট খাওয়া বন্ধ। জাব্বা জোব্বা পরে বাইরে মাইনাস কুড়ি ডিগ্রিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানা মানে ভয়ংকর ঠান্ডা কিছু বাতাস ফুসফুসে ঢুকিয়ে ফুসফুস জখম করা।

আমি দিনরাত মাসুদের অ্যাপার্টমেন্টে বসে থাকি। জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতি দেখি। বুড়োবুড়িরা হতাশ ভঙ্গিতে হাঁটে। তাদের দেখায় সাদা তেলাপোকার মতো।

পরিবেশ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলবে, এটাই স্বাভাবিক। সুইডেনের মানুষদের ওপর ঠান্ডার প্রভাব হয়েছে বিচিত্র। প্রতি বছর বেশ কিছু তরুণ-তরুণী শীতের কঠিন আক্রমণের সময় ঘর ছাড়ে। চলে যায় আরও শীতের দিকে। জামাকাপড় খুলে ফেলে। গিটার বাজিয়ে গান করে। ভদকা খায়। একসময় ঠান্ডায় জমে তাদের মৃত্যু হয়। শীতকে আলিঙ্গন করে স্বেচ্ছামৃত্যু। সরকারি হিসেবে ২০১১ সালে এই ধরনের মৃত্যুর সংখ্যা পাঁচ শ'। প্রতি বছর তা বাড়ছে। সরকার কিছু করতে পারছে না।

সুইডেনবাসীরা সন্তান গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। জন্মহার সেখানে নেগেটিভ। অনেক সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও কেউ সন্তান নিচ্ছে না। তারা ঝুঁকেছে মদ্যপানের দিকে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মদ্যপান করা হয় সুইডেনে।

বয়স্ক মানুষদের মধ্যে এসেছে বিকার। অল্পবয়সী বালক-বালিকাদের প্রতি যৌন আসক্তি। সুইডেন সরকার এই সমস্যা নিয়েও হিমশিম খাচ্ছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কোনোটাতেই সুইডেন অংশগ্রহণ করে নি। তারা যুদ্ধের সুফল নিয়েছে। যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করেছে। এখনো করছে। মানুষ মারার অস্ত্র তৈরিতে এদের দক্ষতা সীমাহীন।

আমার কাছে শীতের সুইডেন হলো আত্মাহীন দেশ।

আমি শীতের দেশে বছরের পর বছর থেকেছি। জায়গার নাম ফার্গো, নর্থ ডাকোটা। সেখানেও শীতের সময় তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নিচে নেমে যায়। তবে সেখানে আত্মার মৃত্যু দেখি নি।

মাসুদ আমার শীতের আড়ষ্টতা কাটাতে জাহাজভ্রমণের ব্যবস্থা করল। বারো তলা জাহাজে করে যাব আইসল্যান্ড। আরও শীতের দেশ।

যে জাহাজে চড়লাম তা প্রমোদ তরী। আনন্দের সব উপকরণ সেখানে আছে। নাচ হচ্ছে, গান হচ্ছে, মদ্যপান হচ্ছে, জুয়া খেলা হচ্ছে। ডাইনিং হলে এলাহি কাণ্ড। প্রায় এক শ' আইটেমের বুফে লাঞ্চ। শাওন এই জাহাজেই প্রথম ক্যাভিয়ার নামক অখাদ্য মৎসডিম্ব খেল। ক্যাভিয়ার ছিল দু রকমের। একটা লাল, একটা কালো।

যেসব পাঠক ক্যাভিয়ার খান নি তাদের আশ্বস্ত করছি, তারা কিছুই মিস করেন নি। আঁশটে গন্ধের এই মহাখাদ্য বাঙালি জিভের উপযুক্ত না। আমাদের মহাখাদ্য ইলিশ মাছের ডিমেই সীমাবদ্ধ থাকুক। স্টারজেল মাছের ডিমে না।

আইসল্যান্ড পৌঁছলাম, কিন্তু জাহাজ থেকে নামলাম না। এখন আইসল্যান্ডবাসীদের অতি প্রিয় একটি খাবারের রেসিপি দিচ্ছি। রেসিপি পড়লেই পাঠক বুঝবেন কেন নামি নি।

> **খাবারের নাম :** Piss Haj (বাংলায় মূত্র হাঙ্গর)
>
> **রন্ধন প্রণালি :** তিন ফুটের মতো গর্ত খুঁড়ে কিছু তাজা হাঙ্গর মাছ রাখুন। বরফ দিয়ে ঢেকে দিন। প্রতিদিন একবার দলবেঁধে মাছ ঢেকে রাখার জায়গায় উপস্থিত হন এবং সেখানে প্রস্রাব করুন। এইভাবে এক মাস পার করে বরফ খুঁড়ে মাছ তুলে নিন। ডিনারে হোয়াইট ওয়াইনের সঙ্গে মাছ পরিবেশন করুন। প্রয়োজনে সামান্য লবণ ছিটানো যেতে পারে, তবে লবণ ছাড়াই এই মাছ সুস্বাদু। মাছ প্রস্রাব থেকে তার প্রয়োজনীয় লবণ নিয়ে নিয়েছে।

হুতুতুম হুট

অন্যরকম একটি ভ্রমণের গল্প দিয়ে 'খড়ম' শেষ করছি। আমার বয়স তখন আট কিংবা নয়। বাবা দিনাজপুরের বর্ডার ইন্সপেক্টর। যখনকার কথা বলছি, তখন বর্ডার ছিল পুলিশের হাতে। আমরা থাকি জগদ্দলে। সেখানকার জমিদার বাড়ির একতলাটা আমাদের বাসা এবং বাবার অফিস। দোতলা তালাবন্ধ। জমিদার দেশ ত্যাগের সময় মূল্যবান কিছু জিনিস দোতলায় রেখে গেছেন। সম্ভবত তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, একসময় দেশে ফিরে সবকিছুর দখল নেবেন।

জমিদার যে অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ির অসংখ্য খুপড়ি ঘরের একটিতে আমি ছাপাখানা আবিষ্কার করলাম। জমিদার সাহেব দাওয়াতের চিঠিপত্র এই ছাপাখানায় ছেপে বিলি করতেন। ছাপাখানা আবিষ্কারের পর আমার প্রধান খেলা হয়ে গেল—টাইপ বসিয়ে নিজের নাম ছাপ দিয়ে তোলা। আ-কার ই-কার খুঁজে পাই নি বলে ছাপা হতো—হময়ন অহমদ।

জমিদার সাহেবের বিশাল লাইব্রেরি ছিল। লাইব্রেরির প্রায় সব বই তিনি নিয়ে গেছেন। কিছু অপ্রয়োজনীয় ভেবে ফেলে গেছেন। এই বইগুলো আমার দখলে চলে এল। এর মধ্যে একটি বই কয়লাচালিত রেল ইঞ্জিনের ওপরে। এই একটি বই আমার হৃদয় হরণ করল। প্রতিদিন একবার কয়লার ইঞ্জিনের ছবি না দেখলে আমার ভালো লাগত না।

প্রকৃতি কিংবা ন্যাচার কিংবা 'গড' পুনরাবৃত্তি করতে পছন্দ করেন। আমেরিকায় 'বার্নস এন্ড নোবেলস'-এ বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে চমকে উঠে দেখি একটি বইয়ের নাম *Trains*। লেখক James Gibb। Metro Books NY। পাতা উল্টে দেখি সব কয়লার ইঞ্জিনের ছবি। এমন কি হতে পারে শৈশবের বইটিই দেখছি ? হতে পারে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। বই কিনে পুত্র নিষাদকে উপহার দিলাম। এখন দেখি সেও প্রতিদিন কয়েকবার এই বইয়ের ছবি দেখে।

জমিদার বাড়ি ছিল আমবাগানের ভেতর। অসংখ্য আমগাছে জঙ্গলের মতো হয়ে ছিল। জমিদার বাড়ি থেকে একটু দূরেই আবসল জঙ্গল। আমার বাবা মাঝে মধ্যেই তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে জঙ্গল ভ্রমণে বের হতেন। তাঁর সঙ্গে থাকত গুলিতরা রাইফেল। হঠাৎ যদি কোনো বন্যপশু বের হয়, সে বিষয়ে সতর্কতা। বন্যপশুর ভেতর ছিল দাঁতাল শূয়র ও ভল্লুক। বনে প্রচুর নীল গরু ছিল। নীল গরু মানে বন্য গরু। আমার বড় মামা এই জঙ্গল থেকেই প্রায় হাতির মতো বড় একটা নীল গাই মেরেছিলেন।

জমিদার বাড়ির পশ্চিমে কোয়ার্টার মাইল দূরে—পাকিস্তান হিন্দুস্থান বর্ডারে একটা নদী ছিল। নদীতে সবসময়ই হাঁটুপানি। সেই পানি কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ। নদীর পাড়ে জমিদার সাহেব বেশ কিছু বেঞ্চ বানিয়ে রেখেছিলেন। মনে হয় তিনি বেঞ্চে বসে সূর্যাস্তের ছবি দেখতেন।

আমার যে বয়স তাতে সৌন্দর্যবোধ তৈরি হওয়ার কথা না। তারপরেও যতবার নদীর কাছে গিয়েছি ততবারই আনন্দে অভিভূত হয়েছি। আনন্দের মূল কারণ হাঁটুপানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করার সুযোগ। প্রতিদিন দুপুরে গোসলের নাম করে নদীতে দুই আড়াই ঘণ্টা থাকতাম।

আগেই বলেছি, প্রকৃতি পুনরাবৃত্তি পছন্দ করে। নেপালে বেড়াতে গিয়েছি। কাঠমান্ডু ছাড়িয়ে অনেক ভেতরে ঢুকে গেছি। একদিন হাঁটতে হাঁটতে দেখি—কী আশ্চর্য, জগদ্দলের সেই নদী। হাঁটুপানির নদী। তলার সাদা বালি চিকচিক করছে। কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ পানি। আমি সঙ্গে সঙ্গে শৈশবে ফিরে গেলাম। গায়ের কাপড়চোপড় নিয়েই ঝাঁপ দিয়ে পানিতে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে একজন মাত্র শিশু ছিল। অবসর প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী আলমগীর রহমানের পুত্র প্রতীক। সে পানিতে নেমে আনন্দ ও উত্তেজনায় আধাপাগলের মতো হয়ে গেল। আমি তার মধ্যে শৈশবের হুমায়ূনকে দেখতে পেলাম।

জগদ্দলে কোনো স্কুল ছিল না। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে মা অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বাবাকে প্রায়ই বলতেন বদলির চেষ্টা করতে। বাবা স্কুলের বিষয়টাকে মোটেই পাত্তা দিতেন না। তিনি বলতেন, কপালে পড়াশোনা থাকলে পড়াশোনা হবে। না থাকলে হবে না। এই নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই। তা ছাড়া তোমার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার মধ্যেই আছে।

মা বললেন, পড়াশোনার মধ্যে আছে মানে কী? এরা তো সারা দিন বনে-জঙ্গলে ছোটাছুটি করছে।

বাবা বললেন, এটাই তো পড়াশোনা। বনজঙ্গল থেকে শিক্ষা নিচ্ছে।

বাবার দার্শনিক ধরনের কথায় মা প্রভাবিত হলেন না। তিনি নিজেই বাবার বদলির চেষ্টা শুরু করলেন। তবে তিনি গেলেন আধ্যাত্মিক লাইনে। প্রতিদিন নামাজ পড়ে দোয়া, যেন তার স্বামীর এমন এক জায়গায় বদলি হয় যেখানে স্কুল আছে।

তাঁর দোয়ার কারণে বা অন্য কোনো কারণে, বাবার বদলির অর্ডার চলে এল। তিনি এখন যাবেন পঞ্চগড়ে। সেখানে স্কুল আছে।

আমরা জগদ্দল থেকে যাব পঞ্চগড়ে। এই ভ্রমণ কাহিনিটাই বলতে চাচ্ছি।

জগদ্দল ছেড়ে যাচ্ছি, আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আবার স্কুলের যন্ত্রণায় পড়তে হবে। জঙ্গল থাকবে না, হাঁটুপানির নদী থাকবে না, রহস্যে ঢাকা জমিদার বাড়ি থাকবে না? আমার তরফ থেকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ শুরু হলো, 'হে আল্লাহ! বাবার বদলি বাতিল করো।'

দোয়ায় কাজ হলো না। এক সন্ধ্যাবেলা জমিদার বাড়ির সামনে ছয়টা মহিষের গাড়ি (গরুর গাড়িও হতে পারে। ঠিক মনে পড়ছে না।) এসে থামল। আমরা যাব সে গাড়িতে। সন্ধ্যাবেলা রওনা হব, পঞ্চগড়ে পৌঁছাব ভোরবেলা। সারা রাত মহিষের গাড়ি চলবে। বাবা নৈশভ্রমণের আয়োজন করেছেন, কারণ দিনে রোদে কষ্ট হবে। রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে চলে যাব।

মহিষের গাড়ির দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল গভীর রাতে। আমরা ঘন জঙ্গলের ভেতর। গাড়ি চলছে না। আমি অবাক হয়ে দেখি, প্রবল জোছনায় বনভূমি প্লাবিত। জঙ্গলে গাছপালার ভেতর দিয়ে জোছনার কী যে রহস্য! আমি মুগ্ধ হয়ে জোছনা দেখছি এবং ডাক শুনছি। অদ্ভুত এবং খানিকটা ভয় জাগানিয়া শব্দ।—হুতুতুম হুট। হুতুতুম হুট।

অদ্ভুত শব্দ, জোছনা, বনভূমি—সব মিলিয়ে আমার মধ্যে প্রবল ঘোর তৈরি হলো। আমি শব্দ করে কেঁদে উঠলাম। বাবা অন্য গাড়িতে ছিলেন, কান্নার শব্দে ছুটে এলেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, বাবা! কী হয়েছে?

আমি বললাম, ভয় পেয়েছি। কিসের শব্দ?

হুতুম পেঁচার শব্দ।

গাড়ি থেমে আছে কেন বাবা?

আমি থামিয়েছি। জোছনা দেখার জন্যে থামিয়েছি।

এর ঠিক ত্রিশ বছর পর প্রকৃতি ঠিক করল, বনভূমিতে আমার জোছনা দেখা ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবে।

আমি যাচ্ছি ফার্গো থেকে সিয়াটল। গাড়িতে করে যাচ্ছি। হাজার মাইলের যাত্রা। ড্রাইভার দুজন। আমি এবং আমার পাকিস্তানি বন্ধু রেহমান ফরিদ। আমার সঙ্গে শ্রীলংকার বন্ধু রত্ন সভাপতি সুরিয়া কুমারণ আছে। সে তখনো গাড়ি চালানো শিখে নি। এরা ছাড়া আছে আমার দুই মেয়ে নোভা, শীলা এবং তাদের মা।

আমরা যাত্রা শুরু করেছি সন্ধ্যায়। কেন সন্ধ্যায় রওনা দিলাম জানি না। সারা দিন গাড়ি চালিয়ে রাতে হোটেলে ঘুমানোটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। তাহলে কি শৈশব ভ্রমণের পুনরাবৃত্তির জন্যেই সন্ধ্যায় রওনা দিলাম?

গভীর রাতে মন্টানার কঠিন বনভূমিতে গাড়ি ঢুকল। চারদিকে ফিনিক ফোটা জোছনা। আমি রাস্তার একপাশে গাড়ি রেখে হেডলাইট নিভিয়ে দিলাম। জোছনা জ্বলে উঠল। আমি অবাক হয়ে শুনি পেঁচা ডাকছে, হুতুতুম হুট। হুতুতুম হুট।

বড় মেয়ে নোভা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল। আমি বললাম, কী হয়েছে মা? ভয় লাগছে?

হুঁ। ভূতের ডাক শুনেছি।

মাগো! ভূতের ডাক না। পেঁচা ডাকছে।

শৈশবে আমি কেঁদেছিলাম। এখন ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছে আমার বড় মেয়ে। ডাকছে হুতুম পেঁচা। প্রকৃতি ঘটনা পুনরাবৃত্তির ব্যবস্থা নতুনভাবেই করেছে। কী জন্যে করেছে? আমাকে নিয়ে মজা করছে? নাকি পুরো ব্যাপারটাই কাকতালীয়?

কে জবাব দেবে এই প্রশ্নের!

রাবণের দেশে
আমি এবং আমরা

১

সিল্কের ঝলমলে লুঙ্গি পরা একজন হাস্যমুখী মানুষ। দেখতে আমাদের বাঙালিদের মতো। যখনই হাসছেন তখনই ধবধবে সাদা দাঁত ঝকমকিয়ে উঠছে। ভদ্রলোকের হাতে গোলাপি রঙের ক্যামেরা। তিনি বিপুল উৎসাহে ক্যামেরায় একের পর এক ছবি তুলে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে নিজেও ছবির জন্যে পোজ দিচ্ছেন। তাঁর ক্যামেরায় অন্যরা ছবি তুলে যাচ্ছে।

ঘটনাটা ঘটছে ঢাকা এয়ারপোর্টের (এই এয়ারপোর্টের নাম ঘনঘন বদলাচ্ছে বলে ঢাকা এয়াবপোর্ট বলছি) যাত্রীদের ওয়েটিং লাউঞ্জে, যেখানে শ্রীলংকাগামী যাত্রীরা প্লেনে ওঠার অপেক্ষায় বসে আছেন। যাত্রীদের মধ্যে আছি আমি, দুই পুত্র এবং তাদের মা শাওন। লুঙ্গি পবা মানুষটির কর্মকাণ্ড আগ্রহ নিয়ে দেখছি। আগ্রহে বাধা পড়ল, কারণ হঠাৎ করেই পারিবারিক বিপ্লবের সূচনা হলো। তিন মাস বয়েসী কনিষ্ঠপুত্র নিনিত গলায় মাইক ফিট করে কান্না শুরু করেছে। সে দুধ খাবে। কৌটার দুধ আছে, কিন্তু তার মা দুধ গোলানোর পানি আনতে ভুলে গেছে। বেচারিকে বিব্রত দেখাচ্ছে।

নিনিতের বড় ভাই নিষাদের বয়স সাড়ে তিন বছর। সে তার ছোট ভাইকে কাঁদতে দেখলেই নিজে কাঁদার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে। নিষাদ বলল, আমার ক্ষিধে পেয়েছে। আমি এখন কী খাব ? বলেই ভাইয়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কান্না।

আমার সফরসঙ্গী স্কুলজীবনের বন্ধু সেহেরি এবং তার স্ত্রী নাজমা। তাদের মধ্যে কিছু নিয়ে ঝামেলা বেঁধেছে। নাজমা ভাবি ক্রুদ্ধমুখে স্বামীকে কঠিন কঠিন কথা বলছেন। সেহেরি গৌতম বুদ্ধের মতো মৌনব্রত ধারণ করেছে। পারতপক্ষে সে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলায় যায় না। বাইপাস অপারেশনের পর তার মধ্যে ভেজিটেবলভাব প্রবল হয়েছে। উচ্চশ্রেণীর কোনো ভেজিটেবলও না, নিম্নশ্রেণীর। যেমন—ধুন্দুল।

আমাদের এই হইচই ঝামেলার মধ্যে লুঙ্গি পরা মানুষটি ক্যামেরা হাতে এগিয়ে এলেন। হাসিমুখে বললেন, আমি আপনাদের ছবি তুলি ?

আমি যথেষ্টই বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তখন একজন বললেন, উনি বাংলাদেশে শ্রীলংকার হাইকমিশনার। যারা শ্রীলংকায় যাচ্ছেন তাদের 'হ্যালো' বলতে এসেছেন।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। একজীবনে নানান দেশে গিয়েছি। কোনো দেশের হাইকমিশনার বা অ্যামবেসেডারই এয়ারপোর্টে 'হ্যালো' বলতে আসেন নি। ঘটনাটা কী ?

সেহেরি বলল, বাংলাদেশ-শ্রীলংকা সরাসরি বিমান চলাচল আজই প্রথম শুরু তো, এই কারণেই হাইকমিশনার এসেছেন।

নাজমা ভাবি যে-কোনো ঘটনা নেগেটিভভাবে দেখার অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, প্রথম বিমান চলাচল শুরু হয়েছে

তার জন্যে হাইকমিশনার আসার দরকার কী ? এইগুলা আবার কী ঢং! ছবি তোলাতুলিতে সময় নষ্ট। ভার কারণেই তো বিমান ছাড়তে দেরি করছে।

বাংলাদেশ-শ্রীলংকা সরাসরি বিমান যাত্রার প্রথম ফ্লাইটের যাত্রী আমরা—এই তথ্য আমার জানা ছিল না। শ্রীলংকা ভ্রমণের আইডিয়া শাওনের। সব ব্যবস্থা সে করেছে। আমাকে কিছু জানায় নি, আমি জানতেও চাই নি। আমার কাছে এই মুহূর্তে শ্রীলংকা ভ্রমণ বিভীষিকার মতো। পুত্র নিনিতের বয়স তিন মাস। আমি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বিদেশের মাটিতে পা দেওয়ামাত্র এই ছেলে তার মাকে চিনবে না। সে সারাক্ষণ বানরের বাচ্চার মতো আমার ঘাড়ে ঝুলে থাকবে। ফিডারে করে তাকে দুধ খাওয়ানো থেকে শুরু করে ডায়াপার বদলানোর সর্ব দায়িত্ব আমার। একই ব্যাপার নিষাদের বেলায়ও ঘটেছে। সারাক্ষণ 'বাবা'! 'বাবা'! 'বাবা' ডাক অবশ্যই মধুর, কিন্তু বিদেশের মাটিতে না।

আমরা মিহিন লংকা বিমানে উঠেছি। সেহেরি এবং তার স্ত্রী বসেছেন আমাদের পেছনেই। নাজমা ভাবি 'মেদভুঁড়ি কী করি' গ্রুপের সদস্য। সিটে অনেক কষ্টে শরীর আঁটিয়েছেন। এখন বেল্ট বাঁধতে পারছেন না। তাঁর বিরক্তি হঠাৎ তুঙ্গে উঠেছে। তিনি তাঁর স্বামীকে ধমকাচ্ছেন—সিটে বাঁকা হয়ে বসেছ কেন ? সোজা হয়ে বসো। পা নাচাচ্ছ কেন ? তুমি কি পুলাপান ? ওইদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ কেন ? সাদা চামড়ার মেয়ে আগে দেখো নাই ? জীবনে প্রথম দেখছ ?

তিন ঘণ্টার বিমান ভ্রমণে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটল না। শুধু একজন বিমানবালা নাজমা ভাবির কাছে ধমক খেয়ে হকচকিয়ে গেল। বেচারি এসেছিল সেহেরিকে জিজ্ঞেস করতে, লাঞ্চে দুটা চয়েস আছে। ন্যাসি গোড়াং এবং জিরা রাইস। সে কোনটা নিবে ?

নাজমা ভাবি শ্রীলংকান বিমানবালাকে খাস বাংলায় বললেন, তারে জিজ্ঞেস করেন কেন ? সে কি কিছু জানে ? তারে যা দিবেন গবগবায়া খাবে। তার যে ডায়াবেটিস—এটা খাওয়ার সময় মনে থাকে না।

শ্রীলংকার এই বিমানবালার খাঁটি বাংলা বোঝার কোনোই কারণ নেই। ইউনিভার্সেল বডি ল্যাংগুয়েজের কারণেই মনে হয় সে বুঝল। দু'ধরনের খাবার এনে নাজমা ভাবির সামনে ধরল। ভাবি ভুরু কুঁচকে বললেন, এইগুলা কী ? আমাদের দেশের কোনো ফকিরের পোলাও তো এইগুলা খাবে না।

বন্দর নায়েকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নেমে দেখি, আমাকে রিসিভ করার জন্যে শ্রীলংকায় বাংলাদেশ মিশনের কনস্যুলার অফিসার মীর আকরাম এসেছেন। তাঁর হাতে সুন্দর গিফট র‍্যাপে মোড়া উপহার। আমার লজ্জার সীমা রইল না। অ্যাম্বেসির লোকজনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত। একজন লেখককে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে এসে সময় নষ্ট করা উচিত না।

আমি হাসিমুখে (নকল হাসি। এতারেস্টবিজয়ী মুসা ইব্রাহিম যে হাসি হেসে ছবি তোলেন।) আকরাম সাহেবের হাত থেকে উপহার নিলাম। ছবি উঠল। আমি এবং শাওন আবার হাসিমুখে একই গিফট নিলাম। আবারও ছবি উঠল। পুত্র নিষাদকে মাঝখানে রেখে তৃতীয়বারের মতো গিফট নেওয়া হলো। নকল হাসির বাজার বসে গেল।

গিফট হাতে নিয়ে আমি হতভম্ব। সেখানে লেখা—'হুমায়ূন স্যার এবং শাওন ভাবির বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা'। পৃথিবীর বেশির ভাগ স্বামীর মতো আজকের দিনটি আমার মনে নেই। এতক্ষণে দুয়ে দুয়ে চার হলো। শাওন কেন এই দিনেই শ্রীলংকা যাওয়ার ব্যবস্থা করল, কেন আমাকে ভ্রমণসংক্রান্ত কিছুই জানায় নি, কেন আমার কাছ থেকে কোনো টাকাপয়সা নেয় নি—সব পরিষ্কার। শ্রীলংকায় প্রমোদ ভ্রমণ বিবাহবার্ষিকীতে আমাকে দেওয়া শাওনের উপহার। এখন আমার উচিত তার দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে তাকানো, তা পারছি না। কারণ কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীলংকার বাঁদরের মতোই আমার গলায় ঝুলে তারস্বরে চিৎকার শুরু করেছে। তার ডায়াপারের ফাঁক দিয়ে হলুদ রঙের সিরাপের মতো কী যেন নামছে। তার বড় ভাই কিছুক্ষণ পরপর আমার শার্টে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলছে, বাবা! আমি এখন কী খাব?

[পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চই কৌতূহল বোধ করছেন, গিফট র‍্যাপে মোড়া উপহারটা কী জানার জন্যে। তাদের কৌতূহল মেটাচ্ছি। উপহার হলো একটা ফটোফ্রেম। ফটোফ্রেমের বিশেষত্ব হচ্ছে ফ্রেম বানানো এলাচির খোসা দিয়ে। গরম মসলার দেশে সবকিছুতে গরম মসলা থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক।]

আকরাম সাহেব আমাদের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (সাড়ে চার শ' ডলারে চুক্তি। সাত দিন গাড়ি থাকবে আমাদের সঙ্গে।) নয় সিটের বিশাল গাড়ি। গাড়ির চালক সুদর্শন যুবা পুরুষ, নাম 'দিগায়ু'। আমি চালককে বললাম, তোমার নামের অর্থ কি দীর্ঘ জীবন?

চালক অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ। তুমি কীভাবে জানলে?

দীর্ঘায়ু থেকে দিগায়ু—এটি আর ব্যাখ্যা করলাম না। আমার নজর সেহেরির দিকে। সে চোখের ইশারায় আমাকে কী যেন বলতে চাচ্ছে। মেয়েদের চোখের ভাষা সহজেই পড়া যায়, পুরুষদেরটা পড়া যায় না। একপর্যায়ে সেহেরির চোখের ভাষা বুঝতে পারলাম। সে তার স্ত্রীর পাশে বসতে চাচ্ছে না। আলাদা বসতে চাচ্ছে। আমি বললাম, সেহেরি! তুমি ড্রাইভারের পাশে বসো।

নাজমা ভাবি বললেন, এটা কেমন কথা! স্বামী-স্ত্রী বসবে পাশাপাশি, এটাই নিয়ম।

আমি বললাম, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। এর অর্থ বিদেশে কোনো নিয়ম নেই।

নাজমা ভাবি বললেন, আপনারা তো স্বামী-স্ত্রী ঠিকই পাশাপাশি বসেছেন।

আমি বললাম, আমাদের দু'জনের মাঝখানে ডাবল হাইফেনের মতো দুই পুত্র।

নাজমা ভাবি মুখ তোঁতা করে পরিস্থিতি মেনে নিলেন। আমাদের টিম লিডার শাওনের নির্দেশে গাড়ি চলতে শুরু করল। আমরা যাচ্ছি 'ডাম্বুলা'। সেখানে কোন হোটেলে উঠব, দর্শনীয় কী দেখব, কিছুই জানি না। টিম লিডার জানেন এটাই যথেষ্ট।

শাওন বলল, ডাম্বুলা যেতে আমাদের লাগবে মাত্র আড়াই ঘণ্টা। আমরা উঠব পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর হোটেলগুলির একটিতে। হোটেলটা ডিজাইন করেছেন পৃথিবীর সেরা আর্কিটেক্টদের একজন, তাঁর নাম জেফরি বাওয়া। হোটেলের নাম হেরিটেন্স কান্ডালামা। প্রায় বছরই এটি পৃথিবীর সেরা পরিবেশবান্ধব হোটেল হিসেবে ইউনেস্কো পুরস্কার পায়।

কী মনে করে আমি দিগায়ুকে জিজ্ঞেস করলাম, ডাম্বুলা যেতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে?

সে বলল, সাত থেকে আট ঘণ্টা।

আমি টিম লিডারের দিকে তাকালাম। টিম লিডার বললেন, আমি সব তথ্য পেয়েছি ইন্টারনেটে। এক্ষুনি তোমাকে দেখাচ্ছি।

সে তার আইফোন নিয়ে টেপাটিপি করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। সে জানাল তার আইফোন কাজ করছে না।

আমি দিগায়ুকে বললাম, আমরা দীর্ঘ ভ্রমণে রওনা হয়েছি, ধরো কোনো কারণে গাড়ি নষ্ট হয়ে গেল, তখন আমরা কী করব?

দিগায়ু বলল, আমি কোম্পানিকে টেলিফোন করে দিলেই অন্য গাড়ি চলে আসবে। তবে ছোট্ট সমস্যা হয়েছে।

কী সমস্যা?

হাত থেকে পড়ে আমার মোবাইল ফোন নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি বললাম, চমৎকার। ধরা খাব কয়েকটা ইঁদুর এবার।

দিগায়ু বলল, কী বললে বুঝলাম না।

আমি বললাম, বাংলা ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করলাম।

ততক্ষণে আনন্দের বদলে আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবার ক্ষুধা পাবে। সঙ্গে শ্রীলংকার কোনো টাকা নেই। এয়ারপোর্টে ডলার ভাঙানো হয় নি, কারণ টিম লিডারের নির্দেশ পাওয়া যায় নি।

আমি দিগায়ুকে বললাম, পথে আমাদের কিছু খেতে হবে। এমন কোনো রেস্টুরেন্ট কি পাওয়া যাবে যেখানে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যায়? আমার সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড আছে। ডলার আছে।

দিগায়ু বলল, সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে চেষ্টা করে দেখব।

প্রতি আধঘণ্টা পরপর দিগায়ু একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামাচ্ছে। খোঁজ নেওয়ার জন্যে ছুটে যাচ্ছে এবং মুখ শুকনো করে ফিরে আসছে। আমি প্রমাদ গুনলাম।

অন্ধকার রাস্তা। স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা নেই। রাস্তাও ভালো না। বাংলাদেশের মফস্বল শহরের রাস্তার মতো খানাখন্দে ভরা। আমরা ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগুচ্ছি। ঝাঁকুনির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ভালো। নিনিত ঘুমাচ্ছে। শিশুরা বিচিত্র কারণে ঝাঁকুনি পছন্দ করে।

সেহেরি বলল, আমার ডায়াবেটিস! কিছু না খেলে তো মারা যাব।

আমি বললাম, নিনিতের দুধ আছে। ফিডারে করে বানিয়ে দেই খাও।

সেহেরি হতাশ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মৌনভাব ধরল। নাজমা ভাবি বললেন, হুমায়ূন ভাই তো ভুল কিছু বলেন নাই। তুমি রোগী মানুষ। তোমার খাওয়া দরকার। দুধ তোমার জন্যে উপকারী। বাচ্চাদের দুধে ফ্যাটও থাকে কম।

সেহেরি ক্ষিপ্ত গলায় বলল, আমি ফিডারে করে দুধ খাব ?

নাজমা ভাবি বললেন, তোমার জন্যে এখন গ্লাস পাব কই ? হুমায়ূন ভাই জ্ঞানী মানুষ। তিনি না ভেবে-চিন্তে কিছু বলেন না।

সেহেরি বলল, চুপ করো তো!

নাজমা ভাবি বললেন, চুপ করব কেন ? চুপ করার কী আছে ? আগে তো জীবন রক্ষা করবে, তারপর অন্য কিছু। তোমাকে ফিডারে দুধ খেতে হবে। আমরা আমরাই তো। কেউ তো আর ঘটনা দেখছে না।

প্রিয় পাঠক, সেহেরি ফিডারে দুধ খেয়েছে কি খায় নি তা পরিষ্কার করছি না। সব তথ্য প্রকাশ করতে নেই। তবে আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে।'

গভীর রাতে আমরা জেফরি বাওয়ার ডিজাইন করা হোটেলে ঢুকতে শুরু করলাম। মনে হলো সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। একসময় গাড়ি থামল। পাথরের প্রকাণ্ড পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে হোটেল। কেমন যেন ভৌতিক দেখাচ্ছে।

ফাইভস্টার হোটেলের লবি হয় আলোঝলমল। দেখামাত্র চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এখানে লবি বলে কিছু নেই। টেবিলের কোণে দু'টি লুঙ্গি পরা মেয়ে বসে আছে। তাদের সামনে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। আধো আলো এবং অন্ধকার। সব মিলিয়ে অতি রহস্যময় পরিবেশ।

নাজমা ভাবি কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, হুমায়ূন ভাই! এই কোন জঙ্গলে এনে আপনি তুললেন ? তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ফল পড়ার মতো গাছ থেকে দুটা বাঁদর পড়ল। নাজমা ভাবি চেঁচিয়ে উঠলেন, এইগুলা কী! এইগুলা কী!

পুত্র নিষাদ বলল, এগুলির নাম মাংকি!

মাংকি দু'টা নিষাদের সামনে এসে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যেই নিষাদের হাতের চকলেটের প্যাকেট কেড়ে নিয়ে গাছে উঠে পড়ল।

ভয়ে হোক কিংবা প্রেমবশতই হোক, নাজমা ভাবি সেহেরিকে জড়িয়ে ধরে আছেন। দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগছে।

অতি দ্রুত আমরা রুমের চাবি পেয়ে গেলাম। রিসিপশনিস্ট মেয়েটি বলল, তোমাদের রুমের একদিকটা পুরোটাই কাচের। স্লাইডিং ডোর। রাতে ঘুমুবার আগে অবশ্যই স্লাইডিং ডোর লক করবে। নয়তো বাঁদর ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে যাবে।

নাজমা ভাবি হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করে বললেন, হুমায়ূন ভাই, আপনি কোথায় এনে তুলেছেন! রাতে বান্দর ঢুকে তো আমাকে খেয়ে ফেলবে।

সেহেরির ঠোঁটের ফাঁকে ক্ষীণ হাসি। বাঁদর তার স্ত্রীকে খেয়ে ফেলছে—এই দৃশ্য কল্পনায় দেখে তার হয়তো ভালো লাগছে।

ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় রুমে ঢুকলাম। শাওন বলল, হোটেল পছন্দ হয়েছে?

আমি বললাম, ভোর হোক, তারপর বলব।

রুমের সামনের বিশাল বারান্দায় সাত-আটটা বাঁদর এসে বসে আছে। গভীর আগ্রহে তারা নতুন অতিথিদের দেখছে। একটিকে দেখলাম দু'পায়ে ভর দিয়ে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। নিষাদ তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, Don't touch me. সে কিছুদিন হলো স্কুলে যাচ্ছে। তার ইংরেজি স্কুল থেকে শেখা।

পাশের রুমে সেহেরি এবং নাজমা ভাবি। নাজমা ভাবির কঠিন গলা শোনা যাচ্ছে। সেহেরির গলা পাওয়া যাচ্ছে না। ঝগড়া হচ্ছে একতরফা।

আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকীর রাত। রাতটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কিছু একটা করা দরকার। আমি শাওনের দিকে তাকিয়ে বললাম, একটা গান করো তো।

শাওন বলল, এই অবস্থায়?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

নিষাদ বলল, মা গান করবে না। আমি কথা বলেই সে গান ধরল—

আজকের আকাশে অনেক তারা
দিন ছিল সূর্যে ভরা
আজকের জোছনাটা আরও সুন্দর
সন্ধ্যাটা আগুনলাগা।

শাফিন আহমেদের গাওয়া এই গানটা নিষাদ পুরোটা গাইতে পারে। নিষাদ গান করছে, তার মা'র চোখ ছলছল করছে। আহারে, কী সুন্দর দৃশ্য!

ভোর হয়েছে।

আমি চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় বসে আছি। আমার সামনে বিশাল কান্ডালামা লেক। আকাশ ঘন নীল। সেই নীল গায়ে মেখে কান্ডালামা হ্রদ হয়েছে নীল। কী আনন্দময় অপূর্ব দৃশ্য! আমি মনে মনে বললাম, 'আজ আমি কোথাও যাব না।'

মধ্যবিত্তের বিদেশ ভ্রমণ হলো চড়কিবাজি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি। দর্শনীয় যা আছে সব দেখে ফেলতে হবে। কোনোকিছু যেন বাদ না পড়ে। এত টাকাপয়সা খরচ করে এসে বিশ্রামে সময় নষ্ট করা কেন?

ইউরোপ-আমেরিকার ট্যুরিস্টদের দেখি ভ্রমণের সঙ্গে তারা যুক্ত করে বিশ্রাম। রোদে শুয়ে থেকে বই পড়ে। বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঘুম। ঠান্ডা বিয়ারের গ্লাসে চুমুক।

আমি সারা দিন আমার ঘরের বারান্দায় বসে কাটাব—এই দুঃসংবাদ শুনে নাজমা ভাবির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি হতাশ গলায় বললেন, আপনি তো সারা দিন নুহাশপল্লীর বাংলোর বারান্দাতে বসে সময় কাটাতে পারেন। এত টাকাপয়সা খরচ করে এখানে তাহলে এসেছেন কেন ?

অকাট্য যুক্তি। কিন্তু লেখকশ্রেণী যুক্তির বাইরে থাকতে পছন্দ করেন। আমি হ্রদের দিকে তাকিয়ে বারান্দায় বসে রইলাম। আমার সামনে কাগজ-কলম। দেশের বাইরে আমি কখনো লেখালেখি করি না। এই তথ্য জানার পরেও আমি যেখানে গিয়েছি শাওন কাগজ-কলম নিয়ে গেছে। আমার সামনে রেখেছে। শাওনকে খুশি করার জন্যেই কবিতার কয়েকটি চরণ লেখার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম।

আজ দুপুরে হ্রদের নিমন্ত্রণ
অতিথি আমরা ক'জন।
পুত্র নিষাদ এবং শাওন
শাওনের লেখক স্বামী...

এরপর আর মিলাতে পারছি না। গদ্যলেখক হওয়ার অনেক সুবিধা। মিলানোর চিন্তা নেই। কবিতাটা হয়তো আরও কয়েক লাইন লিখতে পারতাম, তার আগেই দুর্ঘটনা ঘটল। বাঁদর এসে টেবিল থেকে চশমা নিয়ে পালিয়ে গেল। চশমা ছাড়া আমি কাছের জিনিস দেখতে পাই। দূরের কিছুই দেখি না। এখন উপায় কী হবে! আমার হাহাকার ধ্বনি শুনে শাওন বারান্দায় এসে আমাকে আশ্বস্ত করল। সে আমার আরও দুটি চশমা নিয়ে এসেছে।

এখন অতি বিস্ময়কর একটি ঘটনা বলি। রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে বারান্দায় গিয়েছি শেষ সিগারেট খেতে। অবাক হয়ে দেখি টেবিলে আমার চশমা। যে বাঁদর চশমা নিয়ে গিয়েছিল সে ফেরত দিয়ে গিয়েছে।

পুনশ্চ

কান্ডালামা হোটেলে এক ভোরবেলায় নাশতা খাচ্ছি, বেয়ারা যখন শুনল আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি তখন আনন্দে তার বত্রিশ দাঁত বের হয়ে গেল। তার আনন্দের কারণ বুঝতে না পেরে আমি জানতে চাইলাম, বাংলাদেশি শুনে এত খুশি কেন ?

সে বলল, তোমরা খুব ভালো মারামারি করতে পারো।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। তার কাছে শুনলাম, এই হোটেলে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম এবং ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম ছিল। তাদের মধ্যে মারামারি লেগে গেল। বাংলাদেশ জিতল। দু'দলের মারামারি থামিয়েছিলেন ক্রিকেটার জাভেদ ওমর।

যেভাবেই হোক দেশ পরিচিতি পাচ্ছে, এটা খারাপ কী!

যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ১৬০০ বছর আগে শ্রীলংকার নৃপতি ছিলেন রাজা কাশ্যপ।

কাশ্যপ ছিলেন মহা ভীতুদের একজন। সর্বক্ষণ আতঙ্কে থাকেন কখন জলদস্যুরা আক্রমণ করে। কখন-বা ভারত থেকে সৈন্যবাহিনী এসে তাঁর দেশ দখল করে।

তাঁর আসল ভয় সৎভাই ম্যাগলোনাকে। সে ঘোঁট পাকাচ্ছে কাশ্যপের রাজত্ব দখলের। প্রজারা আবার ম্যাগলোনার অনুগত, কারণ মহারাজা কাশ্যপ রক্ষিতার গর্তে জন্মেছেন। অন্যদিকে তার সৎভাইয়ের গায়ে আছে রাজরক্ত। প্রজারা রাজরক্তের ভক্ত হয়ে থাকে।

একজন ভীতু মহারাজা কী করেন? বিশাল সৈন্যবাহিনী হাতের কাছে মজুদ রাখেন। কাশ্যপও তা-ই করেছেন। তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী। সবাই হাতিতে চড়ে যুদ্ধে পারদর্শী। শ্রীলংকা হাতির দেশ। রাজা কাশ্যপের আছে দশ হাজার হাতির বিশাল বাহিনী।

একজন ভীতু রাজা তাঁর প্রাসাদ এমন এক জায়গায় নির্মাণ করেন, যেখানে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। রাজা কাশ্যপ তা-ই করেছেন। ছয় শ ফুট উঁচু এক পাথর কেটে দুর্ভেদ্য প্রাসাদ বানিয়েছেন। প্রাসাদ অনেকটা মৌচাকের চাকের মতো। এই পাথর 'সিগিরিয়া রক' নামে ভুবনবিখ্যাত। সিগিরিয়া রকের আরেক নাম 'লায়ন রক'। পাথরের এই দুর্গের প্রবেশপথটি একটি বিশাল সিংহমূর্তির মতো। সিংহমূর্তির অনেকখানি এখনো টিকে আছে।

ভীতু রাজারা লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করেন। সেই কারণেই কাশ্যপের বেশিরভাগ সময় কাটে দুর্ভেদ্য পাথরের প্রাসাদে। সেখানে আমোদ-প্রমোদের সব ব্যবস্থা আছে। তাঁর রক্ষিতার সংখ্যা পাঁচ শ'র বেশি। তাঁর রক্ষিতা হিসেবে আফ্রিকান মোটা ঠোঁট কোঁকড়ানো চুলের মেয়ে যেমন আছে, চাপা নাক চেরাচক্ষুর চৈনিক তরুণীও আছে।

তাঁর নির্দেশে এই পাঁচ শ' তরুণীর নগ্ন এবং অর্ধনগ্ন চিত্র আঁকা হয়েছে পাহাড়ের গুহায়। এইসব দেয়ালচিত্রের সামনেই গ্রানাইট পাথরের দেয়াল। গ্রানাইট পাথর ঘষে এমন চকচকে করা হয়েছে যে, সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে আয়না। এই আয়নায় দেয়ালচিত্রে আঁকা রক্ষিতাদের ছবি প্রতিফলিত হয়। রাজা কাশ্যপ প্রতি বিকেলে আয়নায় রক্ষিতাদের ছবি দেখে ঠিক করেন আজ রাত কার সাথে কাটাবেন।

পাথরের সুউচ্চ প্রাসাদে কাশ্যপ সুইমিং পুলের ব্যবস্থা করেছেন (আজও টিকে আছে)। সখীদের নিয়ে আনন্দ-স্নানের আয়োজন।

ব্রিটিশ এক ইতিহাসবিদ ভিন্ন কথা বলছেন। তাঁর মতে তরুণীরা সবাই একদিকে যাচ্ছে। কারও কারও হাতে ফুল। তারা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে বৌদ্ধ বিহার পিদুরাগালা, সিগিরিয়া থেকে এক মাইল দূরে। কাজেই তরুণীরা যাচ্ছে বৌদ্ধ বিহারে গৌতম বুদ্ধের মূর্তির কাছে।

ইতিহাসবিদরা মাঝে মাঝে ইতিহাস লিখতে হাস্যকর যুক্তি ব্যবহার করেন। যে গৌতম বুদ্ধ নারীদের সাধনার বিঘ্ন ঘোষণা করেছেন, তাঁর কাছে তরুণীরা যাবে নগ্ন অবস্থায় ? শুধু নগ্ন নারীরাই যাবে ? পুরুষ যাবে না ? কোনো পুরুষের ছবি দেয়ালচিত্রে নেই।

কাশ্যপের দিন আনন্দেই কাটছিল, হঠাৎ খবর পাওয়া গেল সৎভাই হস্তীবাহিনী নিয়ে আক্রমণের জন্যে আসছে। কাশ্যপ তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। তখনকার রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালক হিসেবে হাতির পিঠে রাজা কাশ্যপ আছেন সবার সামনে। তাঁকে অনুসরণ করছে তাঁর বাহিনী। এমন সময় দুর্ঘটনা ঘটল। কাশ্যপের হাতি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ স্থির থেকে পেছনে ফিরল।

কাশ্যপের সেনাপতিরা ভাবল, রাজা যুদ্ধ না করে পালাতে চাচ্ছেন। তারা রাজাকে ফেলে নিমিষের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। কাশ্যপ অবাক হয়ে দেখলেন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একা। ভাইয়ের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে তিনি মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করলেন। কোমর থেকে ধারালো ছোরা নিয়ে নিজের গলায় বসিয়ে দিলেন।

কাশ্যপের সেই পাথরের প্রাসাদ আজও দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর অতি বিস্ময়কর স্থান হিসেবে।

এই মুহূর্তে আমি আমার সফরসঙ্গীদের নিয়ে সিগিরিয়া রক নামে খ্যাত কাশ্যপের প্রাসাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। যেসব পর্যটক দেয়ালচিত্র দেখবে তাদের চার শ' ফুট উপরে উঠতে হবে।

আমি বললাম, অসম্ভব ব্যাপার। সিগারেট ফুঁকে ফুঁকে ফুসফুস করেছি দুর্বল। বাইপাস অপারেশনে হার্টের অবস্থা নাজুক। নগ্নবক্ষা তরুণীদের ছবি দেখতে গিয়ে অপঘাতে মরার কোনো মানে হয় না। আমি শাওনকে জানালাম, আমার পক্ষে উপরে ওঠার প্রশ্নই আসে না।

সেহেরি আমার চেয়ে এক কাঠি উপরে। সে উপরে উঠবে কি উঠবে না তা না-বলেই স্ত্রীকে রেখে উল্টাদিকে হাঁটা শুরু করল।

নাজমা ভাবি চেঁচাচ্ছেন, এই, তুমি কাউকে কিছু না বলে যাচ্ছ কোথায় ? তোমার কি ভীমরতি হয়েছে ?

সেহেরি ফিরেও তাকাল না। স্ত্রীকে উপেক্ষা করার তার অসীম সাহস দেখে আমি মুগ্ধ।

নাজমা ভাবি বললেন, হুমায়ূন ভাই, আপনি একটা বুদ্ধি দেন দেখি আমি কী করব। ডলার খরচ করে একটা জিনিস না দেখে চলে যাব ? এটা কি ঠিক হবে ?

আমি বললাম, অবশ্যই ঠিক হবে না। আপনি উপরে উঠবেন। গাইডরা ঠেলেঠুলে আপনাকে তুলে ফেলবে।

পরপুরুষ গায়ে হাত দিবে—এটা কেমন কথা ?

তাহলে নিজেই সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকুন। শাওন যাচ্ছে। সে আপনাকে সাহায্য করবে।

নাজমা ভাবি রওনা হলেন। আমি দুই পুত্র নিয়ে বিশাল এক পাথরের উপর বসে আছি। জায়গাটা সমভূমি থেকে অনেক উঁচুতে। দুজনকে নিয়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাসের কাছে যাওয়া সম্ভব না। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অপরূপ। দৃশ্যে মন দিতে পারছি না। বারবার একটা সাইনবোর্ডে দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে। সেখানে ইংরেজিতে লেখা সাবধান বাণী—

ভয়ঙ্কর ভিমরুলের চাকপ্রধান এলাকা

শব্দ করে তাদের বিরক্ত করবে না।

প্রাণসংহার হতে পারে।

ভিমরুলদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই হয়তোবা নিষাদ গলা উঁচিয়ে কাঁদতে লাগল— মা'র কাছে যাব! মা'র কাছে যাব! তার বিকট কান্নায় কনিষ্ঠজনের নিদ্রাভঙ্গ হলো। সে ভাইয়ের সঙ্গে তাল দিয়ে কাঁদতে লাগল। দুই ভাইয়ের কান্নায় ভিমরুলদের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কথা। আমি আতঙ্কিত বোধ করছি। বেড়াতে এসে ভিমরুলের হাতে জীবন দেওয়ার অর্থ হয় না।

আমার দুরবস্থা দেখে শ্রীলংকান এক যুবক পুরুষ এগিয়ে এল। জানতে চাইল, বাচ্চা কাঁদছে কেন? [ইংরেজিতে প্রশ্ন, শুদ্ধ ইংরেজি। শ্রীলংকায় শিক্ষার হার শতভাগ।]

আমি বললাম, বড়টি কাঁদছে মা'র কাছে যাওয়ার জন্যে। ছোটটি ভাইয়ের কান্নায় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিচ্ছে। এরা কখনোই আলাদা কাঁদে না, একসঙ্গে কাঁদে।

যুবাপুরুষ বলল, এক হাজার রুপির বিনিময়ে আমি তোমার পুত্রকে ঘাড়ে করে তার মা'র কাছে নিয়ে যেতে পারি। শিশুদের কোলে করে দেয়ালচিত্রের কাছে নিয়ে যাওয়াই আমার জীবিকা।

নিষাদ অপরিচিত এই মানুষটির কোলে চড়ে মা'র কাছে যেতে রাজি হলো। কান্না থামাল।

বড় ভাই কাঁদছে না, কাজেই ছোটটারও কান্না বন্ধ। আমি যুবককে বললাম, তুমি আরেকজনকে খুঁজে বের করো যে ছোটটাকে কোলে নিয়ে উঠবে। আমার কাছে বেবি ক্যারিয়ার আছে। বাচ্চাকে সেখানে বসিয়ে পিঠে বেঁধে নিলেই হবে।

আমি কল্পনায় দেখছি দুই ভাই মা'র কাছে উপস্থিত। মা তাদের দেখে বিস্ময়ে খাবি খাচ্ছে। দেয়ালচিত্র তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। পরিচিতজনদের বিস্মিত করতে আমার সবসময় ভালো লাগে।

বিস্মিত করার পরিকল্পনা কাজে লাগল না। শেষ মুহূর্তে নিষাদ বলল, সে তার বাবাকে ছাড়া যাবে না। কেউ আমাকে কোলে করে সিঁড়ি বাইছে—এই দৃশ্য কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। দুই ভাই কাঁদুক। কী আর করা।

সরু পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে সাড়ে চার শ' ফুট ওঠার রোমাঞ্চকর বর্ণনা শাওনের কাছে শুনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। এত কাছে এসেও দেখা হলো না। বয়স এবং স্বাস্থ্য বাদ সাধল। আনন্দভ্রমণে তিনটি জিনিস লাগে—

অর্থ

বয়স

স্বাস্থ্য

ভ্রমণে বের হওয়ার মতো অর্থবান হতে সাধারণ বাঙালি ছেলের অনেক সময় লাগে। অর্থ যোগাড়ের সামর্থ্য হতে হতে তার বয়স হয়ে যায়, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে।

শাওনের কাছ থেকে নাজমা তাবির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শুনলাম। বেচারি দেড় শ' ফুট পর্যন্ত নিজে নিজেই উঠলেন। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমার পক্ষে আর ওঠা সম্ভব না। আমি নেমে যাব।

বললেই নামা যায় না। নামার সিঁড়ি ভিন্ন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর জন্য দুজন গাইড যোগাড় করা হলো। একজন তাঁকে সামনে থেকে টানছে। আরেকজন পেছন থেকে ঠেলছে। সাড়ে চার শ' ফুট ওঠার পর তিনি হতাশ গলায় বললেন, 'নেংটা মেয়েদের ছবি দেখার জন্য এত কষ্ট করেছি?' বলেই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তাঁকে নামিয়ে আনতে তিনজন গাইড লাগল। তারা কাঁধে করে তাঁকে নামিয়ে ফেলল। গাইডদের কর্মক্ষমতা অসাধারণ।

পাঁচ শ' রক্ষিতার ছবি থেকে মাত্র আঠারটি টিকে আছে। বাকি ছবি ধ্বংস করেছেন বৌদ্ধভিক্ষুরা। পরাজিত কাশ্যপের বিজয়ী ভ্রাতা সিগিরিয়া রক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপহার হিসেবে দান করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের বাণী তাঁকে খুব প্রভাবিত করেছে তা মনে হয় না। তিনি কাশ্যপের প্রতিটি কর্মচারী, তার আত্মীয়স্বজন সবাইকে হত্যা করেন। এই হতভাগ্যের দলে কাশ্যপের স্ত্রী-কন্যারাও ছিল। সর্বমোট সংখ্যা এক হাজার।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কাশ্যপের সাধের প্রাসাদে বাস করতে আসেন। তাঁরা সেখানকার নির্জনতায় উপাসনার ফাঁকে ফাঁকে দেয়ালচিত্র ধ্বংস করতে থাকেন। বৌদ্ধধর্মে নারীরা সাধনার বাধা। সেখানে নগ্ন নারীমূর্তির ছবির সামনে উপাসনা অর্থহীন হবেই।

একই ঘটনা রোমের সিসটিন চ্যাপালে ঘটেছিল। গির্জার দেয়ালচিত্র এঁকেছিলেন পৃথিবীর মহান শিল্পীদের একজন—মাইকেল এঞ্জেলো। সেখানে নগ্ন নারীর ছবি। পোপের নির্দেশে সব নগ্ন নারীকে কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়। অনেক বছর পরে কাপড়ের রঙ সরিয়ে অপূর্ব নারীমূর্তি বের করা হয়।

সিগিরিয়া রকের ফ্রেসকো আমি দেখতে পাই নি, সিসটিন চ্যাপেলের বিখ্যাত ফ্রেসকো দেখেছি।

এখন রাজা কাশ্যপ বিষয়ে কিছু বলি। তাঁর বাবা ছিলেন অনুরাধাপুরের নৃপতি। নাম ধাতুসেন। তিনি শুধু যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন তা-না, মনেপ্রাণে গৌতম বুদ্ধের বাণীতে

বিশ্বাসী ছিলেন। প্রজাহিতকর অসংখ্য কাজ তিনি করেছেন। সাধারণ মানুষের হাসপাতাল তো বানিয়েছেনই, পঙ্গুদের জন্যেও একটা হাসপাতাল বানিয়েছেন। অনুরাধাপুরের মানুষদের জলকষ্ট নিবারণের জন্যে তিনি বৃষ্টির পানি ধরে রাখার বিশাল প্রকল্প শেষ করেন। এই পানি সেচকার্যে ব্যবহার করে অনুরাধাপুর হয়ে উঠল সুজলা-সুফলা। ঐতিহাসিক মাহাওয়ানসা (Mahawansa) বলেছেন, ধাতুসেনের সুকৃতি লিখতে পাতার পর পাতা লাগবে, তারপরেও লিখে শেষ করা যাবে না।

তাঁর পুত্র কাশ্যপ পিতাকে বন্দি করে সিংহাসন দখল করলেন। পিতার উপর প্রবল চাপ প্রয়োগ করলেন তাঁর লুকানো সম্পত্তির জন্যে। একসময় ধাতুসেন বললেন, চলো তোমাকে আমার সম্পত্তি দেখাচ্ছি। তিনি তাকে নিয়ে গেলেন তাঁর তৈরি জলাধারের কাছে। বললেন, ওই দেখো আমার সম্পত্তি।

কাশ্যপ পিতাকে বললেন, আপনি যেন সারা জীবন আপনার লুকানো সম্পত্তি দেখতে পারেন সেই ব্যবস্থা করছি। তিনি লেকের দিকে মুখ ফিরিয়ে পিতাকে দেয়ালের সঙ্গে জীবন্ত প্লাস্টার করে ফেললেন। ধাতুসেন চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে ছিলেন।

মোঘল আমলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। সম্রাট শাহজাহানকে বন্দি করেছেন তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব। শাহজাহানের দিন কাটছে তাঁর নিজের সৃষ্টি তাজমহলের দিকে তাকিয়ে। শাহজাহান ভাগ্যবান, তাঁর পুত্র পিতাকে দেয়ালে প্লাস্টার করে ফেলে নি।

ভাইয়ের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে কাশ্যপের হাতি হঠাৎ কেন পিছু ফিরল তার ব্যাখ্যা হলো—হাতিরা জলাভূমিতে চোরাবালির অস্তিত্ব বুঝতে পারে। হাতির সামনে চোরাবালি পড়েছিল বলেই সে দিক পরিবর্তন করে। এখানে আমার ছোট্ট প্রশ্ন আছে। হাতি চোরাবালির অস্তিত্ব টের পেয়ে পেছনে ফিরে—এই তথ্য কি হাতিটা কাউকে বলে গেছে?

সিগিরিয়া রক একসময় বনজঙ্গলে ঢাকা পড়ে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। দুজন ব্রিটিশ পর্যটক ১৮৫৩ সালে এর অস্তিত্ব খুঁজে পান। এরপর থেকে প্রতিবছর শত শত পর্যটক এখানে আসেন। মুগ্ধ হয়ে দেখেন যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ১৬০০ বছর আগের অপূর্ব স্থাপত্য।

পুনশ্চ

দেয়ালচিত্রগুলিতে তিনটি রঙ ব্যবহার করা হয়—লাল, হলুদ ও সবুজ। একটি মাত্র ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কালো ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো ছবিতে নীল রঙ নেই। এটি চিত্র বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করেছে। কারণ অজন্তার গুহাচিত্র একই সময়ে আঁকা। সেখানে নীল রঙ ব্যবহার করা হয়েছে।

সিগিরিয়া রকে আঁকা ফ্রেসকো বিষয়ে কিছু কথা। দেয়াল তৈরি হওয়ার পর রঙতুলি দিয়ে ফ্রেসকো আঁকা হয় না। দেয়ালে প্লাস্টারের সময় ছবি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। লাইম স্টোনের আস্তরের সঙ্গেই প্রাকৃতিক রঙ মেশানো হয়। এই কারণেই ছবিতে যদি কোনো ভুল থাকে সেই ভুল শুধরানো যায় না।

সিগিরিয়া রকের দেয়ালচিত্রে বড় কিছু ভুল এই কারণেই থেকে গেছে। যেমন, এক তরুণীর দু'টা হাতের বদলে তিনটা হাত। একটা হাত তার বুকের ভেতর থেকে বের হয়েছে।

পাঁচটা আঙুলের বদলে কিছু তরুণীর হাতে দু'টা আঙুল। একজনের হাতে ছয়টা আঙুল দৃশ্যমান।

দেয়ালচিত্রগুলো একজন শিল্পী এঁকেছেন, নাকি অনেকের পরিশ্রমের ফসল—তা জানা যায় নি। শিল্পী হারিয়ে গেছেন, তার শিল্পকর্ম সাড়ে তিন হাজার বছর পরেও মানুষকে মুগ্ধ করছে। সেইসব শিল্পী কত না ভাগ্যবান!

৩

তরা পূর্ণিমা। জোছনার ফিনকি ফুটেছে। জানালা ভেঙে যশোধরার শোবার ঘরের খাটে জোছনা ঢুকে পড়েছে। তরুণী যশোধরা পুত্র রাহুলকে নিয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। পাশেই তার রূপবান তরুণ স্বামী। স্বামী হঠাৎ জেগে উঠলেন। অপূর্ব জোছনা দেখে তাঁর হৃদয় আবেগে মথিত হলো। সর্ব রূপের আধার যে ঈশ্বর তাঁর সন্ধানের জন্যে তিনি ব্যাকুল হলেন। স্ত্রী-সন্তানকে ফেলে গৃহত্যাগের সংকল্প নিয়ে বিছানায় বসলেন। ঘুমের ঘোরে স্ত্রী যশোধরা তাঁর গায়ে হাত রাখলেন। তিনি সাবধানে সেই হাত সরিয়ে রেখে যখন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেলেন তখন পুত্র অব্যক্ত স্বরে ডেকে উঠল, 'বাবা!' তিনি চমকে উঠলেন, কিন্তু সংকল্পচ্যুত হলেন না। গৃহত্যাগ করলেন।

প্রাচীন সেই ভারতে তখন থালা হাতে অনেক ভিক্ষুক পথে পথে ঘুরত। তারা মুখে খাবার চাইত না। গৃহস্থের দিকে থালা বাড়িয়ে দিত।

যশোধরার স্বামী এই কাজটিই করলেন। থালা হাতে মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরতে লাগলেন।

মানুষটিকে সারা পৃথিবী চেনে। তিনি গৌতম বুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় হুবহু এই ঘটনাটা আছে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর কবিতায় স্বামী যখন স্ত্রী-সন্তানকে ফেলে ঈশ্বরের সন্ধানে গৃহত্যাগ করছেন তখন ঈশ্বর আক্ষেপের সুরে বলছেন—

> দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, 'হায়
> আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?'

আমরা এখন আছি গৌতম বুদ্ধের দেশে। যেখানেই চোখ যায় সেখানেই গৌতম বুদ্ধের ধ্যানী মূর্তি। একেকটি ছ'তলা সাততলা দালানের সমান। প্রতিটি পাহাড়ের চূড়ায় মূর্তি। প্রকাণ্ড সব স্তূপা। স্তূপা নির্মিত হয় বুদ্ধের ব্যবহৃত জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখার জন্যে।

ক্যান্ডিতে আছে গৌতম বুদ্ধের পবিত্র দাঁত। নাজমা ভাবি গৌতম বুদ্ধের দাঁত দেখার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর একটাই কথা, ডলার খরচ করে এসেছি, গৌতম বুদ্ধের দাঁত না দেখে ফিরে যাব? এটা কেমন কথা!

আমার কথা হচ্ছে, দাঁত শরীরের একটি মৃত অংশ। অন্য একজন মানুষের দাঁতের সঙ্গে এই পবিত্র দাঁতের কোনো পার্থক্য থাকার কথা না।

নাজমা ভাবি রাগী গলায় বললেন, এটা কী বললেন! আপনার দাঁত আর উনার দাঁত একই?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, অবশ্যই না। দাঁত থেকে DNA টেস্টের মাধ্যমে যদি জিন স্ট্রাকচার বের করা যায় তাহলে দেখা যাবে দুজনের জিন-গঠন ভিন্ন। চলুন দাঁত দেখতে যাব।

আমি রাজি হলাম, কিন্তু আমার মনের খুঁতখুঁতানি দূর হলো না। খুঁতখুঁতানির প্রধান কারণ, ভূপর্যটক এবং মহান পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। তিনি লংকার কলম্বোর একটি বৌদ্ধ বিহারের সম্মানিত শিক্ষক ছিলেন। আঠার মাস সেখানে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা *আমার জীবনযাত্রা* গ্রন্থে লিখে গেছেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে গৌতম বুদ্ধের দাঁত প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, এই দাঁত বুড়ো আঙুলের মতো মোটা। লম্বায় প্রায় দুই ইঞ্চি। এটা মানুষের দাঁত হতে পারে না। মূল দাঁত পর্তুগীজ জলদস্যুরা পুড়িয়ে ফেলে। তারা নকল একটি দাঁত দান করে।

আমরা গৌতম বুদ্ধের দাঁত দেখতে যাচ্ছি—এই খবরে পুত্র নিষাদ অত্যন্ত উল্লসিত হলো। তার উল্লাসের কারণ ধরতে পারলাম না। গৌতম বুদ্ধের বিশাল বিশাল মূর্তি দেখে সে এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে কি না কে জানে!

আমি তাকে বললাম, বাবা তুমি গৌতম বুদ্ধের দাঁত দেখতে চাচ্ছ কেন?

নিষাদ বলল, সে তার ভাই নিনিতের জন্যে সেখান থেকে দাঁত কিনে ভাইয়ের মুখে লাগিয়ে দেবে। দাঁতের অভাবে তার ভাই চকলেট খেতে পারছে না—এইজন্যে তার খারাপ লাগে।

শেষ পর্যন্ত দাঁত দেখা হলো না। কারণ ড্রাইভার সিংহলি বলল, বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়া এই দাঁত সর্বসম্মুখে বের করা হয় না। আজ সেই বিশেষ দিন না।

গৌতম বুদ্ধের পবিত্র দাঁত দর্শনার্থীরা সবসময় দেখতে পারে। দিগায়ুর মিথ্যা ভাষণে আমার ভূমিকা আছে। গৌতম বুদ্ধের দেখা পাওয়া মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাঁর দাঁত দেখার কিছু নেই। যে মঠে গৌতম বুদ্ধের দাঁত আছে, সেখানে তাঁব মাথার চুলও সংরক্ষিত আছে। এই চুল উপহার হিসেবে বাংলাদেশ দিয়েছে শ্রীলংকাকে। বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের চুল কীভাবে এসেছে সেটা বলা যেতে পারে।

বুদ্ধ এসোসিয়েসনের প্রধান অজিত রঞ্জন বড়ুয়া বলেন, তিব্বতের এক সাধু (শাক্য ভিক্ষু) পবিত্র চুল বাংলাদেশে আনেন ১৯৩০ সালে। আরেক সূত্র বলছে, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের ভন্তে শ্রমন (বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রধান) গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে রেঙ্গুন থেকে কিছু চুল নিয়ে আসেন।

গৌতম বুদ্ধের চুল বাংলাদেশ থেকে উপহার হিসেবে যাওয়ার অনেক আগেই শ্রীলংকায় এসেছিল। প্রাচীন পালি গ্রন্থ *জাতক কথায়* বলা হয়েছে ভারতবর্ষের দুই ব্যবসায়ী গৌতম বুদ্ধের একগোছা চুল নিয়ে শ্রীলংকায় আসেন। তাঁদের একজনের নাম থাপাসু (Thapassu), অন্যজনের নাম ভালুকা (Bhalluka)। চুল থাকতেও শ্রীলংকা আবার বাংলাদেশ থেকে কেন চুল নিল জানি না।

সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করে। দলে দলে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে থাকেন। এতে শঙ্কিত হয়ে শংকরাচার্য সুন্দর একটা প্যাঁচ খেলেন। তিনি ঘোষণা করেন, গৌতম বুদ্ধ হিন্দুদের অষ্টম অবতার। তিনি হিন্দু সনাতন ধর্মেরই একজন। কাজেই তাঁর কৃপালাভের জন্যে বৌদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের প্রবল স্রোত বাধাগ্রস্ত হলো।

শেষ খেলা খেললেন রাজা অজাতশত্রু। বিচিত্র কোনো কারণে তিনি বৌদ্ধধর্মালম্বীদের উপর ক্ষেপে গেলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করলেন। ঘোষণা করলেন, গৌতম বুদ্ধের অনুসারীদের দেখামাত্রই হত্যা করা হবে।

প্রাণভয়ে ভীত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পালিয়ে পাহাড়-পবর্তের দিকে চলে গেলেন। আজও পাহাড়-পর্বতেই এই ধর্মের মানুষের ঘনত্ব বেশি। সমতলে নেই।

এই সময়ে পৃথিবীজুড়েই বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রবল আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। পত্রপত্রিকায় প্রায়ই খবর আসছে হলিউডের অমুক তারকা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাদের আগ্রহের মূল কারণ, এই ধর্মে ঈশ্বর নেই। সোজাসাপটা ঈশ্বর নেই বলাটা ঠিক হচ্ছে কি না তাও বুঝতে পারছি না। কারণ এক ভক্ত গৌতম বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, গুরুজি, ঈশ্বর কি নেই?

বুদ্ধ বললেন, ঈশ্বর নেই এমন কথা কি আমি বলেছি?

ভক্ত মহা আনন্দিত। কারণ সে মনেপ্রাণে একজন ঈশ্বর চাইছে। ভক্ত বলল, গুরুজি, তাহলে কি ঈশ্বর আছে?

বুদ্ধ বললেন, ঈশ্বর আছেন এমন কথা কি আমি বলেছি?

গৌতম বুদ্ধের নিজের মধ্যে সংশয় ছিল—এমন কথা কি বলা যায়? তিনি ঈশ্বরের কথা বলেন নি, নির্বাণের কথা বলেছেন। কিন্তু নির্বাণ আসলে কী তা কখনো পরিষ্কার করে বলেন নি। একবার বললেন, জ্বলন্ত শিখাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়াই নির্বাণ। তাঁর কথা হলো, মানুষকে চারটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতেই হবে।

শোক
ব্যাধি
জরা
মৃত্যু

মানুষ বারবার পৃথিবীতে জন্মাবে (জন্মান্তরবাদ)। কীটপতঙ্গ হিসেবে, পশু হিসেবে, মানুষ হিসেবে। তার সুকীর্তির কারণে একটা সময় আসবে যখন আর তাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে না। এটাই নির্বাণ।

আমার কাছে বারবার পৃথিবীতে ফিরে এসে শোক, ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ অনেক আকর্ষণীয় মনে হয়। শোকের সঙ্গে থাকবে আনন্দ, জোছনাপ্লাবিত রজনী, প্রিয় সখার কোমল করস্পর্শ। যে নির্বাণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় সেই নির্বাণ আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না। আমি গৌতম বুদ্ধের যুক্তিই তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, 'যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার বিষয়ে কি বলা যাবে?'

কমিউনিস্টদের আধুনিক কমিউনের শুরুটা গৌতম বুদ্ধ করে গেছেন। তাঁর কমিউনের নাম সংঘ (সংঘং শরণং গচ্ছামি)। সেখানে সবার খাবার একত্রে রান্না করা হতো। সংঘে নারীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ভিক্ষুরা ভোরবেলা শূন্য থালা হাতে বের

হতেন। সারা দিন ভিক্ষা করে যা পাওয়া যেত তা-ই রান্না হতো। সবাই মিলে তা-ই খেতেন। সংঘে নারীদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

গৌতম বুদ্ধের খালা প্রজাপতি গৌতমী ছিলেন এক অর্থে গৌতম বুদ্ধের মা। তিনিই গৌতম বুদ্ধকে লালনপালন করেছিলেন। এই মহিলা বহু কষ্টে, পায়ে হেঁটে বহু পথ অতিক্রম করে তাঁর পালকপুত্রের কাছে এলেন। সংঘে যোগ দিবেন। বাকি জীবন সংঘে কাটাবেন।

গৌতম বুদ্ধ বললেন, না। সংঘে নারী নিষিদ্ধ।

একবার না, পরপর তিনবার তিনি এই বাক্য উচ্চারণ করলেন।

কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন প্রজাপতি। গৌতম বুদ্ধের সার্বক্ষণিক সঙ্গী আনন্দ তখন বুদ্ধের কাছে কাতর আবেদন করলেন। তিনি যুক্তি দিলেন নারীরাও তো আলোকপ্রাপ্তির সুযোগ পেতে পারে। নারীদের বাদ দেওয়া মানে মানবজাতির অর্ধেককে বাদ দেওয়া।

গৌতম বুদ্ধ অনিচ্ছার সঙ্গে রাজি হলেন। তবে শর্ত জুড়ে দিলেন।

শর্ত হচ্ছে, নারীভিক্ষুরা যত উচ্চবর্ণের হোক তাদের পদমর্যাদা হবে সব পুরুষ ভিক্ষুর নিচে। যখনই নারীর সামনে কোনো পুরুষ ভিক্ষু আসবে তখনই ভিক্ষুনীকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে হবে।

আনন্দ একবার জানতে চাইলেন, নারীদের প্রতি তাহলে আমরা কী আচরণ করব?

বুদ্ধ বললেন, তুমি তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। তাহলেই কী আচরণ করবে সেই প্রশ্ন উঠবে না।

গৌতম বুদ্ধ নারীদের সাধনার বিঘ্ন মনে করতেন। স্বামী বিবেকানন্দও তা-ই করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে নারী নিষিদ্ধ ছিল। এখনো আছে। আমার খুবই অবাক লাগে, এই দুই মহাপুরুষ কী করে নারীর গর্ভে জন্মেও নারীদের সাধনার বাধা হিসেবে চিহ্নিত করলেন!

বুদ্ধ বলছেন, সকল প্রাণী সুখী হোক! শক্তিশালী কী দুর্বল, উচ্চ মধ্য বা নিচু গোত্রের, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, দৃশ্য বা অদৃশ্য, কাছের বা দূরের, জীবিত বা জন্মপ্রত্যাশী সকলেই সুখী হোক।*

সর্বজীবে কি আমরা আসলেই দয়া করতে পারি? একটা কেউটে সাপ আমাকে ছোবল দিতে আসছে, আমি কি তাকে দয়া করব? তার ছোবল খাব? তাকে মারব না!

কলেরা, টাইফয়েড, সিফিলিসের ভয়ঙ্কর জীবাণুরাও তো জীব। তাদের প্রতি দয়া করতে হলে পেনিসিলিন ব্যবহার করা যাবে না। তাও কি সম্ভব!

নিয়তির পরিহাস হচ্ছে, যে দেশে অহিংস বুদ্ধের জয়জয়কার, চারদিকে তাঁর ধ্যানী মূর্তি, সেখানেই জন্মেছে কঠিনতম হিংসা। আত্মঘাতী বোমা হামলার শুরু শ্রীলংকায়। টাইগার প্রভাকরণের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ তরুণ-তরুণী শরীরে বোমা বেঁধে নিজেকে উড়িয়ে দিচ্ছে।

---

* বুদ্ধ: ক্যারণ আর্মস্ট্রং অনুবাদ শওকত হোসেন। ঐতিহ্য।

গৌতম বুদ্ধের একটি বাণী আমার খুব পছন্দের। তিনি ভক্তদের বলছেন, আমার কথা হলো নদী পার হওয়ার ভেলা। একবার নদী পার হওয়ার পর ভেলা মাথায় নিয়ে বেড়ানোর কিছু নেই।

এই ধর্মের আরেকটি বিষয় আমাকে আলোড়িত করে, পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা।

আষাঢ়ি পূর্ণিমা : গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগ।

বৈশাখী পূর্ণিমা : বুদ্ধের মহাজ্ঞান লাভ।

শারদীয় পূর্ণিমা : কঠিন চিবরদান অনুষ্ঠান।

ভাদ্র পূর্ণিমা (মধু পূর্ণিমা) : কঠিন তপস্যার সময় বানররা গৌতম বুদ্ধকে মধু পান করিয়েছে বলে মধু পূর্ণিমা।

আশ্বিনী পূর্ণিমা : বুদ্ধ তার চুল কেটে আকাশে উড়িয়েছিলেন। এই পূর্ণিমায় বৌদ্ধরা আকাশে ফানুস উড়ায়।

মাঘি পূর্ণিমা : এই দিনে বুদ্ধ ঘোষণা করেন, আর তিনমাস পর তাঁর মহাপ্রয়াণ হবে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা : এই তিথিতে বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে আসেন। বাবা-মা'র সঙ্গে শেষবার দেখা করার জন্যে।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে হয়েছিল। কাকতালীয় হলেও দু'বারই আকাশে ছিল পূর্ণচন্দ্র।*

পুনশ্চ

বৈরাগ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী—
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?"
দেবতা কহিলা, "আমি।"—শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা?"

* অভিনেতা এবং আবৃত্তিকার জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় 'বৌদ্ধধর্ম ও পূর্ণিমা' বিষয়ে আমাকে অনেক সঠিক তথ্যের সঙ্গে একটি ভুল তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, পৌষ পূর্ণিমায় গৌতম বুদ্ধ শ্রীলংকা গিয়েছিলেন। তথ্যটা ভুল। ধর্মপ্রচারের জন্যে গৌতম বুদ্ধ কখনো শ্রীলংকা আসেন নি।

দেবতা কহিলা, "আমি।"—কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা প্রভু ?"
দেবতা কহিলা, "হেথা।"—শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি—
দেবতা কহিল, "ফির।"—শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়!
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায় ?"

সরাসরি গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে, নাম 'ব্রাহ্মণ'। এখানে সত্যকাম গিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্যে। গৌতম তাঁকে ফিরিয়ে দেন। সত্যকাম মা'কে বলেন,

'কহো গো জননী, মোর পিতার কী নাম,
কী বংশে জনম। গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে, গুরু কহিলেন মোরে—
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যা লাভে। মাতঃ কী গোত্রে আমার ?'
শুনি কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনত মুখে
কহিলা জননী, 'যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে;
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি তাত।'

কৌতূহলী পাঠক পুরো কবিতাটি পড়তে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে কিছু প্রবন্ধও লিখেছেন। তিনি এই ধর্মপ্রচারককে শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে বিবেচনা করেছেন।

কিং সোলায়মান এবং শেবার রানীর গল্প তো সবাই জানেন। আরেকবার বলি। জানা বিষয় নতুন করে জানায় আনন্দ আছে। অনেকটা শোনা গান আবার শোনার মতো।

কিং সোলায়মান সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শেবার রানী বিলকিস।

রানী রাজদরবারে ঢুকলেন। সোলায়মানের সিংহাসন অনেকটা দূরে। রানীকে কিছুদূর হেঁটে যেতে হবে। রানী ক্ষণিকের জন্যে বিভ্রান্ত হলেন। মেঝে স্ফটিক দিয়ে এমন করে বানানো যে রানীর মনে হলো পানি। তাঁকে যেতে হবে পানির উপর দিয়ে। নিজের অজান্তেই তিনি তাঁর গায়ের কাপড় খানিকটা উঁচুতে তুললেন, যাতে পানি লেগে ভিজে না যায়।

সিংহাসন থেকে সোলায়মান অবাক হয়ে দেখলেন, এই পৃথিবীর অতি রূপবতী এক তরুণীর পাভর্তি পশুদের মতো লোম। সোলায়মান রাজবৈদ্যকে এই রোগের ওষুধ দিতে বললেন। রাজবৈদ্যের ওষুধে রানীর লোম সমস্যা দূর হলো। কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হয়ে তিনি সোলায়মানকে বিয়ে করলেন। (মিথ হচ্ছে—সোলায়মান তাঁর পোষা জ্বিনদের কাছ থেকে রানী বিলকিসের ওষুধ নিয়েছিলেন।)

সোলায়মান নবপরিণীতা স্ত্রীকে খুশি করার ব্যবস্থা করলেন। দুটা জাহাজ পাঠালেন রত্নের দেশে। দেশের নাম শ্রীলংকা।

শ্রীলংকাকে বলা হয় পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার। ব্লু শেফায়ার বা নীলার মতো দামি পাথরে এই দেশ পূর্ণ। সবচেয়ে বেশি রত্ন যেখানে পাওয়া যায় তার নাম রত্নপুরা বা রত্নের নগর। চীনা ভাষায় দ্বীপটির নাম 'রত্নদ্বীপ'। Star of India নাম দিয়ে যে অপূর্ব নীলা পাথরটি নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে প্রদর্শিত হচ্ছে সেটা নীলা পাথর। পাথরটির নাম রাখা উচিত ছিল Star of Srilanka. ব্রিটিশ রাজমুকুটে চার শ' ক্যারেটের যে নীলা পাথরটি আছে সেটাও শ্রীলংকার।

পদ্মরাগ মণি (নীলা পাথরের আরেক সংস্করণ। রঙ কমলা ও গোলাপির মিশ্রণ।) শুধুমাত্র শ্রীলংকাতেই পাওয়া যায়। অন্য কোথাও না।

নীলা ছাড়াও আরও যেসব পাথর শ্রীলংকায় পাওয়া যায় তা হলো—রুবি, একুয়া মেরিন, টোপাজ, গার্নেট, মুনস্টোন এমেথিস্ট, ক্যাটস আই।

মুর পর্যটক ইবনে বতুতা শ্রীলংকায় এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে মুরগির ডিমের চেয়েও বড় রুবি দিয়ে হাতির মাথা সাজানো হতো বলে উল্লেখ করেছেন।

চায়নিজ পর্যটক ফা হিয়েন শ্রীলংকায় একটি রুবি দেখেছিলেন, যা মানুষের বাহুর মতো লম্বা এবং এক বিঘৎ চওড়া। রুবিটি দেখে তাঁর মনে হয়েছে যেন পাথরটিতে আগুন জ্বলছে।

মার্কোপলোও মনে হয় এই রুবিটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

রত্ন আহরণের পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। নদীর কাদাবালি মেশানো পানি এবং নদীর তলদেশের মাটি ঝুড়িতে নেওয়া হয়। ঝুড়ির নিচটা চালনির মতো। এই ঝুড়ি পানিতে ধুয়ে ধুয়ে কাদামাটি ও ময়লা দূর করা হয়। ভাগ্য ভালো হলে রত্ন পাওয়া যায়।

আমি মনে করি, বাংলাদেশের শংখ নদীতে এইভাবে রত্নের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। শংখ নদী পাহাড়-পর্বত কেটে সমুদ্রের দিকে গেছে। পাহাড়-পর্বতে আটকে থাকা মণিমুক্তা শংখ নদী বেয়ে নিচে নামার কথা।

আমাদের পাশের দেশ বার্মা যদি রুবিতে তর্তি থাকে, আমরা দোষ করেছি কী ? বার্মার মাটি, শ্রীলংকার মাটি আমাদের দেশের মতোই পলিঘটিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়গুলো শ্রীলংকার চেয়ে উঁচু। বাংলাদেশে যে রত্নের অনুসন্ধান করা যেতে পারে তা মনে হয় কারও মাথায় আসে নি।

শ্রীলংকার মণিমুক্তা সম্পর্কে বিতং করে লেখার একটি ব্যক্তিগত কারণ আছে। আমার একসময়ের শখ ছিল রত্ন সংগ্রহ করা। পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছি রত্ন কেনার চেষ্টা করেছি। কখনো পেরেছি, কখনো অর্থের অভাবে পারি নি। আমার সংগ্রহের রত্নে শ্রীলংকার দুর্লভ পদ্মরাগ মণি আছে।

আমার পাথর সংগ্রহের নেশা যখন তুঙ্গে তখন দুটি দেশে খুব যেতে ইচ্ছা করত— একটি শ্রীলংকা, অন্যটি বার্মা। বার্মায় পাওয়া যায় খাঁটি রুবি। রুবি, নীলা এবং পদ্মরাগ মণির মতোই দামি।

দুটি দেশের কোনোটাতেই যাওয়া হয় নি। কারণ বার্মায় সামরিক জান্তা। আসল মগের মুল্লুক। আর শ্রীলংকায় চলছে গৃহযুদ্ধ।

দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, শ্রীলংকায় যখন এসেছি তখন আমার রত্ন সংগ্রহ রোগ সেরে গেছে। অল্প বয়সে ছেলেমেয়েরা স্ট্যাম্প কালেক্ট করে খাতা ভরিয়ে ফেলে। একসময় তাদের এই ব্যাধি সেরে যায়। খাতাও হারিয়ে যায়। কয়েন কালেক্টারদের একই অবস্থা। অনেক ঝামেলা করে সংগ্রহ করা মুদ্রা একসময় যেখানে সেখানে পড়ে থাকে।

আমি রত্ন সংগ্রহ করছি ত্রিশ বছর ধরে। সবই বাক্সবন্দি। কাউকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করতে চাইলে বাক্স খুলি।

আজ আমি শ্রীলংকার রাস্তায়। কিছুদূর পরপরই Gems-এর দোকান। একবারও দোকানে ঢুকতে ইচ্ছা করল না।

শাওন বলল, রত্নের দেশে এসে রত্ন কিনবে না ?

আমি বললাম, 'আনা রাজুলুন মিসকিন।'

শাওন বলল, এর মানে কী ?

আমি বললাম, এর অর্থ 'আমি একজন মিসকিন।' মিসকিনের রত্নরোগ সাজে না। কাজেই রত্ন কেনা হবে না।

শাওন বলল, আমি টাকা দিচ্ছি। তুমি তোমার পছন্দের একটা রত্ন কিনে আনো।

আমি রত্নের দোকানে ঢুকলাম না। কাঠের মূর্তির দোকানে ঢুকে একটি বুদ্ধ মূর্তি কিনলাম।

নাজমা ভাবি মহা বিরক্ত হলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, এত দাম দিয়ে বুদ্ধের মূর্তি কিনেছেন। আপনি কি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। শ্রীলংকায় হাঁ-সূচক মাথা নাড়ার অর্থ 'না'। ভাবি তা বুঝলেন না। তিনি স্বামীর কাছে নালিশ করলেন, হুমায়ূন ভাই বৌদ্ধ ধর্ম নিবেন। ছিঃ ছিঃ কী কাণ্ড। লেখক হলেই যা ইচ্ছা তা করা যায় ?

আমি নাজমা ভাবির সঙ্গে ঝামেলায় গেলাম না, গৌতম বুদ্ধের মতো মৌনভাব ধারণ করলাম।

রাতে ঘুমাতে যাব, হঠাৎ দেখি আমার বালিশের উপর চমৎকার একটি মুন স্টোন। চন্দ্রের আলোর মতো হালকা আলো বের হচ্ছে। মুন স্টোনের সঙ্গে একটি চিঠি। শাওন লিখেছে—

> 'তুমি বদলে যাচ্ছ কেন ?
>
> একসময় পাগলের মতো gems খুঁজে বেড়াতে। আজ ফিরেও তাকাচ্ছ না। বদলে যাওয়া হুমায়ূন আহমেদ আমি দেখতে চাই না। আমি চাই তুমি কখনো বদলাবে না।'

আমি শাওনকে বললাম, চলো দু'জন হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের পাশ থেকে ঘুরে আসি।

শাওন বলল, নিষাদ নিনিত ?

ওরা ঘুমাচ্ছে। নাজমা ভাবিকে বলো ওদের দিকে নজর রাখতে। বেশিক্ষণ তো আর বাইরে থাকব না। বেশি হলে পনের মিনিট।

নাজমা ভাবি সব শুনে বললেন, পুলাপানের ক্যাঁও ম্যাঁও আমার ভালো লাগে না। এরা দু'জন একসঙ্গে কাঁদে। আমি পারব না।

বলেই তিনি নিজের ঘরে ঢুকে বেশ শব্দ করে দরজা বন্ধ করলেন।

শাওন বলল, প্রথম রাতে গান শুনতে চেয়েছিলে। এখন কি গাইব ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

শাওন গাইছে। আমি দুই পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে তার গান শুনছি—

> 'মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে
> ফিরেছ কি ফির নাই, বুঝিব কেমনে।'

পুনশ্চ

শ্রীলংকার সবচেয়ে সুন্দর বুদ্ধমূর্তির নাম 'আউকানা'। তের মিটার উঁচু গৌতম বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। এই নামের অর্থ সূর্যখাদক (Devourer of the Sun)। অনুরাধাপুরের নৃপতি ধাতুসেনার নির্দেশে এটি বানানো হয়। এই মূর্তিটি সবচেয়ে সুন্দব দেখায় সূর্যোদয়ের মুহূর্তে।

বুদ্ধের মূর্তির বসার ভঙ্গি এবং হাতের মুদ্রার অর্থ আছে। এ থেকে বলে দেওয়া যায় তিনি জেগে আছেন, না সমাধিতে চলে গেছেন। আমার কাঠের কেনা মূর্তিটির ভঙ্গি জাগ্রত।

মূর্তিবিষয়ক শেষ কথাটা বলি। পুত্র নিষাদ দেশে ফিরে সবাইকে বলছে, 'আমরা শ্রীলংকার আল্লাকে কিনে এনেছি।'

৫

নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে Ph.D. করতে গিয়ে একজন শ্রীলংকান তামিল ছাত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। সেও Ph.D. করতে এসেছে। তার নাম রত্ন সভাপতি সুরিয়া কুমারণ। আমেরিকানরা এই নাম ছোট করে ডাকে 'সুরি'। আমিও ডাকি সুরি।

সুরি অতি ভদ্র অতি লাজুক ছেলে। ভাত না খেলে তার পেট ভরে না বলে আমার এখানে মাঝে মাঝে ভাত খেতে আসে।

আমি তাকে বললাম, বিয়ে করে বউ নিয়ে আসো। প্রবাসজীবন তখন সহনীয় হবে। সে বলল, আমার পক্ষে বিয়ে করা এখন কঠিন। আমার বাবা-মা দরিদ্র। বিয়ে করলে তাদের ছেড়ে আমাকে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে হবে। আমার রোজগারের টাকা শ্বশুর-শাশুড়ির হাতে তুলে দিতে হবে।

আমি বললাম, সব ছেলেকেই কি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে হয়?

সুরি বলল, হ্যাঁ। এটাই আমাদের দেশের নিয়ম।

আমি বললাম, বাংলাদেশেও যে কিছু ছেলে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠে না, তা-না। তাদের বলা হয় ঘরজামাই। ঘরজামাইদের আমরা ছোট চোখে দেখি। তাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী ভাবা হয়।

শ্রীলংকার অনেক পারিবারিক গল্প আমি সুরির কাছে শুনেছি। এখন মনে পড়ছে না।

আমেরিকার প্রবাসজীবনে আমি একটা উপন্যাস শুরু করি। উপন্যাসটি প্রকাশ করি দেশে ফিরে। নাম *সবাই গেছে বনে*। এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয় রত্ন সভাপতি সুরিয়া কুমারণের নামে।

শ্রীলংকায় পা দেওয়ার পর থেকেই আমার এই বন্ধুটির কথা মনে পড়ছিল। শাওনকে বলতেই সে ইন্টারনেট খুলে বসে গেল। ফেসবুক থেকে বের করে ফেলবে। বের করতে পারল না।

সুরি বলেছিল, আমার রূপবতী একটি মেয়ে বিয়ে করার শখ, কিন্তু আমাদের দেশে রূপবতী মেয়ে নেই।

সুরির কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। রাস্তাঘাটে যেসব তরুণী দেখছি তাদের চেহারায় আকর্ষণীয় কিছু নেই। এরা কেউ সাজগোজও মনে হয় করে না। ঝলমলে পোশাকের বদলে মলিন পোশাক পরে বের হয়েছে। সবাই কেমন মন খারাপ করে হাঁটছে। কিংবা কে জানে এদের মুখের গঠনই বিষণ্ণ!

শ্রীলংকার প্রিয় বাহন মোটরসাইকেল। ওরা বলে ভটভটিয়া। ছেলেমেয়ে সবাই ভটভটিয়া চালায়।

রাস্তায় পাশের বাড়িঘরের বাগানে যেসব ফল হয় তা টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়, কেউ যদি কেনে। প্রতিটি বাড়ির সামনেই একটা টেবিল। ফলের মধ্যে আছে—কলা, তামা রঙের ডাব এবং আম। আমের গন্ধ চমৎকার, তবে আমাদের দেশের আমের মতো মিষ্টি না।

টেবিলে ছোট ছোট কাপড়ের পুঁটলি পেতে অনেককেই বসে থাকতে দেখেছি। পুঁটলিতে আছে আধা কেজি করে লাল চাল। দরিদ্র মানুষ ঘরে ফেরার সময় এক পুঁটলি চাল কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

গ্রাম্য কিছু বাজার দেখলাম। আমাদের দেশের গ্রামের বাজারের মতোই। তবে প্রচুর শুঁটকি মাছের দোকান দেখলাম। লোকজন কিছু কিনুক না-কিনুক শুঁটকি মাছ কিনছে।

নারকেল শ্রীলংকানদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। নারকেল তেল ছাড়া তারা কোনো খাবার রান্না করে না। 'কারি'তে নারকেল তেল ছাড়াও গুঁড়া শুঁটকি মাছ ব্যবহার করা হয়। এই গুঁড়া শুঁটকিকে তারা মসলার অংশ হিসেবে দেখে। আরব্য রজনীতে নারকেল তেলে রান্না করা খাবারের বর্ণনা আছে। সেখানে এইসব খাবার কুৎসিত এবং অপকারী বলা হয়েছে।

শ্রীলংকান পদ্ধতিতে নারকেল তেলে রান্না করা ভাজি এবং ডিমের কারি খেয়েছি। আমার কাছে যথেষ্টই সুস্বাদু মনে হয়েছে। তবে এরা রান্নায় প্রচুর গরম মসলা ও লাল মরিচ ব্যবহার করে। গরম মসলার দেশে এই মসলা বেশি ব্যবহার হবেই। গরম মসলা ও মরিচ আরও কম হলে আমাদের রুচির সঙ্গে মিলত। শ্রীলংকার ডিমের কারির একটি রেসিপি দিয়ে দিলাম। রান্নাবান্নায় আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা রান্না করে খেয়ে দেখতে পারেন।

শ্রীলংকায় যেসব গরম মসলার চাষ হয় তার একটা তালিকা দিচ্ছি। চায়ের পরেই শ্রীলংকার রপ্তানিযোগ্য পণ্যের নাম গরম মসলা। পর্যটক ফা হিয়েন, মার্কোপোলো এবং ইবনে বতুতা সবাই জাহাজ ভর্তি করে শ্রীলংকার মসলা পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানির উল্লেখ করেছেন।

গরম মসলা

সেফরন (জাফরান), গ্যাম্বুজ, কিউমিন সিড (জিরা), দিলসিড, কার্ডামন (এলাচি), গোলমরিচ, ফিনেল সীড, সরিষা, দারুচিনি, কোরিয়েন্ডার (ধনিয়া), লবঙ্গ, নিটমেগ।

আমার প্রকাশক বন্ধু আলমগীর রহমানের জন্যে উপহার হিসেবে শ্রীলংকার সব মসলার একটি করে প্যাকেট নিয়ে এসেছিলাম। তিনি রান্নাবান্নায় উৎসাহী। তাঁর প্রকাশনা থেকে চমৎকার কিছু রান্নার বইও বের হয়েছে। আমার ধারণা ছিল উপহার পেয়ে তিনি খুশি হবেন, উল্টা বিরক্ত হয়ে বললেন, সব মসলা বাংলাদেশে পাওয়া যায়। আপনি শ্রীলংকা থেকে আনবেন মুখোশ, গরম মসলা কেন!

মসলার সব প্যাকেট আমার ঘরে পড়ে আছে। তিনি ফেরত দিয়ে গেছেন।

ডিমের সালুন

(Bittara Vanjanaya)

এই রান্না ডিমের কারি খেয়ে বাবুর্চির কাছ থেকে রেসিপি নিয়েছি।

উপকরণ

ছয়টি ভালোমতো সিদ্ধ করা ডিম।
দু'চামচ মাখন।
একটি কাঁচামরিচ, ছোট ছোট করে কাটা।
তিনটি ছোট পাতাওয়ালা পেঁয়াজ কুচি কুচি করে কাটা।
তিনটি রসুনের কোয়া, কুচি কুচি করে কাটা।
এক ইঞ্চি লম্বা দারুচিনি।
দুই টেবিল-চামচ বাটা রসুন।
এক টেবিল-চামচ গুঁড়া ব্ল্যাক পিপার।
এক টেবিল-চামচ লালমরিচের গুঁড়া।
কয়েকটি কারি লিফ।
এক চা-চামচ হলুদ গুঁড়া।
দেড় কাপ ঘন নারকেলের দুধ।
দেড় কাপ সয়া দুধ (না পাওয়া গেলে পানি)।
এক টেবিল-চামচ লেবুর রস।

রন্ধন প্রণালি

মাটির হাঁড়িতে মাখন গলাতে হবে। সয়াসস, লেবুর রস এবং নারকেলের দুধ ছাড়া বাকি সব উপকরণ দুই মিনিট Stir Fry করতে হবে। নারকেলের দুধ, সয়াসস এবং লেবুর রস দিয়ে বলক বের না হওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিতে হবে। এর মধ্যে সিদ্ধ ডিম দিয়ে দিলেই রান্না শেষ।

প্রিয় পাঠক, শ্রীলংকার Cuisine বিশ্বসভায় স্থান করে নিতে পারে নি। দেশি পদ্ধতিতে নতুন আলু দিয়ে আমাদের ডিমের ঝোল অমৃত।

পুনশ্চ

এই অধ্যায়ে প্রিয় নাজমা ভাবি বিষয়ে কিছু লেখা হয় নি বলে অধ্যায়টা অসম্পূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। কাজেই তাঁর খাদ্যাভাস বিষয়ে দুটি কথা। আমরা সাত দিন শ্রীলংকায় থেকেছি। সাত দিনে চৌদ্দটি মেজর মিল খাওয়া হয়েছে। প্রতিবারই তিনি নিজের জন্যে চিকেন কারি অর্ডার দিয়েছেন। এটা বিশেষ কোনো ব্যাপার না। ফার্মের স্বাস্থ্যবান চিকেন কারও পছন্দের খাবার হতেই পারে। বিশেষ ব্যাপারটা হচ্ছে প্রতিবারই তিনি বলেছেন, আপনারা সবাই ভালো ভালো খাবার খাচ্ছেন আর আমার জন্যে চিকেন কারি!

শাওন মনে করিয়ে দিল যে, প্রত্যেকেই তার নিজের খাবার নিজে অর্ডার করেছে।

ভাবি বিরক্ত হয়ে বললেন, এটা কোনো কথা না। পরেরবার আমি চিংড়ি মাছ খাব।

পরেরবারও তিনি চিকেন কারি অর্ডার দিলেন। বাটিভর্তি মাংস দেখে ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, আবার চিকেন কারি ? আপনারা কি আমাকে মানুষ বলে গণ্য করেন না!

৬

আমরা বেনটোটায় এসেছি। হোটেলের নাম সেরেনডিপ। বলাই বাহুল্য, এই হোটেলের ডিজাইনও জেফরি বাওয়া করেছেন। সব সফরের থিম থাকে। আমাদের সফরের থিম হচ্ছে 'জেফরি বাওয়া'।

খুব কাছেই জেফরি বাওয়ার বসতবাড়ি। এটা এখন মিউজিয়াম। দর্শকরা টিকিট কেটে মিউজিয়াম দেখবেন, ছবি তুলবেন। জেফরি বাওয়া নব্বই বছর বয়সে দু'হাজার তিন সালে মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি এই বাড়িতেই থাকতেন। দর্শনার্থীরা তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে পারত। তাঁর বইয়ে অটোগ্রাফ নিতে পারত।

তিনি নেই কিন্তু তাঁর বসতবাড়িতে দর্শনার্থীদের ভিড় কমে নি, বরং বেড়েছে। শাওন ক্যামেরা নিয়ে তার ভাবগুরুর বাড়ি দেখতে গিয়েছে। সঙ্গে পুত্র নিষাদ। আমি ছোটটিকে নিয়ে সমুদ্রতীরে বসে আছি।

পাঠকদের অনেকেই হয়তো জানেন, পৃথিবীতে দু'ধরনের সমুদ্রসৈকত আছে। একটা সাধারণ—যেমন, কক্সবাজার সৈকত। অন্যটির নাম সোনালি সৈকত (Golden beach), যার বালি সোনালি।

আমরা সোনালি সৈকতে আছি। আমাদের উপরে নারকেল গাছের সারি। প্রতিটি ডাব বা নারকেলের বর্ণ তামার মতো। সোনালি সৈকতের সঙ্গে এই তামা রঙ চমৎকার মানিয়েছে।

আমাদের সঙ্গে প্রচুর সাদা চামড়ার ট্যুরিস্ট। মেয়েগুলোর গায়ে বিকিনি। এরা সূর্যস্নান করছে।

আমি এবং পুত্র নিনিত করছি ছায়াস্নান। আমরা বসে আছি নারকেল গাছের ছায়ায়। পুত্র নিনিত জেগেছে। খুব হাত-পা নাড়ছে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ একতরফা গল্প করলাম। যেমন—

আমি : সমুদ্র কেমন লাগছে বাবা?

নিনিত : পা দিয়ে ঝাঁকি। অর্থ সম্ভবত—আমি তো সমুদ্রে নামি নি। কী করে বলব!

আমি : গায়ে রোদ চিড়বিড় করছে না তো?

নিনিত : কুঁ ওয়া।

আমি : ছায়াতে বসে মজা পাচ্ছ?

নিনিত : অয়।

[সিলেটি ভাষায় বলল, হ্যাঁ। বেশিরভাগ সময় সে চাইনিজদের মতো কিচমিচ শব্দ করে। এই প্রথম সিলেটি ভাষা।]

আমাদের কথাবার্তায় সাদা চামড়ার এক বুড়ি ক্যামেরা হাতে এগিয়ে এল। এই বুড়ির গায়েও বিকিনি। থলথলে শরীরে বিকিনি যে কী কুৎসিত দেখায় তা মনে হয় এই বুড়িকে কেউ বলে নি।

বুড়ি বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমি কি এই শিশুটির একটি ছবি তুলতে পারি?

বেশিরভাগ পিতা-মাতাই বলত, অবশ্যই তুলতে পারো। আমি বললাম, ছবি তুলতে চাচ্ছ কেন?

বুড়ি বলল, আমার বড় ছেলের একটি ছেলে হয়েছে, দেখতে অবিকল এই শিশুটির মতো। আমি এই গল্পটা তাকে বললে সে বিশ্বাস করবে না। ছবি দেখালে বিশ্বাস করবে।

ছবি তোলো।

ছবি তোলা হলো। একটি ছবি আমাকে তুলতে হলো। সেখানে বুড়ি নিনিতকে কোলে নিয়ে নকল হাসি হাসল।

আমি বললাম, শ্রীলংকা কেমন লাগছে?

বুড়ি বলল, আমি তো শ্রীলংকা দেখতে আসি নি। আমি এখানকার রোদ গায়ে মাখতে এসেছি। আমার দেশ ফিনল্যান্ডে। সেখানকার তাপ এখন শূন্যের ৩০ ডিগ্রি নিচে।

আমি বললাম, তোমার দেশ ফিনল্যান্ড আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। সুইডেন থেকে জাহাজে করে।

বুড়ি অবাক হয়ে বলল, ফিনল্যান্ড কেন গিয়েছিলে?

আমার স্ত্রী ও পুত্রকে বরফের দেশ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তুমি যেমন রোদ দেখে আনন্দে আত্মহারা, তারাও বরফ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল।

বুড়ি বলল, তুমি কী করো জানতে পারি?

আমি বললাম, আমি কিছুই করি না। আমাকে বেকার বলা যেতে পারে।

বুড়ি : তুমি কোনো কাজ করো না?

আমি : না।

বুড়ি নিজের জায়গায় ফিরে হাত-পা রোদে মেলে সিগারেট ফুঁকতে শুরু করেছে। আমি পুত্রের সঙ্গে কথোপকথনে মন দিয়েছি। আমি যা-ই বলছি সে তার উত্তরে কুঁ জাতীয় শব্দ করছে। সে এই মুহূর্তে কী ভাবছে, চারপাশের জগতটা তার কেমন লাগছে যদি জানা যেত!

সেহেরি এসে বসল আমার পাশে। তার হাতে আমের জুস (এই দ্বীপে সারা বছর আম হয়।) সেহেরির চোখমুখ উজ্জ্বল। আমি বললাম, ভাবি কোথায়?

সেহেরির মুখ আরও হাসি হাসি হয়ে গেল। সে বলল, নাজমা গেছে স্যুটকেসের তালা কিনতে।

আমি বললাম, তোমাকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছে। তালা কেনার সঙ্গে তোমার আনন্দের সম্পর্ক কী?

সেহেরি বলল, সে প্রতিটি দোকানে ঢুকবে। দোকানের সব তালা পরীক্ষা করবে। শেষে কিনবে না। আবারও প্রথম দোকান থেকে তালা দেখা শুরু করবে। দুপুরে খাওয়ার আগে সে ফিরবে না। আমি এইজন্যেই আনন্দিত।

সেহেরি লম্বা সৈকত চেয়ারে শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে শুরু করল। সে ঘুমাচ্ছে; তার পাশে গ্লাসভর্তি আমের জুস। সেখানে মাছি তনভন করছে। সেহেরির নাক ডাকার শব্দে তারা খানিকটা বিভ্রান্ত। সেহেরির নাক ডাকা মাঝে মাঝে কমে এসে হঠাৎ নতুন উদ্যমে বিকট শব্দে শুরু হয়। তখন মাছির ঝাঁক পালিয়ে যায়। সেহেরি একটু ঠান্ডা হলে ভয়ে ভয়ে ফিরে আসে। দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগছে।

আমার হাতে বই। বইটার নাম *Outlines of Ceylon History*। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। লেখকের নাম Donald Obeyesekere। যথেষ্টই আনন্দ নিয়ে বইটি পড়ছি। এই বই পড়েই জানলাম কবি মিল্টন শ্রীলংকা নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন—

Embassies from regions far remote,
From India and the golden chersonese,
And from utmost India isle, Taprobane.

এখানে Taprobane হলো শ্রীলংকা। শ্রীলংকার আদি নাম Taprobane.

শ্রীলংকায় প্রথম বসতি স্থাপন করেন Wijeya (বিজয়)। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে কোত্থেকে এসেছিলেন শুনলে পাঠক চমকে উঠবেন। তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে (Bengal). তার মা'র নাম শচিদেবী। শচিদেবী সেই সময়কার বাংলার রাজার বড় মেয়ে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই বিজয় সিংহকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতার প্রথম চারটি চরণ—

'আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ
কবিয়া লংকা জয়
সিংহল নামে রেখেছেন তাঁর
শৌর্যের পরিচয়।'

কবিতার চরণগুলো আমাকে দিয়েছেন সাংবাদিক বন্ধু সালেহ চৌধুরী। তিনি যে-কোনো কবিতা একবার পড়লে বাকি জীবন মনে রাখতে পারেন, তবে নিকট মানুষজনের নাম মনে রাখতে পারেন না। তার নাতি-নাতনিদের কার কী নাম এই নিয়ে মাঝে মাঝেই তাঁকে বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়।

বিজয় সিংহ বিষয়ে একটি কুৎসিত জনশ্রুতি আমাকে বললেন আর্কিটেক্ট-নাট্যকার ও নির্মাতা শাকুর মজিদ। তিনি বললেন, বিজয় সিংহের কোনো পিতা নেই। তাঁর পিতা হলো মা শচিদেবীর পোষা সিংহ। মানুষ এবং সিংহের মিলনে বিজয় সিংহের জন্ম হয়। যে কারণে তাঁর আচার-আচরণ ছিল সিংহের মতো।

এরকম কোনো তথ্য আমি পাই নি। বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে আমি জেনেছি, বিজয় সিংহ তাঁর দলবল নিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় শ্রীলংকায় পৌঁছেন। নারকেল খেয়ে কোনোরকমে তাঁদের জীবনরক্ষা হয়।

বিজয় সিংহ সিংহের মতো কোনো সাহসও দেখান নি। স্থানীয় নৃপতিকে দলবলসহ নিমন্ত্রণ করে কাপুরুষের মতো সবাইকে হত্যা করেছেন।

প্রাচীন শ্রীলংকা রাবণের দেশ বলে আমরা জানি। রাবণ রামপত্নী সীতাকে হরণ করেছিলেন। অনেক ঝামেলা করে লংকায় অগ্নিকাণ্ড করে সীতাকে উদ্ধার করা হয়।

আসলেই কি এমন কিছু ঘটেছিল ? নাকি পুরোটাই গল্পগাথা ? বলা কঠিন। শ্রীলংকার লিখিত ইতিহাস শুরু হয় বিজয় সিংহ থেকে। তার আগের ঘটনা মানুষের কল্পনা, জনশ্রুতি, মিথ এবং গল্পগাথা।

পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণের *আমার জীবনযাত্রা* বই থেকে উদ্ধৃত করছি—

> সকালবেলা আমরা সীতা এলিয়া দেখতে গেলাম। লংকা যখন র‍্যবণের দ্বীপ তখন তার রাজধানী আর হরণ করে আনা সীতাকে রাখার একটা স্থান নিশ্চয়ই থাকবে। বাবু মথুরাপ্রাসাদ স্থানটির নির্জনতা আর রমণীয়তা—পাশে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছতোয়া ছোট নদী আর পাহাড়ের গায়ে ফুলে লাল 'অশোক' গাছগুলো দেখে বললেন, 'ঠিক, এটাই মহারানী জানকীর অশোকবন।' বড় শ্রদ্ধাভরে তিনি অশোকের পাতা নিজের কাছে রাখলেন। আমি পাশের পাহাড়ের ঘাসের নিচে দেড় দু'ফুট মোটা কালো মাটি দেখিয়ে বললাম, 'আর এই দেখুন সোনার লংকার দহন।'
>
> লংকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় আমি বললাম, 'রাবণের কাহিনীর সত্যতা ব্যাপারে আমি দিব্যি গালতে রাজি নই। তবে যদি কিছু থেকে থাকে, তো এই।'

সীতাকে সত্যি যদি অপহরণ করে লংকায় আনা হয় তাহলে তার নামে কিছু জায়গার নাম লংকায় থাকার কথা। তা কিন্তু আছে। যেমন, সীতা টালাওয়া (সীতাভূমি), সীতাএলা (সীতার নদী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই জায়গায় এসেছিলেন।), সীতাকুণ্ড (সীতার দিঘি)।

বাল্মীকির *রামায়ণ* এবং *স্কন্দপুরাণ* দুটি গ্রন্থই শ্রীলংকাকে বিশাল মহাদেশ বলে উল্লেখ করেছে, তা কিন্তু না। এই দুই গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীলংকার আয়তন মেলানো যায় না। তবে বলা হয়ে থাকে শ্রীলংকার বড় অংশই সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। আগে মালদ্বীপও শ্রীলংকার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

রাবণ-সীতার রহস্য কোনো একদিন দূর হবে এই আশায় রইলাম।

ইতিহাস চিন্তায় বিঘ্ন ঘটল। নিনিত জেগে উঠেছে। সে দুধ খাবে। একই সঙ্গে তার কান্না থামানো এবং তার জন্যে দুধ বানানো দুরূহ কর্ম। ফিনল্যান্ডের মহিলা এগিয়ে এলেন। আমি তার কোলে নিনিতকে দিয়ে নিনিতের জন্যে দুধ বানাতে বানাতে বললাম, তুমি আমার বাচ্চাটির এত ছবি তুললে। এখন তার কান্না সামলাচ্ছ। একবারও তো জিজ্ঞেস করলে না, বাচ্চাটির নাম কী ?

মহিলা বিব্রত গলায় বললেন, এর নাম কী ?

আমি বললাম, এর নাম নিনিত। নামের অর্থ Grace of God।

অবাক হয়ে দেখলাম মহিলার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, এর নাম নিনিত?

আমি বললাম, হ্যাঁ। ততক্ষণে নিনিতের মুখে দুধের ফিডার দেওয়া হয়েছে। সে কান্না থামিয়েছে। ফিনল্যান্ডের মহিলা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন।

এমন কি হতে পারে যে, তাঁর নাতিটির নামও নিনিত! রহস্যময় প্রকৃতি মানুষকে নিয়ে নানান খেলা খেলে। এখানেও কোনো খেলা খেলছে!

আমি মহিলাকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। সব রহস্য ভাঙতে হয় না।

পুনশ্চ-১

শাওন গুরুগৃহ দর্শন করে ফিরেছে। তার চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল। জেফরি বাওয়া যে চামড়ার চেয়ারে বসতেন, সেখানে সে নিষাদকে বসিয়ে ছবি তুলেছে। লাইব্রেরি থেকে জেফরি বাওয়ার একগাদা বই কিনেছে। সে হাত নেড়ে নেড়ে বসতবাড়িটা কতটা যে সুন্দর এবং কেন সুন্দর তা বুঝানোর চেষ্টা করছে।

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছি এরকম অভিনয় করলাম। একবার ভাবলাম শাওনকে বলি, তোমার এই গুরু কিন্তু চিরকুমার এবং সমকামী। তারপর ভাবলাম দরকার কী এই প্রসঙ্গের! কথায় আছে—

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়
তদ্যপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

গুরু বলে কথা।

পুনশ্চ-২

জেফরি বাওয়া

কলম্বো শহরে ১৯১৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেন (১৯৩৮-১৯৪১)। লন্ডনে আইন পড়েন, ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেন। আইন ব্যবসা শুরু করেন। হাতে কিছু টাকাপয়সা আসতেই লুনুগঙ্গায় তিনি পরিত্যক্ত একটি রাবার বাগান কিনে নেন। রাবার বাগানে ঘরবাড়ি তুলতে থাকেন নিজের মতো করে। এই হলো তাঁর আর্কিটেক্ট জীবনের শুরু। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁর কোনো পুঁথিগত পড়াশোনা নেই।

তাঁকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এশিয়ান আর্কিটেক্ট বলা হয়ে থাকে। তিনি Sustainable architecture শুরু করার অনেক পরে স্থাপত্যবিদ্যায় Sustainable architecture এর ধারণা আসে। বাওয়া'র ডিজাইনের বিশেষত্ব হচ্ছে, ভেতর এবং বাহিরকে মিলিয়ে দেওয়া। বাসস্থানকে প্রকৃতির অংশ করে নেওয়া।

মারা যান ২০০৩ সালে, নিজের ডিজাইন করা স্বর্গচারণ লুনুগঙ্গায়।

৭

সন্ধ্যা মিলিয়েছে। আমি হোটেল রুমের বারান্দায় বসে আছি। বারান্দা থেকে সুইমিংপুল, নারকেল গাছের মাথা, মাথার ফাঁকে সমুদ্র দেখা যায়। রুমসার্ভিসে চায়ের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। চা এখনো আসে নি। দুই পুত্রই সারা দিনের পরিশ্রমের পর ঘুমুচ্ছে। সহজে তাদের ঘুম ভাঙবে এরকম মনে হয় না।

সেহেরি ও নাজমা ভাবিকে হাত ধরাধরি করে সুইমিংপুলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখলাম। মনে হয় সমুদ্রের দিকে যাচ্ছেন। স্বামী-স্ত্রীর ভেতর যত বৈরী সম্পর্কই থাকুক বিদেশে তা প্রকাশ করা হয় না। বিদেশে 'সখী ধরো ধরো' অবস্থা থাকে।

চা এসেছে। শাওন টি-পট থেকে চা ঢালছে। আমি সিগারেট ধরালাম। শাওন আড়চোখে দেখল, কিছু বলল না। দেশের বাইরে বেড়াতে গেলে আমার উপরি পাওনা হলো বিনা বাধায় সিগারেট ফোঁকা। শাওন রাগারাগি করে ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট করতে চায় না। সারা জীবন দেশের বাইরে থাকতে পারলে মন্দ হতো না। পায়ের উপর পা তুলে সিগারেট টানা।

শাওন বলল, আমি ছোট্ট একটা ভুল করেছি। ভুল শোধরাতে চাচ্ছি।

কী ভুল?

পুরো ট্যুর প্রোগ্রাম আমার করা।

এটা ভুল হবে কেন?

তোমার নিজেরও তো কোথাও যেতে ইচ্ছা করতে পারে। এখনো সময় আছে, বলো, বিশেষ কোথাও কি যেতে চাও?

আমি চেয়ারে সোজা হয়ে বসতে বসতে বললাম, চাই।

কোথায় যেতে চাও?

লেনামা মাউনটেইন।

সেটা কোথায়?

পূর্ব শ্রীলংকায়। জায়গাটার নাম পানামা পাটু। ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা জায়গা। জঙ্গলভর্তি বন্য হাতি আর লিওপার্ড।

ওখানে কেন যেতে চাচ্ছ?

ঘটনা আছে।

ঘটনা আগে বলো। আমি ইন্টারনেটে বসি। ড্রাইভার দিগায়ুর সঙ্গে কথা বলে দেখি কীভাবে যাওয়া যায়।

আমি আয়োজন করে ঘটনা বলা শুরু করলাম। শাওন চোখ বড় বড় করে শুনছে। চোখ দেখে মনে হচ্ছে সে যথেষ্টই আনন্দ পাচ্ছে।

জে আর টলকিনের নাম শুনেছ ?

না।

হবিটের নাম শুনেছ ?

না।

হবিট হচ্ছে জে আর টলকিনের উপন্যাসের চরিত্র। এরা সম্পূর্ণ আলাদা মানবশ্রেণী। তিন ফুট উঁচু। এদের নিজস্ব ভাষা আছে, সংস্কৃতি আছে। দেখতেও মানুষের মতো। 'লর্ড অব দ্য রিং' ছবিটা তো দেখেছ ?

হ্যাঁ। একসঙ্গে তো দেখলাম।

সেখানে হবিট আছে। মনে পড়েছে ?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। শ্রীলংকার জঙ্গলের সঙ্গে হবিটের কী সম্পর্ক ?

আমি সাবধানে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, হবিট কোনো কাল্পনিক বিষয় না। নৃতত্ত্ববিদরা এখন মনে করছেন পৃথিবীতে একসময় সত্যি হবিট ছিল।

বলো কী ?

ইন্দোনেশিয়ার লিয়াং বুয়া গুহায় খর্বাকৃতি মানুষের কিছু কংকাল পাওয়া গেছে। নৃতত্ত্ববিদদের মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা। এদের বলা হয় 'Ebu-gogo'। নৃতত্ত্ববিদরা এদের নাম দিয়েছেন *Homo floresienis*। হোমারের মহাকাব্য *ইলিয়ডে* এক জাতির কথা বলা হয়েছে, যারা সবাই বামুন। এরা যুদ্ধে পারদর্শী।

শাওন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, জ্ঞান না ফলিয়ে মূল ঘটনা বলো।

আমি বললাম, মূল ঘটনা বুঝতে হলে জ্ঞান ফলাতেই হবে। গ্রীক দার্শনিক প্লিনি (Pliny) আড়াই ফুট চার ইঞ্চি বামন মানবজাতির কথা লিখে গেছেন। তারা থাকত এশিয়া মাইনর, ভারতবর্ষ এবং নীলনদের আশপাশে।

শাওন বলল, তুমি বরং আরেকটা সিগাবেট ধরিয়ে শ্রীলংকার বেঁটে মানবজাতির কথা বলো।

আমি অতি আগ্রহে আরেকটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, শ্রীলংকার এই মানবগোষ্ঠীর নাম নিতেয়ু (Nittaewo)। এদের মূল বাস ছিল পানামা পাটুতে। বাস করত পাহাড়ের গুহায়। এদের কথা প্রথম বলে গহিন জঙ্গলের জংলি মানুষেরা। জংলিদের নাম তাস (Vass)। তাসরা নিতেয়ুদের অত্যাচারে তটস্থ থাকত। নিতেয়ুরা তাসদের শুধু যে খাবার চুরি করত তা-ই না, সুযোগ পেলেই জংলি মেয়েদের ধর্ষণ করত।

নিতেয়ুরা পাখির মতো কিচিরমিচির করে নিজেদের মধ্যে কথা বলত। ভাসরা তাদের কিছু কিছু কথা বুঝতে পারত। নিতেয়ুরা সাহসী ছিল, তবে কুকুর ও বন্য মহিষ ভয় পেত।

ভাসরা একপর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে কুকুর এবং তীর-ধনুক নিয়ে এদের আক্রমণ করে। নিতেয়ুরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে গুহায় আশ্রয় নেয়। তারা তাদের শিশুদের দু'হাতে উঁচু করে

ধরে এদের জীবনরক্ষার আবেদন করে। ভাসরা কোনো কথাই শোনে নি। গুহার মুখে তিন রাত তিন দিন আগুন জ্বালিয়ে সবাইকে হত্যা করে।

শাওন বলল, ঘটনা কতদিন আগের ?

বেশি দিন না, মাত্র দু' শ' বছর আগে।

অদ্ভুত তো! এত কিছু জানলে কোথায় ?

আমি ভারিক্কি ভাব নিয়ে বললাম, প্রদীপ এ জয়তুঙ্গা নামের এক স্কলার এদের উপর থিসিস করেছেন। থিসিসের নাম *The Hobbits of Srilanka, An analysis of the legend*।

ড্রাইভারকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে। আমরা পানামা পাটু যেতে চাই শুনে সে চোখ তুলে বলল, সেটা তো তয়াবহ জঙ্গল। পুরো জঙ্গল ঘেরা আছে হাই টেনশান ইলেকট্রিক তার দিয়ে, যাতে বন্য হাতি বের হতে না পারে। তোমরা সেখানে যেতে চাও কোন দুঃখে ? সেখানে তো থাকার মতো কোনো রেস্টহাউসও নেই।

আমি দিগায়ুর দিকে তাকিয়ে বললাম, আমরা সেখানে যাব না। আরামদায়ক ফাইভস্টার হোটেলের বারান্দায় বসে সমুদ্র দেখে সময় কাটাব। কারণ আমরা সত্য মানুষ।

পুনশ্চ

সমুদ্র দর্শন করে সেহেরি এবং নাজমা ভাবি ফিরেছেন। নাজমা ভাবি ভয়ানক উত্তেজিত, কারণ তিনি তার হ্যান্ডব্যাগ হারিয়ে ফেলেছেন। হ্যান্ডব্যাগে পাসপোর্ট ও ডলার। নাজমা ভাবিকে মনে হচ্ছে এক্ষুনি তার হার্ট অ্যাটাক হবে।

আমি বললাম, আপনারা কি হোটেলের রেস্টুরেন্টে চা-নাস্তা খেয়েছেন ? সেখানে ব্যাগ ফেলে আসতে পারেন। নাজমা ভাবি উল্কার মতো রেস্টুরেন্টের দিকে ছুটে গেলেন।

সেহেরি হাসিমুখে বলল, খুঁজে মরুক। একটা শিক্ষা হোক।

শাওন বলল, বিদেশে পাসপোর্ট, ডলার হারানো তো ভয়ংকর ব্যাপার। সেহেরি তাই, আপনি এত নিশ্চিন্ত কেন ?

সেহেরি মুচকি হেসে বলল, ব্যাগ আমি লুকিয়ে রেখেছি। উচিত শিক্ষা।

৮

আমরা অনুরাধাপুর মৃত নগরীর গেটে দাঁড়িয়ে আছি। শাওনকে অত্যন্ত বিব্রত এবং লজ্জিত দেখাচ্ছে। সে যতটা বিব্রত, নাজমা ভাবি ততটাই আনন্দিত। ঘটনা হলো— অনুরাধাপুর মৃত নগরীতে ঢুকতে চড়া দামে টিকিট কাটতে হয়। সার্কদেশের নাগরিকরা পাসপোর্ট দেখালে অর্ধেক দামে টিকিট পায়। শাওন আমাদের পাসপোর্ট আনতে ভুলে গেছে। নাজমা ভাবি তাঁর এবং সেহেরির পাসপোর্ট এনেছেন। তাঁরা অর্ধেক দামে টিকিট কাটতে পারবেন। আমাদের দিতে হবে ডাবল দাম।

নাজমা ভাবি আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে নিজের মনে গজগজ করছেন, দেশ-বিদেশ ঘুরলেই হয় না। নিয়মকানুন জানা লাগে। বিদেশের মাটিতে পাসপোর্ট হলো কলিজার মতো। কলিজা সবসময় সঙ্গে থাকা লাগে। কলিজা হোটেলে ফেলে আসতে হয় না।

ড্রাইভার দিগায়ু অনেক চেষ্টা করল সার্ক টিকিটে আমাদের ঢোকাতে। শেষমেষ সন্দেহজনক চেহারার একজনকে নিয়ে এল। সে গলা নামিয়ে বলল, বিনা টিকিটেই সে সবাইকে ঢুকিয়ে দেবে। বিনিময়ে সে সার্ক দেশের হিসেবে টাকা নেবে।

সেহেরি আনন্দিত গলায় বলল, প্রবলেম সলভড্। আমরা তোমাকে এখন টাকা দেব না। সব দেখা শেষ হওয়ার পর টাকা পাবে।

ওই লোক বলল, অসুবিধা নেই।

আমি অবাক হয়ে মেহেদিরঙে রাঙানো ধবধবে সাদা দাড়ির সুফি সাধকদের চেহারার সেহেরির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি বললাম, সেহেরি, এই লোক ঘুষ খেতে চাচ্ছে। আমি তাকে ঘুষ দেব?

সেহেরি বলল, যে টাকাটা আমরা খরচ করতাম, সেই টাকাই তো তাকে দিচ্ছি। আমাদের দিক থেকে আমরা ক্লিয়ার। আমি শাওনের দিকে তাকালাম, সে কিছু বলছে না। এর অর্থ সেহেরির যুক্তি সে মেনে নিচ্ছে। আমি বললাম, টাকা বাঁচানোর জন্যে ভুল যুক্তিতে আমি যাব না। লোকটা তার দেশকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছে, সেই সুযোগ তাকে দেব না। আমি একজন লেখক। একজন লেখক কখনো এ ধরনের কাজ করেন না।

টিকিট কাটা হলো। আমি একজন গাইড নিলাম। তাকে দু'হাজার টাকা দিতে হবে। সে মৃত নগরীর সব বিষয় আমাদের বোঝাবে। গাইড কতটুকু জানে তা বোঝার জন্যে আমি বললাম, সংঘমিত্রা কে?

গাইড বলল, ভারতসম্রাট অশোকের একমাত্র মেয়ে। তিনি অনুরাধাপুর এসেছিলেন।

মহেন্দ্র কে?

ইনি সম্রাট অশোকের একমাত্র পুত্র। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে ইনিও অনুরাধাপুর এসেছিলেন।

বোঝা গেল গাইড ভালোই জানে। আমি বললাম, তুমি নিজ থেকে বকবক করবে না। তোমাকে আমরা কেউ যখন কিছু জিজ্ঞেস করব তখনই জবাব দেবে।

গাইড না-সূচক মাথা নাড়ল, এর অর্থ হ্যাঁ।

বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির লাভায় ঢাকা পড়ে সমৃদ্ধশালী পম্পেই নগরী মৃত নগরীতে পরিণত হয়েছিল। অনুরাধাপুর মৃত নগরী হয়েছে কালের লাভায় চাপা পড়ে।

অসংখ্য ট্যুরিস্ট বিস্ময় নিয়ে মৃত নগরী দেখছে। সব দলের সঙ্গেই একজন গাইড। গাইডরা মুখস্থ পড়া বলার মতো করে অনুরাধাপুরের ইতিহাস বলছে।

আমি ট্যুরিস্টদের তিন ভাগ করে ফেললাম—

১. এদের হাতে ভিডিও ক্যামেরা। তারা যা দেখছে, ভিডিও ক্যামেরায় তুলে ফেলছে। ভিডিও ক্যামেরা মাঝে মাঝে ধরছে গাইডের মুখে। এই দলে জাপানি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বেশি। ওদের নিজেদের ভিডিও করার আগ্রহ নেই বললেই হয়।

২. এদের হাতে ছোট স্টিল ক্যামেরা। এরাও যা দেখছে তার ছবি তুলছে। নিজেরা দর্শনীয় জায়গার সামনে দাঁড়িয়ে ছবির জন্যে পোজ দিচ্ছে। বেশির ভাগই ইউরোপের। মধ্যবয়স্ক এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

৩. তৃতীয় দলের হাতে কোনো ক্যামেরা নেই। বয়স অল্প। এরা ক্যামেরার চোখ দিয়ে কিছু দেখছে না। এরা এসেছে জোড়ায় জোড়ায়। হাঁটছে একজন আরেকজনের কোমর জড়িয়ে। বেশির ভাগ আমেরিকান। বয়স অল্প। গাইডের কথার প্রতি এদের কোনো মনোযোগ নেই। এদের কাছাকাছি গেলে তীব্র গাঁজার গন্ধ পাওয়া যায়।

আমি দলবল নিয়ে একটা প্রাসাদের পর আরেকটা প্রাসাদে যাচ্ছি। কী বিপুল ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য নিয়ে এইসব প্রাসাদ দাঁড়িয়ে ছিল! আজ ধ্বংসস্তূপ।

পুত্র নিষাদ অবাক হয়ে বলল, বাবা! আমরা ভাঙাবাড়ি দেখছি কেন?

নাজমা ভাবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হুমায়ূন ভাইয়ের এই ছেলেটা ট্যালেন্ট। ঠিকই বুঝেছে ভাঙা ঘরবাড়ি দেখার কিছু নাই। এখন পর্যন্ত হাতি দেখলাম না। ভাঙা দালানকোঠার মধ্যে ঘুরছি। সাপে কাটে কি না কে জানে! ভাঙা দালানকোঠা সাপের আখড়া। ডলার খরচ করে এসে সাপের কামড় খাওয়ার কোনো মানে হয়?

ভাবি একা আমাদের সঙ্গে ঘুরছেন। সেহেরি গাড়ি থেকে নামে নি। তার পক্ষে নাকি মাইলের পর মাইল হাঁটা সম্ভব না।

শাওন মহা উৎসাহে ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। তার বুকে বেবি ক্যারিয়ারে পুত্র নিনিত ঝুলছে। তার বড়ভাই কাঁদছে না দেখে নিনিতও চুপচাপ। চোখ বড় বড় করে ধ্বংসস্তূপ দেখছে।

আমি নাজমা ভাবিকে বললাম, চলুন, আপনার কিছু ডলার উসুলের ব্যবস্থা করি। বোধিবৃক্ষ দেখে আসি।

নাজমা ভাবি বললেন, বোধিবৃক্ষ আবার কী ?

যে বৃক্ষের নিচে সাধনা করে গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

সেটা কি এই দেশে ?

না। তবে অশোককন্যা সংঘমিত্রা তার একটা ডাল এনে অনুরাধাপুরে লাগিয়েছিলেন। এই গাছটিকেও পবিত্র গণ্য করা হয়। অনেকেই এই গাছের কাছে আসেন পুণ্যলাভের আশায়।

আমরা মুসলমান। আমরা কেন পুণ্য পাব ?

তা হয়তো পাবেন না, তারপরেও ভুবনবিখ্যাত একটা বৃক্ষ দেখার আনন্দ তো পাবেন।

বোধিবৃক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে নাজমা ভাবি বললেন, এটা তো একটা বটগাছ। বটগাছ তো কত দেখেছি।

আমি বললাম, বটগাছ না। এটা অশ্বত্থগাছ। ভাবি বললেন, অশ্বত্থগাছও তো দেখেছি।

আমি বললাম, শ্রীলংকার অশ্বত্থগাছ তো দেখেন নি। বাংলাদেশে কত হাতি দেখেছেন, তারপরেও শ্রীলংকার হাতি দেখার জন্যে আপনি অস্থির।

ভাবি বললেন, হুমায়ূন ভাই, আপনি আমাকে ভোলাচ্ছেন। আপনার মতলব আমি টের পাচ্ছি। আপনি আমাকে হাতি দেখতে দিবেন না। তা হবে না। আমি কিন্তু হাতি দেখব। শ্রীলংকায় এসে হাতি না দেখে গেলে আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

অনুরাধাপুরের ইতিহাস লিখে পাঠকদের বিরক্ত করছি কি না বুঝতে পারছি না। ভ্রমণকাহিনির লেখকেরা অনেকটা ট্যুরিস্ট গাইডের মতো। গাইডরা ট্যুরিস্টদের সুন্দর সুন্দর জায়গায় নিয়ে বকরবকর করতে থাকে। ভ্রমণকাহিনির লেখকেরা পাঠকদের সুন্দর সুন্দর জায়গায় নিয়ে লেখার মাধ্যমে বকরবকর করতে থাকেন। গাইডদের সঙ্গে তাদের তফাত হচ্ছে গাইডদের ধমক দিয়ে থামানো যায়, লেখকদের যায় না।

প্রিয় পাঠক! বেশি বিরক্ত করব না। অনুরাধাপুরের ইতিহাসের মজার অংশটা (আমার কাছে) খুবই অল্প কথায় বলব।

'অনুরাধা' নামটা শুনলেই মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ের ছবি মনে আসে। অনুরাধা আসলে একজন অত্যন্ত বলশালী পুরুষের নাম। তার নামে যে নগরের প্রতিষ্ঠা তা-ই হচ্ছে অনুরাধাপুর। চব্বিশ শতাব্দী বছর আগের প্রতিষ্ঠিত এই নগরী দর্শনার্থীদের এখনো বিমুগ্ধ করে যাচ্ছে। আমরা অবাক হয়ে ভাবছি, মানুষ তখনো এত ক্ষমতাধর ছিল!

মৃত নগরী দেখার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। নগরীর কোনো নির্জন অংশ বেছে নিয়ে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে হয়। তখন হঠাৎ মৃত নগরী জীবন ফিরে পায়। যে ধ্যান করছে তার কানে জীবন্ত নগরীর নানা শব্দ, বাদ্যবাজনা ভেসে আসে। আমি তা-ই করলাম। নির্জন একটা জায়গায় চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি, তখন এক ইউরোপীয় ট্যুরিস্ট এগিয়ে এসে চিন্তিত গলায় বলল, Any problem man ? আমাকে ধ্যানভঙ্গ করে তাকাতে হলো। মৃত নগরীকে জীবিত করা গেল না।

গাইড ব্যস্ত হয়ে পড়ল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শুয়ে থাকা বুদ্ধ দেখানোর জন্যে।

বুদ্ধমূর্তি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তারপরেও গেলাম দেখতে।

গাইড বলল, অনুরাধাপুরে গৌতম বুদ্ধের পবিত্র দাঁত ছিল। এখন আছে ক্যান্ডিতে।

আমি বললাম, তোমাকে তো প্রশ্ন না করলে চুপ করে থাকতে বলেছি। কথা বলছ কেন ?

গাইড বলল, না বললে তুমি তো জানতে না এখানে উনার পবিত্র দাঁত ছিল।

আমি বললাম, দাঁত যিনি নিয়ে এসেছিলেন আমি তার নাম জানি। তুমি কি জানো ?

না। উনার নাম কী ?

আমি বলা শুরু করলাম। পাঠক নিশ্চয়ই ভুরু কুঁচকে ভাবছেন, 'হুঁ বুঝলাম। জ্ঞান ফলানো শুরু হয়েছে।' আমি জ্ঞান ফলানোর জন্যে কিছু বলছি না। গাইডের কাছে জ্ঞান ফলানোর কিছু নেই। আমার লক্ষ্য শাওন। পৃথিবীর সব স্বামীর মতো আমিও স্ত্রীকে মুগ্ধ করতে ভালোবাসি। এই সুযোগ কখনো হয় না। আজ হয়েছে। শাওন ক্যামেরা হাতে এগিয়ে এসেছে আমার গল্প শুনতে।

আমি ভাব নিয়ে বললাম, যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ৫৪০ বছর আগে বুদ্ধকে দাহ করা হয়। আগুন থেকে তাঁর একটি দাঁত এবং কলার বোন রক্ষা পায়। কলিঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান উড়িষ্যার রাজা এই দুটি সংগ্রহ করেন এবং গভীর যত্নে রক্ষা করতে থাকেন। কলিঙ্গের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন পাশের এক নৃপতি। যুদ্ধে হেরে গেলে দাঁত এবং কলার বোন হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে বলে তিনি তাঁর কন্যা রানী ওয়ালিয়াম কুমারীকে তীর্থযাত্রী সাজিয়ে শ্রীলংকায় পাঠিয়ে দেন। রানী ওয়ালিয়াম কুমারীর ছিল মাথাভর্তি লম্বা চুল। তিনি সেই চুলের ভেতর দাঁত এবং কলার বোন লুকিয়ে শ্রীলংকায় চলে আসেন। অনুরাধাপুরের নৃপতি তখন রাজা শ্রীমেঘাওয়ানা। তাঁকে এই দুই পবিত্র বস্তু দেওয়া হয়। এই হলো ঘটনা।

শাওন বলল, কলিঙ্গের রাজা কি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

শাওন মুগ্ধকণ্ঠে বলল, তুমি এত পড়াশোনা কখন করলে ? আই অ্যাম ইমপ্রেসড।

আমি তৃপ্তির হাসি হাসলাম। যাক, অনুরাধাপুরে আসা সার্থক হয়েছে।

পুনশ্চ

অনুরাধাপুরের প্রায় এক শ' ছবি শাওন তার ডিজিটাল ক্যামেরায় তুলেছে। মৃত নগরীর আর্কিটেকচারাল বিউটি তাকে বিমোহিত করেছে। সে অনেক খাটাখাটনি করে ফ্রেম করে যখনই ছবি তুলতে যায়, তখনই নাজমা ভাবি ফ্রেমে ঢুকে পড়ে মিষ্টি হাসি হেসে পোজ দেন। একবার শাওন বলল, ভাবি, আপনি বাঁ-দিক দিয়ে ঢুকবেন না। বাঁ-দিকের এই পিলারটা আমার ফ্রেমের শেষ অংশ।

নাজমা ভাবি বললেন, আচ্ছা ঢুকব না। শাওন ফ্রেম করে যেই ছবি তুলতে গেছে, নাজমা ভাবি ডানদিক থেকে ঢুকে মিষ্টি হাসি হেসেছেন।

শাওনের তোলা এক শ' ছবির আশিটিতে নাজমা ভাবি আছেন। শাওন এখন চেষ্টা করছে ফটোশপের মাধ্যমে ভাবিকে মুছে ফেলতে। একটা ছবিতে কিছু সাফল্য এসেছে। ভাবির শরীর মুছে গেছে, শুধু মুখটা পিলারের মাথায় আটকে আছে। মুখ দূর করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে অনুরাধাপুরের একটা পিলার সবার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ছবি হিসেবে চমৎকার।

৯

বেনটোটা থেকে আমরা যাব নিগাম্বু। কলম্বো হয়ে যেতে হবে। কলম্বোর কাছেই রত্নপুরা। রত্নাপুরাতে আছে রত্নগিরি বা রত্নের পাহাড়। পাহাড় খুঁড়লেই মণিমুক্তা। কলম্বো যাওয়ার পর রত্নপাহাড় দেখা যায়। এই রত্নগিরিই বিখ্যাত আদম'স পিক। অনেক উঁচু পাহাড়। উপরে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। পাহাড়ের নিচে ঘুরাফিরা করে নিগাম্বু চলে যাওয়া। সঙ্গে গাড়ি আছে, সমস্যা কিছু নেই।

আদম'স পিক সম্পর্কে কিছু বলা যাক। সাত হাজার তিন শ' আটান্ন ফুট উঁচু পাহাড়। এর চূড়ায় একটি পদচিহ্ন।

মুসলমানরা দাবি করেন এই পদচিহ্ন হযরত আদমের। বেহেশত থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি এসেছেন শ্রীলংকায়।

খ্রিষ্টানদেরও এই দাবি। তাদের মতে শ্রীলংকাই হলো স্বর্গভূমি (Eden)। খ্রিষ্টানদের একটি দল অবশ্য বলে এটি সেইন্ট পিটারের পায়ের ছাপ।

বৌদ্ধদের দাবি এটি গৌতম বুদ্ধের বাঁ পায়ের ছাপ। তিনি পৃথিবী থেকে শেষবারের মতো চলে যাওয়ার সময় বাঁ পা রাখেন এখানে, ডান পা রাখেন ব্যাংককের সারাবুড়ি প্রদেশে। সেখানে পাথরের উপর ডান পায়ের একটি ছাপ আছে।

হিন্দুদের দাবি এই পায়ের ছাপ শিবের। পাহাড়ের নিচে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরও আছে।

প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে ইহুদি ছাড়া বাকি সবাই পদচিহ্নের দাবিদার। ইহুদিরা যদি বলত এটি মোসেসের (মুসা আলায়হেস সালাম) পায়ের ছাপ, তাহলে সর্বকলা সম্পন্ন হতো।

আমার নিজের ধারণা, এটা কোনো মানুষের পায়ের ছাপই না। প্রাকৃতিক কারণে শিলা ক্ষয়ে পায়ের পাতার আকৃতি নিয়েছে। কিংবা মানুষই পাথর খুদে এই জিনিস বানিয়েছে।

আমার এই ধারণার কারণ পায়ের পাতা পাঁচ ফুট লম্বা। দৈত্যের পায়ের পাতা এত বড় হতে পারে, মানুষের না।

ধার্মিক সেহেরি বলল, আদি মানুষ ৬০ ফুট লম্বা ছিল। তাদের পায়ের পাতা তো পাঁচ ফুট লম্বা হবেই।

আমার যুক্তি, এক মিলিয়ন বছর আগে মানুষের দৈর্ঘ্য আমাদের মতোই ছিল। গুহাচিত্রে আঁকা ছবিগুলিই তার প্রমাণ। গুহাচিত্রে শিকারি মানুষ বাইসন, হাতি, হরিণ তাড়া করছে। ছবিতে আঁকা হাতি বা বাইসনের দৈর্ঘ্য এবং মানুষের দৈর্ঘ্যের অনুপাত এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানি প্রাচীন মানুষ ছিল ক্ষীণায়ু এবং খর্বাকৃতির। পুষ্টির অভাব, চিকিৎসার অভাব, যুদ্ধ, মহামারী—সব মিলিয়ে মানুষের গড় আয়ু ছিল পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ আজ দীর্ঘায়ু। লম্বাতেও মানুষ বাড়ছে। চীন ও জাপান হলো উজ্জ্বল উদাহরণ। চীনের যুবকরা তো লম্বায় এখন আমেরিকানদের ধরে ফেলছে।

কলম্বোর দিকে যাত্রাশুরুর আগে আগে আমি বললাম, শ্রীলংকায় এসে ট্রেনে চড়া হয় নি। বেনটোটা থেকে ট্রেনে কলম্বো গেলে কেমন হয়? দিগায়ু গাড়ি নিয়ে আগে আগে চলে গেল।

সেহেরি বাদ সাধল। সে বলল, ট্রেন প্লাটফরম থেকে উঁচুতে থাকে। ট্রেনের সিঁড়ি সরু। তোমার ভাবি উঠতে পারবে না।

আমি বললাম, দুজন ভাবিকে নিচ থেকে ঠেলবে, আমি তাকে উপর থেকে টানব। টানা এবং ঠেলা খেয়ে সিঁড়ি বাওয়া তো ভাবির অভ্যাস আছেই।

নাজমা ভাবি বললেন, আপনার সব কথা আমি শুনব। শুধু যদি আপনি হাতি দেখাবার ব্যবস্থা করে দেন।

শাওন বলল, ভাবি, ওকে এসব কিছু বলে লাভ নেই। ট্যুর প্রোগ্রাম আমি করেছি। নিগাম্বু থেকে আমরা যাব পিনাওয়ালায়। সেখানে আছে হাতির বাচ্চার এতিমখানা। যে সব হাতির বাচ্চার মা মারা গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে তাদের এই হস্তী এতিমখানায় রাখা হয়। তাদের খাওয়ার দৃশ্য, স্নানের দৃশ্য অসাধারণ।

নাজমা ভাবির চোখ চকচক করছে। মনে হয় তিনি কল্পনায় হস্তীস্নান দৃশ্য দেখছেন।

চার কামরার ছোট্ট ট্রেন। কামরাগুলির অবস্থা শোচনীয়। মন খারাপ করে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন চলতে শুরু করামাত্র মন ভালো হয়ে গেল। সমুদ্র ঘেঁসে ট্রেনের লাইন। শান্ত নীল সমুদ্র, সমুদ্রের পাড়ে জেলেপল্লী। দৃশ্যপট বদলাচ্ছে। সমুদ্র বদলাচ্ছে না। অনেকদিন ট্রেনে এমন আনন্দভ্রমণ হয় নি।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ট্রেনের টিকিট ব্রিটিশ আমলের ট্রেনের টিকিটের মতো। এক ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি হার্ডবোর্ডে ছাপানো। টিকিটের রঙ বলে দিচ্ছে কোন ক্লাস। হলুদ রঙ হলে থার্ড ক্লাস, নীল হলে সেকেন্ড ক্লাস। আমি কলেজে পড়া পর্যন্ত এই টিকিটের চল আমাদের দেশে দেখেছি।

চমৎকার রেলস্টেশনের ছবি দেখে পাঠক বিভ্রান্ত হবেন না। শ্রীলংকার স্টেশনগুলির দীন দশা। এই স্টেশন হোটেল সেরেনডিয়া তাদের প্রচারের জন্যে করে দিয়েছে।

কলম্বোয় পৌঁছে টিম লিডার শাওন ম্যাডাম আমাদের এক ঘণ্টা সময় দিলেন। এই এক ঘণ্টার মধ্যে দুপুরের খাওয়া শেষ করতে হবে। কারোর কেনাকাটার কিছু থাকলে এর মধ্যেই সারতে হবে। আমি কলম্বোর একটা বইয়ের দোকানে ঢুকলাম। বইয়ের সংগ্রহ ভালো। বেছে বেছে বই কিনতে হয়। বই বাছাবাছি করতে অনেক সময় চলে গেল। এখন

আদম'স পিকের দিকে রওনা হলে হোটেলে পৌঁছতে রাত দু'টা বেজে যাবে। কাজেই আদম'স পিক বাদ দিয়ে হোটেলের দিকে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

নাজমা ভাবি বললেন, এটা হুমায়ূন ভাইয়ের একটা সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। আমরা যাতে বাবা আদমের কাছে যেতে না পারি তার জন্যে বইয়ের দোকানে দেরি করেছেন। বিরাট সোয়াব থেকে বঞ্চিত হলাম।

আমি মৌনভাব ধারণ করলাম। গৌতম বুদ্ধের দেশে ঘনঘন মৌনভাব ধারণ করতে হয়।

আমাদের হোটেলের নাম 'ক্লাব ডলফিন হোটেল'। ফাইভস্টার হোটেল। নিগাম্বুতে এটিই সবচেয়ে সুন্দর হোটেল। এদের মতো বড় সুইমিংপুল সার্কভুক্ত কোনো দেশে নেই। রাত আটটায় হোটেলে পৌঁছলাম। হোটেলের লবি দেখে মন ভালো হয়ে গেল। ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে বলতে ইচ্ছা করল, কী সুন্দর! কী সুন্দর!

হোটেলে রুম না নিয়ে আমরা একটা ভিলা নিয়েছি। ভিলায় সবাই থাকব। সমুদ্র দেখব। আলাদা কিছু খেতে ইচ্ছা করলে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা। প্রতিটি ভিলার জন্যে আলাদা অ্যাটেনডেন্ট।

জিনিসপত্র সব নামানো হয়েছে। শাওন গিয়েছে চেক ইন কাউন্টারে। সেখানে তাকে বলা হলো, তোমার নামে কোনো বুকিং নেই।

শাওন বলল, নিশ্চয়ই তোমাদের কোথাও ভুল হয়েছে।

ম্যাডাম, ভুল হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

শাওন বলল, এই হোটেলের ম্যানেজমেন্ট অফিস কলম্বোয়। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। যার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি তার নাম জোসেফ। তার মাধ্যমে আমরা একটা ভিলা নিয়েছি।

ম্যাডাম, আপনার কথা ঠিক আছে। আমাদের হেড অফিস কলম্বো এবং জোসেফ হেড অফিসেই কাজ করেন। কিন্তু ক্রিসমাসের কারণে আজ আমরা ওভার বুকড।

শাওন বলল, আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের খুব বড় একজন লেখক আছেন। আপনারা তার কথা বিবেচনা করবেন না?

হোটেল ম্যানেজমেন্টের সবাই একসঙ্গে সেহেরির দিকে তাকাল। সেহেরি উদাস ভঙ্গিতে মেহেদি রঞ্জিত দাড়িতে আঙুল বুলাচ্ছে। তাকে দেখাচ্ছে বেঁটে টলস্টয়ের মতো।

বেঁটে টলস্টয় দেখিয়েও লাভ হলো না। জিনিসপত্র তুলে আমরা অন্য হোটেলের সন্ধানে বের হলাম। শুরু হলো ক্লান্তিকর অনুসন্ধানপর্ব।

বিভিন্ন হোটেলের সামনে গাড়ি থামছে। আমরা গাড়িতে বসে আছি। ড্রাইভার দিগায়ুর সঙ্গে চিন্তিত মুখে শাওন নামছে। আর চিন্তিত মুখ করে ফিরছে।

এ রকম চলতেই থাকল, আমরা হোটেলের পর হোটেল দেখতেই থাকলাম। ক্রিসমাস সিজন। সব হোটেল ওভার বুকড। নাজমা ভাবি বললেন, হুমায়ূন ভাই, যদি হোটেল না পাওয়া যায় তখন কী হবে?

আমি বললাম, গাড়ি তো আছে। আমরা গাড়িতে থাকব।

বাথরুম করব কোথায়?

গাড়িতেই করবেন। তারপর নাকে রুমাল চাপা দিয়ে রাতটা পার করবেন।

নাজমা ভাবি বললেন, আপনার সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা বলাই উচিত না।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, কথা সত্য।

রাত বারোটায় প্যারাডাইস বিচ হোটেলের লবি থেকে শাওন ছুটতে ছুটতে গাড়ির কাছে এসে বলল, পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!... সে যখন আর্কিটেকচারে ব্যাচেলর ডিগ্রি পেয়েছিল তখনো মনে হয় এত আনন্দিত হয় নি।

হোটেলে রুম পাওয়ার পেছনে ইউরোপের প্রবল তুষারপাতের বড় ভূমিকা আছে। সুইডিশ এক পরিবার চারটি রুম বুক করেছিলেন। তুষারপাতের কারণে তাদের ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় তারা হোটেল বুকিং ক্যানসেল করেছে। ঘটনা ঘটেছে শাওনের হোটেল লবিতে পা দেওয়ার পাঁচ মিনিট আগে। হোটেলের লবি ম্যানেজার শাওনকে বলল, তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী মেয়ে। সুইডিশ পরিবার বুকিং ক্যানসেল না করলে তুমি কোথাও থাকার জায়গা পেতে না।

শাওন হাসতে হাসতে বলল, আমি না, আমার স্বামী ভাগ্যবান। সে কখনো কোথাও কোনো বিপদে পড়ে না।

অন্যদের কথা জানি না। আমি এই হোটেলে খুবই আনন্দে ছিলাম। দু'দিন দু'রাত কাটিয়েছি—দুটি বই পড়ে শেষ করেছি। একটি জনাথন লাইওনস-এর লেখা *The House of Wisdom*। অন্যটির নাম *Between Eternities*, লেখক Ashuin Desai। দুটিই চমৎকার বই।

নিগাম্বু এলাকাটা কক্সবাজারের মতো। অসংখ্য স্যুভেনিয়ারের দোকান। দাম নিয়ে মুলামুলি জায়েজ। গায়ে গা লাগা ভিড়।

আমার শ্রীলংকা ভ্রমণ এই হোটেলেই ইতি। এখান থেকে ঢাকার দিকে রওনা হব। বিদেশ যাত্রা শেষে দেশে ফেরার সময় সবসময় আমি আনন্দিত থাকি। আমার মনে হয়, দেশ মা আমাকে অনেক দিন না দেখে মন খারাপ করে আছে। অভিমানী মা'র মন খারাপ ভাব দূর করতে হবে। তাড়াতাড়ি দেশের মাটিতে পা দিতে হবে।

আমার জন্যে শ্রীলংকা ভ্রমণ ছিল আনন্দময় অভিজ্ঞতা। ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে শাওনকে ধন্যবাদ। নাজমা ভাবির নানান কর্মকাণ্ডে আনন্দ পেয়েছি। তাঁকেও ধন্যবাদ। তিনি অবশ্যি শেষ পর্যন্ত হাতির বাচ্চাদের স্নান দেখতে পান নি। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, আরেকবার তাঁকে নিয়ে শুধুমাত্র হাতি দেখার জন্যেই আসব। যেখানেই হাতি সেখানেই আমরা।

ধন্যবাদ শ্রীলংকার সহজ-সরল মানুষদের। প্রকৃতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই। প্রকৃতি মানুষের ধন্যবাদের ধার ধারে না। তারপরেও পৃথিবীতেই যিনি স্বর্গচারণ বানিয়েছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিজ্ঞান কল্পকাহিনির মহান লেখক আর্থার সি ক্লার্ক কেন নিজ দেশ ফেলে সারা জীবন শ্রীলংকায় কাটিয়েছেন—তা এই দেশে পা না দিলে বুঝতে পারতাম না।

আমার কথা ফুরাল
নটে গাছটি মুড়াল
কেন যে নটে মুড়ালি ....
ইত্যাদি।

পুনশ্চ

শ্রীলংকার একটি লোককাহিনি দিয়ে দিলাম। অনুবাদ করেছেন বিপ্রদাশ বড়ুয়া। প্রকাশ করেছে 'সাহিত্যপ্রকাশ'।

বোকা রাজার গল্প

রাস্তা দিয়ে চলেছে বোকা রাজা, পেছনে পেছনে ঘোড়াটা। ভারি সুন্দর সাদা ঘোড়া। যেমন পছন্দ করত তেমনি ভালোও বাসত রাজা সেই ঘোড়াটাকে। রাজার ছিল এক বন্ধু। ভারি পণ্ডিত সেই বন্ধুটি, আর তেমনি বুদ্ধিমান। রাজ্যের যত লোক সবাই পণ্ডিতের কথা শুনত, তাকে ভালোবাসত ও সমীহ করত। আর এ জন্যই রাজার যত রাগ। রাজা চায় রাজ্যের সবাই তার কথা শুনুক। সে রাজা। কিন্তু প্রজারা শোনে কি না পণ্ডিতের কথা, পণ্ডিতের প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ। হাটেঘাটে সবখানে শুধু পণ্ডিতের গুণগান।

রাজা এবার তেতে উঠল। অনেক খেটেখুঁটে মাথা থেকে একটু বুদ্ধি বের করল।

রাজা হুকুম দিল, পণ্ডিত, সবাই বলে তুমি খুব বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। তা মানলাম। এবার আমার সাদা ঘোড়াটাকে কথা বলা শেখাও। তবেই বুঝব তুমি কত বড় পণ্ডিত। যদি পার তো মিলবে বকশিশ, না পার তো হয়ে যাবে হাপিস। ধড় থেকে মাথা একেবারে আলাদা।

পণ্ডিত বাড়ি ফিরল। মাথা নুয়ে পড়েছে, মন খারাপ, মুখে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই।

দেখে মেয়ে শুধোয়, বাবা, মন খারাপ কেন ? কী হয়েছে ?

পণ্ডিত বলল, উপায় আর কী! রাজা যা বলেছে, সারা জীবনেও তা আমি করে উঠতে পারব না। শুধু এই জীবনে কেন, সাত জীবনেও কেউ তা পারবে না।

মেয়ে আবার শুধোয়, কী করতে বলেছে তোমায় ?

পণ্ডিত তখন মেয়েকে সব কথা বলল। বলে নিঃশ্বাস ছাড়ল লম্বা।

শুনে মেয়ে বলল, দুক্‌খু করো না বাবা। কালই যাও রাজার কাছে। গিয়ে বলো, হ্যাঁ, আপনার ঘোড়াকে কথা বলা শেখাতে তো পারি। কিন্তু ঘোড়া তো মানুষ নয়, তাই সময় লাগবে অনেক দিন। অন্তত সাত বছরের জন্য ঘোড়াটা আমাকে দিন। তাহলে তাকে কথা বলা শেখাতে শুরু করতে পারি।

কী বলছিস তুই মা! সাত বছরেই বা কী করে শেখাব ? সাত বছর পর রাজা আমাকে মেরে শেষ করে দেবে ?

বাবা, সাত বছর দীর্ঘ সময়। আর কেই-বা বলতে পারে এরই মধ্যে কী ঘটে যাবে! হয়তো রাজার সিংহাসনও উলটে যেতে পাবে! নয়তো রাজাই যেতে পারে এই পৃথিবী ছেড়ে!

মেয়ের কথা পছন্দ হলো পণ্ডিতের। খেল দেল। ভালো ঘুম হলো রাতে। সকালে উঠে আস্তে আস্তে চলল রাজবাড়ির দিকে। পথের পাশে ফোটা ভুঁইচাঁপা ফুল দেখে তার ভালো লাগল। তার পাশ দিয়ে একটা খঞ্জনা পাখি ছুটে গেল লেজ দুলিয়ে। তাকেও ভালো লাগল। তারপর পণ্ডিত রাজবাড়িতে গিয়ে পৌঁছাল। দরবার তখনো বসে নি। পণ্ডিত অপেক্ষা করতে থাকল।

রাজা এল রাজদরবারে। মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল সবাই উঠে রাজার নামে জয়ধ্বনি দিল। শুকপাখি বলে উঠল, পণ্ডিত এসেছে।

পণ্ডিত বলল, হ্যাঁ, আমি এসেছি মহারাজ। আমি আপনার ঘোড়াকে কথা বলা শেখাতে রাজি। কিন্তু এজন্য আমাকে সাত বছর সময় দিতে হবে।

রাজা হাসতে হাসতে বলল, দিলাম। নিয়ে যাও ঘোড়া। মনে রেখো, নয়তো যাবে গর্দান।

পণ্ডিত ঘোড়াটিকে নানা কাজে খাটায়। ঘোড়ার কল্যাণে তার অবস্থা ভালো হয়ে গেল। আর পণ্ডিতের বুদ্ধিমতী মেয়ের কথাই ঠিক। সাত বছর শেষ না হতেই বোকা রাজার সিংহাসন গেল উলটে। আর ঘোড়াটাও মরার আগ পর্যন্ত পণ্ডিতের কাছে ছিল, পণ্ডিতকে ধনী করে না দিলেও খাওয়া-পরার অভাব রাখে নি।

দেখা না-দেখা

মহান চীন এবং কিছু ড্রাগন

বিশেষ এক ধরনের জটিল ব্যাধি আছে যা শুধুমাত্র লেখকদের আক্রমণ করে। লেখকেরা তাদের লেখালেখি জীবনে কয়েকবার এই ব্যাধিতে ধরাশায়ী হন। পৃথিবীতে এমন কোনো লেখক পাওয়া যাবে না—যিনি জীবনে একবারও এই জটিল অসুখের শিকার হন নি। মেটেরিয়া মেডিকায় এই অসুখের বিবরণ থাকা উচিত ছিল, কিন্তু নেই। লেখকদের নিয়ে কে ভাবে!

যাই হোক, অসুখটার ইংরেজি নাম 'Writers' Block', বাংলায় 'লেখক বন্ধ্যা রোগ' বলা যেতে পারে। এই রোগের লক্ষণ এরকম—হঠাৎ কোনো একদিন লেখকের মাথা শূন্য হয়ে যায়। তিনি লিখতে পারেন না। গল্প-কবিতা দূরে থাকুক, স্বরে 'অ' স্বরে 'আ'-ও না। তিনি অভ্যাসমতো রোজ কাগজ-কলম নিয়ে বসেন এবং কাগজের ধবধবে সাদা পাতার কোনায় কোনায় ফুল-লতাপাতা আঁকার চেষ্টা করেন। কাপের পর কাপ চা ও সিগারেট খান। একসময় উঠে পড়েন। এটা হচ্ছে রোগের প্রাথমিক পর্যায়।

রোগের দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখক ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত হন। সারা রাত জেগে থাকেন। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। অকারণে রাগারাগি করতে থাকেন। যেমন—

'চা এত গরম কেন?'

[চা গরম হওয়ারই কথা। লেখক আইসটি খেতে চাইলে ভিন্ন কথা।]

'সবাই উঁচু গলায় কথা বলছে কেন?'

[সবাই স্বাভাবিক গলাতেই কথা বলছে। এরচেয়ে নিচু গলায় কথা বললে কানাকানি করতে হয়।]

'এই গ্লাসে করে আমাকে পানি কেন দেওয়া হলো?'

[লেখক জীবনে কখনো কোন গ্লাসে পানি দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার পর গ্লাস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কী রকম গ্লাসে পানি দেওয়া হলে তিনি খুশি হবেন তাও কিন্তু খোলসা করে বলছেন না।]

রোগের শেষ পর্যায়ে লেখক ঘোষণা করেন, তিনি আর লেখালেখি করবেন না। অনেক হয়েছে। '... ছাল' লিখে ফায়দা নেই। [ছালের আগের শব্দটা বুদ্ধিমান পাঠক গবেষণা করে বের করে নিন।] লেখকের মুখের ভাষা বস্তি লেভেলে নেমে আসে। তাঁর মধ্যে কাজী নজরুল সিনড্রম দেখা যায়। হাতের কাছে যা-ই পান তা-ই ছিঁড়ে ফেলেন। নিজের পুরনো লেখা, টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিসিটি বিল সব শেষ। তারপর এক অনিদ্রার মধ্যরাতে স্ত্রীকে ডেকে তুলে শান্ত গলায় বলেন, আমি বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সুইসাইড করব। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্যে তোমার কাঁচাঘুম ভাঙিয়েছি। তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। এখন দয়া করে একুশটা ঘুমের ওষুধ আমাকে দাও, আর এক গ্লাস ঠান্ডা পানি।

কোনো কোনো পাঠক হয়তো ভাবছেন আমি Writers' Block নামক রোগটা নিয়ে রসিকতা করছি। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এই পৃথিবীর অনেক লেখক (খ্যাত এবং অখ্যাত) এই ভয়াবহ অসুখের শেষ পর্যায়ে এসে আত্মহত্যা করেছেন। এই মুহূর্তে যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন—

কবি মায়াকোভস্কি (রাশিয়া)
ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ে (নোবেল প্রাইজ বিজয়ী, আমেরিকান)
ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতা (নোবেল প্রাইজ বিজয়ী, জাপানি)
কবি জীবনানন্দ দাশ (বাংলাদেশ)

বিখ্যাতদের মতো অতি অখ্যাতরাও যে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন তার উদাহরণ আমি। গত শীতের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ আমাকে এই রোগে ধরল। কঠিনভাবেই ধরল। এক গভীর রাতে শাওনকে ডেকে তুলে বললাম; 'কোথা সে ছায়া সখি কোথা সে জল? কোথা সে বাঁধাঘাট অশ্বত্থতল?' সে হতভম্ব হয়ে বলল, এর মানে?

আমি বললাম, তুমি খুব আগ্রহ করে একজন লেখককে বিয়ে করেছিলে। সেই লেখক কিছু লিখতে পারছেন না। কোনোদিন পারবেনও না। আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লেখকের সঙ্গে জীবনযাপনের আগ্রহ তারপরেও যদি তোমার থাকে, তুমি অন্য লেখক খুঁজে বের কোরো। আমি শেষ। আসসালামু আলায়কুম।

জীবন সংহারক রাইটার্স ব্লকের কোনো ওষুধ নেই। এন্টিবায়োটিক বা সালফা ড্রাগ কাজ করে না, তবে সিমটোমেটিক চিকিৎসার বিধান আছে। সিমটোমেটিক চিকিৎসায় লেখককে অতি দ্রুত তিনি যে পরিবেশে বাস করেন সেখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তাঁর প্রিয়জনরা সবাই তাঁর আশেপাশে থাকবেন, তবে লেখালেখি বিষয়ে কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারবেন না। লেখকের সঙ্গে কোনো বিষয়েই কেউ তর্কে যাবেন না। তিনি যা বলবেন সবাই 'গোপাল বড়ই সুবোধ বালকে'র মতো তাতে সায় দেবে।

আমার লেখক ব্লক দূর করার ব্যবস্থা হলো। প্রধান উদ্‌যোগী অন্যপ্রকাশের মাজহার। আমার এই অসুখে সে-ই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বই না লিখলে সে ছাপবে কী? সামনেই একুশের বইমেলা!

মাজহার এক সকালবেলা অনেক ভণিতার শেষে বলল, আমি জানি আপনি দেশের বাইরে যেতে চান না। চলুন না ঘুরে আসি। আপনি লেখালেখি করতে পারছেন না—এটা কোনো ব্যাপার না। সারা জীবন লেখালেখি করতে হবে তাও তো না। একজীবনে যা লিখেছেন যথেষ্ট। এমনি একটু ঘুরে আসা। আপনি হ্যাঁ বললে খুশি হব।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

আনন্দে মাজহারের কালো মুখ বেগুনি হয়ে গেল। হিসাবমতো তার মুখে বত্রিশটা দাঁত থাকার কথা, সে কীভাবে যেন চল্লিশটা দাঁত বের করে হেসে ফেলল।

হুমায়ূন ভাই, কোথায় যেতে চান বলুন—ইন্দোনেশিয়ার বালি, মালয়েশিয়ার জেনটিং, থাইল্যান্ডের পাতায়া/ফুকেট, মরিশাস, মালদ্বীপ।

আমি বললাম, ড্রাগন দেখতে ইচ্ছা করছে। চীনে যাব।

মাজহারের মুখের ঔজ্জ্বল্য সামান্য কমল। সে আমতা আমতা করে বলল, চীনে এখন ভয়ঙ্কর ঠান্ডা। টেম্পারেচার শূন্যেরও নিচে...

আমি আগের চেয়েও গম্ভীর গলায় বললাম, চীন।

মাজহারের মনে পড়ল রাইটার্স ব্লকের রোগীর সব কথায় সায় দিতে হয়। সে বলল, অবশ্যই চীন। আমরা গরম দেশের মানুষ। ঠান্ডা কী জানি না। হাতেকলমে ঠান্ডা শেখার মধ্যেও মজা আছে।

হঠাৎ করে আমার মাথায় চীন কেন এল বুঝতে পারলাম না। এমন না যে আমি চীন দেখি নি। পনের বছর আগে একবার গিয়েছিলাম। প্রায় একমাস ছিলাম। চীন দেশের নানান অঞ্চলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই দেশে আরেকবার না গিয়ে অন্যকোথাও যাওয়া যেত। কিন্তু আমার মাথায় বাচ্চাদের মতো ঘুরছে—চীন, চীনের ড্রাগন।

সফরসঙ্গীর দীর্ঘ তালিকা তৈরি হলো। রাইটার্স ব্লক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীকে একা ছাড়া যাবে না। তার চারপাশে বন্ধুবান্ধব থাকতে হবে।

আমার সফরসঙ্গীরা হলেন—

০১. চ্যালেঞ্জার এবং চ্যালেঞ্জার-পত্নী।

চ্যালেঞ্জার একজন অভিনেতা। বেচারা একদিন নুহাশ চলচ্চিত্রে নাটকের শুটিং দেখতে এসেছিল। নাপিতের এক চরিত্রে কাউকে অভিনয় করার জন্যে পাচ্ছিলাম না। তাকে ধমক দিয়ে জোর করে নামিয়ে দিলাম। আজ সে বিখ্যাত অভিনেতা। শুনেছি বাংলাদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে তার সম্মানী সর্বোচ্চ। চ্যালেঞ্জার-পত্নী স্কুলশিক্ষিকা। স্বামীর প্রতিভায় তেমন মুগ্ধ না, তবে স্বামীর নানাবিধ যন্ত্রণায় কাতর।

০২. কমল, কমল-পত্নী এবং কন্যা আরিয়ানা।

কমলও আমার নাটকের অভিনেতা। ডায়ালগ ছাড়া অভিনয়ে সে অতি পারঙ্গম। ডায়ালগ দিলেই নানা সমস্যা। তোতলামি, মুখের চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়া, হাত-পা বেঁকে যাওয়া শুরু হয়। সে আমার নাটকে অতি দক্ষতার সঙ্গে, রাইফেল কাঁধে মুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তান আর্মির সেপাই, পথচারী, দুর্ভিক্ষে মৃত লাশের ভূমিকা করেছে। এই মহান অভিনেতা অভিনয়ের জন্যে কোনো সম্মানি দাবি করেন না। ডেডবডির ভূমিকায় তিনি অনবদ্য। ডেডবডির ভূমিকায় এক বটগাছের নিচে তিনি আড়াই ঘণ্টা হা করে পড়ে ছিলেন। এর মধ্যে মুখে পিঁপড়া ঢুকেছে, কামড় দিয়ে তাঁর জিহ্বা ফুলিয়ে ফেলেছে, তিনি নড়েন নি। কমল-পত্নীর নাম লিজনা। একসময় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অভিনেতা স্বামীর পেছনে সময় দিতে গিয়ে স্কুল ছেড়েছেন। এখন তাঁর প্রধান কাজ অভিনেতা স্বামীর কস্টিউম গুছিয়ে দেওয়া। এই দম্পতির একমাত্র কন্যা আরিয়ানার বয়স চার। পরীশিশুর চেয়েও সুন্দর। পুরো চায়না ট্রিপে আমার অনেকবারই ইচ্ছা

করেছে, মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করি। নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য কোনো ছেলেমেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করার আমার অভ্যাস নেই বলে করা হয় নি।

০৩. মাজহার, মাজহার-পত্নী, তাদের শিশুপুত্র অমিয় এবং টমিও।

মাজহারের একটি পরিচয় আগেই দিয়েছি, তারচেয়ে বড় পরিচয় সেও আমার নাটকের একজন অভিনেতা। তার এক মিনিটের একটি দৃশ্য আমি পুরো একদিন শুট করার পর ফেলে দিয়ে বাসায় চলে আসি। পরের দিন আমার হয়ে শাওন সেই দৃশ্য শুট করতে যায়। আমি নিশ্চিত ছিলাম সে পারবে। সে আমার মতো অধৈর্য না। তার ধৈর্য বেশি। সে এক মিনিটের এই দৃশ্য শুট করতে দেড় দিন সময় নেয়। শুটিং শেষে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে বাসায় ফিরে আসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাজহার কেমন করেছে ? সে খড়খড়ে গলায় বলেছে, তুমি জানো না সে কেমন করেছে ? সব বন্ধু-বান্ধবকেই অভিনেতা বানাতে হবে ?

আমি এখনো আশাবাদী। কারণ আমার চিফ অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর (জুয়েল রানা) আমাকে বলেছে যে, মাজহার স্যারের না-সূচক মাথা নাড়া এবং হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়া খারাপ হয় নি। প্রায় ন্যাচারাল মনে হয়েছে।

মাজহার-পত্নী স্বর্ণা সিলেটের মেয়ে। মা-স্বভাবের মেয়ে। মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। দীর্ঘদিন ধরে তাকে চিনি। তার মুখ থেকে এখনো ভুলেও প্রসঙ্গে একটি মন্দ কথা শুনি নি। স্বর্ণা স্বামীর অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ। স্বামীর প্রথম অভিনয়ের দিন সে মানতের রোজা রেখেছে। শাহজালাল সাহেবের দরগায় বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করেছে।

এই দম্পতির একমাত্র পুত্রসন্তান অমিয়। নামটা রেখেছেন অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর। মাজহার পুত্রের নামের জন্যে আমার কাছে প্রথম এসেছিল। আমি নাম রেখেছিলাম— অরণ্য। মাজহার এই নাম রাখে নি। কারণ এই নামের একটা বাচ্চাকে সে চেনে। সেই বাচ্চা খুবই দুষ্টু প্রকৃতির। অরণ্য নাম রাখলে বাচ্চা বন্যস্বভাবের হয়ে যেতে পারে।

'যে যার নিন্দে তার দুয়ারে বসে কান্দে'। আমাদের অমিয় (বয়স চার) মাশাল্লাহ অতি দুষ্টু প্রকৃতির হয়েছে। তার সঙ্গে খেলতে এসে তার হাতে মার খায় নি এমন কোনো শিশু নেই। কামড় দিয়ে রক্ত বের করার বিষয়েও সে ভালো দক্ষতা দেখাচ্ছে। এইদিকে সে আরও উন্নতি করবে বলে সবারই বিশ্বাস। বেইজিং-এর ম্যাগডোনাল্ড রেস্টুরেন্টে বার্গার খাওয়ার সময় সে ফ্লাইং কিক দিয়ে দুই চায়নিজ বাচ্চাকে একই সঙ্গে ধরাশায়ী করে রেস্টুরেন্টের সবার প্রশংসাসূচক দৃষ্টি লাভ করেছে।

তার বিষয়ে একটি গল্প এখনই বলে নেই, পরে ভুলে যাব।

আমি কোনো একটা পত্রিকায় ইন্টারভ্যু দিচ্ছি। বিষয়বস্তু 'বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ'। অতি জটিল বিষয়। যিনি ইন্টারভ্যু নিচ্ছেন তিনি কঠিন কঠিন সব প্রশ্ন করছেন, যার উত্তর আমি জানি না। মোটামুটি অসহায় বোধ করছি। আমার পাশে নিরীহ মুখ করে অমিয় বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে ইন্টারভ্যু নামক বিষয়টাতে যথেষ্ট মজা পাচ্ছে। প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন একটু বলুন, বাংলাদেশের কোন কোন গল্পকার কাফফাকে অনুসরণ করেন ?'

উত্তরের জন্যে আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি, এমন সময় আমার গালে প্রচণ্ড এক চড়। আমার প্রায় পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। প্রথমে ভাবলাম—প্রশ্নকর্তা আমার মূর্খতায় বিরক্ত হয়ে চড় লাগিয়েছেন। ধাতস্থ হয়ে বুঝলাম প্রশ্নকর্তা না, চড় দিয়েছে অমিয়। আমি উত্তর দিতে দেরি করায় সে হয়তো বিরক্ত হয়েছে। প্রশ্নকর্তা ভীত গলায় বলল, স্যার, এই ছেলে কে?

আমি বললাম, *অন্যদিন* পত্রিকার সম্পাদক মাজহারুল ইসলামের ছেলে। সে বলল, আপনাকে মারল কেন?

আমি বললাম, ছেলে তার বাবার মতো হয়েছে। সাহিত্য পছন্দ করে না। সাহিত্য বিষয়ক কোনো আলোচনাও পছন্দ করে না। ইন্টারভ্যু এই পর্যন্ত থাক।

জি আচ্ছা থাক।

এত সহজে প্রশ্নকর্তা যে তার ইন্টারভ্যু বন্ধ করল তার আরেকটি কারণ—ইতিমধ্যে অমিয় প্রশ্নকর্তার ক্যামেরার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। ক্যামেরা নিয়ে দু'জনের দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে।

অমিয়'র চড় খেয়ে আমি তেমন কিছু মনে করি নি। তার কারণ সে আমাকে ডাকে—বুব বু। বুব বু'র অর্থ বন্ধু। বন্ধু বলতে পারে না, বলে বুব বু। একজন বন্ধু আরেক বন্ধুর গালে চড়-থাপ্পড় মারতেই পারে।

ও আচ্ছা টমিওর কথা বলা হয় নি। অমিয়র ভাই টমিও মায়ের পেটে। তার এখনো জন্ম হয় নি। সে মায়ের পেটে করে বেড়াতে যাচ্ছে।

০৪. স্বাধীন খসরু। অভিনেতা।

সে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। কারণ সে আছে ইংল্যান্ডে। তার সঙ্গে কথা হয়েছে, সে সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে বেইজিংয়ে চলে আসবে। সে অভিনয় শিখেছে লন্ডন স্কুল অব ড্রামা থেকে। যে স্কুল পৃথিবীর অনেক বড় বড় অভিনেতার জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ—এলিজাবেথ টেলর, পিটার ও টুল...। সে ইংল্যান্ডের সব ছেড়ে-ছুড়ে বাংলাদেশে চলে এসেছে শুধুমাত্র অভিনয়ের আকর্ষণে। আমার সব নাটকেই তাকে দেখা যায়। সে নাম করেছে 'তারা তিনজন'-এর একজন হিসেবে। দেশের বাইরে তার জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। তাকে নিয়ে একবার আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে গিয়েছিলাম। বাঙালি সমাজ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আনন্দময় দৃশ্য। ছেলে হিসেবে সে অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ। অতি তুচ্ছ কারণে সে তেউ তেউ করে কাঁদছে—এটি নিত্যদিনকার দৃশ্য। তার গত জন্মদিনে আমরা তাকে নরসিংদীর বিশাল এক গামছা উপহার দিয়েছি। উপহারপত্রে লেখা—'পবিত্র অশ্রুজল মোছার জন্যে'।

০৫. শাওন ও লীলাবতী।

শাওনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। তার প্রভাতেই সে দীপ্ত। হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রী পরিচয় অবশ্যই তার জন্যে সুখকর না। লীলাবতীর পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। লীলাবতী তার গর্তে কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা কন্যা। গত পাঁচ মাস ধরে সে মায়ের পেটের অন্ধকারে বড় হচ্ছে। মা'র সঙ্গে সেও চীনে যাচ্ছে। তার ভ্রমণ অতি

আনন্দময়। সে বাস করছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত ঘরে। যে ঘর অন্ধকার হলেও মায়ের ভালোবাসায় আলোকিত।

ভ্রমণ বিষয়ে শাওনের উৎসাহ সীমাহীন। যেখানে ঘরের বাইরে পা ফেলতে পারলেই সে খুশি, সেখানে সে যাচ্ছে চীনে! মিং ডায়ানেস্টির সত্যতা দেখবে, চীনের প্রাচীর দেখবে।

দেশের ভেতর সে আমাকে নিয়ে ঘুরতে পারে না। প্রধান কারণ দোকানে দোকানে জিনিসপত্র দেখে বেড়ানো আমার স্বভাব না। রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া আমার অপছন্দ। তারপরেও কোথাও কোথাও যাওয়া হয়। লোকজন তখন যে তার দিকে মায়া মায়া দৃষ্টিতে তাকায় তা-না। লোকজনের দৃষ্টিতে থাকে—হুমায়ূন আহমেদ নামক ভালো মানুষ লেখককে কুহক মায়ায় তুমি মুগ্ধ করেছ। তুমি কুহকিনী!

দেশের বাইরে তার সেই সমস্যা নেই। আমাকে পাশে নিয়ে কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে বসলে কেউ সেই বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাবে না। দু'একজন হয়তো ভাববে—বাচ্চা একটা মেয়ে বুড়োটার সঙ্গে বসে আছে কেন? এর বেশি কিছু না। এ ধরনের দৃষ্টিতে শাওনের কিছু যায় আসে না।

দেশের বাইরে শাওনের ঝলমলে আনন্দময় মুখ দেখতে আমার ভালো লাগে। তবে মাঝেমধ্যে একটা বিষয় চিন্তা করে বুকের মধ্যে ধাক্কার মতো লাগে। আমি ষাট বছরের বুড়ি ধরতে যাচ্ছি। চলে যাওয়ার ঘণ্টা বেজে গেছে। আমার মৃত্যুর পরেও এই মেয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে। সে কি একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে? নাকি আনন্দময় অন্য কোনো পুরুষ আসবে তার পাশে। সে কোনো এক রেস্টুরেন্টে মাথা দুলিয়ে হেসে হেসে গল্প করবে তার সঙ্গে—'এই কী হয়েছে শোনো, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন না...'

০৬. পুত্র নুহাশ।

না না, সে আমাদের সঙ্গী না। শাওন যেখানে আছে সেখানে সে যাবে কিংবা তাকে যেতে দেওয়া হবে তা হয় না।

নুহাশকে আমার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা করতে দেওয়া হয়। তবে আমার ঘরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় না। সে আসে, গ্যারেজে দাঁড়িয়ে মোবাইলে এসএমএস করে জানায়—'বাবা আমি এসেছি।' আমি নিচে নেমে যাই। গাড়িতে কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে ঘুরি। মাঝে মধ্যে মাথায় হাত রাখি। সে লজ্জা পায় বলেই চট করে হাত সরিয়ে নেই। তাকে বাসায় নামিয়ে মন খারাপ করে ফিরে আসি।

যে পুত্র সঙ্গে যাচ্ছে না তার নাম সফরসঙ্গী হিসেবে কেন লিখলাম? এই কাজটা লেখকেরা পারেন। কল্পনায় অনেক সঙ্গী তারা সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারেন।

দীর্ঘ চীন ভ্রমণে অদৃশ্য মানব হয়ে আমার পুত্র আমার সঙ্গে ছিল। একবার ফরবিডেন সিটিতে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে পড়লাম। কমল কমলের মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, মাজহার তার ছেলেকে নিয়ে। আমি শাওনকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। তার পেটে লীলাবতী। পা পিছলে পড়লে বিরাট সমস্যা। হঠাৎ দেখি একটু দূর দিয়ে মাথা নিচু করে নুহাশ হাঁটছে। তার মুখ বিষণ্ন। চোখ আর্দ্র। আমি বললাম, বাবা,

আমার হাত ধরো। আমাব দায়িত্ব শাওনকে হাত ধরে ঠিকমতো নিয়ে যাওয়া। তোমার দায়িত্ব আমাকে ঠিকমতো নিয়ে যাওয়া। সে এসে আমার হাত ধরল।

কল্পনার নুহাশ বলেই করল। লেখকেরা তাদের কল্পনার চরিত্রদের নিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেন। লেখক হওয়ার মজা এইখানেই।

প্রথম রজনী...

ঢাকা থেকে হংকং। হংকং থেকে বেইজিং।

প্লেন থেকে নামলাম। এয়ারপোর্টের টার্মিনাল থেকে বের হলাম, একসঙ্গে সবার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। মেয়েদের লম্বা চুল বলেই খাড়া হলো না, তবে ফুলে গেল। কারণ সহজ। তাপমাত্রা শূন্যের সাত ডিগ্রি নিচে। হাওয়া বইছে। টেম্পারেচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিল ফ্যাক্টর। চিল ফ্যাক্টরের কারণে তাপমাত্রা শূন্যের আঠার-উনিশ ডিগ্রি নিচে চলে যাওয়ার কথা। এই হিসাব কেমন করে করা হয় আগে জানতাম। এখন ভুলে গেছি।

কমল বলল, হুমায়ূন ভাই, ঠান্ডা ঠান্ডা তাব আছে।

আমি বললাম, হুঁ।

শুধু মেয়েরা খুশি। বেড়াতে বের হলে সব কিছুতেই তারা আনন্দ পায়। বড়ই আহ্লাদী হয়।

শাওন বলল, ঠান্ডাটা যা মজা লাগছে!

বাকিরাও তার সঙ্গে গলা মেলাল। তাদেরও নাকি মজা লাগছে। তারা সিগারেট খেলা শুরু করল। সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গি করে ধোঁয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাসের জলীয়বাষ্প জমে যায়। মনে হয় বুনকা বুনকা ধোঁয়া।

বাচ্চারা সবার আগে কাহিল হলো। কারও হাত-মোজা নেই। ঠান্ডায় হাত শক্ত হয়ে গেল। তারা শুরু করল কান্না। কে তাকায় বাচ্চাদের দিকে! বাচ্চাদের মায়েদের ঠান্ডা নিয়ে আহ্লাদী তখনো শেষ হয় নি।

বাংলাদেশ অ্যাম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি অ্যাম্বেসির গাড়ি নিয়ে এসেছেন। তাঁর নাম মনিরুল হক। তিনি আমাদের হয়ে হোটেল বুকিংও দিয়ে রেখেছেন। তাঁর দায়িত্ব আমাদেরকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। এক গাড়িতে হবে না। আরও কয়েকটা গাড়ি লাগবে। তিনি ব্যস্ত হয়ে চলে গেছেন গাড়ির সন্ধানে। আমরা দুর্দান্ত শীতে থরথর করে কাঁপছি।

অ্যাম্বেসির বিষয়টা বলি। একজন লেখক বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়াতে যাবে, তার জন্যে অ্যাম্বেসি গাড়ি পাঠাবে—বাংলাদেশ অ্যাম্বেসি এই জিনিস না। লেখক কবি-সাহিত্যিক-পেইন্টার তাদের কাছে কোনো বিষয় না। প্রবাসে যেসব বাংলাদেশি বাস করেন, তারাও তাদের কাছে কোনো বিষয় না। অ্যাম্বেসি দেখে বেড়াতে আসা মন্ত্রী-মিনিস্টারদের,

আমলাদের। সেইসব মহামানবরা অ্যাম্বেসির গাড়ি নিয়ে শপিং করেন। অ্যাম্বেসির কর্মকর্তারা বাজারসদাইয়ে সহায়তা করেন।

পৃথিবীর বাকি দেশগুলির অ্যাম্বেসির অনেক কর্মকাণ্ডের প্রধান কর্মকাণ্ড, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এত সময় বাংলাদেশ অ্যাম্বেসির কর্মকর্তাদের নেই। তাদেরকে নানান স্টেট ফাংশানে ডিনার খেতে হয়। অনেকগুলি পত্রিকা পড়তে হয় (দেশে কী হচ্ছে জানার জন্যে।) সময়ের বড়ই অভাব।

আমি কখনো দেশের বাইরে গেলে অ্যাম্বেসির সঙ্গে যোগাযোগ করে যাই না। আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। বেইজিং-এ অ্যাম্বেসিকে আগেভাগে জানানোর কাজটি করেছে মাজহার। যে ভদ্রলোক অ্যাম্বেসি থেকে এসেছেন তিনি যে অ্যাম্বাসেডর কর্তৃক নির্দেশ পেয়ে এসেছেন তাও না। তিনি এসেছেন, নিজের আগ্রহে এবং আনন্দে। তিনি লেখক হুমায়ূন আহমেদের অনেক বই পড়েছেন, অনেক নাটক দেখেছেন। লেখককে সামনাসামনি দেখার ইচ্ছাই তাঁর মধ্যে কাজ করেছে।

এই সৌভাগ্য আমার প্রায়ই হয়। অ্যাম্বেসিতে সিরিয়াস কিছু ভক্ত পাওয়া যায়। তারা যে আগ্রহ দেখায় তার জন্যেও সমস্যায় পড়তে হয়। ১৯৯৬ সালে বিশাল এক দল নিয়ে নেপালের কাঠমাণ্ডুতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অ্যাম্বেসিতে মোটামুটি হুলস্থূল পড়ে গেল। অ্যাম্বেসি তিনটি ডিনার দিল। কাঠমাণ্ডুর লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করল। আমি বিব্রত (এবং খানিকটা আনন্দিতও)। সমস্যা দেখা দিল তারপর যখন বাংলাদেশ অ্যাম্বেসি আমার এবং আমার দলের পেছনে বিরাট অঙ্কের খরচ দেখাল। খরচের হিসাব চলে গেল জাতীয় সংসদে। শাওনের মা, বেগম তহুরা আলি তখন সংসদ সদস্য। তাঁর কাছেই সংসদের আলোচনার কথা শুনলাম। খুবই লজ্জা পেলাম।

কাজেই আমি অ্যাম্বেসির তরুণ সুদর্শন হাস্যমুখি ফার্স্ট সেক্রেটারিকে শক্তভাবে বললাম, আপনি যে কষ্ট করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। তবে আপনার কাছ থেকে আর কোনো সাহায্য-সহযোগিতা আমি নেব না। আপনাদের কারও বাড়িতে ডিনার খাব না, অ্যাম্বাসেডর সাহেবের সঙ্গে দেখা করব না।

মনিরুল হক অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনি যা বলবেন তা-ই।

মনিরুল হক তাঁর কথা রাখেন নি। তিনি তাঁর বাড়িতে বিশাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমাদের অ্যাম্বাসেডরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, পৃথিবীর সংস্কৃতি চর্চা, ধর্ম নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ (এবং শিক্ষনীয়) বিষয়ে আলোচনা করলেন। এই আলোচনায় আমার সফরসঙ্গীরা উপকৃত হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ তারা গভীর আগ্রহে আলোচনা শুনল।

দেশে ফেরার সময় মনিরুল হক সাহেব কাচুমাচু হয়ে একটা প্রস্তাব দিলেন। অ্যাম্বাসেডর সাহেব ফরেন সেক্রেটারির জন্য উপহার হিসেবে একটা গলফ সেট পাঠাবেন। গলফ সেটটা অত্যন্ত দামি বিধায় লাগেজে দেওয়া যাচ্ছে না। হাতে করে নিয়ে

যেতে হবে। আমরা কি নিয়ে যাব? একবার ঢাকায় পৌঁছলে আমাদের আর কিছুই করতে হবে না। সেক্রেটারি সাহেব লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন।

আমি গলফ সেট কাঁধে করে নিয়ে যেতে খুবই রাজি ছিলাম। আমার সফরসঙ্গীরা বাদ সাধল। তারা মনে করল, এতে লেখক হুমায়ূন আহমেদের সম্মানহানি হবে। গলফ সেট নেওয়া হলো না।

আমাদের পররাষ্ট্র সচিবের কাছে এতদিনে নিশ্চয়ই গলফ সেট পৌঁছে গেছে। আশা করি, গলফে তাঁর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আমরা মন্ত্রী, সচিব ও অ্যাম্বাসেডরদের সর্ব বিষয়ে উন্নতি কামনা করি।

বেইজিংয়ে আমাদের জন্যে যে হোটেল ঠিক করা ছিল, তার নাম Gloria Plaza। চমৎকার হোটেল। সামনেই ক্রিসমাস, এই উপলক্ষে সুন্দর করে সাজানো। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা, ভেতরে চমৎকার উষ্ণতা। ডেস্কের চায়নিজ মেয়েরা সুন্দর ইংরেজি বলছে। ব্যবহার আন্তরিক। এক যুগ আগের দেখা চীন এবং বর্তমানের আধুনিক চীনের কোনো মিল নেই।

আমাদের হোটেলে দাখিল করে মনিরুল হক সাহেব কয়েকটা টিপস দিলেন। প্রথম টিপস, কেনাকাটা করতে গেলেই দামাদামি করতে হবে। এখানকার দোকানপাট ইউরোপ-আমেরিকার মতো না—যে দাম লেখা থাকবে সেই দামেই সোনামুখ করে কিনতে হবে। চায়নিজ দোকানিরা জিনিসপত্রের গায়ে আকাশছোঁয়া দাম লিখে রাখে, কাজেই শুরু করতে হবে পাতাল থেকে। যে বস্তুর গায়ে লেখা পাঁচ শ' ইয়েন, তার দাম বলতে হবে পাঁচ ইয়েন। কিছুক্ষণ দরদাম করার পর দশ ইয়েনে ওই বস্তু পেয়ে যাওয়ার কথা।

মেয়েরা আসন্ন দরদামের কথা ভেবে আনন্দে অধীর হয়ে গেল। এই কাজটি মেয়েরা কেন জানি না খুবই আগ্রহের সঙ্গে করে। চারঘণ্টা সময় নষ্ট করে তারা এক শ' টাকার জিনিস ৯৫ টাকায় কিনে এমন ভাব করবে যেন তারা চেঙ্গিস খান, এইমাত্র এক রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছে। চারঘণ্টা তাদের কাছে কোনো বিষয় না, পাঁচ টাকা বিষয়।

আমি নিজে নিউমার্কেট কাঁচাবাজারে এক অতি বিত্তবান তরুণীকে পেঁপের দাম দু'টাকা কমানোর জন্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দরদাম করতে দেখেছি। বিত্তবান তরুণীর পরিচয় দিলে আপনারা কেউ কেউ চিনতেও পারেন। তাঁর নাম মেহের আফরোজ শাওন। তিনি ফিল্মে অভিনয় করেন এবং গান করেন।

মনিরুল হক সাহেবের দ্বিতীয় টিপস হলো—এখানে সবকিছুর দু'টা নাম। একটা ইংরেজি নাম, একটা চায়নিজ নাম। হোটেল Gloria Plaza-র একটা চায়নিজ নাম আছে। চায়নিজ নাম জানা না থাকলে মহাবিপদ। কোনো ট্যাক্সি ড্রাইভারই ইংরেজি নাম জানে না। মনিরুল হক সাহেবের এই উপদেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা না করায় আমি যে বিপদে পড়েছিলাম যথাসময়ে তা বর্ণনা করা হবে।

হোটেলের রুমগুলি সবার পছন্দ হলো। শুধু মাজহারের হলো না। তার ধারণা, তার নিজের রুম ছাড়া বাকি সবগুলো ভালো।

অনেক ঝামেলা করে সে তার রুম পাল্টালো। রাতে সবাইকে নিয়ে খেতে যাব, তখন শুনি বর্তমান রুমটাও মাজহার বদলাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ এই রুমের সবই ভালো, শুধু কমোডের ঢাকনিটায় কালো কালো দাগ।

রাত এগারোটায় দ্বিতীয় দফা রুম বদলানোর পর আমরা খাদ্যের সন্ধানে বের হলাম। কাছেই ম্যাকডোনাল্ড। বার্গার খাওয়া হবে। মেয়েদের মধ্যে আবারও আনন্দের ঝড় বয়ে গেল। আচ্ছা, মেয়েরা সবসময় জাংক বস্তু পছন্দ করে কেন? জাংক ফুড, জাংক স্বামী। একজন ভালোমানুষ স্বামীকে মেয়েরা যত পছন্দ করে, তারচেয়ে দশগুণ বেশি পছন্দ করে জাংক স্বামী। এইজন্যেই কি নারী চরিত্র 'দেবা না জানন্তি, কুত্রাপি মনুষ্যা'?

শুকনা বার্গার চিবুতে চিবুতে দুঃসংবাদ শুনলাম। হোটেল গ্লোরিয়া প্লাজার নাশতা বিষয়ক দুঃসংবাদ। প্রতি রুমের একজন ফ্রি নাশতা খাবে। অন্যজনকে কিনে খেতে হবে। আমি বলতে গেলে পৃথিবীর সব দেশেই গেছি—এমন অদ্ভুত নিয়ম দেখি নি এবং কারও কাছ থেকে শুনিও নি।

রাতেই দলগতভাবে সিদ্ধান্ত হলো, সকালবেলা প্রতি রুমের স্বামী বেচারা নাশতা খেতে যাবে, তার দায়িত্ব হবে স্ত্রীর নাশতা লুকিয়ে নিয়ে আসা। সেদ্ধ ডিম, রুটি, মাখন, কলা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলা কোনো ব্যাপারই না। পরের দিন স্ত্রীদের পালা, তারা স্বামীদের নাশতা নিয়ে আসবে। দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ চুরি চুরি খেলার কথা ভেবে আনন্দে সবাই আত্মহারা। আমি ক্ষীণ স্বরে আপত্তি করতে গিয়ে ধমক খেলাম। ব্যাপারটায় নাকি প্রচুর ফান আছে। আমি মাথামোটা বলে ফানটা ধরতে পারছি না। খাবার চুরি এবং বই চুরিতে পাপ নেই—এইসবও শুনতে হলো।

পাঠক শুনে বিস্মিত হবেন, পুরুষদের কেউ কোনো চুরি করতে পারে নি। পুরুষদের একজন শুধু একটা কমলা পকেটে নিয়ে ফিরেছে।

দ্বিতীয় দিন ছিল মহিলাদের পালা। তারা যে পরিমাণ খাবার চুরি করেছে তা দিয়ে বাকি সবাই এক সপ্তাহ নাশতা খেতে পারে। মনস্তত্ত্ববিদ এবং সমাজবিজ্ঞানীরা এই ঘটনা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে কি উপনীত হতে পারেন?

নিষিদ্ধ নগরে তুষারঝড়

নিষিদ্ধ পল্লীর কথা আমরা জানি। নিষিদ্ধ পল্লী—Red Light Area। যেখানে নিশিকন্যারা থাকেন। নগরের আনন্দপ্রেমীরা গোপনে ভিড় করেন। নিষিদ্ধ নগরী কী?

নিষিদ্ধ নগরী হলো—Forbidden City। চায়নিজ ভাষায় গু গং (Gu Gong)। বেইজিংয়ের ঠিক মাঝখানে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা মিং এবং জিং (Ging) সম্রাটদের প্রাসাদ। বিশাল এক নগর। প্রজারা কখনো কোনোদিনও এই নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনই কঠিন নিয়ম। এই নগর প্রজাদের জন্যে নিষিদ্ধ বলেই নগরীর নাম 'নিষিদ্ধ নগরী'।

নগরীতে প্রাসাদ সংখ্যা কত ? আট শ'। প্রাসাদে ঘরের সংখ্যা আট হাজারের বেশি।

এই নগরীর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৪০৬ সনে। দুই লক্ষ শ্রমিক ১৪ বৎসর অমানুষিক পরিশ্রম করে নির্মাণ শেষ করে। এই নগরীর কঠিন পাঁচিল এমন করে বানানো হয় যেন কামানের গোলা কিছুই করতে না পারে। সম্রাটরা ধরেই নিয়েছিলেন, তাঁদের কঠিন দেয়াল ভেঙে কেউ কোনোদিন ঢুকতে পারবে না। হায়রে নিয়তি! ব্রিটিশ সৈন্যরা ১৮৬০ সনে নিষিদ্ধ নগরী দখল করে নেয়। হতভম্ব সম্রাট শুধু তাকিয়ে থাকেন।

নিষিদ্ধ নগরীর শেষ সম্রাটের নাম পু ই (Pu Yi)। ১৯১২ সনে তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হয়। শেষ হয় নিষিদ্ধ নগরীব কাল। শেষ সম্রাটকে নিয়ে যে ছবিটি বানানো হয়, The Last Emperor, সেটা হয়তো অনেকেই দেখেছেন। না দেখে থাকলে দেখতে বলব, কারণ ছবিটি চীন সরকারের অনুমতি নিয়ে নিষিদ্ধ নগরীর ভেতরেই শুট করা হয়। প্রথম নিষিদ্ধ নগরীর ভেতর ৩৫ মিমি ক্যামেরা ঢোকে।

রাজা-বাদশাদের বিলাসী জীবন কেমন ছিল তা দেখার আগ্রহ আমি কখনো বোধ করি নি। সব বিলাসের একই চিত্র। সোনা, রুপা, মণি মাণিক্য। হাজার হাজার রক্ষিতা। পান এবং ভোজন। এর বাইরে কী ?

কারও গান-বাজনার শখ থাকে, কেউবা ছবি আঁকেন, এইখানেই শেষ। সম্রাটদের সমস্ত মেধার সমাপ্তি নারী এবং সুরায়।

প্রথমবার নিষিদ্ধ নগরীতে ঢুকে আমার মন খারাপ হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, চীনের হতদরিদ্র মানুষদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে আছে। রক্ষিতারা যেখানে থাকত সেখানে গেলাম। একসঙ্গে তিন হাজার রক্ষিতার থাকার ব্যবস্থা। প্রত্যেকের জন্যে পায়রার খুপড়ির মতো খুপড়িঘর। কী বিভৎস তাদের জীবন! ইচ্ছে হলে কোনো-একদিন কিছুক্ষণের জন্যে এদের একজনকে সম্রাট ডেকে নেবেন। কিংবা নেবেন না। উপহার হিসেবে পাঠাবেন ভিনদেশের রাজা-মহারাজাদের কাছে।

মোঘল সম্রাটরা বেশ কয়েকবার চীন সম্রাটদের কাছ থেকে রূপবতী চৈনিক মেয়ে উপহার পেয়েছেন।

এইসব রূপবতীদের সংগ্রহ করত রাজপুরুষরা। কোনো-এক চাষীর ঘরে ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। মেয়ে বড় হয়েছে। বাবা-মা'কে ছেড়ে তাকে চিরদিনের জন্যে চলে যেতে হচ্ছে নিষিদ্ধ নগবীব উঁচু পাঁচিলের ভেতর।

সেবারে সম্রাটদের সুরাপাত্র এবং পিকদান দেখেছিলাম। সুরাপাত্র স্বর্ণের থাকবে এটা ধরে নেওয়া যায়—থুথু ফেলার সব পাত্রও সোনার হতে হবে ? মণি মাণিক্য খচিত হতে হবে ? সম্রাটের থুথু এতই মূল্যবান ?

যাই হোক, ভ্রমণ প্রসঙ্গে যাই। আমি দলবল নিয়ে নিষিদ্ধ নগরীতে ঢুকলাম। ছোট্ট বক্তৃতা দিলাম—অনেক মিউজিয়াম আছে। তোমরা দেখতে পার। দেখার কিছু নেই।

কোন সোনার পাত্রে রাজা থুথু ফেলতেন, কোন হীরা মণি মাণিক্যের টাট্টিখানায় হাগু করতেন তা দেখে কী হবে? তা ছাড়া খুব বেশি জিনিসপত্র এখানে নেই।

অনেক কিছু লুট করে নিয়ে গেছে ব্রিটিশরা। তারা ব্রিটিশ মিউজিয়াম সাজিয়েছে। দ্বিতীয় দফায় লুট করা হয়েছে (১৯৪৭) চিয়াং কাই শেকের নির্দেশে। তিনি সব নিয়ে গেছেন তাইওয়ানে। সেখানকার ন্যাশনাল প্যালেস মিউজিয়ামের বেশির ভাগ জিনিসপত্রই নিষিদ্ধ নগরীর।

সম্রাটদের প্রাসাদ দেখেও কেউ কোনো মজা পাবে না। সব একরকম। কোনো বৈচিত্র্য নেই। দোচালা ঘরের মতো ঘর। একটার পর একটা। ঢেউয়ের মতো।

আমার নেগেটিভ কথা সফরসঙ্গীদের উপর বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলল না। তারা সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, একী! কী দেখছি! এত বিশাল! এত সুন্দর! এটা না দেখলে জীবন বৃথা হতো।

পরম করুণাময় আমার সফরসঙ্গীদের উচ্ছ্বাস হয়তো পছন্দ করলেন না। তিনি ঠিক করলেন তাঁর তৈরি সৌন্দর্য দেখাবেন। হঠাৎ শুরু হলো তুষারপাত। ধবধবে সাদা তুষার ঝিলমিল করতে করতে নামছে। যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোছনার ফুল। যেন চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে নেমে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো নিষিদ্ধ নগর বরফের চাদরে ঢেকে গেল। আমি তাকিয়ে দেখি, চ্যালেঞ্জার এবং চ্যালেঞ্জার-পত্নী কাঁদছে। আমি বললাম, কাঁদছ কেন?

চ্যালেঞ্জার বলল, বাচ্চা দুটাকে রেখে এসেছি। এত সুন্দর দৃশ্য তারা দেখতে পারল না, এই দুঃখে কাঁদছি। স্যার, আমি এই দৃশ্য আর দেখব না। হোটেলে ফিরে যাব।

শাওন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বললাম, ক্যামেরাটা দাও, ছবি তুলে দেই। সে বলল, এই দৃশ্যের ছবি আমি তুলব না। ক্যামেরায় কোনোদিন এই দৃশ্য ধরা যাবে না।

অবাক হয়ে দেখি তার চোখেও পানি। সে আমাকে চাপা গলায় বলল, এমন অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য তোমার কারণে দেখতে পেলাম। আমি সারা জীবন এটা মনে রাখব।

মেয়েরা আবেগতাড়িত হয়ে অনেক ভুল কথা বলে। আমার কারণে যে-সব খারাপ অবস্থায় সে পড়েছে সেসবই তার মনে থাকবে, সুখস্মৃতি থাকবে না। মেয়েরা কোনো এক জটিল কারণে দুঃখস্মৃতি লালন করতে ভালোবাসে।

অন্য সফরসঙ্গীদের কথা বলি। মাজহার তুষারপাতের ছবি নানান ভঙ্গিমায় তুলতে গিয়ে পিচ্ছিল বরফে আছাড় খেয়ে পড়েছে। তার দামি ক্যামেরার এইখানেই ইতি। কমলের কাছে মাজহার হলো গুরুদেব। গুরুদেব আছাড় খেয়েছেন, সে এখনো খায় নি—এটা কেমন কথা! গুরুদেবের অসম্মান। কমল তার মেয়ে আরিয়ানাসহ গুরুদেবের সামনেই ইচ্ছা করে আছাড় খেয়ে লম্বা হয়ে পড়ে রইল।

চীন ভ্রমণ শেষে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছ কী দেখে? গ্রেটওয়াল? ফরবিডেন সিটি, টেম্পেল অব হেভেন, সামার প্যালেস?

সবাই বলল, নিষিদ্ধ নগরে তুষারপাত।

তুষারসন্ধ্যা নিয়ে লেখা রবার্ট ফ্রস্টের প্রিয় কবিতাটি মনে পড়ে গেল।

STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

দীর্ঘতম কবরখানা

পৃথিবীর দীর্ঘতম কবরখানার দৈর্ঘ্য কত ? পনের শ' মাইল। আরও লম্বা ছিল—তিন হাজার নয় শ' চুরাশি মাইল। বর্তমানে অবশিষ্ট আছে পনের শ' মাইল। চায়নার বিখ্যাত গ্রেটওয়ালের কথা বলছি। এই অর্থহীন দেয়াল তৈরি করতে এক লক্ষের উপর শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে। দেয়াল না বলে কবরখানা বলাই কি যুক্তিযুক্ত না!

অর্থহীন দেয়াল বলছি, কারণ যে উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিল, মোঙ্গলদের হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা, সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। মোঙ্গলরা এবং মাঞ্চুরিয়ার দুর্ধর্ষ গোত্র বারবারই দেয়াল অতিক্রম করেছে।

গ্রেটওয়াল বিষয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছি। পবিত্র কোরআন শরিফের একটি সূরা আছে—সূরা কাহাফ। কাহাফের তাষ্য অনুযায়ী অনেকে মনে করেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এই প্রাচীর নির্মাণ করেন।

ওরা বলল, 'হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে
অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা এই শর্তে কর দেব যে, তুমি আমাদের
এবং ওদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবে।' (১৮; ৯৪)

জুলকারনাইন স্থানীয় অধিবাসীদের শ্রমেই প্রাচীর তৈরি করে দেন।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যে আমাদের নবিদের একজন, এই তথ্য কি পাঠকরা জানেন? জুলকারনাইন হলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

চীনের ইতিহাস বলে মোট পাঁচ দফায় প্রাচীর তৈরি হয়। প্রথম শুরু হয় জিন ডায়ানেস্টির আমলে (Qin Dynasty), যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ২০৮ বছর আগে। বর্তমানে যে প্রাচীর আছে তা তৈরি হয় সম্রাট হংথু (মিং ডায়ানেস্টি, ১৩৬৮ সন)-এর শাসনকালে। শেষ করেন সম্রাট ওয়ানলি (মিং ডায়ানেস্টি, ১৬৪০)।

প্রাচীরের গড় উচ্চতা ২৫ ফিট। তিন লক্ষ শ্রমিকের তিন শ' বছরের অর্থহীন শ্রম। কোনো মানে হয়? কোনো মানে হয় না। মানব সম্পদের এই অপচয় সম্রাটরাই করতে পারেন। রাজা-বাদশাদের কাছে সাধারণ মানুষের জীবন সব সময়ই মূল্যহীন ছিল।

আমরা আজ যাব দীর্ঘতম কবরখানা দেখতে। চীনের পরিচয় চীনের দেয়াল। সেই দেয়াল দেখা সহজ বিষয় না। আমার সফরসঙ্গীদের আনন্দ-উত্তেজনায় টগবগ করার কথা। তারা কেমন যেন ঝিমিয়ে আছে। গা-ছাড়া ভাব। কারণটা ধরতে পারলাম না।

একপর্যায়ে মাজহার কাঁচুমাচু হয়ে বলল, গ্রেটওয়াল দেখার প্রোগ্রামটা আরেকদিন করলে কেমন হয়!

আমি বললাম, আজ অসুবিধা কী?

কোনো অসুবিধা নেই। গতকাল ফরবিডেন সিটি দেখে সবাই টায়ার্ড। আজকে বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হতো। মেয়েরা বিশেষ করে কাহিল হয়ে পড়েছে। নড়াচড়াই করতে পারছে না।

আমি বললাম, মেয়েরা যেহেতু ক্লান্ত তারা অবশ্যই বিশ্রাম করবে। গ্রেটওয়াল পালিয়ে যাচ্ছে না।

মাজহারের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। একই সঙ্গে মেয়েদের মুখেও হাসি। একজন বলে ফেলল, দেরি করে লাভ নেই, চলো রওনা দেই।

আমি বললাম, তোমাদের না রেস্ট নেবার কথা, যাচ্ছ কোথায়?

মেয়েদের মুখপাত্র হিসেবে মাজহার বলল, সিল্ক মার্কেটে টুকটাক মার্কেটিং করবে। মেয়েদের মার্কেটিং মানেই বিশ্রাম।

মেয়েরা বিপুল উৎসাহে বিশ্রাম করতে বের হলো। দুপুর দু'টা পর্যন্ত এই দোকান থেকে সেই দোকান, দোতলা থেকে সাততলা, সাততলা থেকে তিনতলা, তিনতলা থেকে আবার ছয়তলা করে বিশ্রাম করল। প্রত্যেকের হাতভর্তি নানান সাইজের ব্যাগ। দুপুরে দশ মিনিটের মধ্যে লাঞ্চ শেষ করে আবার বিশ্রামপর্ব শুরু হলো।

সিল্ক মার্কেটের যত আবর্জনা আছে, তার বেশির ভাগ আমরা কিনে ফেললাম। মেয়েরা দরদাম করতে পারছে এতেই খুশি। কী কিনছে এটা জরুরি না। আমি একবার ক্ষীণ স্বরে বললাম, যা কিনছ সবই ঢাকায় পাওয়া যায়। সবাই আমার কথা শুনে এমনভাবে তাকাল যেন এত অদ্ভুত কথা কখনো তারা শোনে নি।

আমি ক্লান্ত, বিরক্ত এবং হতাশ। রাত দশটার আগে কারও বিশ্রাম শেষ হবে এমন মনে হলো না। বিশ্রামপর্ব দশটায় শেষ হবে, কারণ সিল্ক রোড বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ মেয়েদের কেনাকাটা দেখলাম। এর মধ্যে এরা কিছু চায়নিজও শিখে নিয়েছে। দোকানি বলছে, ইয়ি বাই। তারা বলছে, উয়ু। জিজ্ঞেস করে জানলাম 'ইয়ি বাই' হলো এক শ', আর 'উয়ু' হলো পাঁচ। মেয়েদের বিদেশি ভাষা শেখার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়ে নিজের মনে কিছুক্ষণ ঘুরলাম। একদিকে শিল্পীদের মেলা বসেছে। একজন হাতের বুড়ো আঙুলে চায়নিজ ইংক লাগিয়ে নিমিষের মধ্যে অতি অপূর্ব ছবি বানাচ্ছেন। আমার আগ্রহ দেখে তিনি আমার আঙুলে কালি লাগিয়ে কাগজ এগিয়ে দিলেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছু দাঁড়া করতে পারলাম না। শিল্পী যেমন আছে ভাস্করও আছে। সিল্ক মার্কেটের এক কোনায় দেখি এক চাইনিজ বুড়ো একদলা মাটি নিয়ে বসে আছে। দু শ' ইয়েনের বিনিময়ে সে মাটি দিয়ে অবিকল মূর্তি বানিয়ে দেবে। তার সামনে বিশ মিনিট বসলেই হবে। বিশ মিনিট বসে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবেই বসলাম। একজন ভাস্কর কীভাবে কাজ করে তা দেখার আগ্রহ তো আছেই।

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমাকে দেখে অতিদ্রুত মাটি ছানতে শুরু করল। কুড়ি মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা পার হলো। মূর্তি তৈরি। আমি বললাম, কিছু মনে কোরো না, মূর্তিটা আমার না। চায়নিজ কোনো মানুষের। মূর্তির চোখ পুতি পুতি। নাক দাবানো।

বুড়ো বলল, তোমার চেহারা তো পুরোপুরি চায়নিজদের মতো।

আমি বললাম, তাই নাকি?

বুড়ো বলল, অবশ্যই।

আশেপাশের সবাই বুড়োকে সমর্থন করল। আমিও নিশ্চিত হলাম আমার চেহারা চৈনিক। ইতিমধ্যে শাওন চলে এসেছে। তার কাছে ইয়েন যা ছিল সব শেষ। আমাকে যেতে হবে ডলার ভাঙাতে। সে বলল, তুমি চায়নিজ এক বুড়োর মূর্তি হাতে নিয়ে বসে আছ কেন?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, চায়নিজ বুড়ো তোমাকে কে বলল? এটা আমার নিজের ভাস্কর্য। উনি বানিয়েছেন। উনি একজন বিখ্যাত ভাস্কর।

কত নিয়েছে?

দু শ' ইয়েন।

আমাকে ডাকলে না কেন! আমি পঁচিশ ইয়েনে ব্যবস্থা করতাম।

বলেই সে দেরি করল না, দরাদরি শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবাক হয়ে দেখি, আমাদের মহান ভাস্কর ত্রিশ ইয়েনে শাওনের মূর্তি বানাতে রাজি হয়েছেন।

শাওন বলল, তুমি ডলার ভাঙিয়ে নিয়ে এসো, ততক্ষণ উনি আমার একটা মূর্তি বানাবেন। আমার খানিকক্ষণ রেস্টও হবে। পা ফুলে গেছে।

ডলার ভাঙিয়ে ফিরে এসে দেখি, মহান ভাস্কর চায়নিজ এক মেয়ের মূর্তি বানিয়ে বসে আছেন। শাওন খুশি। মূর্তির কারণে না। শাওন খুশি কারণ মহান ভাস্কর তার মোটা নাককে শাওনের অনুরোধে খাড়া করে দিয়েছেন। চেহারা চায়নিজ মেয়েদের মতো হলেও নাক তো খাড়া হয়েছে।

আমরা হোটেলে ফিরলাম রাত আটটায়। কে কী কিনল সব ডিসপ্লে করা হলো। সবার ধারণা হলো তারা যা কিনেছে সেটা ভালো না। অন্যদেরটা ভালো। মাজহারের মুখ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। 'একটু আসছি' বলে সে বের হয়ে গেল। ফিরল রাত দশটায়। শাওন কিছু মুখোশ কিনেছে, যেগুলি সে কিনে নি। মাজহার গিয়েছিল ওইগুলি কিনতে।

আমি ঠাট্টা করছি না, সারা দিনের বিশ্রামের কারণে সব মেয়ের পা ফুলে গেল। তারা ঠিক করল ফুট ম্যাসাজ করাবে। হোটেলের কাছেই বিশাল ম্যাসাজ পার্লার।

ম্যাসাজের বিষয়টা এবার দেখছি। এক যুগ আগে ম্যাসাজ পার্লার চোখে পড়ে নি। আধুনিক চীনের অনেক রূপান্তরের এটি একটি। আমাদের হোটেল থেকে ম্যাগডোনাল্ড রেস্টুরেন্টের দূরত্ব দশ মিনিটের হাঁটা পথ। এর মধ্যে চারটা ম্যাসাজ পার্লার। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, ম্যাসাজ পার্লারে ম্যাসাজ নিচ্ছে চায়নিজরাই। কঠিন পরিশ্রমী চৈনিক জাতি গা টেপাটেপির ভক্ত হয়ে পড়েছে। মাও সে তুং-এর মাথায় নিশ্চয়ই এই জিনিস ছিল না।

রাস্তায় প্রসটিটিউটরাও নেমেছে। রূপবতী কন্যারা বিশেষ এক ধরনের কালো পোশাক পরে নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘুরছে। কেউ তাদের নিয়ে বিব্রত বা চিন্তিত না। এমন একজনের পাল্লায় আমি নিজেও একদিন পড়েছিলাম। ঘটনাটা বলি, বাংলাদেশ অ্যাম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি আমাকে বইয়ের দোকানে নিয়ে যাচ্ছেন। দু'জন গল্প করতে করতে এগুচ্ছি, হঠাৎ কালো পোশাকের এক তরুণী এসে আমার হাত ধরল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। রূপবতী এক তরুণী। মায়া মায়া চেহারা। সে আদুরে গলায় বলল, আমাকে তুমি তোমার হোটেলে নিয়ে চলো। আমি ম্যাসাজ দেব। বলেই চোখে কুৎসিত ইশারা করল। এমন নোংরা ইশারা চোখে করা যায় আমার জানা ছিল না। আমি হতভম্ব।

মনিরুল হক ধমক দিয়ে মেয়েটিকে সরিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, বর্তমান চীনে এই বিষয়টা খুব বেড়েছে। আমি বললাম, পুলিশ কিছু বলে না? মনিরুল হক বললেন, না।

পার্ল এস বাকের গুড আর্থের চীন এবং বর্তমান চীন এক না। এই দেশ আরও অনেকদূর যাবে। ক্ষমতায় ও শক্তিতে পাল্লা দেবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। মানুষ বদলাবে, মূল্যবোধ বদলাবে। ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিলে আলো-হাওয়া যেমন ঢোকে—কিছু মশা-মাছিও ঢোকে। মহান চীন তার দরজা-জানালা খুলে দিয়েছে। আলো-হাওয়া এবং মশা-মাছি ঢুকছে।

মূল গল্পে ফিরে আসি। পরের দিন গ্রেটওয়াল দেখতে যাওয়ার কথা, যাওয়া হলো না, কারণ সফরসঙ্গীরা যে যার মতো মার্কেটে চলে গেছে। সবাই বলে গেছে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবে। তারা ফিরল সন্ধ্যায়। প্রত্যেকের হাতভর্তি ব্যাগ। মুখে বিজয়ীর হাসি।

শেষ পর্যন্ত গ্রেটওয়াল দেখা হলো। সেও এক ইতিহাস। ব্যবস্থা করল এক ট্যুর কোম্পানি। তারা গ্রেটওয়াল দেখাবে। ফাও হিসেবে আরও কিছু দেখাবে ফ্রি। জনপ্রতি ভাড়া এক শ' ডলার। সেখানেও দরাদরি। কী বিপদজনক দেশে এসে পৌঁছলাম! একেকবারে আমরা বলছি—'না, পোষাচ্ছে না।' বলে চলে আসার উপক্রম করতেই তারা বলে, 'একটু দাঁড়াও, ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে দেখি।' তারা চ্যাঁও চু করে কিছুক্ষণ কথা বলে, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'ম্যানজেমেন্ট আরও দু'ডলার করে কমাতে রাজি হয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত ১০০ ডলার ভাড়া কমিয়ে আমরা ত্রিশ ডলারে নিয়ে এলাম। বাচ্চাদের টিকিট লাগবে না। তারা ফ্রি। ট্যুর কোম্পানির রূপবতী অপারেটর নিচু গলায় বলল, তোমাদের যে এত সস্তায় নিয়ে যাচ্ছি খবরদার এটা যেন অন্য ট্যুরিস্টরা না জানে। জানলে কোম্পানি বিরাট বিপদে পড়ে যাবে।

ট্যুর কোম্পানির বাসে উঠার পরে জানলাম, ট্যুরিস্টরা যাচ্ছে বিশ ডলার করে। একমাত্র আমরা ত্রিশ ডলার। অস্ট্রেলিয়ার এক গাধা সাহেব-মেম শুধু এক শ' ডলার করে টিকিট কেটেছে। অস্ট্রেলিয়ার সেই গাধা দম্পতির সঙ্গে আমার ভালোই খাতির হয়েছিল। আমরা একসঙ্গে চায়নিজ হার্বাল চিকিৎসা নিয়েছি, সেই প্রসঙ্গে পরে আসব।

কোম্পানিব বাস সরাসরি আমাদের গ্রেটওয়ালে নিয়ে গেল না। জেড তৈরির এক কারখানায় এনে ছেড়ে দিল। যদি আমরা জেডের তৈরি কিছু কিনতে চাই। ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে জেড কারখানার বন্দোবস্ত করা আছে। ট্যুর কোম্পানি যাত্রীদের এনে এখানে ছেড়ে দেবে। কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য হবে। বিনিময়ে কমিশন।

পাঠকদের মধ্যে যারা আগ্রার তাজমহল দেখেছেন, তারা এই বিষয়টি জানেন। তাজমহল দর্শনার্থীরা সরাসরি তাজ দেখতে যেতে পারেন না। তাদেরকে মিনি তাজ বলে এক বস্তু প্রথমে দেখতে হয়। সেখানকার লোকজন সবাই কথাশিল্পী। তাদের কথার জালে মুগ্ধ হয়ে মিনি তাজ কিনতে হয়। সেই মিনি তাজ আজ পর্যন্ত কেউ অক্ষত অবস্থায় বাংলাদেশে আনতে পারেন নি। বর্ডার পার হওয়ার আগেই অবধারিতভাবে সেই তাজ ভেঙে কয়েক টুকরা হবেই।

জেড এম্পোরিয়াম থেকে কেনাকাটা শেষ করে বাসে উঠলাম, ভাবলাম এইবার বোধহয় গ্রেটওয়াল দেখা হবে। ঘণ্টাখানিক চলার পর বাস থামল আরেক দোকানে। এটা নাকি সরকার নিয়ন্ত্রিত মুক্তার কারখানা। ঝিনুক চাষ করা হয়। ঝিনুক থেকে মুক্তা বের করে পালিশ করা হয়—নানান কর্মকাণ্ড।

একজন মুক্তা বিশেষজ্ঞ সব ট্যুরিস্টকে একত্র করে মুক্তার উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিলেন। মুক্তার প্রকারভেদ, ঔজ্জ্বল্য, এইসব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করে তিনি ঘোষণা করলেন—এইবার আপনাদের সামনে আমি একটা ঝিনুক খুলব। আপনারা অনুমান করবেন ঝিনুকের ভেতর মুক্তার সংখ্যা কত। যার অনুমান সঠিক হবে তাকে আমাদের পক্ষ থেকে একটা মুক্তা উপহার দেওয়া হবে। এইখানেই শেষ না, আপনাদের ভেতর যেসব মহিলা ট্যুরিস্ট আছেন তাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা। সবচেয়ে রূপবতীকেও একটা মুক্তা উপহার দেওয়া হবে।

মেয়েদের মধ্যে টেনশন এবং উত্তেজনা। মেকাপ ঠিক করা দরকার। সেই সুযোগ কি আছে?

চায়নিজ ভদ্রলোক (চেহারা অবিকল অভিনেতা ব্রুসলীর মতো) বড় সাইজের একটা ঝিনুক তুলে আমাকেই প্রথম জিজ্ঞেস করলেন, বলো এর ভেতর ক'টা মুক্তা?

একটা ঝিনুকে একটাই মুক্তা থাকার কথা। এরকমই তো জানতাম। আমি বললাম, একটা।

সফরসঙ্গীরা আমাকে নানান বিষয়ে জ্ঞানী ভাবে। তারা মনে করল এটাই সত্যি উত্তর। প্রত্যেকেই বলল, একটা। শুধু বলেই ক্ষান্ত হলো না, জ্ঞানীর হাসিও হাসল। যে হাসির অর্থ—কী ধরা তো খেলে! এখন দাও সবাইকে একটা করে মুক্তা।

সফরসঙ্গীদের মধ্যে শুধু চ্যালেঞ্জার বলল, সতেরটা। চ্যালেঞ্জারের বোকামিতে আমরা সবাই যথেষ্ট বিরক্ত হলাম।

ঝিনুক খোলা হলো। ঝিনুক ভর্তি মুক্তা। মুক্তা গোনা হলো এবং দেখা গেল মুক্তার সংখ্যা ১৭। কাকতালীয় এই ঘটনার ব্যাখ্যা আমি জানি না। আমি আমার একজীবনে অনেক কাকতালীয় ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। এটি তার একটি। চ্যালেঞ্জারকে একটা বড়সড় মুক্তা দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জারের চোখে পানি। তার চোখের অশ্রু গ্ল্যান্ডে মনে হয় কোনো সমস্যা আছে, সে কারণে এবং সম্পূর্ণ অকারণে চোখ থেকে এক দেড় লিটার পানি ফেলতে পারে।

শ্রেষ্ঠ রূপবতীর পুরস্কার পেল শাওন। সে এমন এক ভঙ্গি করল যেন শেষ মুহূর্তে সে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় রানার্সআপকে পরাজিত করে সোনার মুকুট জিতে নিয়েছে।

কমল তার স্ত্রীর উপর খুব রাগ করল, ধমক দিয়ে বলল, কোথাও বেড়াতে গেলে সাজগোজ করে বের হবে না? ঢাকা থেকে তো দুনিয়ার সাজের জিনিস নিয়ে এসেছ, এখন ঘুরছ ফকিরনীর মতো।

মুক্তা বিষয়ক জটিলতা শেষ করে বাস ছুটছে গ্রেটওয়ালের দিকে। একসময় থামল। আমরা কৌতূহলী হয়ে তাকালাম। কোথায় গ্রেটওয়াল? চায়নিজ হার্বাল মেডিসিনের বিশাল দালান। হার্বাল বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে নাকি হার্বাল মেডিসিনের কিংবদন্তি ডাক্তারেরা আমাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করবেন। শুধু ওষুধপত্র নগদ ডলারে কিংবা ক্রেডিট কার্ডে কিনতে হবে।

ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বাংলাদেশের কয়েকজন গবেট

ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বাস থেমেছে, আমরা হইচই করে নামছি। ওম্নি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা ছুটে এলেন। চাপা গলায় নিখুঁত ইংরেজিতে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। ক্লাস চলছে, অধ্যাপকেরা গবেষণা করছেন। হইচই চলবে না। পিনপাতনিক নৈঃশব্দ্য বজায় রাখতে হবে।

আমরা গেলাম ঘাবড়ে। মায়েরা নিজেদের বাচ্চাদের মুখ চেপে ধরলেন। এ-কী ঝামেলা! রওনা হয়েছি গ্রেট ওয়াল দেখতে, এ কোন চক্করে এসে পড়লাম?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা আমাদের হলঘরের মতো ঘরে দাঁড় করিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। হলঘরের চারপাশে নানান ধরনের ভেষজ গাছ। প্রতিটির গায়ে চায়নিজ নাম, বোটানিকেল নাম। দু'টি গাছ চিনলাম। একটি আমাদের অতিপরিচিত ঘৃতকুমারী, অন্যটা জিনসেং, যৌবন ধরে রাখার ওষুধ। দেয়ালে বিশালাকৃতির ছবি। একটিতে মাও

সে তুং ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন। অন্য একটিতে World Health Organization-এর প্রধানের সঙ্গে হাসি হাসি মুখে কী যেন আলোচনা করছেন। বিদেশি যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভেষজবিদ্যা শিখতে এসেছে তাদের ছবিও আছে।

হলঘরের এক প্রান্তে অতি বৃদ্ধ এক চায়নিজের মর্মর পাথরের মূর্তি। ভারতবর্ষের ভেষজবিজ্ঞানের জনক যেমন মহর্ষি চরক, এই চায়নিজ বৃদ্ধও (নাম মনে নেই) চৈনিক ভেষজবিজ্ঞানের জনক। সফরসঙ্গীরা চৈনিক ভেষজবিজ্ঞানীর সামনে নানান ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। আমি ভাবছি কখন এই চক্কর থেকে উদ্ধার পাব।

মিনিট পাঁচেক পার হলো, এক অতি স্মার্ট তরুণী ঢুকল। সে পোশাকে স্মার্ট। ইংরেজি কথা বলায় স্মার্ট। পুরো চীন ভ্রমণে আমার দেখা মতো সবচেয়ে স্মার্ট তরুণী। সে আমাদেব একটি সুসংবাদ দিল।

সুসংবাদটা হচ্ছে, ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাজ্ঞানী চিকিৎসকরা বিনামূল্যে আমাদের শরীরের অবস্থা দেখতে রাজি হয়েছেন। আমরা যে অতি দূরদেশ থেকে এখানে এসেছি, ভেষজ চিকিৎসা সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছি, তার কারণেই আমাদের প্রতি এই দয়া।

আমরা কৃতজ্ঞতায় ছোট হয়ে গেলাম এবং ভেষজ চিকিৎসকদের মহানুভবতায় হলাম মুগ্ধ ও বিস্মিত।

আমাদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। স্মার্ট তরুণী ব্যাখ্যা করলেন আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র, বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক কী করে আমাদের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে। ভেষজবিজ্ঞানই আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা। তিনি জানালেন, তিনজন চিকিৎসক একসঙ্গে ঘরে ঢুকবেন। তাঁরা কেউ চৈনিক ভাষা ছাড়া কিছুই জানেন না। সবার সঙ্গে একজন করে ইন্টারপ্রেটার থাকবে।

মহান চিকিৎসকরা আমাদের মল-মূত্র-কফ কিছুই পরীক্ষা করবেন না। নাড়ি দেখে সব বলে দেবেন।

আমরা আবারও অভিভূত।

নাড়ি দেখে রোগ নির্ণয় বিষয়ে তারাশংকরের বিখ্যাত উপন্যাস আছে—*আরোগ্য নিকেতন*। সেই উপন্যাসের আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ নাড়ি দেখে মৃত্যুব্যাধি ধরতে পারতেন। আমার ভেতর রোমাঞ্চ হলো এই ভেবে যে, উপন্যাসের একটি চরিত্র বাস্তবে দেখব।

স্মার্ট তরুণী বললেন, মহান ভেষজবিদদের সম্বন্ধে শেষ কথা বলে বিদায় নিচ্ছি। আধুনিক ডাক্তাররা নাড়ি ধরে শুধু Pulse beat শোনে। আমাদের মহান শিক্ষাগুরুরা নাড়ি ধরেই হার্ট, লিভার, কিডনি ও রক্ত সঞ্চালন ধরেন। প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এই হলো মহত্ত্ব। এই বিদ্যা হারিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয় তা পুনরুদ্ধার করেছে। আপনারা কি এই আনন্দ সংবাদে হাততালি দিবেন?

আমরা মহা উৎসাহে হাততালি দিলাম।

স্মার্ট তরুণী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমাদের মহান চিকিৎসকরা প্রবেশ করছেন, আপনারা যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে আচরণ করবেন, এই আমাব বিনীত অনুরোধ।

দরবারে মহারাজার প্রবেশের মতো দুই বৃদ্ধ এক বৃদ্ধা প্রবেশ করলেন। দেখেই মনে হচ্ছে—তাঁদের জীবন থেকে রস কষ নিঃশেষ হযে গেছে। চোখে মুখে ক্লান্তি ও হতাশা।

আমরা সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলাম। তাঁরা তিনজনই বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

স্মার্ট তরুণী বললেন, আপনারা তিনজন করে আসুন। আপনাদের কী অসুখ কিছুই বলতে হবে না। উনারা নাড়ি ধরে সব জানবেন।

প্রথমে গেলাম আমি, মাজহার এবং কমল। তিনজনেরই বুক ধড়ফড় করছে—না জানি কী ব্যাধি ধরা পড়ে।

বৃদ্ধ ভেষজ মহাজ্ঞানী অনেকক্ষণ আমার নাড়ি ধরে ঝিম ধরে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, হার্টের অসুখ।

আমি তাঁর ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে ঘনঘন কয়েকবার হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

তিনি বললেন, আগে আমাদের কাছে এলে বুক কেটে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হতো না।

আমি আরও মুগ্ধ। এই জ্ঞানবৃদ্ধ নাড়ি ধরে জেনে ফেলেছেন যে, আমার বাইপাস হয়েছে। কী আশ্চর্য!

তোমার রক্ত দূষিত। সব রক্ত নষ্ট হয়ে গেছে। রক্ত ঠিক করতে হবে।

আপনি দয়া করে ঠিক করে দিন।

স্নায়ুতন্ত্রেও সমস্যা। রক্তের সঙ্গে স্নায়ুও ঠিক করতে হবে।

দয়া করে স্নায়ুও ঠিক করে দিন।

আমি প্রেসক্রিপশন দিচ্ছি। ছ'মাস ওষুধ খেতে হবে। তোমার সমস্যা মূল থেকে দূর করা হবে।

ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ওষুধগুলি ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রাগ স্টোর ছাড়া কোথাও পাবে না। তোমার ভদ্রতা এবং ভেষজবিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস আমাকে মুগ্ধ করেছে বিধায় তুমি বিশেষ কমিশনে ওষুধগুলি পাবে। দামটা দিবে ডলারে। ডলার না থাকলে ক্রেডিট কার্ড।

আমি উনার হাতে ক্রেডিট কার্ড তুলে দিলাম। একবার মনে হলো পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলি।

উনার কাছ থেকে বের হয়ে আমি দলের অন্যদের মুগ্ধ গলায় মহান ভেষজবিজ্ঞানীর নাড়িজ্ঞানের কথা বললাম। কী করে নাড়িতে হাত দিয়েই তিনি আমার বাইপাসের কথা বলে ফেললেন সেই গল্প।

শাওন বলল, তোমার যে বাইপাস হয়েছে এটা বলার জন্যে কোনো ভেষজবিজ্ঞানী লাগে না। যে-কেউ বলতে পারে।

আমি বললাম, কীভাবে ?

তোমার বুক যে কাটা এটা শার্টের কলারের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যে হাতে নাড়ি ধরা হয়েছে সেই হাতও কাটা। হাত কেটে রগ নেয়া হয়েছে।

আমি থমকে গেলাম। শাওন বলল, তুমি কি ওষুধ কেনার জন্যে টাকা-পয়সা দিয়েছ ?

আমি মিনমিন করে বললাম, হ্যাঁ।

কত দিয়েছ ?

কত এখনো জানি না, ক্রেডিট কার্ড নিয়ে গেছে।

শাওন বলল, কী সর্বনাশ!

আমি বিড়বিড় করে বললাম, সর্বনাশ তো বটেই।

মাজহারের সঙ্গে ডাক্তারের কথাবার্তা এখন তুলে দিচ্ছি।

ডাক্তার : হুঁ হুঁ। তোমার কিডনি প্রায় শেষ। এখন রক্ষা না করলে আর রক্ষা হবে না।

মাজহার : বলেন কী!

ডাক্তার : তোমাব মাথায় চুল যে নেই তার কারণ কিডনি।

মাজহার : আপনার মাথায়ও তো কোনো চুল নেই। আপনারও কি কিডনি সমস্যা ?

ডাক্তার : (চুপ)

মাজহার : আপনি আপনার নিজের কিডনির চিকিৎসা কেন করছেন না ?

ডাক্তার : তোমার যা দেখার দেখেছি—Next যে তাকে পাঠাও।

মাজহারের নির্বুদ্ধিতার অনেক গল্প আছে। তার বুদ্ধিমত্তার এই গল্পটি আমি অনেকের সঙ্গেই আগ্রহের সঙ্গে করি।

কমলের বেলাতেও দেখা গেল তার রক্ত দূষিত। লিভার অকার্যকর, স্নায়ুতন্ত্রে ঝিমুনি। কমল জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়ল। সে বলল, আমি যে গাড়িতে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ি, এখন তার কারণ বুঝলাম। আমার স্নায়ুতন্ত্রেই ঝিমুনি।

আমি ছাড়া পুরো দলের কেউ এক ডলারের ওষুধও কিনল না। কমল কিনতে চাচ্ছিল, মাজহারের ধমকে চুপ করে গেল। আমি চার শ' ডলারের ওষুধ কিনলাম। অস্ট্রেলিয়ান গাধাটারও নাকি কমলের মতো সমস্যা—রক্ত দূষিত, লিভার অকার্যকর, স্নায়ুতন্ত্রে ঝিমুনি। সে কিনল এক হাজার ডলারের ওষুধ। ছয় মাসের সাপ্লাই।

চার শ' ডলারের ওষুধের এক পুরিয়াও আমি খাই নি। নিজের বোকামির নিদর্শন হিসেবে জমা করে রেখে দিয়েছি।

ভেষজ বৃক্ষ নিয়ে আমার নিজের যথেষ্টই উৎসাহ আছে। নুহাশপল্লীতে যে ভেষজ উদ্যান তৈরি করেছি তাতে ২৪০ প্রজাতির গাছ আছে। তারপরেও বলছি, এই শতকে এসে পুরনো গাছগাছড়ায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা হাস্যকর। গাছগাছড়া থেকেই আমরা আধুনিক ওষুধে এসেছি। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিজ্ঞান। শত

শত বৎসরের সাধনায় এই বিজ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। এখান থেকে আরও অনেকদূর যাবে। একে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস কারোই থাকা উচিত নয়।

প্রাচীন চৈনিক ভেষজবিজ্ঞান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। সম্রাটরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন নিজেদের স্বার্থে। তাঁরা চেয়েছেন অমরতা, ভোগ করার ক্ষমতা। প্রাচীন ভেষজবিজ্ঞান সম্রাটদেব অমরত্বের ওষুধ দিতে পারে নি। চিরস্থায়ী যৌবনের ওষুধও দিতে পারে নি। আমার ধারণা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কোনো একদিন পারবে।

চেঙ্গিজ খাঁ'র সঙ্গে চীন দেশীয় চারজন ভেষজবিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার বিষয়ক একটি গল্প বলি।

চেঙ্গিজ খাঁ বৃদ্ধ এবং অশক্ত। মৃত্যুভীতি ঢুকে গেছে। তিনি মৃত্যু নিবারক ওষুধ চান। অর্থ যা প্রয়োজন তারচেয়েও বেশি দেওয়া হবে, ওষুধ চাই। বার্ধক্য রোধ করতে পারে, এমন ওষুধ কি পাওয়া যাবে?

চেঙ্গিজ খাঁ বললেন, পারবেন আপনারা বানিয়ে দিতে?

চারজনের মধ্যে তিনজনই বললেন, অবশ্যই পারব। বিশেষ বিশেষ লতাগুল্ম আছে। সময় লাগবে। একেক গুল্ম একেক সময়ে জন্মায়। তবে পারব। না-পারার কিছু নেই।

শুধু একজন বললেন, জরা ও মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। একে কিছুতেই আটকানো যাবে না।

চেঙ্গিজ খাঁ সেই চিকিৎসককে বললেন, ধন্যবাদ। বাকি তিনজনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

ভালো কথা, আমরা যে তিনজনের পাল্লায় পড়েছিলাম তারা কোন দলের?

পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। চার শ' ডলারের ওষুধের বস্তা হাতে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি এবার সত্যি সত্যি গ্রেটওয়ালের কাছে এনে রাখল।

সবার মনে আনন্দ। শুধু আমার এবং কমলের মন ভালো না। কমলের মন ভালো নেই, কারণ মাজহারের চোখ রাঙানির কারণে তার চিকিৎসা হয় নি। আমার মন ভালো নেই, কারণ আমার চিকিৎসা হয়েছে।

সফরসঙ্গীরা হৈ হৈ করে গ্রেটওয়ালে ছোটাছুটি করছে। তাদের ক্যামেরা বিরামহীনভাবে ক্লিক ক্লিক করছে। গ্রেটওয়াল না, গ্রেটওয়ালের পাশে তাদের কেমন দেখাচ্ছে এটা নিয়েই তারা চিন্তিত।

সবাইকেই অন্যরকম লাগছিল। দিন শেষের সূর্যের আলো পড়েছে তাদের মুখে। বিশাল গ্রেটওয়াল দিগন্তে মিশে আছে, মনে হচ্ছে বিশাল এক নদী। দৃশ্যটা একই সঙ্গে সুন্দর এবং মন খারাপ করিয়ে দেওয়ার মতো।

গ্রেটওয়ালের এক কোনায় দেখি, দানবের মতো সাইজের এক মঙ্গোলিয়ান ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার মালিক ইয়েনের বিনিময়ে দর্শনার্থীদের ঘোড়ায় চড়াচ্ছেন।

গ্রেটওয়াল দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছি ঘোড়া দেখে তেমন মুগ্ধ হলাম। যেন পাথরের তৈরি ভাস্কর্য। নিঃশ্বাসও ফেলছে না এমন অবস্থা। আমি এক ঘণ্টার চুক্তি করে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। কমল ছুটে এসে বলল, এ-কী হুমায়ূন ভাই, ঘোড়ায় বসে আছেন কেন?

আমি বললাম, ঘোড়া আমার অতি পছন্দের একটি প্রাণী। নুহাশপল্লীতে আমার দু'টা ঘোড়া ছিল।

সে বলল, সবাই গ্রেটওয়ালে ছোটাছুটি করছে, আর আপনি ঝিম ধরে ঘোড়ায় বসে আছেন, এটা কেমন কথা?

আমি নামলাম না। বসেই রইলাম। দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যখন ছুটে যেত তখন তাদের কেমন লাগত ভাবতে চেষ্টা করলাম।

পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে। মোঙ্গলরা নেই, তাদের ভগ্নস্বপ্ন পড়ে আছে।

ট্যুরিস্টের চোখে

ট্যুরিস্টদের দেশ ভ্রমণের কিছু নিয়ম আছে। তারা প্রতিটি দর্শনীয় জায়গায় যাবে। যা দেখবে তাতেই মুগ্ধ হবে। মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই, পয়সা উসুল করার ব্যাপার আছে। মুগ্ধ হওয়া মানে পয়সা উসুল হওয়া।

প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে তারা কতক্ষণ থাকবে তারও নিয়ম আছে। ক্যামেরায় যতক্ষণ ফিল্ম আছে ততক্ষণ। ফিল্ম শেষ হওয়া মানে দেখা শেষ। আজকাল ডিজিটাল ক্যামেরা বের হয়ে নতুন যন্ত্রণা হয়েছে। এইসব ক্যামেরায় ফিল্ম লাগে না। যত ইচ্ছা ক্যামেরায় ক্লিক ক্লিক করে যাও।

আমরা বেইজিংয়ের দর্শনীয় স্থান সবই দেখে ফেললাম।

গ্রীষ্ম প্রাসাদ (Summer Palace)

UNESCO ১৯৯৮ সনে সামার প্যালেসকে World Heritage-এর লিস্টে স্থান দিয়েছে। গ্রীষ্ম প্রাসাদ দেখে সবাই মুগ্ধ। মুগ্ধ হওয়ারই কথা। সম্রাটরা রাজকোষ ঢেলে দিয়েছেন নিজের গ্রীষ্ম প্রাসাদ বানাতে। সম্রাটরা গরমে কষ্ট করবেন তা কী করে হয়? গরমের সময় Kuming Lake-এর সুশীতল হাওয়া ভেসে আসে। কী শান্তি!

বিকেলে সম্রাট বা সম্রাট-পত্নীর লেকের পাশে হাঁটতে ইচ্ছা হতে পারে। তার জন্যে তৈরি হলো হাঁটার পথ Long Corridor. অর্থের কী বিপুল অর্থহীন অপচয়! সম্রাট-পত্নী লেকের হাওয়া খাবেন। সহজ ব্যাপার না। সম্রাট-পত্নীর কথা লিখলাম, কারণ গ্রীষ্ম প্রাসাদ সম্রাট-পত্নী Dawager Cixi'র শখ মেটানোর জন্যে ১৮৬০ সনে বানানো হয়।

পাঠকরা কি অনুমান কবতে পারবেন গ্রীষ্ম প্রাসাদের মূল অংশ কোনটা? মূল অংশ দীর্ঘজীবী তবন। যেখানে সম্রাট এবং সম্রাট-পত্নীর দীর্ঘজীবনের জন্য মন্ত্র পাঠ করতে

হয়। দীর্ঘদিন বেঁচে না থাকলে কে ভোগ করবে ? সম্রাটদের জীবনের মূলমন্ত্র তো একটাই—ভোগ।

গ্রীষ্ম প্রাসাদে আমার কাছে ভালো লেগেছে মার্বেলের বজরা। অতি দামি মার্বেলে বিশাল এক বজরা বানিয়ে পানিতে ভাসানোর বুদ্ধি কার মাথায় এসেছিল—এটা এখন আর জানা যাবে না। যার মাথায় এসেছিল, তার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতেই হয়।

আগেই বলেছি আমরা বেড়াতে গেছি শীতকালে। কিউমিং লেকের পুরোটাই তখন জমে বরফ। দেখে মনে হবে বরফের জমাট সমুদ্র। সেখানে ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে দৌড়াচ্ছে। শাওনের শখ হলো বরফের উপর হাঁটবে। সে বলল, আমি জীবনে এই প্রথম লেক জমে বরফ হতে দেখলাম। এর উপর হাঁটব না! তাকে আটকালাম। সে বরফের লেকে নামলেই অন্যসব মেয়েরা নামবে। তাদের সঙ্গে বাচ্চারা নামবে এবং অবধারিতভাবে আছাড় খেয়ে কেউ-না-কেউ কোমর ভাঙবে। শাওন ও স্বর্ণা দু'জনই সন্তানসম্ভবা। তাদের পেটের সন্তানরা মায়ের আছাড় খাওয়াকে ভালোভাবে নেবে—এরকম মনে করার কারণ নেই।

এদিকে অমিয় খুবই যন্ত্রণা শুরু করেছে। বানরের মতো বাবার গলা ধরে ঝুলে আছে তো আছেই। গলা ছাড়ছে না। উদ্ভট উদ্ভট আবদারও করছে। তার আবদারে আমরা সবাই মহাবিরক্ত, শুধু মাজহার খুশি। তার ধারণা এতে ছেলের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাচ্ছে। অমিয়'র উদ্ভট আবদারের নমুনা দেই—পাথরের বজরা দেখে সে ঘোষণা করল, এই বজরায় চড়ে সে ঘুরবে। কাজটা এক্ষুনি করতে হবে।

মাজহার আনন্দিত গলায় আমাকে বলল, ছেলের বুদ্ধি দেখেছেন হুমায়ূন ভাই! পুরা বজরা পাথরের তৈরি, অথচ ছেলে দেখামাত্র বুঝে ফেলেছে এটা পানিতে ভাসে।

এক চায়নিজ শিশু আমাদের দেশের হাওয়াই মিঠাই টাইপ একটা খাবার খেতে খেতে যাচ্ছিল। হঠাৎ অমিয় ছোঁ মেরে তার হাত থেকে এটা নিয়ে নিজে খেতে শুরু করল। আমরা সবাই বিব্রত, শুধু মাজহারের মুখে গর্বের হাসি। মাজহার আমাকে বলল, আমার ছেলের অধিকার আদায়ের চেষ্টাটা দেখে ভালো লাগছে। সাহসী ছেলে। অন্য একজন খাচ্ছে, আমি কেন খাব না! এটাই তার Spirit। মাশাল্লাহ।

আমাদের দলে দু'টা শিশু। অতি দুষ্ট অমিয়, অতি শিষ্ট আরিয়ানা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পুরো চায়না ট্রিপে দেখেছি চায়নিজ তরুণীরা অমিয়কে নিয়ে মহাব্যস্ত। তারা আরিয়ানার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। কত মেয়েই না ছোঁ মেরে অমিয়কে কোলে তুলল! কত না আদর! চকলেট গিফট লজেন্স গিফট। অথচ পাশেই পরী শিশুর মতো আরিয়ানা মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে।

মূল বিষয়টা পুরুষ সন্তানের প্রতি চায়নিজদের গভীর প্রীতি। আধুনিক চায়নায় একটির বেশি সন্তান নেওয়া যাবে না। আইন কঠিন। সেই একটি সন্তান সবাই চায় পুত্র। কন্যা নয়। যাদের ভাগ্যে কন্যা জোটে, তারা কপাল চাপড়ায় এবং অন্যের পুত্রসন্তানদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। দুঃখজনক পরিস্থিতি! এই পরিস্থিতি আরও খারাপের

দিকে যাচ্ছে। আলট্রাসনোগ্রাফির কারণে গর্ভবতী মায়েরা আগেই জেনে যাচ্ছেন সন্তান ছেলে না মেয়ে। যখনই জানছেন মেয়ে, গর্ভ নষ্ট করে ফেলছেন। পরের বার যদি পুত্র হয় তখন দেখা যাবে।

গর্ত নষ্ট বিষয়ে কঠিন আইনকানুন না হলে এক সন্তানের দেশ মহান চীন আগামী এক শ' বছরে নারীশূন্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

স্বর্গমন্দির (Temple of Heaven)

চীনা সম্রাটরা নিজেদের স্বর্গের পুত্র ভাবতেন। ধুলোমাটির পৃথিবীতে তাদের আসতে হয়েছে 'প্রজা' নামক একটা শ্রেণীর দেখভালের জন্যে। স্বর্গের পুত্ররা প্রার্থনা করবেন, সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে না এটা কেমন কথা ?

স্বর্গমন্দিরে ভালো ফসল যেন হয় তার জন্যে প্রার্থনা করা হতো। সমস্যা হচ্ছে, স্বর্গপুত্র প্রার্থনা করছেন তারপরও প্রার্থনা গ্রাহ্য হচ্ছে না, ফসল নষ্ট হচ্ছে, দুর্তিক্ষ হচ্ছে, এটা কেমন কথা!

স্বর্গপুত্রদের কাছে এই কঠিন প্রশ্নেরও উত্তর আছে। প্রার্থনায় কোনো একটা ক্রটি হয়েছে। নিয়মকানুন ঠিকমতো মানা হয় নি।

১৯৯৮ সালে UNESCO স্বর্গমন্দিরকে World Heritage-এর আওতায় নিয়ে আসে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, পাঠকরা কি জানেন বাংলাদেশের একটা জায়গা UNESCO'র World Heritage-এর লিস্টে আছে ? যাঁরা জানেন তারা তো জানেনই। যারা জানেন না তাদের জন্যে এটা একটা কুইজ।

হঠাৎ বাংলাদেশের প্রসঙ্গ কেন নিয়ে এলাম ? স্বর্গমন্দির, মিং রাজার কবরখানা নিয়ে ভালো লাগছে না। একটা দেখলেই সব দেখা হয়ে গেল। সব প্রাসাদের একই ডিজাইন। একটাই বিশেষত্ব, তার বিশালত্ব। সম্রাটরা কখনো ছোট কোনো চিন্তা করতে পারেন না। আমার প্রাসাদ হবে সবচেয়ে বড়। দেখে যেন সবার পিলে চমকে যায়। চীনের ডায়ানেস্টিরা পিলে চমকানোর ব্যবস্থাই করেছেন। এর বেশি কিছু না।

রাজা-বাদশার ভোগ বিলাসের আয়োজন দেখে আমি মুগ্ধ হই না, এক ধরনের বিতৃষ্ণা অনুভব করি। এক যুগ আগে যখন চীনে প্রথম এসেছিলাম, তখন মিং সম্রাটের বালিশের মিউজিয়াম দেখেছিলাম। ঘুমুবার সময় তাঁর কয়টা বালিশ লাগত তার সংগ্রহ। এর মধ্যে পিরিচের সাইজের দু'টা গোলাকার বালিশ দেখে প্রশ্ন করেছিলাম—এই বালিশ দু'টা কেন ?

গাইড বলল, সম্রাটের কানের লতি রাখার বালিশ।

আমি মনে মনে বললাম, মাশাল্লাহ। সম্রাটের কানের লতির গতি হোক। আমি এর মধ্যে নেই।

শিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যাও

আমাদের নবী (স.)-র কথা। একজন মওলানা আমাকে বলেছিলেন—এই শিক্ষা ধর্ম শিক্ষা। অন্য কোনো শিক্ষা না। মাওলানাকে বলতে পারি নি যে, চীনে ইসলাম ধর্ম গিয়েছে নবীজির মৃত্যুর পর। ধর্ম শিক্ষার জন্যে চীনে যেতে হলে অন্য কোনো ধর্ম শিক্ষার জন্য যেতে হয়।

যাই হোক, প্রথমবার চীনে গিয়ে একটা মসজিদে গিয়েছিলাম। মসজিদের ভিজিটার্স বুক আছে। ভিজিটার্স বুকে নাম সই করতে গিয়ে দেখি, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবও এই মসজিদ দেখেছেন এবং সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছেন।

মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁর দু'টা নাম—একটা চায়নিজ নাম, অন্যটা মুসলমান নাম। যখন নামাজ পড়ান বা ধর্মকর্ম করেন, তখন চায়নিজ নাম ব্যবহার করেন।

ইসলাম ধর্মে জীবজন্তুর ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার অনুমতি নেই। কিন্তু চায়নিজ মসজিদের দেয়ালে এবং মসজিদেব মাথায় ড্রাগন থাকবেই। চায়নিজ মুসলমানদের এই বিষয়ে ছাড় দেওয়া হয়েছে কি না জানি না।

নবীজি শিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যেতে বলেছিলেন। আমার ধারণা দূরত্ব বোঝানোর জন্যে তিনি চীনের নাম করেছেন। তবে আক্ষরিক অর্থে বলে থাকলেও চীনের উল্লেখ ঠিক আছে।

প্রাচীন চীন ছিল উদ্ভাবনের স্বর্গভূমি। কম্পাস চীনের আবিষ্কার। বারুদ, কাগজ, ছাপাখানা।

যখন এই লেখা লিখছি, তখন বিশ্বকাপ নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে। কেউ কি জানে ফুটবল চীনাদের আবিষ্কার? মিং ডায়নাস্টির সম্রাট টাইজু ফুটবল খেলছেন—এরকম একটি তৈলচিত্র আছে। ফুটবলের তখন নাম ছিল কু জু (Ku ju) অর্থ Kick ball.

আরও দুঃসংবাদ আছে। গলফও চাইনিজদের আবিষ্কার করা খেলা। গলফের নাম Chui Wan (মারের লাঠি), চুই ওয়ান খেলার আরেক নাম বু ডা (bu da)। এর অর্থ হাঁটো এবং পেটাও।

এক হাজার বছর আগে চায়নিজ কবি ওয়াং জিয়ানের (টেং ডায়ানেস্টি) কবিতায় বু ডা খেলার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আধুনিককালের গলফ।

দাবা চায়নিজদের আবিষ্কার করা খেলা। ভারতীয়রাও অবশ্যি এই খেলা আবিষ্কারের দাবিদার।

প্রথম ক্যালকুলেটার চায়নিজদের। নাম অ্যাবাকাস। হট এয়ার বেলুন, প্যারাসুট চায়নিজদের কীর্তি।

অঙ্কে ডেসিমেল সিস্টেম এখন সারা পৃথিবীতেই ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় বাইনারি সিস্টেম। ডেসিমেল সিস্টেম এখন ডাল-ভাত, অথচ মানবজাতিকে দশভিত্তিক এই অঙ্কে আসতে শত বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

নিওলিথিক সময়ে (৬০০০ বছর আগে) এই ডেসিমেল সিস্টেম চায়নিজরা জানত এবং ব্যবহার করত। সাংহাই শহরে মাটি খুঁড়ে পাওয়া পটারিতে ১০, ২০, ৩০ এবং ৪০ সংখ্যার চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা সেই সময়ের মানুষের ডেসিমেল সিস্টেমের জ্ঞানের কথাই বলে।

সংখ্যা	চিহ্ন
১০	I
২০	U
৩০	W
৪০	W'

সিসমোগ্রাফ কাদের আবিষ্কার? চায়নিজদের, আবার কার! এই আবিষ্কার করা হয় Han dynasty-র সময়ে।

এবার আসি ধাতুবিদ্যায়।

আকর থেকে লোহা এবং লোহা থেকে ইস্পাত চায়নিজদের আবিষ্কাব। তামা এবং পরে ব্রোঞ্জও তাদের।

মাটির নিচ থেকে পেট্রোলিয়াম বের করা এবং ব্যবহার করার পদ্ধতিও তাদের আবিষ্কার। তারাই প্রথম খনি থেকে কয়লা তোলা শুরু করে।

ও, সিল্কের কথা তো বলা হলো না। সিল্ক চায়নিজদের। চা চায়নিজদের। চা শব্দটাও কিন্তু চায়নিজ। চিনিও চাইনিজদের।

আমি আমার এই লেখার শিরোনাম দিয়েছি 'মহান চীন'। চীনকে মহান চীন বলছি চীনাদের এই আশ্চর্য উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্যে। চীন একটি বিশাল দেশ এইজন্যে না। চীনে গ্রেটওয়াল আছে এইজন্যেও না।

আমি লেখক মানুষ। বই ছাপা হয়। যে কাগজে লিখছি সেই কাগজ চায়নিজদের আবিষ্কার। যে ছাপাখানায় বই ছাপা হয়, সেই ছাপাখানাও তাদের আবিষ্কার। চীনকে মহান চীন না বলে উপায় আছে!

চীনে গিয়েছিলাম রাইটার্স ব্লক কাটাতে। সেই ব্লক কীভাবে কাটল সেটা বলে চীন ভ্রমণের উপর এলোমেলো ধরনের লেখাটা শেষ করি।

চীন ভ্রমণের শেষদিনের কথা। সবাই আনন্দ-উল্লাসে ঝলমল করছে। আজ শেষ মার্কেটিং। যে জিনিস আজ কেনা হবে না সেটা আর কোনোদিনও কেনা হবে না। ভোর আটটা বাজার আগেই সবাই তৈরি। আমি হঠাৎ বেঁকে বসলাম। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, আজ আমি কোথাও যাব না। (আমার একটা বইয়ের নাম।)

শাওন বলল, যাবে না মানে?

আমি বললাম, যাব না মানে যাব না।

কেন?

আমার ইচ্ছা।

কী করবে ? সারা দিন হোটেলে বসে থাকবে ?

হ্যাঁ।

তুমি হোটেলে বসে থাকার জন্যে এত টাকা খরচ করে চীনে এসেছ ?

হ্যাঁ।

তুমি কি জানো, তুমি না গেলে তোমার সফরসঙ্গীরা কেউ যাবে না ? সবাই যার যার ঘরে বসে থাকবে।

কেউ ঘরে বসে থাকবে না। সবাই যাবে। দুই শ' ডলার বাজি।

আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই যাবে। কিন্তু মন খারাপ করে যাবে। তুমি শেষ দিনে সবার মন খারাপ করিয়ে দিতে চাও ?

মাঝে মাঝে মন খারাপ হওয়া ভালো। এতে লিভার ফাংশন ঠিক থাকে।

তুমি না গেলে আমিও যাব না।

তুমি থাকতে পারবে না। হোটেলে আমি একা থাকব।

শাওনের গলা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। তার দিকে তাকালেই চোখের পানি দেখা যাবে। আমি আবার চোখের পানির কাছে অসহায়। কাজেই তার দিকে না তাকিয়ে চোখ-মুখ কঠিন করে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি ব্যাগ খুলে কাগজ-কলম বের করলাম। লিখতে শুরু করলাম। আমার রাইটার্স ব্লক কেটে গেছে। কলমের মাথায় বৃষ্টিধারার মতো শব্দের পর শব্দ আসছে। কী আনন্দ! কী আনন্দ! একসময় চোখে পানি এসে গেল। কিছুক্ষণ লেখার পর পাতা ঝাপসা হয়ে যায়। চোখ মুছে লিখতে শুরু করি।

কতক্ষণ লিখেছি জানি না। একসময় বিস্মিত হয়ে দেখি, শাওন আমার পেছনে। সে কি হোটেল থেকে যায় নি? সারাক্ষণ কি হোটেল ঘরেই ছিল ? আমার কিছুই মনে নেই।

আমি লজ্জিত গলায় বললাম, হ্যালো।

সে বলল, তোমার রাইটার্স ব্লক কেটে গেছে, তাই না ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

সে বলল, আমি কী সুন্দর দৃশ্যই না দেখলাম! একজন লেখক কাঁদছে আর লিখছে। কাঁদছে আর লিখছে।

খুব সুন্দর দৃশ্য ?

আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য।

আমি বললাম, নিষিদ্ধ নগরীতে তুষারপাতের চেয়েও সুন্দর ?

এক শ' গুণ সুন্দর।

আমি অবাক হয়ে দেখি, তার চোখেও অশ্রু টলমল করছে।

চীন ভ্রমণে আমার অর্জন একজন মুগ্ধ তরুণীর আবেগ ভালোবাসার শুদ্ধতম অশ্রু। মিং রাজাদের ভাগ্যে কখনো কি এই অশ্রু জুটেছে ? আমার মনে হয় না।

প্রিয় পদরেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স তখন মাত্র আঠার। 'ভগ্নহৃদয়' নামে তাঁর একটি কবিতা ছাপা হয়েছে *ভারতী* পত্রিকায়।

ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের হৃদয় তখন সত্যিকার অর্থেই ভগ্ন। তাঁর স্ত্রী মহারাণী ভানুমতি মারা গেছেন। তিনি ভগ্নহৃদয় নিয়েই রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' পড়লেন। পড়ে অভিভূত হলেন। একজন রাজদূত (রাধারমন ঘোষ) পাঠালেন কিশোর কবির কাছে। রাজদূত অতীব বিনয়ের সঙ্গে জানালেন, ত্রিপুরার মহারাজা আপনাকে 'কবিশ্রেষ্ঠ' বলেছেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। [জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ]

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য প্রতিভা চিনতে ভুল করেন নি। রবীন্দ্রনাথও বন্ধু চিনতে ভুল করেন নি। তিনি গভীর আগ্রহ এবং গভীর আনন্দ নিয়ে বারবার ত্রিপুরা গিয়েছেন। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য এবং তাঁর পুত্র রাধাকিশোরমাণিক্যের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কত না গান লিখেছেন ত্রিপুরায় বসে। যার একটি গানের সঙ্গে আমার বাল্যস্মৃতি জড়িত। আগে গানের কথাগুলি লিখি, তারপর বাল্যস্মৃতি।

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে ॥
    দিল তারে বনবীথি,
    কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে ॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
    বাণী মম নিল তুলি
    পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে ॥

রচনা : আগরতলা, ১২ই ফাল্গুন ১৩৩২
সূত্র : রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা, বিকচ চৌধুরী

এখন এই গান-বিষয়ক আমার বাল্যস্মৃতির কথা বলি। আমরা তখন থাকি চট্টগ্রামের নালাপাড়ায়। পড়ি ক্লাস সিক্সে। আমার ছোটবোন সুফিয়াকে একজন গানের শিক্ষক গান শেখান। এই গানটি দিয়ে তার শুরু। আমার নিজের গান শেখার খুব শখ। গানের টিচার চলে যাওয়ার পর আমি তালিম নেই আমার বোনের কাছে। সে আমাকে শিখিয়ে দিল হারমোনিয়ামের কোন রিডের পর কোন রিড চাপতে হবে। আমি যখন তখন যথেষ্ট আবেগের সঙ্গেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাই—'ফাগুনের নবীন আনন্দে'।

একবার গান গাইছি, গানের শিক্ষক হঠাৎ উপস্থিত। আমার হারমোনিয়াম বাজানো এবং গান গাওয়া দেখে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, খোকা শোনো! তোমার গলায় সুর নেই। কানেও সুর নেই। রবীন্দ্রনাথের গান বেসুরে গাওয়া যায় না। তুমি আর কখনো হারমোনিয়ামে হাত দেবে না। অভিমানে আমার চোখে পানি এসে গেল।

আমি সেই শিক্ষকের আদেশ বাকি জীবন মেনে চলেছি। হারমোনিয়ামে হাত দেই নি। এখন বাসায় প্রায়ই শাওন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে। যন্ত্রটা হাত দিয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ধরি না। বালক বয়সের অভিমান হয়তো এখনো কাজ করে। তবে বাল্য-কৈশোর ও যৌবন পার হয়ে এসেছি বলেই হয়তো অভিমানের 'পাওয়ার' কিছুটা কমেছে। এখন ভাবছি কোনো-একদিন গায়িকা শাওনকে বলব—তুমি আমাকে 'ফাগুনের নবীন আনন্দে' গানটা কীভাবে গাইতে হবে শিখিয়ে দেবে?

যে ত্রিপুরা রবীন্দ্রনাথকে এত আকর্ষণ করেছে সেই ত্রিপুরা কেমন, দেখা উচিত না? রবীন্দ্রনাথের পদরেখা আমার প্রিয় পদরেখা। সেই পদরেখা অনুসরণ করব না? প্রায়ই ত্রিপুরা যেতে ইচ্ছা করে, যাওয়া হয় না, কারণ একটাই, ভ্রমণে আমার অনীহা। ঘরকুনো স্বভাব। আমার ঘরের কোনায় আনন্দ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *প্রথম আলো* উপন্যাস পড়ে ত্রিপুরা যাওয়ার ইচ্ছা আবারও প্রবল হলো। উপন্যাসের শুরুই হয়েছে ত্রিপুরা মহারাজার পুণ্যাহ উৎসবের বর্ণনায়। এমন সুন্দর বর্ণনা! চোখের সামনে সব ভেসে ওঠে।

একবার ত্রিপুরা যাওয়ার সব ব্যবস্থা করার পরেও শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিলাম। কেন করলাম এখন মনে নেই, তবে হঠাৎ করে ত্রিপুরা যাওয়ার সিদ্ধান্ত কেন নিলাম সেটা মনে আছে। এক সকালের কথা, নুহাশপল্লীর বাগানে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল। অবাক হয়ে দেখি, নীলমণি গাছে থোকায় থোকায় ফুল ফুটেছে। অর্কিডের মতো ফুল। হালকা নীল রঙ। যেন গাছের পাতায় জোছনা নেমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত, যেতে হবে ত্রিপুরা। কারণ নীলমণি লতা গাছ রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখেন ত্রিপুরায় মালঞ্চ নামের বাড়িতে। মালঞ্চ বাড়িটি রাজপরিবার রবীন্দ্রনাথকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। বাড়ির চারদিকে নানান গাছ। একটা লতানো গাছে অদ্ভুত ফুল ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথ গাছের নাম জানতে চান। স্থানীয় যে নাম তাঁকে বলা হয় তা তাঁর পছন্দ হয় না। তিনি গাছটার নাম দেন 'নীলমণি লতা'।

আমি আমার বন্ধুদের কাছে ত্রিপুরা যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করলাম। তারা একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলল। বিরাট এক বাহিনী সঙ্গে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।

আমরা অবশ্যি যাচ্ছি বাসে। সরকারি বাস। সরকার ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস চালু করেছেন। আরামদায়ক বিশাল বাস। এসির ঠান্ডা হাওয়া। সিটগুলি প্লেনের সিটের মতো নামিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া যায়।

বাস আমাদের নিয়ে রওনা হয়েছে। বাংলাদেশ দেখতে দেখতে যাচ্ছি। কী সুন্দরই না লাগছে! যাত্রী বলতে আমরাই। বাইরের কেউ নেই। কাজেই গল্পগুজব হইচইয়ে বাধা নেই। দলের মধ্যে দুই শিশু। মাজহার-পুত্র এবং কমল-কন্যা। এই দুজন গলার সমস্ত জোর দিয়ে ক্রমাগত চিৎকার করছে। শিশুদের বাবা-মা'র কানে এই চিৎকার মধুবর্ষণ করলেও আমি অতিষ্ঠ। আমার চেয়ে তিনগুণ অতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন। সে একবার আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, মাজহারের এই বান্দর ছেলেটাকে থাপ্পড় দিয়ে চুপ করানো যায় না?

আমি বললাম, যায়। কিন্তু থাপ্পড়টা দেবে কে?

আমার নিয়মিত সফরসঙ্গীদের সঙ্গে এবারই প্রথম মিলন যুক্ত হয়েছে। আরেকজন আছেন, আমার অনেক দিনের বন্ধু প্রতীক প্রকাশনীর মালিক আলমগীর রহমান। তাঁর বিশাল বপু। বাসের দুটা সিট নিয়ে বসার পরেও তাঁর স্থান সংকুলান হচ্ছে না।

আলমগীর রহমান দেশের বাইরে যেতে একেবারেই পছন্দ করেন না। একটা ব্যতিক্রম আছে—নেপাল। তাঁর বিদেশ ভ্রমণ মানেই প্লেনে করে কাঠমাণ্ডু চলে যাওয়া। নিজের শরীর পর্বতের মতো বলেই হয়তো পাহাড়-পর্বত দেখতে তাঁর ভালো লাগে। তিনি আগরতলা যাচ্ছেন ভ্রমণের জন্যে না। কাজে। আগরতলায় বইমেলা হচ্ছে। সেখানে তাঁর স্টল আছে।

বাস যতই দেশের সীমানার কাছাকাছি যেতে লাগল ভ্রমণ ততই মজাদার হতে লাগল। রাস্তা সরু। সেই সরু রাস্তা কখনো কারও বাড়ির আঙিনার উপর দিয়ে যাচ্ছে। কখনোবা বৈঠকখানা ও মূলবাড়ির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়কর ব্যাপার! রাস্তাঘাট না বানিয়েই আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু করে দেওয়া একমাত্র বাংলাদেশের মতো বিস্ময়-রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

শুভেচ্ছা স্বাগতম

বাস বাংলাদেশ-ত্রিপুরার সীমান্তে থেমেছে। আমরা বাস থেকে নেমেছি এবং বিস্ময়ে খাবি খাচ্ছি। আমাদের আগমন নিয়ে ব্যানার শোভা পাচ্ছে। বিশাল বিশাল ব্যানার। আগরতলা

থেকে কবি এবং লেখকেরা ফুলের মালা নিয়ে এতদূর চলে এসেছেন। ক্যামেরার ফ্লাশলাইট জ্বলছে। ক্রমাগত ছবি উঠছে। সীমান্তের চেকপোস্টে বিশাল উৎসব।

অন্যদের কথা জানি না, আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। প্রিয় পদরেখার সন্ধানে এসে এত ভালোবাসার মুখোমুখি হব কে ভেবেছে! ফর্সা লম্বা অতি সুপুরুষ একজন, অনেক দিন অদর্শনের পর দেখা এমন তঙ্গিতে, আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন। কিছুতেই ছাড়ছেন না। ভদ্রলোকের নাম রাতুল দেববর্মন। তিনি একজন কবি। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের বংশধর। কিংবদন্তি গায়ক শচীন দেববর্মন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁকে আমি এই প্রথম দেখছি।

সীমান্তের চেকপোস্টে আরও অনেকেই এসেছিলেন, সবার নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন *দৈনিক ত্রিপুরা দর্পণ* পত্রিকার সম্পাদক সমীরণ রায়, পদ্মা-গোমতী আগরতলা-র সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস তলাপাত্র, আগরতলা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দাশ, অধ্যাপক কাশীনাথ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। শুভেচ্ছার বাণী নিয়ে এগিয়ে নিতে আসা এইসব আন্তরিক মানুষ আমাদের ফিরে যাওয়ার দিনও এক কাণ্ড করলেন। তাঁরা গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, আপনারা আজ যেতে পারবেন না। আমরা আপনাদের আরও কিছুদিন রাখব।

তখন আমরা পুঁটলাপুঁটলি নিয়ে বাসে উঠে বসেছি। এক্ষুনি বাস ছাড়বে।

তাঁরা বললেন, আমরা বাসের সামনে শুয়ে থাকব, দেখি আপনারা কীভাবে যান!

ট্যুরিস্ট, না লেখক ?

কবি-লেখকদের সম্মিলিত হইচইয়ের ভেতর পড়ব এমন চিন্তা আমার মনেও ছিল না। আমার কল্পনায় ছিল বন্ধুবান্ধব নিয়ে ট্যুরিস্টের চোখে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়ভূমি দেখব। সেটা সম্ভব হলো না। আমাকে নিয়ে তাঁদের আগ্রহ দেখেও কিছুটা বিব্রত এবং বিচলিত বোধ করলাম। এত পরিচিতি ত্রিপুরায় আমার থাকার কথা না। বাংলাদেশের গল্প-উপন্যাস ত্রিপুরায় খুব যে পাওয়া যায় তাও না। টিভি চ্যানেলগুলি দেখা যায়। আমার পরিচিতির সেটা কি একটা কারণ হতে পারে ? অনেক বছর ধরে *দেশ* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লিখি, সেটা কি একটা কারণ ? হিসাব মিলাতে পারছি না।

প্রথম রাতেই যেতে হলো বইমেলায়। ভেবেছিলাম ছোট্ট ঘরোয়া ধরনের বইমেলা। গিয়ে দেখি হুলস্থূল আয়োজন। বিশাল জায়গা নিয়ে উৎসব মুখরিত অঙ্গন। দেখেই মন ভালো হয়ে গেল। প্রতিটি দোকান সাজানো, সুশৃঙ্খল দর্শকের সারি। মেলার বাইরে বড় বড় ব্যানারে কবি-লেখকদের রচনার উদ্ধৃতি। বাংলাদেশের কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা দেখে খুবই ভালো লাগল। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র তাঁর উদ্ধৃতিই স্থান পেয়েছে।

কবি গুণ আমার পছন্দের মানুষ। আমি তাঁর কবিতার চেয়েও গদ্যের ভক্ত। আমার ধারণা তাঁর জন্ম হয়েছিল গদ্যকার হিসেবে। অল্প বয়সেই চুল-দাড়ি লম্বা করে ফেলায় কবি হয়েছেন। যতই দিন যাচ্ছে নির্মলেন্দু গুণের চেহারা যে রবীন্দ্রনাথের মতো হয়ে যাচ্ছে—এই ব্যাপারটা কি আপনারা লক্ষ করছেন ? খুবই চিন্তার বিষয়।

আমি মেলায় ঘুরছি, আগরতলার লেখকেরা গভীর আগ্রহে আমাকে তাঁদের লেখা বইপত্র উপহার দিচ্ছেন। নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগছে। কারণ এই যে গাদাখানিক বই নিয়ে দেশে যাব, আমি কি বইগুলি পড়ার সময় পাব? বই এমন বিষয় তেতর থেকে আগ্রহ তৈরি না হলে পড়া যায় না। জোর করে বই পড়া অতি কষ্টকর ব্যাপার। আমি বই পড়ি আনন্দের জন্যে। যে বইয়ের প্রথম পাঁচটি পাতা আমাকে আনন্দ দিতে পারে না, সেই বই আমি পড়ি না।

আগরতলার লেখকদের যে সব বই পেলাম, তার সিংহভাগ কবিতার। বাঙলা ভাষাভাষিরা কবিতা লিখতে এবং কবিতার বই প্রকাশ করতে পছন্দ করেন। প্রতিবছর ঢাকায় জাতীয় কবিতা সম্মেলন হয়। এই উপলক্ষে কত কবিতার বই যে বের হয়! শুনেছি গত কবিতা সম্মেলনে বাংলাদেশের পাঁচ হাজার কবি রেজিস্ট্রেশন করেছেন। কবির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই ব্যবস্থা। নাম রেজিস্ট্রি করে রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিতে হয়।

কবিতা প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ। কবিরা আমার উপর রাগ করতে পারেন। একটাই ভরসা, এই রচনা কোনো কবি পাঠ করবেন না। কবিরা গদ্য পাঠ করেন না।

উদয়পুর

বইমেলার সামনে বড়সড় একটা বাস দাঁড়িয়ে। এই বাসে করে আমরা যাব ত্রিপুরা থেকে সত্তুর কিলোমিটার দূরে উদয়পুর। বাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন *ত্রিপুরা দর্পণ* পত্রিকার সম্পাদক সমীরন বাবু। আমাদের সঙ্গে গাইড হিসেবে যাচ্ছেন কবি রাতুল দেববর্মণ। আনন্দ এবং উত্তেজনায় তিনি স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতেও পারছেন না। ক্রমাগত সিট বদলাচ্ছেন।

বাস ছাড়বে ছাড়বে করছে—এই সময় রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর দিলীপ চক্রবর্তী উপস্থিত হলেন। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। অতি সুদর্শন মানুষ। গায়ের রঙ সাহেবদের মতো গৌর। তিনি যখন জানলেন, বাংলাদেশ থেকে লেখকদের দল যাচ্ছে উদয়পুর—তিনি লাফ দিয়ে বাসে উঠে পড়লেন। আমাদের সফরের বাকি দিনগুলি তিনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। নিজের ঘরসংসার বাদ।

আমরা আগ্রহ নিয়ে উদয়পুরের ভুবনেশ্বর মন্দিব দেখতে গেলাম। এই মন্দিরে নরবলি হতো। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' লিখলেন এই মন্দির দেখে। পরে রাজর্ষিকে নিয়ে বিখ্যাত 'বিসর্জন' নাটকটি লেখা হলো। সবাই আগ্রহ নিয়ে ভুবনেশ্বর মন্দির দেখছে। ছবি তুলছে। আমি খটকা নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পড়ে আমি যতটুকু জানি—'রাজর্ষি' লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় যান নি। অনেক পরে গেছেন। 'রাজর্ষি'র কাহিনি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন স্বপ্নে। তিনি ফিরছেন দেওঘর থেকে। সারা রাত ঘুম হয় নি। হঠাৎ ঝিমুনির মতো হলো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> কোন্‌-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবা এ কী! এ-যে রক্ত!' বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার

> প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরও আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম। [জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ]

ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শনের পর গেলাম ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দেখতে। আমি ছোটখাটো মন্দির দেখে আনন্দ পাচ্ছিলাম না। ভারতবর্ষ মন্দিরের দেশ। এমন সব মন্দির সারা ভারতে ছড়ানো যা দেখতে পাওয়া বিরাট অভিজ্ঞতা। সেই তুলনায় উদয়পুরের মন্দিরগুলি তেমন কিছু না।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের একটা বিষয় আমার সফরসঙ্গীদের, বিশেষ করে মহিলাদের, খুব আকর্ষণ করল। সেখানে একটা বাচ্চার অন্নপ্রাশন উৎসব হচ্ছিল। বর্ণাঢ্য উৎসব। তারা উৎসবের সঙ্গে মিশে গেল। পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই আনন্দঘন্টা বাজাতে লাগল।

উৎসবের মধ্যেই জানা গেল, পাশেই ইচ্ছাপূরণ দিঘি বলে এক দিঘি। দিঘি ভর্তি মাছ। মাছকে খাবার খাওয়ালে তাদের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। মেয়েরা অন্নপ্রাশন উৎসব ছেড়ে রওনা হলো ইচ্ছাপূরণ দিঘির দিকে।

এই অঞ্চলেই নাকি ভারতবর্ষের সবচেয়ে ভালো প্যারা পাওয়া যায়। দু শ' বছর ধরে মিষ্টির কারিগররা এই প্যারা বানাচ্ছেন। আমি গেলাম প্যারা কিনতে। ভারতবর্ষের মন্দিরগুলির সঙ্গে প্যারার কি কোনো সম্পর্ক আছে? যেখানেই মন্দির সেখানেই প্যারা। দেবতাদের ভোগ হিসেবে মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। প্যারা কি দেবতাদের পছন্দের মিষ্টান্ন?

প্যারার একটা টুকরো ভেঙে মুখে দিলাম—যেমন গন্ধ তেমন স্বাদ। আমাদের মধ্যে প্যারা কেনার ধুম পড়ে গেল।

আমি কবি রাতুলকে প্রশ্ন করলাম, আপনার কি ধারণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানকার প্যারা খেয়েছেন?

রাতুল প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। আমার নিজের ধারণা খেয়েছেন। ভালো জিনিসের স্বাদ তিনি গ্রহণ করবেন না তা হয় না। যদিও তাঁর সমগ্র রচনায় তিনি শারীরিক আনন্দের বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। তাঁর রচনায় মানসিক আনন্দের বিষয়টিই প্রধান। শরীর গৌণ। তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মে যৌনতার বিষয়টি অনুপস্থিত বললেই হয়। হৈমন্তী গল্পে একবার লিখলেন—'তখন তাহার শরীর জাগিয়া উঠিল।' এই পর্যন্ত লিখেই চুপ। তাঁর কাছে দেহ মনের আশ্রয় ছাড়া কিছু না। নারীদেহের দিকে তাকালে পুরুষদের নানা সমস্যা হয়। রবীন্দ্রনাথের সমস্যা অন্যরকম—

> ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
> যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
> সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
> জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
>
> [স্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

কালো বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধিজীবীরা সাদা-কালো হন না। তাদের জীবিকা বুদ্ধি। বুদ্ধি বর্ণহীন। তবে আমাদের ভ্রমণের একজন প্রধান সঙ্গী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক শফি আহমেদকে আমি 'কালো বুদ্ধিজীবী' ডেকে আনন্দ পাই।

চিল আকাশে উড়ে, তার দৃষ্টি থাকে স্থলে। শফি আহমেদ বাংলাদেশে বাস করেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় পড়ে থাকে আগরতলায়। আগরতলার প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পাথর তিনি চেনেন। আগরতলা সম্পর্কে কেউ সামান্যতম মন্দ কথা বললে তিনি সার্টের হাতা গুটিয়ে মারতে যান।

এই সদানন্দ চিরকুমার মানুষটি আমাকে মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলার মহান ভূমিকার কথা কী সুন্দর করেই না বললেন! মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় থাকত, কোথায় ছিল ফিল্ড হাসপাতাল, সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

বেড়াতে গেলে আমি কখনো ইউনিভার্সিটি বা কলেজ দেখতে যাই না। কালো বুদ্ধিজীবী আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন আগরতলার এমবিবি কলেজে। কারণ কী? কারণ একটাই, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই কলেজের একটা ভূমিকা আছে। কলেজটা ছিল শরণার্থী শিবির। কাজেই আমাকে দেখতে হবে।

শুনতে পাচ্ছি শফি আহমেদ সাহেব বলেছেন মৃত্যুর পর তাঁর কবর যেন হয় আগরতলায়। শফি সাহেবের বন্ধুবান্ধবরা চিন্তিত। ডেডবডি নিয়ে এতদূর যাওয়া সহজ ব্যাপার না।

চখাচখি

আমাদের এবারের ভ্রমণ চখাচখি ভ্রমণ। সবাই জোড়ায় জোড়ায় এসেছে। দেশের বাইরে পা দিলে চখাচখি ভাবের বৃদ্ধি ঘটে। আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। স্ত্রীরা স্বামীদের নিয়ে নানান আহ্লাদী করছে। স্বামীরা প্রতিটি আহ্লাদীকে গুরুত্ব দিচ্ছে। খুবই চেষ্টা করছে প্রেমপূর্ণ নয়নে স্ত্রীর দিকে তাকাতে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে। মাজহার এবং কমল দু'জনকেই দেখলাম স্ত্রীর মুখে তুলে প্যারা খাওয়াচ্ছে। স্ত্রীরাও এমন ভাব করছে যেন সারা জীবন তারা এভাবেই মিষ্টি খেয়ে এসেছে। এটা নতুন কিছু না।

চখাচখিদের মধ্যমণি *অন্যদিন* পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আবদুল্লাহ্ নাসের এবং নাসের-পত্নী তামান্না। এটা তাদের হানিমুন ট্রিপ। কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে। তামান্নার হাতের মেহেদির দাগ তখনো ম্লান হয় নি।

আমরা কত না জায়গায় ঘুরলাম, কত কিছু দেখলাম, এই দু'জন কিছুই দেখল না। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল।

চখাচখি গ্রুপ থেকে বাদ পড়েছে মিলন ও আলমগীর রহমান। তারা স্ত্রীদের দেশে ফেলে গেছে। সবাই জোড়া বেঁধে ঘুরছে, মিলন-আলমগীরও জোড়া বেঁধে ঘুরছে। দু'জনের মুখই গম্ভীর। দু'জনই দু'জনের উপর মহাবিরক্ত। ভদ্রতার খাতিরে কেউ বিরক্তি প্রকাশ করতে পারছে না। মজার ব্যাপার।

সবচেয়ে আনন্দ লাগল আর্কিটেক্ট করিম এবং তার স্ত্রী স্নিগ্ধাকে দেখে। স্নিগ্ধা সারাক্ষণ স্বামীর হাত ধরে আছে। করিমের অতি সাধারণ রসিকতায় হেসে ভেঙে পড়ছে এবং রাগ করে বলছে, তুমি এত হাসাও কেন? ছিঃ! দুষ্টু!

করিমের গানের গলা ভালো। যে-কোনো বাংলা এবং হিন্দি গানের প্রথম চার লাইন সে শুদ্ধ সুরে গাইতে পারে। করিম তার এই ক্ষমতাও কাজে লাগাচ্ছে, স্নিগ্ধার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে গানে।

শাওন একসময় আমাকে বলল, দেখো করিম চাচা স্ত্রীকে নিয়ে কত আনন্দ করছেন, আর তুমি গম্ভীর হয়ে বসে আছ!

আমি করিমকে ডেকে বললাম, তুমি শাওনের অভিযোগের উত্তর গানে গানে দাও।

করিম সঙ্গে সঙ্গে গাইল—

সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা,
এ কি আর ভালো লাগে?

বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি, আগরতলার আনন্দময় ভ্রমণ শেষ করেই স্নিগ্ধা তার স্বামী এবং একমাত্র শিশুপুত্র রিসাদকে ফেলে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে।

জগতের সর্বপ্রাণী সুখী হোক।

নীরমহল

ত্রিপুরার মহারাজ (খুব সম্ভব মহারাজা বীরবিক্রম বাহাদুর) তাঁর স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে স্ত্রীর দেশের রাজপ্রাসাদের অনুকরণে বিশাল এক জলপ্রাসাদ বানিয়েছিলেন। জলপ্রাসাদ, কারণ প্রাসাদটা জলের মাঝখানে। দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির মাঝখানে এক রাজবাড়ি। নাম নীরমহল। জলে যার ছায়া পড়ে। যেমন কল্পনা তেমন রূপ। UNESCO মনে হয় এর খোঁজ এখনো পায় নি। খোঁজ পেলে World Heritage-এর আওতায় অবশ্যই নিয়ে আসত।

আমরা একটি আনন্দময় রাত কাটালাম দূর থেকে নীরমহলের দিকে তাকিয়ে। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল এমন একটা রেস্টহাউসে, যেখান থেকে জলপ্রাসাদ নীরমহল দেখা যায়।

রাত অনেক হয়েছে, আমরা গোল হয়ে রেস্টহাউসের বারান্দায় বসে আছি। তাকিয়ে আছি নীরমহলের দিকে। চট করে রবীন্দ্রনাথের লাইন মনে হলো—

রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ।

কেন জানি মনটাই খারাপ হলো। আমি শাওনের দিকে ফিরে বললাম, গান শোনাও তো। একের পর এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যাবে। Stop না বলা পর্যন্ত থামবে না।

রেস্টহাউসের সব বাতি নেভানো। আমাদের দৃষ্টি দূরের নীরমহলের দিকে। গায়িকার কিন্নরকণ্ঠ বাতাসে মিশে মিশে যাচ্ছে। সে গাইছে—'সখী, বহে গেল বেলা।'

আমি মনে মনে বললাম, জলরাশির মাঝখানে অপূর্ব নীরমহল দেখার জন্যে আমি ত্রিপুরায় আসি নি। আমি এসেছি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পদরেখার সন্ধানে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আপনি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা গ্রহণ করুন। আমার গলায় সুর নেই। আপনার অপূর্ব সঙ্গীত আমি কোনোদিনই কণ্ঠে নিতে পারব না। আমার হয়ে আপনার গান আপনাকে পাঠাচ্ছে আমার স্ত্রী শাওন। কী সুন্দর করেই সে গাইছে—তাই-না কবি?

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভগ্নহৃদয়'-এর কিছু অংশ

ভগ্নহৃদয়

প্রথম সর্গ

দৃশ—বন। চপলা ও মুরলা

চপলা। সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা?
এ ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস্ বসি
খুঁজে খুঁজে হোয়েছি যে সারা!
এমন আঁধার ঠাঁই,— জনপ্রাণী কেহ নাই,
জটিল-মস্তক বট চারি দিকে ঝুঁকি!
দুয়েকটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।
অন্ধকার, চারি দিক হ'তে, মুখপানে
এমন তাকায়ে রয়, বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রোয়েছিস্ বসিয়া এখানে?

মুরলা। সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই!
বায়ু বহে হুহু করি, পাতা কাঁপে ঝর ঝরি,
স্রোতস্বিনী কুলু কুলু করিছে সদাই!
বিছায়ে শুকানো পাতা বটমূলে রাখি মাথা
দিনরাত্রি পারি, সখি, শুনিতে ও ধ্বনি।
বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি!

যা সখি, একটু মোরে রেখে দে একেলা,
এ বন আঁধার ঘোর   ভাল লাগিবে না তোর,
তুই কুঞ্জবনে, সখি, কর্‌ গিয়ে খেলা!

চপলা। মনে আছে, অনিলের ফুলশয্যা আজ ?
তুই হেথা বোসে র'বি, কত আছে কাজ!
কত ভোরে উঠে   বনে গেছি ছুটে,
   মাধবীরে নোয়ে ডাকি,
ডালে ডালে যত   ফুল ছিল ফুটে
   একটি রাখি নি বাকি!
শিশিরে ভিজিয়ে   গিয়েছে আঁচল,
   কুসুমরেণুতে মাখা।
কাঁটা বিঁধে, সখি,   হোয়েছিনু সারা
   নোয়াতে গোলাপ-শাখা!
তুলেছি করবী   গোলাপ-গরবী,
   তুলেছি টগরগুলি,
যুঁইকুঁড়ি যত   বিকেলে ফুটিবে
   তখন আনিব তুলি।
আয়, সখি, আয়, ঘরে ফিরে আয়,
   অনিলে দেখিবে আজ—
হরষের হাসি   অধরে ধরে না,
   কিছু যদি আছে লাজ!

মুরলা। আহা সখি, বড় তারা ভালবাসে দুই জনে!

স্বর্গ, না অন্যকিছু ?

কোথায় যাচ্ছি ?

সুইজারল্যান্ড।

কেন যাচ্ছি ?

খেলতে।

কী খেলা ?

নাটক নাটক খেলা।

পাঠকরা নিশ্চয়ই ধাঁধায় পড়ে গেছেন। ধাঁধা ভেঙে দিচ্ছি। আমি নাটকের এক দল নিয়ে যাচ্ছি সুইজারল্যান্ড। এই উর্বর বুদ্ধি আমার মাথা থেকে আসে নি। এত বুদ্ধি আমার নেই।

আমি (স্বল্পবুদ্ধির কারণেই হয়তো) মনে করি না টিভি নাটক করার জন্যে দেশের বাইরে যেতে হবে। বাংলাদেশে সুন্দর জায়গার অভাব পড়ে নি। পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে, হাওর আছে, বন-জঙ্গল আছে, চা-বাগান আছে, রাবার বাগান আছে। মরুভূমি অবশ্যি নেই। ক্যামেরার সামান্য কারসাজিতে পদ্মার ধু-ধু বালির চরকে মরুভূমি দেখানো জটিল কিছু না, কয়েকটা উট ছেড়ে দিতে হবে। বাংলাদেশে এখন উটও পাওয়া যায়।

তা ছাড়া টিভি নাটকে প্রকৃতি দেখানোর তেমন সুযোগ কোথায় ? টিভি নাটকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দেখানো হয়। প্রকৃতি সেখানে গৌণ। টিভি পর্দায় Depth of field আসে না বলে প্রকৃতির অতি মনোরম দৃশ্যও মনে হয় Two dimensional. সাদাকথায় ফ্ল্যাট।

তাহলে আমি সুইজারল্যান্ড কেন যাচ্ছি ? আমার এক প্রাক্তন ছাত্রের কথার জাদুতে বিভ্রান্ত হয়ে। ছাত্রের নাম হাসান। সে চ্যানেল আই-এর কর্তাব্যক্তিদের একজন। এইচআরভি নামক দামি এক জিপে করে গম্ভীর ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ায়।

আমি যখন শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর সে ওই হলের ছাত্র। হৃদয়ঘটিত কোনো এক সমস্যায় জর্জরিত। অর্থনৈতিকভাবেও পর্যুদস্ত। এমন সময়ে সে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার আবদার—এমন কিছু যেন বলি যাতে তার মন শান্ত হয়। আমি তাকে কী বলেছিলাম তা এখন আর তার মনে নেই। তবে হাসানের মন শান্ত হয়েছিল—এই খবর সে আমাকে দিয়েছে।

সেই হাসান সুইজারল্যান্ডের কথা বলে আমাকে প্রায় কাবু করে ফেলল।

স্যার, ভূস্বর্গ! আপনি ভূস্বর্গ দেখবেন না ? রথ দেখবেন এবং কলা বেচবেন। নাটকও হলো, ভূস্বর্গও দেখা হলো।

বিদেশে নাটক করার নতুন হুজুগ ইদানীং শুরু হয়েছে। একজন নায়ক এবং একজন নায়িকা যান। তারা সুন্দর সুন্দর জায়গায় যান। প্রেম করেন। গান করেন। স্থানীয় কিছু ছেলেমেয়ে আনা হয়। তারা যেহেতু কখনো ক্যামেরার সামনে আসে নি তারা রোবটের মতো আসে। চোখ-কান বন্ধ করে দু'একটা সংলাপ কোনোমতে বলে।

এ ধরনের নাটক করা তো আমার পক্ষে সম্ভব না। নায়ক-নায়িকা নির্ভর নাটক আমি লিখতেও পারি না। হাসানকে এই কথা বলতেই সে বলল, আপনার যে ক'জনকে নিতে হয় নেবেন। কোনো সমস্যা নেই। দশজন নিলে দশজন। পনেরজন নিলে পনেরজন।

আমি আশ্চর্যই হলাম। হাসান বলল, বিশাল দু'টা বাড়ি আমি আপনাদের জন্যে এক মাসের জন্যে ভাড়া করেছি। বাড়িতে থাকবেন। নিজের মতো রান্না করে খাবেন। একজন বাবুর্চিকেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

হাসানের কর্মকাণ্ডে আমি মুগ্ধ। তারপরেও মন টানছে না। কেন জানি বাইরে যেতে ইচ্ছা করে না। নিজের দেশের ঘরের এক কোণে সারা দিন বসে থাকতেও ভালো লাগে। হাসানকে না করে দিলাম। ইতিমধ্যে সুইজারল্যান্ডে নাটক বানানোর প্রস্তাব প্রকাশ হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের খুব আগ্রহ দেখে আমি রাজি হই।

রাজি হলাম। হাসানের হাতে শিল্পীদের একটা তালিকা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এদের সবাইকে যদি নিয়ে যেতে পারি তাহলে OK।

হাসান বলল, আরও নিতে পারেন। আমি তো বলেছি কতজনকে নেবেন আপনার ব্যাপার।

আমি আবারও চমৎকৃত হলাম। তালিকাটা যথেষ্টই বড়।

রিয়াজ, শাওন, চ্যালেঞ্জার, স্বাধীন খসরু, ডাক্তার এজাজ, ফারুক আহমেদ, টুটুল, তানিয়া।

আমাকে নিয়ে নয়জন। হাসান নিমিষের মধ্যে ভিসা করিয়ে ফেলল। যথাসময়ে বিমানে উঠলাম। ডাক্তার এজাজ এবং ফারুক আহমেদের এই প্রথম দেশের বাইরে যাত্রা। তাদের আনন্দ এবং উত্তেজনা দেখে ভালো লাগল। তারা শপিং শুরু করল ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে। এটা দেখেও ভালো লাগল। রিয়াজ অবশ্যি যেতে পারল না। শেষমুহূর্তে তার জরুরি কাজ পড়ে গেল। ব্যস্ত নায়করা শেষমুহূর্তে জরুরি কাজ বের করে মূল পরিকল্পনা বানচাল করে ফেলেন। আমি এই 'শেষমুহূর্ত' নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম বলে তেমন সমস্যা হলো না।

আমি লক্ষ করেছি, ঢাকা শহরে খুব দামি গাড়ি চড়ে যারা ঘুরে তারা খোলামেলা কথা বলতে পারে না। দরজা-জানালা বন্ধ এসি গাড়িতে থাকার কারণেই মনে হয় এটা হয়।

হাসানের কাছে শুনেছিলাম একটা বিশাল বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, বাস্তবে দেখা গেল শাহীন নামে সুইজারল্যান্ডপ্রবাসী এক ছেলে তার ফ্ল্যাটের দু'টা কামরা ছেড়ে

দিয়েছে। একজন বাবুর্চি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল বলে শুনেছিলাম, দেখা গেল বাবুর্চি আমাদের হাসান। সে উৎসাহের সঙ্গে জানালো যে, ডাল রান্নায় তার নৈপুণ্য অসাধারণ। তিনদিনের ডাল রেঁধে সে নাকি ডিপ ফ্রিজে রেখেও দিয়েছে।

ব্যবস্থা দেখে আমার প্রায় স্ট্রোক হওয়ার জোগাড় হলো। আমি খুবই গরিবের ছেলে। গরিবেব ছেলের হাতে যদি দুটা পয়সা হয়, তখন তার মধ্যে নানা বিলাসিতা ঢুকে পড়ে। আমার মধ্যেও ঢুকেছে। শীতের দিনেও আমি এসি ছেড়ে ডাবল লেপ গায়ে দেই।

সুইজারল্যান্ডে যথেষ্ট গরম। ঘরে এসি নেই। সিলিং পাখাও নেই। কয়েকটা ফ্লোর ফ্যান আছে, যার পাখা অতি দুর্বলভাবে ঘুরছে। আমার চিমশা মুখ দেখে হাসান আমাকে একটু দূরে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, আপনার এবং শাওন ভাবির জন্যে ভালো হোটেলের ব্যবস্থা আছে। অভিনেত্রী মৌসুমী ও নায়ক মাহফুজ এই হোটেলেই ছিলেন। তারা হোটেল খুব পছন্দ করেছেন।

আমি বললাম, হাসান, আমি এতগুলি মানুষ নিয়ে এসেছি। এরা সবাই আমার অতি আপন। এদের ফেলে হোটেলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। যে ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি তার মধ্যেই থাকব। কোনো সমস্যা নেই।

হাসান বলল, আপনারা দুজন তাহলে শাহীনের শোবার ঘরে থাকুন। ওই ঘরে এসি আছে।

আমি বললাম, আমি আমার নিজের শোবার ঘরে কাউকে থাকতে দেই না। কাজেই অন্যের শোবার ঘরে আমাদের ঢোকার প্রশ্নই উঠে না। ঢালাও বিছানার ব্যবস্থা করো। সবাই একসঙ্গে থাকব। মজা হবে।

আসন্ন মজার কথা ভেবে আমি উল্লসিত—এরকম তঙ্গি করলেও মনে মনে চিন্তিত বোধ করলাম শাওনকে নিয়ে। ঘুমুবার জায়গা নিয়ে তার শুচিবায়ুর মতো আছে। সে আমার চেয়েও বিলাসী। তাকে দোষও দিতে পারছি না। সে অতি বড়লোকের মেয়ে।

আল্লাহপাকের অসীম রহমত, সে সমস্যাটা বুঝল। এমন এক ভাব করল যেন সবাই মিলে মেঝেতে গড়াগড়ি করার সুযোগ পেয়ে তার জীবন ধন্য। অভিনয় খুব ভালো হলো না। সে হতাশা লুকাতে পারল না।

রাতে ডিনার খেলাম হাসানের বিশেষ নৈপুণ্যে রাঁধা ডাল দিয়ে। ফার্মের মুরগি ছিল। ফার্মের মুরগি আমি খাই না। ঘন কৃষ্ণবর্ণের একটা বস্তুও ছিল। প্রশ্ন করে জানা গেল এটা সবজি। রান্নার গুণে কালো হয়ে গেছে।

ডাক্তার এবং ফারুক সবজি খেয়ে বলল, অসাধারণ। সুইজারল্যান্ডে পৌঁছার পর থেকে তারা যা দেখছে বলছে অসাধারণ। খাবার টেবিলে কাঁচামরিচ দেখে বলল, অসাধারণ। সুইজারল্যান্ডেও কাঁচামরিচ আছে, আশ্চর্য! কাঁচামরিচে কামড় দিয়ে দেখে মিষ্টি। তখনো বলল, অসাধারণ। ঝাল নেই কাঁচামরিচ খেয়েছি। মিষ্টি কাঁচামরিচ এই প্রথম খাচ্ছি। মুহূর্তের মধ্যে এই দুজন টেবিলের সব কাঁচামরিচ শেষ করে ফেলল।

রাতে আমার এবং শাওনের থাকার ব্যবস্থা হলো জেলখানার সেলের চেয়েও ছোট একটা ঘরে। বিছানায় দু'জনের শোবার প্রশ্ন উঠে না। আমি মেঝেতে চাদর পেতে ঘুমুতে গেলাম। ফ্যানের সমস্যা আছে। ফ্যানটা জীবন্ত প্রাণীর মতো আচরণ শুরু করল। ঘুরতে ঘুরতে সে থেমে যায়। কাশির মতো শব্দ করে। আবার ঘুরে আবার থামে। পুরোপুরি এক স্বাধীন সত্তা।

টুটুল-তানিয়া দম্পতিকে একটা রুম দেওয়া হয়েছে। সাইজে আমাদেরটার চেয়ে ছোট। তার উপর নেই ফ্যান।

বাকি সবার গণবিছানা। সেই ঘরেও ফ্যান নেই। সবাই গরমে অতিষ্ঠ। বাড়ির মালিক আমাদের জানালেন, সুইজারল্যান্ড অতি ঠান্ডার দেশ বলে ফ্যানের প্রচলন নেই। এসির তো প্রশ্নই উঠে না। সামারের এক দুই মাস গরম পড়ে। এই গরম সবাই Enjoy করে। গরমটাই তাদের কাছে মজা লাগে। আমাদের কারোই মজা লাগল না। শুধু ডাক্তার এজাজ এবং ফারুক বলল, অতি আরামদায়ক আবহাওয়া।

ঘুমুতে যাওয়ার আগে আগে আমি আমার দলের সবাইকে ডেকে একটা গোপন মিটিং করলাম। আমি বললাম, বুঝতে পারছি এখানে থাকা-খাওয়ার ব্যাপারটা কারও পছন্দ হচ্ছে না। আমাদের বাস্তবতা মানতে হবে। একটা টিভি চ্যানেল এতগুলো মানুষকে এত দূরের দেশে নিয়ে এসেছে। ইউরোপে হোটেল ভাড়া আকাশছোঁয়া। তাদের পক্ষে কোনো রকমেই সম্ভব না সবাইকে হোটেলে রাখা। তোমরা দয়া করে নায়ক-নায়িকাদের মতো নখরা করবে না। তোমরা চরিত্র অভিনেতা। চরিত্র অভিনেতারা অভিনয় করে, নখরা করে না।

তারচেয়ে বড় কথা হাসান আমার ছাত্র। তাকে আমি পছন্দ করি। সে যেন তোমাদের কোনো কথায় বা আচরণে কষ্ট না পায়। তার আগ্রহের কারণেই তোমরা ভূস্বর্গ হিসেবে পরিচিত একটা দেশ দেখবে। এর মূল্যও কম না। সারা দিন আমরা কাজ করব। রাতে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ব। এক ঘুমে রাত কাবার। সামান্য কয়েক ঘণ্টার জন্যে কি ফাইভ স্টার হোটেল লাগবে?

কথা দিয়ে মানুষকে তোলানোর ক্ষমতা আমার আছে! (কথাশিল্পী না?) সবাই বুঝল। ফারুক অতি আগ্রহের সঙ্গে বলল, প্রয়োজনে মেঝেতে শুয়ে থাকব। আমি বললাম, মেঝেতেই তো শুয়ে আছ। সে চুপ করে গেল।

ভোরবেলা দলবল নিয়ে শুটিং করতে বেরুবার সময় সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদটা শুনলাম। আমাদের শুটিং করতে হবে চুরি করে। পুলিশ দেখতে পেলেই ধরে নিয়ে যাবে। কারণ শুটিংয়ের অনুমতি নিতে বিপুল অংকের অর্থ লাগে। ইনস্যুরেন্স করতে হয়।

হাসান সহজ ভঙ্গিতে বলল, পুলিশ আছে কি নেই এটা দেখে শুটিং করতে হবে। পুলিশ যদি ধবে ফেলে তাহলে বলতে হবে আমরা বেড়াতে এসেছি। হোম ভিডিও করছি। দেশে বন্ধুবান্ধবকে দেখাব।

আমাব মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। শুটিংটা হবে কীভাবে?

হাসান বলল, নিশ্চিন্ত থাকেন। ফাঁকফোকর দিয়ে বের করে নিয়ে আসব। শুধু শুটিং চলাকালে আপনি ধারেকাছেও থাকবেন না। এটা সাগর ভাইয়ের অর্ডার।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আমি ধারেকাছে থাকব না কেন?

হাসান বলল, পুলিশ যদি আপনাকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে বিরাট কেলেঙ্কারি হবে। বাংলাদেশ অ্যাম্বেসি ধরে টান পড়বে।

আমার কলিজা গেল শুকিয়ে।

প্রথম দৃশ্য শুরু হলো। বাংলাদেশের এক ছেলে অন্ধ সেজে গিটার বাজিয়ে ভিক্ষা করে। তার স্ত্রী এসে (শাওন) তাকে এখান থেকে বকাঝকা করতে করতে নিয়ে যায়। অন্ধ ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করছে টুটুল। তাকে ফোয়ারার পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। সামনে হাতে লেখা সাইনবোর্ড—Help a blind.

টুটুলের গলা চমৎকার। গিটারের হাত চমৎকার। সে মুহূর্তের মধ্যেই জমিয়ে ফেলল। ক্যামেরা অনেক দূরে। কেউ বুঝতেই পারছে না ক্যামেরা চলছে। এক থুরথুরি বুড়ি চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ গিটার শুনে দশ ইউরোর একটা নোট টুটুলের হাতে গুজে দিল। টুটুল বিস্মিত।

এখন শাওন যাবে, টুটুলকে বকাঝকা করতে করতে নিয়ে আসবে—ঠিক তখন স্বাধীন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হুমায়ূন ভাই, পুলিশ আসছে।

আমি কাউকেই চিনি না এমন ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা দিলাম। শাওন বলল, তুমি আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ কেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই চুরি করে নাটক বানানোর মজা পেয়ে গেলাম। নিষিদ্ধ কিছু করছি, এই আনন্দ প্রধান হয়ে গেল। ফ্রেম কী হচ্ছে জানি না। মনিটর নেই। অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর নেই। লেফট ইন রাইট আউট নামক জটিল বিষয় আমার মোটা মাথায় কখনো ঢোকে না। আমার সাহায্যে শাওন এগিয়ে এল। সে আবার আগমন নির্গমন এবং 'লুক' খুব ভালো বোঝে। 'লুক' বিষয়টা কী পাঠকদের বুঝিয়ে দেই। 'লুক' হলো পাত্রপাত্রী কোনদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলছে। ভিডিওতে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লুক ঠিক না হলে দেখা যাবে নায়ক তার বান্ধবীর দিকে না তাকিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে মাথা নাড়ছে এবং কথা বলছে।

ভিডিওর কাজে আমাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হলো ক্যামেরাম্যান এবং শাওনের উপর।

ক্যামেরাম্যানের নাম তুফান। ঝকঝকে চোখের লম্বা পোশাকে ফিটফাট যুবা পুরুষ। মাথাভর্তি টাক না থাকলে তাকে নায়কের চরিত্র দেওয়া যেত। তুফান ভারী ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে তুফানের মতোই ছোটাছুটি করে। ক্যামেরা কাঁধেই রাখতে হবে, স্ট্যান্ডে বসানোর উপায় নেই। পুলিশ চলে আসতে পারে। হোম ভিডিও যারা করে তারা ক্যামেরার জন্যে স্ট্যান্ড নিয়ে আসে না।

আমি চিন্তিত, ক্যামেরায় কী ছবি আসছে কে জানে! আমাদের সঙ্গে না আছে লাইট, না আছে লাইট কাটার, না আছে শব্দ ধারণের বুম। শব্দের সমস্যার সমাধান আছে, পরে

ডাব করা যাবে। ছবি নষ্ট হলে কী করব! কাঁধের ক্যামেরা যদি কাঁপে ছবিও কাঁপবে। এত দূর দেশে এসে যদি এমন ছবি নিয়ে যাই যা দেখে মনে হবে পাত্র-পাত্রী সবাই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, সবার মধ্যেই কাঁপুনি, তাহলে হবে কী?

তুফান আমাকে আশ্বস্ত করল। সে বলল, স্যার সব ঠিক আছে, আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। উপরে আল্লাহ আছেন।

উপরে নিচে সবদিকেই আল্লাহ আছেন, তবে তিনি চুরি করে ভিডিও গ্রহণের ব্যাপারটা কি ভালোমতো নেবেন?

এদিকে প্রথম দিনেই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। স্বাধীন এক অতি রূপবতীর (হুমায়ূন আহমেদের নায়িকাদের চেয়েও রূপবতী) প্রেমে পড়ে গেল। মেয়ে সুইস, জার্মান ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। স্বাধীনও ইংরেজি এবং সিলেটি ভাষা ছাড়া কিছু জানে না। প্রেম একপক্ষীয় না, দু'পক্ষীয়। আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, ইশারা ইঙ্গিতে কী করে এত অল্প সময়ে এমন গভীর প্রেম হয়!

সন্ধ্যাবেলায় দেখি স্বাধীন উসখুস করছে। জানা গেল মেয়ে তাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছে। রাতে যদি কাজ না করি তাহলে সে ডিনারে যাবে। আমি ডিনারে যাওয়ার অনুমতি দিলাম।

স্বাধীন আবেগমথিত গলায় বলল, আমাদের জন্যে একটু দোয়া করবেন হুমায়ূন ভাই।

আমি বললাম, দোয়া লাগবে কেন?

সে বলল, আমরা বিয়ের কথা চিন্তা করছি। সে শুধু একটা শর্ত দিয়েছে।

কী শর্ত?

পরে আপনাকে বলব।

স্বাধীন ডেটিং-এ চলে গেল। তার চেহারা চোখ-মুখ উদভ্রান্ত।

দ্বিতীয় সমস্যা এজাজ এবং ফারুককে নিয়ে। তারা ডলার যা এনেছে প্রথম দিনেই সব শেষ। দু'জন এখন কপর্দকশূন্য। দু'জনই মুখ শুকনা করে বসে আছে।

আমি বললাম, কেনাকাটা কী করেছ যে প্রথম দিনেই সব শেষ?

সাবান কিনেছি।

সাবান কিনেছ মানে কী?

দু'জনই স্যুটকেস বের করল। স্যুটকেস তর্তি শুধু সাবান। নানান রঙের, নানান ঢং-এর।

এত সাবান কেন কিনেছ?

ফারুক বলল, দেখে এত সুন্দর লাগল! তা ছাড়া দেশে এই জিনিস পাওয়া যায় না।

হাসান দু'জনকেই তিন শ' ডলার করে দিল। এরা পরের দিন সেই ডলার দিয়েও সাবান কিনে ফেলল।

ডাক্তার এজাজ সাবানের বস্তা নিয়ে দেশে ফিরতে পারে নি। এয়ারলাইন তার সাবানভর্তি দু'টা স্যুটকেসই হারিয়ে ফেলে। ফারুক সাবান নিয়ে দেশে ফিরতে পেরেছে। শুনেছি এইসব সাবানের একটাও সে নিজে ব্যবহার করে নি, কাউকে ব্যবহার করতেও দেয় নি। সবই সাজিয়ে রাখা। তার জীবনের বর্তমান স্বপ্ন আবার বিদেশে গিয়ে সাবান কিনে নিয়ে আসা।

শুটিং পুরোদমে চলছে। সুইজারল্যান্ডের সুন্দর সুন্দর জায়গা ব্যবহার করা হচ্ছে। রাইন নদী, রাইনস ফল, নেপোলিয়ানের বাড়ি—কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

খুব উৎসাহ নিয়ে রাইন নদী দেখে ধাক্কার মতো খেলাম। আমরা পদ্মা মেঘনার দেশের মানুষ, আমাদেরকে কি বড় সাইজের খাল দিয়ে ভুলানো যায় ? তবে সবই ঝকঝকে। মনে হয় পুরো সুইজারল্যান্ডকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখা হয় শুধুমাত্র ছবি তোলার জন্যে। গাছের প্রতিটি পাতা সবুজ। একটা শুকনা পাতা বা মরা ডাল নেই। গাছের নিচেও শুকনা পাতা পড়ে থাকা দরকার। সেইসব কোথায় গেল ? পাতা কুড়ানির দল তো চোখে পড়ল না।

নাটকে পিকনিকের একটি দৃশ্য আছে। বেশ বড় দৃশ্য। এই দৃশ্যে পুরো একটা গান আছে। নাটকীয় অনেক ব্যাপার-স্যাপার আছে। পিকনিকের দৃশ্য করার জন্যে রাইন নদীর পাশে ছোট্ট পার্কের মতো একটা জায়গা শাহীন এবং হাসান খুঁজে বের করল।

ছবির দেশে সবকিছুই ছবির মতো। পার্কটাও সে-রকম। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা আছে, অর্থাৎ বাথরুম আছে। বারবিকিউয়ের ব্যবস্থা আছে। একপাশেই আপেলের বাগান। গাছভর্তি আপেল। অন্যপাশে নাশপাতি বাগান। ফল ভারে প্রতিটি বৃক্ষ নত। আমরা মহানন্দে বারবিকিউয়ের ব্যবস্থায় লেগে গেলাম। মেয়েরা মনের আনন্দে ছুটাছুটি করতে লাগল। তাদের মুগ্ধ করল রাইন নদীতে সাঁতার কাটতে ব্যস্ত একদল রাজহাঁস। সাইজে দেশি রাজহাঁসের প্রায় দ্বিগুণ। গলা অনেক লম্বা। শুনেছি এরা প্রকৃতিতে ভয়ঙ্কর। মেজাজ খারাপ হলে এরা বিকট শব্দ করে ছুটে এসে কামড়ে দেয়।

মেয়েরা রাজহাঁসের দলকে পোষ মানিয়ে ফেলল। তারা হাতে পাউরুটি ধরে এগিয়ে দিচ্ছে। রাজহাঁসের দল কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। মেয়েদের জঙ্গি রাজহাঁসদের দলকে পোষ মানানোর ক্ষমতায় অবাক হলাম না। যারা পুরুষদের পোষ মানায়, তারা সবাইকেই পোষ মানাতে সক্ষম।

আমাদের আনন্দ-উল্লাসে হঠাৎ বাধা পড়ল। দুই সুইস জিপ গাড়িতে করে উপস্থিত। শাহীনের সঙ্গে তাদের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো। আমরা তার একবর্ণও বুঝলাম না। সব কথাই হলো জার্মান ভাষায়। এখানে বঙ্গানুবাদটা দিচ্ছি।

সুইস : তোমরা কী করছ জানতে পারি ?

শাহীন : পিকনিক করছি। ফ্যামিলি হলি ডে।

সুইস : তোমরা কি জানো যে, এটা একটা পাবলিক প্রপার্টি ? আপেল এবং নাসপাতি বাগান আমার।

শাহীন : আমরা তো আপেল এবং নাসপাতি বাগানে যাচ্ছি না। আমরা নদীর ধারে পিকনিক করছি।

সুইস : এই জায়গাও আমার। [কুৎসিত গালি। গালির অর্থ কী শাহীন বলল না। এতে মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু হবে।]

শাহীন : [গালি, সে জার্মান গালির সঙ্গে বাঙলা গালি মিশিয়ে দিল। বাংলা ভাষায় সবচেয়ে ভদ্র গালিটা ছিল—খা...কির পুলা অফ যা।]

সুইস : আমি তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেব।

শাহীন : যা তোর বাপদের খবর দিয়ে আয়।

সুইস দু'জন হুস করে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। আমি সব শুনে বললাম, অন্যের জায়গায় আমরা কেন পিকনিক করব ? চলো আরেকটা জায়গা খুঁজে বের করি।

শাহীন বলল, স্যার, সুইস সরকারের আইন বলে নদীর পাড় ঘেঁসে সমস্ত সুন্দর জায়গায় সবার অধিকার। এটা যদি ওর জায়গাও হয় তারপরেও আমাদের অধিকার আছে এখানে পিকনিক করার।

আমি বললাম, ব্যাটা তো মনে হয় পুলিশে খবর দিতে গেল।

শাহীন বলল, পুলিশে খবর দেবে না, কারণ আইন আমাদের পক্ষে। পুলিশে খবর দিলে নিজেই বিপদে পড়বে, তবে সে বন্দুক নিয়ে ফিরে আসতে পারে।

বলো কী!

বন্দুক দিয়ে গুলি করবে না—ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখাবে।

আমরা তখন কী করব ?

ফাইট দিব। মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলব। এখনো বাঙালি চেনে না।

শাহীন আবারও খানকি বিষয়ক গালিতে ফিরে গেল।

আমি স্তম্ভিত। এ কী বিপদে পড়লাম! আমি একা স্থান ত্যাগের পক্ষে, বাকি সবাই 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদেনী' টাইপ। মেয়েরা বিশেষ করেই রণরঙ্গিনী। বাঙালি রমণী কী বিষয় তারা তা সুইসদের শিখিয়ে দিতে আগ্রহী।

চ্যালেঞ্জার লুঙ্গি পরে রাইন নদীর সুশীতল জলে সাঁতার কাটছিল। সে উঠে এসে লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরল। লুঙ্গি পরে মারামারি করা যায় না।

আমার সিক্সথ সেন্স বলছিল ওরা ফিরে আসবে না। ঝামেলা কে পছন্দ করে!

আমার সিক্সথ সেন্স ভুল প্রমাণিত করে সেই দু'জন গাড়ি করে আবার উপস্থিত হলো। শাহীন বারবিকিউর চুলা থেকে জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ তুলে হাতে নিল। স্বাধীনের দিকে তাকিয়ে দেখি তার হাতে সুইস নাইফ।

দু'জন গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল। তাদের হাতে বন্দুক দেখা গেল না। তবে পিস্তল জাতীয় কিছু পকেটে থাকতে পারে।

শাহীনের সঙ্গে তাদের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো।

সুইস : আমরা সরি বলার জন্যে এসেছি। তোমাকে যে সব গালাগালি করেছি তার জন্যে Sorry, আমাদের এ উপলব্ধি গ্রহণ করলে খুশি হব।

শাহীন : এ উপলব্ধি গ্রহণ করা হলো।

সুইস : তোমরা কোন দেশ থেকে এসেছ ?

শাহীন : আমার বন্ধুরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, আমি সুইস নাগরিক।

সুইস : তোমাদের পিকনিক শুভ হোক।

শাহীন : অল্পের জন্যে বাঁচলি, আইজ তরে জানে মাইরা ফেলতাম।

সুইস : কী বললে বুঝতে পারলাম না।

শাহীন : বাংলা ভাষায় বলেছি, তোমাদের ধন্যবাদ।

মহান বাঙালির সম্মান বজায় রইল। শুটিংয়ের শেষে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। আমি ঘোষণা দিলাম, আগামীকাল অফ ডে। আমবা কোনো শুটিং করব না।

হাসানের মুখ শুকিয়ে গেল। শুটিং অফ মানে আরেকদিন বাড়তি থাকা। বাড়তি খরচ। বাড়তি টেনশন।

আমি হাসানকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, তুমি টেনশন করো না। আমরা Extra কাজ করে আগামীকালের ক্ষতি পুষিয়ে দেব।

আগামীকাল কাজ করবেন না কেন ?

আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা। আমি ক্রিকেট খেলা দেখব।

শাহীন বলল, ক্রিকেট খেলা দেখা যাবে না।

কেন দেখা যাবে না ?

শাহীন বলল, এখানকার কোনো বাঙালির বাড়িতে ডিশের লাইন নেই। খরচের ভয়ে তারা ডিশ লাইন নেয় না।

আমি বললাম, রেস্টুরেন্টগুলোতে খেলা দেখার ব্যবস্থা নেই ?

সুইসরা ক্রিকেট ভক্ত না। তারা ফুটবল ছাড়া কোনো খেলা দেখে না।

আমি হাসানের দিকে ফিরে বললাম, তোমার দায়িত্ব কাল আমাকে খেলা দেখানো।

হাসান বলল, অবশ্যই।

পাঠকরা ভুলেও ভাববেন না—আমি ক্রিকেটের পোকা, কে কখন কয়টা ছক্কা মেরেছে, কে কতবার শূন্যতে আউট হয়েছে, এসব আমার মুখস্থ। মোটেও না। আমি শুধু বাংলাদেশের খেলা থাকলেই দেখি। অন্য খেলা না।

বাংলাদেশের কোনো খেলা আমি মিস করি না। ওই দিন আমার সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ। বাংলাদেশের কোনো খেলোয়াড় যখন চার মারে, আমার কাছে মনে হয় চারটা সে মারে নি। আমি নিজে মেরেছি। এবং আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। বাংলাদেশের কোনো বোলার যখন কঠিন বল করে তখন আমার মনের ভাব হচ্ছে—'বলটা কেমন

করলাম দেখলিরে ছাগলা? কলজে নড়ে গেছে কি না বল। আসল বলিং তো শুরুই করি নি। তোকে আজ পাতলা পায়খানা যদি না করাই আমার নাম হুমায়ূন আহমেদই না।'

আনন্দে চোখে পানি আসার মতো ঘটনা আমার জীবনে অনেকবার ঘটেছে। যে ক'বার বাংলাদেশ ক্রিকেটে জিতেছে প্রতিবারই আমার চোখে পানি এসেছে। বাংলাদেশি ক্রিকেটের দুর্দান্ত সব খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ। তারা চোখভর্তি পানি নিয়ে আসার মতো আনন্দ একজন লেখককে বারবার দিচ্ছেন। পরম করুণাময় এইসব সাহসী তরুণের জীবন মঙ্গলময় করুক, এই আমার শুভকামনা।

আমরা যেখানে আছি (রুখতেনস্টাইন) সেখানে ক্রিকেট খেলা দেখার কোনো ব্যবস্থা হাসান করতে পারল না। তাকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল। সে বাসে করে আমাদের নিয়ে রওনা হলো সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জুরিখে। জুরিখে অনেক বাঙালি, তাদের কারও বাসায় Star Sports কিংবা ESPN তো থাকবেই।

কাউকে পাওয়া গেল না। আমরা পাবে পাবে ঘুরতে লাগলাম। সাধারণত পাবগুলোতে খেলা দেখানো হয়। কোথাও পাওয়া গেল না। এই সময় খবর এল জুরিখের একপ্রান্তে অস্ট্রেলিয়ানদের একটা পাব আছে। অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশের খেলা সেই পাবে নিশ্চয়ই দেখানো হবে। গেলাম সেখানে, সেই পাবে রাগবি দেখাচ্ছে। আমরা ক্রিকেট দেখতে চাই শুনে পাবের অস্ট্রেলিয়ান মালিক বিস্মিত হয়ে তাকাল।

স্বাধীন বলল, আমরা তোমাদেরকে একবার হারিয়েছি। আজও হারাব। আমাদের এই আনন্দ পেতে দাও। প্লিজ।

অস্ট্রেলিয়ান মালিক বলল, এসো। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খেলা আগেই শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাট করছে। অবস্থা কেরোসিন। আমরা আয়োজন করে বসার দশ মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশের চারজন খেলোয়াড় আউট।

আমরা মাথা নিচু করে বসে রইলাম। আমি অস্ট্রেলিয়ান পাব মালিককে বললাম, আমরা ঠিক করেছি আজ ক্রিকেট দেখব না। তুমি চ্যানেল বদলে দাও। সবাই রাগবি দেখতে চাচ্ছে। আমরা আসলে রাগবির ভক্ত।

ভ্রমণকাহিনি লেখার কিছু নিয়মকানুন আছে। যে-সব জায়গা দেখা হয় তার বর্ণনা দিতে হয় (ছবিসহ)। ছবিতে লেখক থাকেন। প্রতিটি ছবির সঙ্গে ক্যাপসন থাকে। নমুনা।

রুখতেনস্টাইনের রাজপ্রাসাদের সামনে লেখক।

লেখকের পাশে তার স্ত্রী শাওন।

রুখতেনস্টাইন রাজপ্রাসাদ সেখানে মুখ্য না। মুখ্য হলো লেখক এবং লেখকপত্নী। হাসি হাসি মুখে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ভ্রমণকাহিনিতে নিজ দেশের সঙ্গে একধরনের তুলনামূলক বিষয়ও থাকতে হবে। দেশে কিছুই নেই, বাইরে স্বর্গ—এই বিষয়টা আসতে হবে। যে-সব জায়গায় লেখক গেলেন, তার বর্ণনা এমনভাবে থাকতে হবে যেন পাঠক পড়তে গিয়ে টাসকি খেয়ে

ভাবে—মানুষটা কত জ্ঞানী। নেপোলিয়ানের বাড়ি প্রসঙ্গে লিখতে হবে—কবে কখন নেপোলিয়ান এসে রাইন নদী দেখে মুগ্ধ হয়ে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীরা এই বাড়ি নিয়ে কী করে ইত্যাদি। একফাঁকে নেপোলিয়ানের জীবনীও কিছুটা দিতে হবে। নয়তো পাঠকের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকবে।

আমার নানান সমস্যার একটি হচ্ছে, নিজের দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশই আমার ভালো লাগে না। পাঠকদের কেউ কেউ হয়তো চোখ কপালে তোলার মতো করে বলবেন—'বাপরে, ব্যাটা দেশপ্রেম ফলাচ্ছে।' আমি কিন্তু আমার কথা প্রমাণ করে দিতে পারি। আমেরিকায় পড়াশোনা শেষ করে সেই দেশেই বিরাট বেতনের চাকরি নিয়ে থেকে যাওয়ার সুযোগ আমার ভালোমতোই ছিল। আমার প্রফেসর বারবারই বলেছেন—'তোমার পরিবারের সবার জন্যেই আমি সিটিজেনশিপের ব্যবস্থা করছি, তুমি থেকে যাও। দেশে ফিরে কী করবে! আমেরিকা ল্যান্ড অব অপরচুনিটি।' আমি থাকি নি। দু শ' ডলার সঞ্চয় নিয়ে দেশে ফিরে এসেছি।

আমার ঘনিষ্ঠজনরা জানে, আমাকে দেশের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করানো কতটা কষ্টের। কেন দেশের বাইরে যেতে চাই না ? দেশের বাইরের কোনো কিছুই আমাকে স্পর্শ করে না। মনে লাগে না। বাইরে কম সময় কাটাই নি। আমেরিকায় এক নাগাড়ে ছয় বছর কাটালাম। কত বৈচিত্র্যের সুন্দর দেশ। কিন্তু আমার একদিনের জন্যেও মনে হয় নি—এই দেশ আমার হতদরিদ্র দেশের চেয়েও সুন্দর। পৃথিবীর কোন দেশে পাব আমি আমার দেশের উথালপাতাল জোছনা? কোথায় পাব আষাঢ়ের আকাশভাঙ্গা বৃষ্টি ? আমেরিকা থেকে একবার আমি বাংলায় চিঠি লিখলাম—অনেকদিন বর্ষার ব্যাঙের ডাক শুনি না। আপনি কি ব্যাঙের ডাক রেকর্ড করে ক্যাসেট করে পাঠাতে পারবেন ?

চিঠি পৌঁছানোর পর আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা (আহসান হাবীব, সম্পাদক *উন্মাদ*) ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে ডোবায় ডোবায় খন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যথাসময়ে আমার কাছে ব্যাঙের ডাকের ক্যাসেট চলে এল। এক রাতে দেশের ছেলেমেয়েদের বাসায় দাওয়াত করেছি। সবাই খেতে বসেছে, আমি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে ব্যাঙের ডাকের ক্যাসেট ছেড়ে দিলাম। ভেবেছিলাম সবাই হাসাহাসি করবে। অবাক হয়ে দেখি, বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের চোখে অশ্রু চকচক করতে লাগল।

থাক এই প্রসঙ্গ, ভূস্বর্গ সুইজারল্যান্ড সম্পর্কে বলি। এই দেশ ইউরোপের যে-কোনো পাহাড়ি দেশের মতোই। আলাদা সৌন্দর্যের কিছু নেই। আমি আমার হাতের বলপয়েন্টের দোহাই দিয়ে বলছি—আমার দেশের রাঙামাটির সৌন্দর্য সুইজারল্যান্ডের সৌন্দর্যের চেয়ে কোনো অংশেই কম না। তফাত একটাই, আমরা গরিব ওরা ধনী। পরম করুণাময় ধনী-দরিদ্র বিবেচনা করে তাঁর প্রকৃতি সাজান না। তিনি সাজান নিজের ইচ্ছায়।

সুইজারল্যান্ডের মানুষগুলি ভালো। বেশ ভালো। হাসিখুশি। বিদেশিদের দিকে অবহেলার চোখে তাকায় না। আগ্রহ নিয়ে তাকায়। আগ্রহ নিয়ে গল্প করতে আসে। শাওনকে বেশ কিছু বিদেশিনী জিজ্ঞেস করলেন—তুমি চামড়া ট্যান করার জন্যে যে লোশন ব্যবহার করো, তার নাম জানতে পারি ?

শাওন বলল, আমাদের চামড়া জন্ম থেকেই এরকম। কোনো লোশন দিয়ে ট্যান করানো হয় নি।

তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে—তোমরা কত না ভাগ্যবতী!

স্থানীয় অধিবাসীদের মানসিকতা কেমন—তার উদাহরণ হিসেবে একটা ছোট্ট গল্প বলছি। আমাদের নাটকে (রূপালী রাত্রি) আছে ডাক্তার এজাজ এবং ফারুক গ্রামের কামলাশ্রেণীব মানুষ। প্রথমবার সুইজারল্যান্ডের মতো একটা দেশে আসার সুযোগ হয়েছে। তারা স্যুট পরে মহানন্দে সুইজারল্যান্ডের পথে পথে ঘুরছে। যাকেই পাচ্ছে তাকেই বলছে, 'হ্যালো'।

নাটকের একটি দৃশ্য আছে, এরা দুইজন এক সুইস তরুণীকে বলবে, 'হ্যালো'। তরুণী তাদের দিকে তাকাবে। জবাব না দিয়ে চলে যাবে। ডাক্তার এজাজ ফারুককে বলবে—'এই মাইয়া ইংরেজি জানে না।'

সুইজারল্যান্ডের তরুণীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে এক পথচারী তরুণীকে প্রস্তাব করতেই সে রাজি হয়ে গেল। অভিনয় করল। অভিনয় শেষে সে ডাক্তার এজাজকে বলল, তুমি হ্যালো বলেছ, আমি জবাব না দিয়ে চলে গেছি। আমি কিন্তু এরকম মেয়ে না। আমাকে এরকম করতে বলা হয়েছে বলে আমি করেছি। তারপরেও আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

আধুনিক পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরের বিরাট গুরুত্ব। বার্ন শহরের এক পেটেন্ট অফিসের তেইশ বছর বয়েসী কেরানি *Annals of Physics*-এ তিন পাতার একটি প্রবন্ধ লিখে পদার্থবিদ্যার গতিপথই সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিলেন। পেটেন্ট অফিসের সেই কেরানির নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। বার্ন শহরে তাঁর একটি মিউজিয়াম আছে। আমার খুব ইচ্ছা হলো এই মিউজিয়ামটা দেখে যাই (মিউজিয়াম দেখার বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই। আমি কোথাও বেড়াতে গেলে মিউজিয়াম দেখি না। সমুদ্র, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত দেখি)। শাহীনকে বলতেই সে বলল, কোনো ব্যাপারই না। নিয়ে যাব।

একদিন শাওনকে নিয়ে তার সঙ্গে বের হলাম। সে আমাদের এক ক্যাসিনোতে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, হুমায়ূন ভাই, এই ক্যাসিনো ছোটখাটো। এখানে জুয়া খেলে আপনার ভালো লাগবে।

আমি বললাম, আইনস্টাইন সাহেবের খবর কী?

উনার জায়গাটা এখনো বের করতে পারি নি।

ফিজিক্স বাদ দিয়ে জুয়া?

শাহীন খুবই উৎসাহের সঙ্গে বলল, ক্যাসিনোতে জুয়া খেলতে লাইসেন্স লাগে। মেম্বার হতে হয়। আপনাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করেছি।

ঈশ্বর এবং জুয়া নিয়ে আইনস্টাইনের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, যে উক্তি পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শুরুতে আইনস্টাইন থমকে গেলেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স তিনি মনেপ্রাণে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, ঈশ্বর জুয়া খেলেন না (God does not play dice)। দেখা গেল আইনস্টাইনের বক্তব্য সঠিক না—ঈশ্বর জুয়া খেলেন।

তিনিই যখন খেলতে পারেন—আমার খেলতে অসুবিধা কোথায়? আমি শাওনকে নিয়ে এক টেবিলে বসে অতি দ্রুত পাঁচ শ' ডলার হারলাম। শাহীন আনন্দিত গলায় বলল, মজা হচ্ছে না হুমায়ূন ভাই?

আমি বললাম, হচ্ছে।

সে গলা নামিয়ে বলল, আইনস্টাইন ফাইনস্টাইন বাদ দেন। বিদেশে এসেছেন, অঙ্ক করবেন নাকি?

তা তো ঠিকই।

পাঁচ শ' হেরেছেন, আরও হারেন—এই একটা জায়গাতেই হারলেও মজা।

জুয়ায় জেতার আনন্দটা কী আমি জানি না। কখনো জিততে পারি নি। আমার জুয়ার ভাগ্য খারাপ। এই লাইনে অতি ভাগ্যবান একজনের নাম স্বাধীন খসরু। সে স্ক্রাচ কার্ড নামক একধরনের জুয়া আগ্রহের সঙ্গে খেলে। এক ইউরো, দুই ইউরো দিয়ে স্ক্রাচ কার্ড কিনে। কার্ডের বিশেষ জায়গা ঘসা হয়। সেখানে যদি চারটা সাত উঠে আসে বা এই ধরনের কিছু হয় তাহলেই পুরস্কার।

সুইজারল্যান্ডে স্বাধীন খসরু এই কাণ্ড ঘটাল। কার্ড ঘসার পর যে বস্তু বের হলো তার অর্থ, সে বিশ হাজার ইউরো পুরস্কার পেয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে ইউরো পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন এবং তার পরের দিন ব্যাংক বন্ধ। অফিস টফিসও বন্ধ। আমাদের উত্তেজনার সীমা নেই। লক্ষ করলাম, সফরসঙ্গীদের মধ্যে হিংসা কাজ করতে শুরু করেছে। অনেকেই মত প্রকাশ করছে, শেষপর্যন্ত টাকা পাওয়া যাবে না। সামান্য কার্ড ঘসে কেউ এত টাকা পায়? কোনো-একটা ঝামেলা অবশ্যই আছে।

আমি জানি কোনো ঝামেলা নেই। নিউইয়র্কে দু'জন বাঙালির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে—যারা পাঁচ ডলারে স্ক্রাচ কার্ড ঘসে এক মিলিয়ন ডলার করে পুরস্কার পেয়েছেন।

স্বাধীনের কার্ডের লেখা জার্মান ভাষায়। জার্মান ভাষা ভালো জানে এমন কয়েকজনকে দিয়ে কার্ড পড়ালাম। তারাও বললেন, ঘটনা সত্যি। এই কার্ড বিশ হাজার ইউরো জিতেছে।

হঠাৎ লাখপতি হয়ে যাওয়ায় স্বাধীন দলছুট হয়ে পড়ল। কেউ তার সঙ্গে ভালোমতো কথা বলে না। সেও আলাদা থাকে। আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে না। নগদ ইউরো খরচ করে রেস্টুরেন্টে খেতে যায়। সঙ্গে থাকে নতুন পাওয়া বান্ধবী। এই বান্ধবী স্বাধীনকে বলেছে, সে যদি সুইজারল্যান্ডে থেকে যায় তাহলে স্বাধীনকে সে বিয়ে

করতে রাজি আছে। সুইজারল্যান্ডে থেকে যাওয়া তার জন্যে তেমন কোনো সমস্যা না। কারণ স্বাধীন ব্রিটিশ নাগরিক, তার পিছুটানও নেই। স্বাধীনকে মনে হলো নিমরাজি।

আমি শঙ্কিত বোধ করলাম। স্বাধীন অতি আবেগপ্রবণ ছেলে। আবেগের বশে বিয়ে করে বসতে পারে। সমস্যা একটাই, সে আবেগ ধরে রাখতে পারে না। স্বাধীনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। লক্ষ করলাম, সে আমাকেও এড়িয়ে চলছে। নিজেই আগ বাড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো।

আমি : হ্যালো স্বাধীন!

স্বাধীন : (চুপ)

আমি : কনগ্রাচুলেশনস! বিশ হাজার ইউরো পেয়ে গেলে।

স্বাধীন : থ্যাং-ক য়্যু।

আমি : তারপর কী ঠিক করলে, এই দেশেই সংসার পাতবে?

স্বাধীন : আমার কাছে সব দেশই সমান। বাংলাদেশে জন্ম হলেও জীবন কেটেছে ইংল্যান্ডে।

আমি : দু'দিনের পরিচয়ে একজনকে বিয়ে করে ফেললে পরে সমস্যা হবে না তো?

স্বাধীন : যখন অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হয় তখন তো স্বামী-স্ত্রীর পূর্বপরিচয় ছাড়াই বিয়ে হয়। তারা সুখী হতে পারলে আমরা কেন হতে পারব না?

আমি : (চুপ)

স্বাধীন : হুমায়ূন ভাই, আমার অনুরোধ—এই বিষয়ে আমাকে আর কিছু বলবেন না।

আমি : বিয়েটা হচ্ছে কবে?

স্বাধীন : একটু দেরি হবে। লাইসেন্স করাতে হবে। আপনারা শুটিং শেষ করে দেশে চলে যান, আমি পরে আসব।

আমি : আরও একটু চিন্তা ভাবনা করলে হতো না?

স্বাধীন : চিন্তা ভাবনা তো করছি। সারা রাতই চিন্তা করি। আগামীকাল সকালে আপনি আমাকে একটু সময় দেবেন? আপনাকে নিয়ে মেয়ের মায়ের বাসায় যাব। এখানে আপনি ছাড়া আমার মুরুব্বি কেউ নেই।

আমি : ঠিক আছে যাব।

মেয়ের মায়ের বাড়িতে যাওয়ার আগে আমরা গেলাম স্ক্রাচ কার্ড দেখিয়ে বিশ হাজার ইউরো তুলতে। সঙ্গে আছে শাহীন। সে জার্মান ভাষা জানে। আমরা জানি না।

কোম্পানির তরুণী কার্ড উল্টেপাল্টে বলল, হ্যাঁ, তোমরা বিশ হাজার ইউরো পেয়েছ।

আমরা তিনজন একসঙ্গে বললাম, থ্যাংক ইউ।

তরুণী বলল, তোমরা টাকা পাবে না। কারণ তোমরা কার্ডটা অতিরিক্ত খোঁচাখুঁচি করে নষ্ট করে ফেলেছ। যেখানে স্ক্রাচ করার কথা না সেখানেও করেছ।

শাহীন বলল, তুমি তো খুবই অন্যায় কথা বলছ।

তরুণী বলল, তুমি ল'ইয়ারের কাছে যেতে পার।

অবশ্যই ল'ইয়ারের কাছে যাব।

আমরা ল'ইয়ারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, মামলা করলে অবশ্যই আমরা জিতব।

আমি বললাম, মামলা আমরা অবশ্যই করব।

লইয়ার বলল, আমি দশ হাজার ইউরো ফিস নেব। অর্ধেক এখন দিতে হবে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার রইল না। কে দেবে উকিলকে এত টাকা? আর টাকা দিলেই শেষ পর্যন্ত যে আমরা মামলায় জিতব তার গ্যারান্টি কী?

স্বাধীনের দিকে তাকিয়ে আমার খুবই মায়া লাগল। বেচারা এই টাকার আশায় নিজের যা ছিল সব শেষ করেছে। অন্যের কাছে ধারও করেছে।

সব খারাপ জিনিসের একটা ভালো দিক থাকে। লটারির টাকা না-পাওয়ার ভালো দিকটা হলো স্বাধীন ঘোষণা করল—এই পচা দেশে থাকার প্রশ্নই উঠে না। বিয়ে তো অনেক পরের ব্যাপার।

সুইজারল্যান্ডে বাসের সময় শেষ হলো। কী দেখলাম?

ক. ছবির মতো সুন্দর কিছু জায়গা। সবই সাজানো। জঙ্গলের গাছগুলিও হিসাব করে লাগানো। কোন গাছের পর কোন গাছ, কত দূরত্বে—সব মাপা।

খ. অতি আধুনিক কেতায় সাজানো কিছু শপিংমল। পৃথিবীর হেন কোনো বস্তু নেই যা সেখানে নেই। দামেরও কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। দেশটা অতি ধনী। এদের ক্রয়ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি। জিনিসের দাম তো হবেই। রুপার কৌটায় এক কৌটা টুথপিক বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশি টাকায় পঁচিশ হাজার টাকায়। যেখানে দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচানোর কাজ সারা যায়, সেখানে কেন পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করা হবে?

গ. দেখলাম কিছু সুখী মানুষ। অর্থনীতির কঠিন চাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ। যাদের পেছনে আছে ক্ষমতাধর এক রাষ্ট্র। উদাহরণ দেই—এক সুইস নাগরিক অস্ট্রিয়ায় স্কি করতে গিয়ে আহত হয়েছে। খবর পাওয়ামাত্র সুইজারল্যান্ড থেকে হেলিকপ্টার গেল। তাকে হেলিকপ্টারে নিজ দেশে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো।

এই দেশের সুখী মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ নেই। তারা এক ভুবনের বাসিন্দা, আমরা অন্য ভুবনের। আমরাই শুধু বলতে পারি—

অর্থ নয় কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা নয়
আরও এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত করে।

ওরা এই কথা বলে না, কারণ অর্থশূন্য জীবন তাদের কল্পনাতে নেই।

বিদায় সুইজারল্যান্ড।

বিদায় ভূস্বর্গ।

চন্দ্রযাত্রা

একটা ধাঁধা দিয়ে শুরু করি। চার অক্ষরে নাম এমন এক দেশ, যে নাম শুনলেই বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের মানুষের চোখ চকচক করতে থাকে। হিন্টস দিচ্ছি—আ দিয়ে শুরু। শেষ অক্ষর কা।

হয়েছে—আমেরিকা।

এই দেশে যাওয়ার জন্যে জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হওয়া মানুষদের আতঙ্কে অধীর হয়ে আমেরিকান অ্যাম্বেসিতে বসে থাকতে দেখেছি। সঙ্গে দলিল দস্তাবেজ। বাড়ির দলিল, জমির দলিল, গাড়ির ব্লু বুক, ব্যাংকের কাগজ। তাঁরা প্রমাণ করবেন যে, দেশে তাঁদের যথেষ্ট বিষয়-আশয় আছে। ভিজিট ভিসায় বেড়াতে গেলেও ফিরে আসবেন। আল্লাহর কসম ফিরে আসবেন।

ভিসা রিজেক্ট হওয়ায় ভিসা অফিসে জনৈক বৃদ্ধ শোকে হার্টফেল করে মারা গেছেন—এই খবর *প্রথম আলো* পত্রিকায় পড়েছি।

আমি একজনকে জানি যিনি দেশের সব মাজার জিয়ারত করে আজমির শরিফ যাচ্ছেন খাজা বাবার দোয়া নিতে। খাজা বাবার দোয়া পেলে ভিসা অফিসারের মন গলবে, তিনি স্বপ্নের দেশে যেতে পারবেন। ইউরোপ-আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারটা নাকি খাজা বাবা কন্ট্রোল করেন।

আমেরিকা নামক এই স্বপ্নের দেশে আমাকে দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী কাটাতে হয়েছে। ছয় বছরের বেশি। পিএইচডি করলাম। পিএইচডি শেষ করে Post Doc করলাম। দেশে ফেরার পরেও আরও চার-পাঁচবার যেতে হলো। আমেরিকা নিয়ে বেশ কয়েকটা বইও লিখলাম। *হোটেল গ্রেভার ইন, যশোহা বৃক্ষের দেশে, মে ফ্লাওয়ার*। শেষবার আমেরিকায় গেলাম নুহাশকে নিয়ে। পিতা-পুত্রের যুগলবন্দি ভ্রমণ। ফেরার পথে দু'জনই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। নুহাশ ক্রমাগত বমি করছে, গায়ে জ্বর। আমার বুকে ব্যথা। আমি আতঙ্কগ্রস্ত। বুকের এই ব্যথা মানে হার্টবিষয়ক জটিলতা নয়তো? যদি সে-রকম কিছু হয়, দু'জনকেই প্লেন থেকে নামিয়ে দেবে। আমাকে ভর্তি করবে হাসপাতালে। নয় বছর বয়েসি নুহাশ তখন কী করবে?

দেশে ফিরে ঠিক করলাম, আর না। অতি দূরের দেশে আর যাব না। আমেরিকায় কখনো না।

তারপরেও ব্যাগ-স্যুটকেস গোছাতে হলো। আবার আমেরিকা। তবে এবার অন্য একজনের তল্পিবাহক হিসেবে। সেই অন্য একজনের নাম মেহের আফরোজ শাওন। সে *চন্দ্রকথা* ছবিতে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে। বলিউড অ্যাওয়ার্ড। জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার দেওয়া হবে।

আমার জন্যেও কী কী পুরস্কার যেন আছে। পুরস্কার নেওয়ার জন্যে আমেরিকায় যাওয়ার মানুষ আমি না। আমি যাচ্ছি শাওনের জন্যে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, শাওনের নতুন দেশ দেখার আগ্রহ যেমন আছে, পুরস্কার নেওয়ার আগ্রহও আছে।

এখন বিদেশে পুরস্কার বিষয়ে কিছু বলি। বেশ কয়েক বছর ধরে এটা শুরু হয়েছে। লন্ডন, আমেরিকা এবং দুবাইয়ে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়।

শ্রেষ্ঠ গায়ক
শ্রেষ্ঠ গায়িকা
শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী
শ্রেষ্ঠ নায়ক
শ্রেষ্ঠ নায়িকা
... ...

অনেক ক্যাটাগরি। বড় হল ভাড়া করা হয়। টিকিট বিক্রি করা হয়। টিকিট বিক্রির টাকাতেই খরচ উঠে আসে। টিভি রাইট বিক্রি হয়, সেখান থেকে টাকা আসে। সবচেয়ে বেশি টাকা আসে স্পন্সরদের কাছ থেকে। স্পন্সরের ব্যাপারটা খোলাসা করি। মনে করা যাক, আপনি একজন জনপ্রিয় নায়িকা। আপনাকে একটি পুরস্কার (ভারী ক্রেস্ট, ঠিকমতো ধরতে হবে। হাত ফসকে পায়ে পড়লে জখম হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা) দেওয়া হবে। যিনি পুরস্কার হাতে তুলে দেবেন তিনিই স্পন্সর। তিনি পুরস্কার দেওয়ার সময় হাসিমুখে আপনার সঙ্গে ছবি তুলবেন। আপনার বিষয়ে এবং নিজের বিষয়ে দু'টি কথা দশটি কথাতে গড়াবে। পুরো সময়টাতেই বিনয়ী ভঙ্গি করে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

রাত ন'টার দিকে আমি এবং শাওন পৌঁছলাম নিউইয়র্কের হোটেল রেডিসনে। পুরস্কার কমিটি আমাদের সেখানেই রাখার ব্যবস্থা করেছেন। হোটেল লবিতে পৌঁছে মোটামুটি বেকায়দা অবস্থায় পড়লাম। শিল্পীরা চারদিকে ঘুরঘুর করছেন। তাদের কারও সঙ্গেই আমার তেমন পরিচয় নেই। মহিলা শিল্পীরা সবাই সঙ্গে তাদের গার্জেন নিয়ে এসেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা, তাঁরা সিরিয়াস সাজ দিয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক ঘসে টকটকে লাল করে মহানন্দে ঘুরছেন। তাঁদের আনন্দ চোখে পড়ার মতো। শিল্পী-কন্যাদের কারণে আমেরিকা ভ্রমণ বিনে পয়সায় হচ্ছে। আনন্দিত হওয়ারই কথা। এমন গুণী মেয়ে পেটে ধরা সহজ কর্ম না। এই ক্যাটাগরির এক মা আবার আমাকে চিনে ফেলে কাছে এসে জানতে চাইলেন—শিল্পী যারা এসেছেন তাদের জন্যে ডেইলি কোনো অ্যালাউন্স আছে কি না। আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে জানালাম, এই বিষয়টি আমি জানি না। তিনি বললেন, থাকা উচিত। তিনি এর আগে মেয়ের সঙ্গে লন্ডনে পুরস্কার নিতে গেছেন, সেখানে মেয়েকে হাতখরচ দেওয়া হয়েছে।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

ভদ্রমহিলা বললেন, বুঝলেন হুমায়ূন ভাই, নিজ থেকে চেয়ে নিতে হবে। অনুষ্ঠানের আগেই নিতে হবে। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে আয়োজকরা আপনাকে চিনতেই পারবে না।

আমি আবারো বললাম, ও আচ্ছা।

ভদ্রমহিলা এই পর্যায়ে নতুন কাউকে আবিষ্কার করে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। সম্ভবত তিনি আয়োজকদের কেউ।

অনেক রাতে আমাদের জন্যে ঘরের ব্যবস্থা হলো। জানানো হলো, গণখাবারের ব্যবস্থা আছে। কুপন দেখিয়ে খেতে হবে। কোনো এক প্রতিষ্ঠান খাবার স্পন্সর করেছে। কোথায় গিয়ে খাব, কুপনই বা কোথায় পাব, কিছুই জানি না। শাওন বলল, চলো বাইরে চলে যাই। ম্যাকডোনাল্ডের হামবার্গার খেয়ে আসি। আমি খুব উৎসাহ বোধ করছি না। প্রথমত, রাত অনেক হয়ে গেছে—ম্যাকডোনাল্ড খুঁজে বের করা সমস্যা হবে। দ্বিতীয়ত, নিউইয়র্ক খুব নিরাপদ শহরও নয়।

আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন ব্যান্ড তারকা জেমস। নিজেই খাবার এনে দিলেন। আর কিছু লাগবে কি না অতি বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তাঁকে বললাম, আপনার মা নিয়ে গাওয়া গানটি শুনেছি। মা নিয়ে সুন্দর গান করলেন, শাশুড়িকে নিয়ে গান নেই কেন? প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, শাশুড়িরা জামাইকে মায়ের চেয়েও বেশি আদর করে।

আমার কথা শুনে ঝাঁকড়া চুলের জেমস কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎই হোটেল কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলেন। এমন প্রাণময় হাসি আমি অনেক দিন শুনি নি।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি জমকালো। লোকে লোকারণ্য। সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। আয়োজকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। উত্তেজনার মূল কারণ, একজন ভারতীয় শিল্পী রাণী মুখার্জি (ছায়াছবি *ব্ল্যাক* খ্যাত) দয়া করে পুরস্কার নিতে রাজি হয়েছেন। তিনি নাকি যে-কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারেন। শুধু পুরস্কার হাতে তুলে নেবেন—এই কারণে তাঁকে বিপুল অঙ্কের ডলার দিতে হচ্ছে। এই নিয়েও আয়োজকদের দুশ্চিন্তা নেই। কারণ স্পন্সরদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে এই বিশেষ পুরস্কারটি স্পন্সর করা নিয়ে। ডলার কোনো সমস্যা না, রাণী মুখার্জির হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার দুর্লভ সম্মান পাওয়াটাই সমস্যা।

রাণী মুখার্জি এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে বডিগার্ড। বাংলাদেশের অনেক শিল্পী ও শিল্পীর মায়েরা আধাপাগল হয়ে গেলেন। তাদের আহ্লাদী দেখে আমি দূর থেকে লজ্জায় মরে গেলাম। একবার মনে হলো, জাতিগতভাবেই কি আমরা হীনমন্য? কবে আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস ফিরে পাব? রাণী মুখার্জিকে নিয়ে আহ্লাদীর একটা উদাহরণ দেই। আমাদের দেশের একজন অভিনেত্রী ছুটে গেলেন। গদগদ ভঙ্গিতে ইংরেজি এবং

হিন্দি মিশিয়ে বললেন, আমি বিশ্বাস করছি না আমি আপনাকে চোখের সামনে দেখছি। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে একটু জড়িয়ে ধরতে চাই।

রাণী মুখার্জি : Please no. You can take picture.

বাংলাদেশি অভিনেত্রী : আমি কোনো কথা শুনব না। আমি আপনাকে ছুঁয়ে দেখবই।

রাণী মুখার্জি : Don't touch me. Take picture.

বাংলাদেশি অভিনেত্রী : আপনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক না করলে আমি মরেই যাব।

রাণী মুখার্জি নিতান্ত অনিচ্ছায় এবং বিরক্তিতে হাত বাড়ালেন। বাংলাদেশের নামি অভিনেত্রী সেই হাত কচলাতে লাগলেন।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনে কখনো বিদেশে কোনো পুরস্কার নিতে যাব না। এই জাতীয় দৃশ্য দ্বিতীয়বার দেখার কোনো সাধ আমার নেই।

বাংলাদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে যেমন হীনমন্যতার ব্যাপার আছে, লেখকদের মধ্যেও আছে। তার একটি গল্প করি।

বাংলাদেশে জনৈক লেখক (নাম বলতে চাচ্ছি না) গিয়েছেন কোলকাতায়। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। বাড়ি খুঁজে বের করে অনেকক্ষণ কলিংবেল টেপাটেপি করলেন। তাঁকে অবাক করে দিয়ে সত্যজিৎ রায় নিজেই দরজা খুললেন। তবে পুরোপুরি খুললেন না। প্রবেশপথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। লেখক বৈঠকখানায় ঢুকতে পারছেন না। লেখক বললেন, আমার নাম ... আমি বাংলাদেশের একজন লেখক। নানান বিষয়ে বিশেষ করে শিশুসাহিত্যে আমার অনেক বই প্রকাশিত এবং সমাদৃত হয়েছে।

সত্যজিৎ : ও আচ্ছা।

লেখক : আমি আপনার ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর উপর বিশাল একটি বই লিখেছি।

সত্যজিৎ : ও আচ্ছা।

লেখক : আমি আপনার বাবা সুকুমার রায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে একটা বই লিখেছি।

সত্যজিৎ : হুঁ।

লেখক : আমি আপনার উপরও একটি বই লিখেছি।

সত্যজিৎ : ধন্যবাদ।

লেখক : আপনার উপর লেখা বইটি আমি নিজের হাতে আপনাকে দিতে এসেছি।

সত্যজিৎ : আমাব বাড়িটা ছোট। এত বই রাখার জায়গা আমার নেই। কিছু মনে করবেন না।

সত্যজিৎ রায় ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি এই গল্পটি অনেকের কাছে শুনেছি। সর্বশেষ শুনেছি *প্রথম আলো* পত্রিকার সাজ্জাদ শরীফের কাছে। যারা বাংলাদেশের ওই লেখকের নাম জানতে আগ্রহী, তারা সাজ্জাদ শরীফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্থান : হোটেল রেডিসনের ঘর।

সময় : সকাল দশটা।

হোটেলের রুমসার্ভিসকে টেলিফোন করেছি নাশতা দিয়ে যাওয়ার জন্যে। নিজের টাকা খরচ করে খাব, আয়োজকদের উপর ভরসা করব না। রুমসার্ভিস থেকে আমাকে জানানো হলো, বাংলাদেশের গেস্টদের যে সব ঘর দেওয়া হয়েছে সেখানে রুমসার্ভিস নেই।

ভালো যন্ত্রণায় পড়লাম। নাশতার কুপনও নেই। জেমসকেও আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না যে তার কাছে সাহায্য চাইব। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। কেউ যেন অতি সাবধানে দু'বার বেল টিপেই চুপ করে গেল। আর সাড়াশব্দ নেই। আমি দরজা খুলে হতভম্ব। হাসি হাসি মুখে তিন মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। একজন *অন্যদিন* পত্রিকার সম্পাদক মাজহার। সে এসেছে বাংলাদেশ থেকে। আরেকজন অভিনেতা স্বাধীন, সে এসেছে লন্ডন থেকে। তৃতীয়জন এসেছে কানাডা থেকে, *অন্যদিন*-এর প্রধান সম্পাদক মাসুম। বর্তমানে কানাডাপ্রবাসী। তারা তিনজন যুক্তি করে আমাকে কোনো কিছু না জানিয়ে একই সময় উপস্থিত হয়েছে শুধুমাত্র আমাকে এবং শাওনকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে।

আমরা সারপ্রাইজড হলাম, আনন্দিত হলাম, উল্লসিত হলাম। আমার জীবনে আনন্দময় সঞ্চয়ের মধ্যে এটি একটি। তারা অতি দ্রুত রেন্ট-এ-কার থেকে বিশাল এক গাড়ি ভাড়া করে ফেলল। যতদিন আমেরিকায় থাকব ততদিন এই গাড়ি আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাব।

কোথায় যাওয়া যায়?

আমেরিকায় মুগ্ধ হয়ে দেখার জায়গার তো কোনো অভাব নেই। পর্বত দেখতে হলে আছে Rocky mountain, জনডেনভারের বিখ্যাত গান Rocky mountain high, সমুদ্র দেখতে হলে ক্যালিফোর্নিয়া। জঙ্গল দেখতে হলে মন্টানার রিজার্ভ ফরেস্ট, ন্যাশনাল পার্ক। গিরিখাদ দেখতে হলে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। যে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখে লেখক মার্ক টুয়েন বলেছিলেন, যে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না সে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখলে ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে বাধ্য।

প্রকৃতির বিচিত্র খেলা দেখতে উৎসাহী? তার জন্যেও আমেরিকা। আছে ওল্ড ফেইথফুল। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে বিপুল জলরাশি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উঠে আসে আকাশে। আছে যশোহা বৃক্ষ নামের অদ্ভুত বৃক্ষের বন। দেখলে মনে হবে অন্য কোনো গ্রহে চলে এসেছি। আছে ক্রিস্টাল কেভস। মাটির গভীরে বর্ণাঢ্য কৃস্টালের গুহা। দেখলে মনে হবে

হীরকখণ্ড দিয়ে সাজানো। আছে প্যাট্রিফায়েড ফরেস্ট। পুরো জঙ্গল অতি বিচিত্র কারণে পাথর হয়ে গেছে। যে জঙ্গলে ঢুকলেই রূপকথার জাদুকরদের কথা মনে হয়।

কোথায় কোথায় যাওয়া হবে, কী কী দেখা হবে তা নিয়ে পুরো একদিন গবেষণার পর আমরা রওনা হলাম আটলান্টিক সিটিতে। শাওনের ধারণা হলো নিশ্চয় অপূর্ব কিছু দেখতে যাচ্ছি। সে যতই জানতে চায় আটলান্টিক সিটিতে কী আছে আমি ততই গা মুচড়ামুচড়ি করি। ভেঙে বলি না। কারণ আটলান্টিক সিটি হলো গরিবের লাস ভেগাস। জুয়া খেলার ব্যবস্থা ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। একজন বঙ্গললনাকে তো বলা যায় না, আমরা যাচ্ছি জুয়া খেলতে। বঙ্গললনারা সবাই *দেবদাস* পড়েছেন। মদ এবং জুয়া কী সর্বনাশ করে তা তারা জানেন।

পবিত্র কোরান শরিফে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> 'দুইয়ের মধ্যেই মানুষের জন্যে কিঞ্চিৎ উপকার আছে। তবে উপকারের চেয়ে ওদের দোষই বেশি।' (সূরা বাকারা, ২-২১৯)

সূরা বাকারার এই আয়াতটির অনুবাদ একেক জায়গায় একেক রকম দেখি। নিজে আরবি জানি না বলে আসল অনুবাদ কী হবে বুঝতে পারছি না। আরবি জানা কোনো পাঠক কি এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবেন?

অনেক অনুবাদে আছে—'উপকারের চেয়ে ওদের অপকারই বেশি। এর পরেও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'

আবার অনেক অনুবাদে 'এরপরেও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?' অংশটি নেই। এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের *কোরান শরীফ সরল বঙ্গানুবাদ*, সেখানে 'এরপরেও কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না' অংশটি নেই।

জুয়াতে যে 'কিঞ্চিৎ উপকার' আছে তার প্রমাণ মাজহার আটলান্টিক সিটিতে পৌঁছামাত্র পেল। স্লট মেশিনে প্রথমবারেই Jack pot, ট্রিপল সেভেন। একটা কোয়ার্টার ফেলে সে পেল সাত হাজার ইউএস ডলার। ঢাকা-নিউইয়র্ক যাওয়া-আসার খরচ উঠে গেল।

কাছের কাউকে জ্যাকপট পেতে আমি কখনো দেখি নি। ব্যাপারটায় অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না, কারণ মাজহার আবারও একটি জ্যাকপট পেল। প্রিয়জনদের সামান্য উন্নতি সহ্য করা যায়। বেশি সহ্য করা যায় না। মানুষ হিংসুক প্রাণী।

আমরা কেউ মাজহারের সঙ্গে কথা বলি না। সে চৌদ্দ হাজার ডলারের মালিক। বাংলাদেশি টাকায় ১২ লাখ টাকা। মেশিনের হ্যান্ডেল কয়েকবার টেনে বার লক্ষ টাকা যে পায় তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অর্থহীন। আমরা যে মাজহারকে পাত্তা দিচ্ছি না সে এটা বুঝতেও পারছে না। নিজের মনে মহানন্দে নানাবিধ জুয়া খেলে যাচ্ছে—রুলেট, ফ্লাশ, স্পেনিশ টুয়েন্টি ওয়ান। জুয়া খেলার টাকার অভাব এখন আর তার নেই। বড় বড় দান ধরে সে আশেপাশের সবাইকে চমকে দিচ্ছে। আরবের শেখ গুষ্টি পর্যন্ত চমকিত।

একফাঁকে বলে নেই—ধর্মপ্রাণ (?) এবং ধনবান আরবদের একটি বড় অংশ আমেরিকায় আসেন জুয়া খেলতে। রুলেটের টেবিলে গম্ভীর তঙ্গিতে বসে থাকেন। তাঁদের হাতে থাকে তসবি। সামনের গ্লাসে অতি দামি হুইস্কি। জুয়া এবং মদ্যপানের মধ্যেও তাঁরা মহান আল্লাহকে ভুলেন না। তসবি টানতে থাকেন।

সূরা বাকারার আয়াত মাজহারের ক্ষেত্রে খেটে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ তার সব জেতা টাকা চলে গেল। নিজের পকেট থেকেও গেল। কত গেল এটা সে বলে না। প্রশ্ন করলে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। সে বলল, এটা শয়তানের আখড়া। শয়তানের আখড়ায় আর এক মুহূর্ত থাকা ঠিক না। আমাদের এক্ষুনি অন্য কোথাও চলে যাওয়া প্রয়োজন। আমেরিকায় এত কিছু আছে দেখার, সেইসব বাদ দিয়ে ক্যাসিনো ভ্রমণ, ছিঃ!

মাজহারের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে আটলান্টিক সিটি ছেড়ে আমরা রওনা হলাম ওয়াশিংটন ডিসির দিকে। ওয়াশিংটন ডিসি হলো মিউজিয়াম নগরী। কতকিছু আছে দেখার। এক স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামেই তো দু'দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। সেখানে আছে রাইট ব্রাদার্সের বানানো প্রথম বিমান। যে লুনার মডিউল চাঁদে নেমেছিল, সেই লুনার মডিউল। চাঁদের পাথর। যে পাথরে হাত রেখে ছবি তোলা যায়।

আমাদের গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে ছুটছে। ঘন্টা দুই পার হয়েছে, হঠাৎ আমাদের মনে হলো গভীর রাতে আমরা ওয়াশিংটন পৌছব। হোটেল ঠিক করা নেই। সমস্যা হতে পারে। সঙ্গে মেয়েছেলে (শাওন) আছে। মেয়েছেলে না থাকলে অন্য কথা। তারচেয়ে বরং আটলান্টিক সিটিতে যাই। সেখানে হোটেলে আরামে রাত কাটিয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আমরা আটলান্টিক সিটিতে পৌঁছেই ক্যাসিনোতে ঢুকে গেলাম। মাজহার আরও হারল।

পরদিন শাওন খুব হইচই শুরু করল। মেয়েদের বেশির ভাগ হইচই যুক্তিহীন হয়। তারটায় যুক্তি আছে। সে বলল, আমি জীবনে প্রথমবার আমেরিকায় এসেছি। আবার আসতে পারব কি না তার নেই ঠিক। আমি কি স্লট মেশিনের জঙ্গল দেখে বেড়াব? আর কিছুই দেখব না?

তাকে শান্ত করার জন্যে পরদিন রওনা হলাম ফিলাডেলফিয়া। ফিলাডেলফিয়াতে ক্রিস্টাল কেইভ দেখব। কিছু ভুতুড়ে বাড়ি আছে (Haunted house), সে সব দেখব। ভূতরা দর্শনার্থীদের নানাভাবে বিরক্ত করে। কিছু কিছু ভূত আবার দৃশ্যমানও হয়। আমার অনেক দিনের ভূত দেখার শখ। তার জন্যে ফিলাডেলফিয়া ভালো শহর।

বিকেলে এক রেস্টুরেন্টে চা খাওয়ার পর মনে হলো—টিকিট কেটে ভূত দেখা খুবই হাস্যকর ব্যাপার। ভূত ছাড়া এই শহরে দেখারও কিছু নেই। Crystal cave-ও তেমন কিছু না। ঝলমলে কিছু ডলোমাইট। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করি কোথায় যাওয়া যায়।

শাওন বলল, ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্যে সেই আটলান্টিক সিটিতেই যেতে হবে? এখানে মাথা ঠান্ডা হবে না?

আমি বললাম, অবশ্যই হবে। তবে এখানে হোটেলের তাড়া অনেক বেশি। আটলান্টিক সিটিতে সস্তা।

আবারও গাড়ি চলল আটলান্টিক সিটির দিকে। সফরসঙ্গীরা ফিলাডেলফিয়াতে এসে মুষড়ে পড়েছিল। আবারও তাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেল। স্বাধীন অতি আনন্দের সঙ্গে বলল, হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর মজাই অন্যরকম।

প্রিয় পাঠক সম্প্রদায়, আপনারা যদি মনে করেন আমরা আটলান্টিক সিটির জুয়াঘর ছাড়া আমেরিকায় আর কিছুই দেখি নি তাহলে ভুল করবেন।

নায়েগ্রা জলপ্রপাত নামক বস্তুটি দেখেছি। আমরা যেন পাহাড় ভেঙে নামা বিপুল জলধারা তালোমতো দেখতে পারি, প্রকৃতির এই মহাবিস্ময় পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি, তার জন্যে দু'দিন দু'রাত নায়েগ্রাতেই পড়েছিলাম। এখানে অবশ্যি রাজনীতিবিদদের তাষায় একটি সূক্ষ্ম কারচুপি আছে। নায়েগ্রাতে ক্যাসিনো আছে। এদের জুয়া খেলার ব্যবস্থাও অতি উত্তম।

এলেম শ্যামদেশে

শ্যামদেশের আমি নাম দিয়েছি 'গা-টেপাটেপির দেশ'। যে-দেশের প্রধান পণ্য Massage, সে-দেশের এই নাম খুব খারাপ নাম না। 'থাই ম্যাসাজ পৃথিবীর সেরা' বলে কোনো জাতি যে অহঙ্কার করতে পারে এই ধারণাই আমার ছিল না। সব নাকবোঁচা জাতির কাছে কি এই দলাইমলাই অতি গুরুত্বপূর্ণ ? খাড়া নাকের মানুষদের মধ্যে তো এই প্রবণতা নেই।

মঙ্গোলীয় জাতি ঘোড়া নির্ভর ছিল। ঘোড়াকে প্রতিদিন দলাইমলাই করতে হতো। ব্যাপারটা কি সেখান থেকে এসেছে ? ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় শরীর ব্যথা। সেই ব্যথা সারাবার জন্যে ম্যাসাজ। ঘোড়া বিদায় হয়েছে কিন্তু তার দলাইমলাই রেখে গেছে, ব্যাপারটা কি এরকম ? পাখি চলে গেছে কিন্তু তার পালক রেখে গেছে।

শ্যামদেশ ভ্রমণের ব্যাপারে আমাকে প্রথম যিনি আগ্রহী করতে চেষ্টা করেন তাঁর নাম মাহফুজুর রহমান খান। আমার ক্যামেরাম্যান। ব্যাংককের 'পাতায়া' নামক জায়গার কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ সবসময় ভেতর থেকে খানিকটা বের হয়ে আসে। চেহারায় 'আহা আহা' ভাব চলে আসে।

কী জায়গা! স্যার, একবার যেতেই হবে। পাতায়া না গেলে মানব জীবনের বিরাট অংশই বৃথা। স্যার, বলেন কবে যাবেন পাতায়া ? আমি যত কাজই থাকুক, আপনার সঙ্গে যাব।

এই ধরনের অতি উচ্ছ্বাসে কিছুটা আগ্রহ দেখানো ভদ্রতা। আমি ভদ্রতার ধারেকাছে না গিয়ে বলি—গা টেপার দেশে আমি যাব না।

মাহফুজুর রহমান খান বললেন, আপনি গা টেপাবেন না। সেখানে মসজিদ আছে। আপনি মসজিদে নফল নামাজ পড়বেন।

ব্যাংকক বিষয়ে দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস পাওয়া গেল শাওনের কাছে। মাহফুজুর রহমান 'পাতায়া'। শাওন 'ফুকেট'। ফুকেটের নীল সমুদ্র, স্কুভা ডাইভিং, দূরের নীল পাহাড়, অতি সস্তায় কেনাকাটা! ইত্যাদি।

আমার কাছে একটি গ্রন্থ আছে, নাম 'পৃথিবীর এক হাজার একটি অপূর্ব প্রাকৃতিক বিস্ময়, মৃত্যুর আগে যা দেখা তোমার অবশ্য কর্তব্য।' (*1001 Natural wonders you must see before you die*) বইটি প্রায়ই আমি নেড়েচেড়ে দেখি। মৃত্যু তো ঘনিয়ে এল—এক হাজার একের কয়টায় ক্রস মার্ক দিতে পারলাম তার হিসাব। বইটিতে বাংলাদেশের একটি মাত্র এন্ট্রি—'সুন্দরবন'। যেন সুন্দরবন ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। মাহফুজ-শাওনের প্রায় স্বপ্নপুরী শ্যামদেশের ব্যাপারে বইটি কী বলছে দেখতে গিয়ে পাতা উল্টালাম। আমি হতভম্ব। শ্যামদেশের এন্ট্রি আছে তেত্রিশটি—কেয়াং সোফা

জলপ্রপাত, ফু রুয়া রক ফার্মশন, দুই ইনথন পর্বত... । এর মধ্যে একটা এন্ট্রি আমার মন হরণ করল—Naga Fireballs. এখানের ঘটনা হচ্ছে, প্রতিবছর এগারো চন্দ্রমাসের পূর্ণচন্দ্রের রাতে মেকং নদীর এক শ' কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে নদীর তেতর থেকে শত শত আগুনের গোলা উঠে আসে। অগ্নিগোলক টেনিস বল আকৃতির। সাড়ে তিন শ' ফুট উঁচুতে উঠে মিলিয়ে যায়। যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিতে পারছে না।

মৃত্যুর আগে আর কিছু দেখি না-দেখি পূর্ণিমায় আগুনের গোলা দেখতেই হবে। আমি আমার ভ্রমণ বিষয়ক পোর্টফোলিওর প্রধান মাজহারকে ডেকে বললাম, ম্যাসাজ করাবে ?

সে কাচুমাচু হয়ে বলল, জি-না। ম্যাসাজের অভ্যাস আমার নেই।

আমি বললাম, অভ্যাস নাই অভ্যাস করাবে। প্রথম প্রথম সিগারেট টানতে কুৎসিত লাগে। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে মহানন্দ। বিয়ারের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার—প্রথম চুমুকে তিতা বিষের মতো এক বস্তু, তারপর ক্যায়া মজা! যাই হোক, ব্যাংককে যাব মনস্থ করেছি। ব্যবস্থা করো।

মাজহার একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলল। প্যাকেজ প্রোগ্রাম। পৃথিবী প্যাকেজের আওতায় চলে এসেছে, সবকিছুতেই প্যাকেজ।

আমরা যথাসময় ব্যাংককের এয়ারপোর্টে নামলাম। দেশের বাইরে বাংলা নামের এয়ারপোর্ট 'সুবর্ণভূমি'। বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে আমাদের সফরসঙ্গীদের একজন আনন্দে এবং উত্তেজনার আধিক্যে বমি করে নিজেকে ভাসিয়ে ফেলল। এই সফরসঙ্গী সর্বকনিষ্ঠ, বয়স ছয় মাস। নাম অন্বয় মাজহার। ছয়মাস বয়েসি আমাদের আরেকজন সফরসঙ্গী আছে, তবে তার ছয়মাস মায়ের পেটে। শাওন তার সন্তান পেটে নিয়েই ঘুরতে বের হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে মায়ের আবেগ, অনুভূতি ও উচ্ছ্বাস গর্তস্থ সন্তান বুঝতে পারে। সেই অর্থে শাওনের সন্তানও সফর অনুভব করছে ধরে নেওয়া যায়। পেটের তেতরে হয়তো আনন্দে খাবি খাচ্ছে।

আমি এখন পর্যন্ত যে ক'টি দেশ দেখেছি তার প্রতিটিকেই (একমাত্র নেপাল ছাড়া) বাংলাদেশ থেকে উন্নত মনে হয়েছে এবং মনটা খারাপ হয়েছে। মন খারাপের একমাত্র কারণ—আমরা এত পিছিয়ে কেন! আমার সব বিদেশ ভ্রমণ মন খারাপ দিয়ে শুরু। কী সুন্দর ঝকঝকে রাস্তা! বাই লেন, ট্রাই লেন। কী সুন্দর শৃঙ্খলা। ট্রাফিক আইন কঠিনতাবে মানা হচ্ছে। দেশে সামরিক শাসন অথচ একটি মিলিটারিও চোখে পড়ছে না। আমরা যাচ্ছি পাতায়ার দিকে। যতই যাচ্ছি ততই মন খারাপ হচ্ছে। মন তালো হয়ে গেল পাতায়া পৌঁছে। আমার দেশের কক্সবাজারের সমুদ্রের কাছে এইসব কী ? অবশ্যই ওয়াক থু। ছি ছি! এর নাম সমুদ্র ? এই সেই সমুদ্র সৈকত ?

মনে হচ্ছে বড় এক দিঘি। সমুদ্র সৈকত নামের জায়গাটা বস্তির মতো ঘিঞ্জি। সমুদ্র থেকে একহাত জায়গা ছেড়ে চেয়ারের গায়ে চেয়ার লাগানো। চেয়ারের মাথায় ছাতা এত ঘন যে নিচটা অন্ধকার হয়ে আছে। শত শত ফেরিওয়ালা ঘুরছে। কাটা ফল, তাজা শুঁটকি, ডাব। গা মালিশওয়ালারা তেলের শিশি নিয়ে ঘুরছে। উল্কি আঁকাওয়ালারা ঘুরছে

উল্কির জিনিসপত্র নিয়ে। হাটবারের মতো মানুষ। এদের মধ্যে অসভ্য বুড়ো আমেরিকানরা কিশোরী পতিতাদের সবার সামনেই হাতাপিতা করছে। নিজ দেশে এই কাজ করলে তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেত। পয়সা খরচ করে মজা পেতে তারা এই দেশে এসেছে। তাদের চোখে এটা প্রসটিটিউটদের দেশ। সব মেয়েই প্রসটিটিউট।

পাতায়া থেকে হাজারগুণ সুন্দর আমার বাংলাদেশের সমুদ্র। কক্সবাজার, টেকনাফ, কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিন। আর বেলাভূমি—আহারে কী সুন্দর!

পাতায়া দেখে এই কারণেই আমার মন ভালো হয়ে গেল। একবার মন ভালো হয়ে গেলে সবকিছু ভালো লাগতে শুরু করে। আমি সফরসঙ্গীদের চমকে দিয়ে গায়ের শার্ট খুলে ফেললাম। এইখানেই থামলাম না, গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলাম, পেটে উল্কি আঁকব। আমাদের সামনে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকা বদ আমেরিকানটাকে দেখিয়ে বললাম, ওই ব্যাটা পেটে যে ছবি আঁকাচ্ছে সেই ছবি।

সফরসঙ্গী কমল বলল, হুমায়ূন ভাই, ওই ব্যাটা তো পেটে নেংটা মেয়েমানুষ আঁকাচ্ছে।

আমিও তা-ই আঁকাব। সেও বুড়ো আমিও বুড়ো।

যখন সফরসঙ্গীরা বুঝল আমি মোটেই রসিকতা করছি না, বাংলাদেশের লেখক ক্ষেপে গেছে তখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে রফা করা হলো—আমার পেটে বাঘের মুখের উল্কি আঁকা হবে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আমি পেটে বাংলার বাঘ নিয়ে ঘুরব। উল্কি আঁকা হলো। শুরু হলো আমার শ্যামদেশ ভ্রমণ। একদিনের মধ্যে চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে গেলাম। হোটেলে ফিরে ঘোষণা করলাম, এখানে যা আছে দেখা হয়ে গেছে। যৌনতা প্রদর্শনীর শহর। জীবনের আনন্দ যেখানে অতি স্থূল অর্থ গ্রহণ করেছে।

মাজহার বলল, পাতায়ায় আমাদের আরও তিনদিন থাকতে হবে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, কেন?

আমরা প্যাকেজে এসেছি। প্যাকেজে এখানে তিনদিন থাকার কথা।

তিনদিন আমি কী করব?

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। আসলেই তো, তিনদিন কী করা যাবে?

দ্বিতীয় দিন একই জায়গায় শুরু হলো। একই দৃশ্য। প্রাণহীন সমুদ্র, অতিরিক্ত প্রাণময় ইউরোপের বুড়োর দল। তরুণী থাই মেয়েদের সঙ্গে লটকা লটকিতে যারা অসম্ভব পারঙ্গম।

আমাদের দলে মহিলা আছে দু'জন—শাওন এবং মাজহারের স্ত্রী স্বর্ণা। তারা শপিংয়ে বের হলো। ফুটপাথ শপিং। তারাও যথেষ্ট বিরক্ত হলো। প্রতিটি দোকানে একই জিনিস। বাংলাদেশের মতো অবস্থা।

একটি জাতির মানসিকতা নাকি তাদের তৈরি খেলনা থেকে পাওয়া যায়। পথের দু'পাশে কিছুদূর পরপরই রবারের যৌনাঙ্গ নিয়ে লোকজন বসে আছে। বিক্রি হচ্ছে।

অদ্ভুত এই খেলনা দেখে মাজহার-পুত্র অমিয় কেনার জন্যে ঘ্যানঘ্যান শুরু করে মা-বাবা দুজনের হাতেই মার খেল। বেচারা মার খাওয়ার কারণ বুঝতে পারল না। তার মন পড়ে রইল অদ্ভুত ওই খেলনায়।

সন্ধ্যাবেলায় ওয়াকিং স্ট্রিট নামের এক রাস্তার পাশের রেস্টুরেন্টে সবাই বসে আছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে শঙ্কিত আরও দু'রাত কাটাতে হবে এই ভেবে, মন থেকে শঙ্কা দূর করে আনন্দে আছি এমন এক ভাব করার চেষ্টা করছি। আমাদের একজন সফরসঙ্গী আর্কিটেক্ট ফজলুল করিম শুধু অনুপস্থিত। বেচারার মন খারাপ। তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে গেছে। স্ত্রীকে নিয়ে এই পাতায়াতে সে অনেকবার এসেছে। এবার সে এসেছে একা। বাকি সবাই এসেছে সস্ত্রীক। ব্যক্তিগত পারিবারিক আনন্দ থেকে বঞ্চিত। প্রায়ই দেখি সে দল ছেড়ে একা ঘুরছে। আমাদের খারাপই লাগে। আজ সে আমাদের চমকে দিয়ে হাসিমুখে উপস্থিত হলো। তার সঙ্গে অতি রূপবতী এক থাই কন্যা। মায়াময় চোখ। উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ। মাথাভর্তি ঘন কালো চুল।

জানা গেল, করিম এই বান্ধবী জোগাড় করেছে। সে এখন থেকে করিমের সঙ্গেই থাকবে। প্রতিরাতে তাকে পাঁচ শ' বাথ দিতে হবে।

আমি অবাক হয়ে মেয়েটির নিষ্পাপ (?) মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দলের সবাই মেয়েটিব সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করল। আমরা ভাব করলাম যেন সে করিমের দীর্ঘদিনের চেনা কোনো তরুণী। কিছুটা সময় আমাদের সঙ্গে কাটাতে এসেছে। মেয়েটিও সহজ-স্বাভাবিক। ছয়মাসের অন্বয়কে কোলে নিয়ে আদর করছে। গল্প করছে।

এর মধ্যে মাজহার-পুত্র এক খেলনা কিনে নিয়ে এল। রিমোট কন্ট্রোলের গাড়ি। কিছুক্ষণ চলে, তারপর তালগোল পাকিয়ে যায়, আবার চলে। আমরা সবাই খেলনা দেখে মজা পাচ্ছি। থাই মেয়েটি জানতে চাইল, খেলনার দাম কত?

মাজহার বলল, পাঁচ শ' বাথ।

মেয়েটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, Me and Toy same same! 500 bath.

সরল বাংলায়—এই খেলনার সঙ্গে আমার কোনো প্রভেদ নেই। আমি এবং খেলনা একই মূল্য, পাঁচ শ' বাথ।

পাতায়া ভ্রমণ শেষে আমরা থাইল্যান্ডের অনেক সুন্দর জায়গায় গিয়েছি। এক হাজার এক প্রাকৃতিক লীলা সৌন্দর্যের ছটা দেখেছি। বইয়ে ক্রস মার্ক দিয়েছি। কিছুই কেন জানি আমাকে স্পর্শ করল না। কানে সারাক্ষণ থাই মেয়েটির করুণ গলা রেকর্ডের মতো বাজতে থাকল, Me and toy same same!

মানবজীবনের কী করুণ পরাজয়!

যশোহা বৃক্ষের দেশে

নেভার নেভার ল্যান্ড

এপ্রিল মাস।

অসহনীয় গরম পড়েছে। এই গরমে শুরু করেছি 'আগুনের পরশমণি' ছবির ইনডোর শুটিং। গুদামের মতো ফ্লোরে সেট সাজানো হয়েছে। হাজার হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলছে। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। প্রকাণ্ড দুটি ফ্যান অবশ্যি ঘুরছে। ফ্যানে শব্দ যত হচ্ছে বাতাস তত হচ্ছে না। সেই বাতাসেও আগুনের হলকা। গরমকে সহনীয় করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে চোখ বন্ধ করে বরফের দেশের কথা ভাবা—কনকনে শীতে তুন্দ্রা অঞ্চলে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছি—এই সব।

সেটের লাইটিং করা হচ্ছে। লাইটিং শেষ হতে ঘণ্টাখানিক লাগবে। আমার কিছু করার নেই। সেটের বারান্দায় বসে লাইটিংয়ের পদ্ধতি দেখতে দেখতে ভাবছি, আমি আসলে তুন্দ্রা অঞ্চলে। হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে 'ইগলু'র সামনে দাঁড়িয়ে। ভাবনাটা জমল না। নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হলো। যে জায়গা কখনো দেখি নি সে জায়গা নিয়ে ভাবব কীভাবে? তুন্দ্রা অঞ্চল বাদ থাক, অন্য কোনো শীতের দেশের কথা ভাবি। আচ্ছা, নর্থ ডাকোটার ফার্গো শহরের কথা ভাবলেই তো হয়। দীর্ঘ দিন ওই অঞ্চলে কাটিয়েছি। কী প্রচণ্ড শীতই না পড়ত। আলাস্কা থেকে উড়ে আসত হিমেল বাতাস, থার্মোমিটারের পারদ নামতে নামতে মাইনাস তিরিশ পর্যন্ত চলে যেত। একবার গাড়ি নিয়ে আটকা পড়লাম তুষারঝড়ে। ঠান্ডায় জীবন-সংশয়ের মতো হলো...

নিজের অজান্তেই আমি ফার্গো শহরের কথা ভাবতে শুরু করেছি এবং বাইরের গরম আর অনুভব করছি না—বরং খানিকটা শীত শীতই লাগছে। শুটিং শেষ করে বাসায় ফিরলাম নস্টালজিক হয়ে। কেবলই ফার্গো শহরের কথা মনে পড়তে লাগল। সেই শহরে প্রথম সংসার শুরু করলাম। ইউনিভার্সিটি হাউজিংয়ে থাকার জন্যে দোতলা বাড়ি দিয়েছে। দু'রুমের ইন্ডিপেন্ডেন্ট হাউজ। কী চমৎকার ছবির মতো বাড়ি! এক সন্ধ্যাবেলায় সে বাড়িতে উঠলাম আমি, গুলতেকিন এবং আমাদের প্রথম কন্যা ছ'মাস বয়সী নোভা। আসবাবপত্র আমাদের কিছু নেই। প্রথম রাতে দুটা কম্বল পেতে বিছানা করলাম। শুরু হলো সংসার। টাকাপয়সার খুব টানাটানি। চার শ' ডলার পাই। সেখান থেকে দেশে মা'কে কিছু পাঠাতে হয়। সারা মাস হাত প্রায় খালিই থাকে। কিছু টাকা জমলেই আমরা দোকানে চলে যাই—সংসারের জন্য জিনিস কেনা হয়। খুব সাহস করে গুলতেকিন একবার কোরেলের একটা সেট কিনে ফেলল—চারটা কাপ, চারটা প্লেট, চারটা পিরিচ। সে কী খুশি! সংসারে নতুন জিনিস এসেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও খুশি। ঝকঝকে নতুন প্লেটে ভাত খাওয়া হলো। চায়ের কাপে চা খাওয়া হলো। খাবারের শেষে সবকিছু খুব সাবধানে ধুয়ে মুছে রাখা হলো।

আমেরিকা নিয়ে আমার কত না মধুর স্মৃতি। প্রথম গাড়ি কিনলাম। লক্কড় ধরনের পুরনো গাড়ি। তাতে কী ? হর্ন তো বাজে, রাস্তায় চলে।

দ্বিতীয় মেয়ের জন্ম হলো—কত আনন্দময় ঘটনা! তারপব একদিন পিএইচডির ভাইভা শেষ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। উত্তেজনায় কাঁপছি—কী হয় কী হয়! প্রফেসর জেনো উইকস বের হয়ে এসে বললেন, আমি এখন তোমাকে ডক্টর হুমায়ূন সম্বোধন করতে পারি—Congratulations my boy. কত কষ্টের পর এই ডিগ্রি! চোখ ভিজে আসছে—প্রাণপণ চেষ্টা করছি যেন চোখের পানি চোখেই শুকিয়ে যায়, টপ করে গালে না পড়ে।

রাতে ভাত খাওয়ার সময় অনেকক্ষণ আমেরিকার গল্প করলাম। গল্প করতে করতে মনে হলো—আরেকবার যদি নর্থ ডাকোটায় যেতে পারতাম। স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো যদি দেখতে পারতাম। রাতের খাবার শেষ করে ঘুমুতে যাওয়ার আগে আগে একটা কাকতালীয় ব্যাপার হলো। নিউ জার্সি থেকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়কার বন্ধু ড. নবী টেলিফোন করে বলল, হুমায়ূন, তুমি কি আমেরিকা আসতে পারবে ? আমাদের নর্থ আমেরিকা-বাংলাদেশ মহাসম্মেলন হচ্ছে—আমরা তোমাকে গেস্ট অব অনার করতে চাচ্ছি। সেপ্টেম্বরের দুই-তিন সম্মেলনের তারিখ। আসবে ?

হ্যাঁ, আসব।

ভাবিকে কি নিয়ে আসবে ?

না, ওকে আনতে পারব না। এই সময় তার পরীক্ষা চলবে।

তুমি একাই চলে এসো। আমরা যথাসময়ে চিঠি পাঠাব।

ব্যাপারটি কেমন হলো ? যখন খুব তীব্রভাবে নর্থ ডাকোটা যাওয়ার জন্য ভাবছি তখনই নিমন্ত্রণ। এটা টেলিপ্যাথি ? টেলিপ্যাথি নামের ব্যাপারটা কি সত্যি আছে ? না সম্পূর্ণ কাকতালীয় যোগাযোগকেই অন্যরকম মনে হচ্ছে ?

দূরের দেশে ভ্রমণের সব ঠিকঠাক হলেই আমি হোমসিক বোধ করতে থাকি। হোমসিকের খুব সুন্দর একটা ময়মনসিংহের শব্দ আছে—'পেট পোড়া'। আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে সব ঠিকঠাক হওয়ার পর আমার পেট পুড়তে শুরু করল। আমি একা একা ঘুরব—আর সবাই পড়ে থাকবে এখানে। বাচ্চাগুলোর কত শখ আমেরিকা দেখার, ডিজনিল্যান্ড দেখার। ওদের শখ মিটিয়ে দিলে কেমন হয় ? আমার তিনটা মেয়ে, কোথায় না কোথায় এদের বিয়ে হবে! চলে যাবে দূরে দূরে। স্বামীরা হয়তো এদের নানাভাবে কষ্ট দেবে। বাবা হিসেবে যদি তাদের কিছু গোপন শখ পূর্ণ করে দিয়ে যেতে পারি, মন্দ কী ? সমস্যা হলো টাকার। এত টাকা পাব কোথায় ? ছবি বানানো নিয়ে দীর্ঘদিন ব্যস্ত আছি। লেখালেখি হচ্ছে না, লেখালেখি থেকে টাকা আসবে না। সঞ্চিত অর্থের সবটাই লেগেছে 'আগুনের পরশমণি' ছবিতে। তাহলে উপায় কী ? উপায় একটা হবেই। আমি আরেকবার লক্ষ করেছি—মনস্থির করলে আর কিছু আটকায় না। উদ্দেশ্য

একবার ঠিক করে ফেললে সেই উদ্দেশ্য পূরণের ব্যবস্থা হয়েই যায়। বাড়ি বানানোর জন্য ব্যাংক লোন দিয়েছে। লোনের টাকাটা নিয়ে চলে গেলে কেমন হয় ? ভালোই হয়।

শুক্রবার দুপুরে সবাই একসঙ্গে খেতে বসি। সেদিন খাবার টেবিলে মেয়েদের বললাম, তোমরা কি আমার সঙ্গে এক জায়গায় বেড়াতে যাবে ?

তিন কন্যা কোরাসের মতো বলল, না।

না কেন ?

বড় মেয়ে বলল, তার ইন্টারমিডিয়েট প্রি-টেস্ট পরীক্ষা। সে ভালোমতো পরীক্ষা দেবে। ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করবে না।

মেজো মেয়ে বলল, আমি জানি তুমি যাবে সেন্টমার্টিন। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সেন্টমার্টিন আমি মরলেও যাব না। যে ঢেউ!

সবচেয়ে ছোটটি বলল, তুমি যেখানে যাবে একগাদা লোকজন সঙ্গে নিয়ে যাও। ওদের সঙ্গে গল্প কর। আমার ভালো লাগে না।

তোমরা তাহলে যেতে চাও না ?

না।

কোথায় যাচ্ছি জানলে যেতে চাইতেও পার। জায়গাটার নাম—নেভার নেভার ল্যান্ড।

সেটা আবার কী ?

স্বপ্নের একটা দেশ। যে দেশে সহজে যাওয়া যায় না। আমেরিকা। যাবে তোমরা ?

সত্যি ?

হ্যাঁ, সত্যি।

ছোট মেয়ে খাওয়া রেখে এঁটো হাতে উঠে গেল। মনে হচ্ছে টেলিফোনে সে তার প্রিয় বান্ধবীকে খবর দিতে গেল।

বড় মেয়ে বলল, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

মেজোটিও বলল, আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না।

ছোটটি টেলিফোনে তার বান্ধবীকে পেয়েছে। খাবার টেবিলে বসে আমি তার উত্তেজিত কথাবার্তা শুনছি—

হ্যালো মৌরী, আমরা আমেরিকা যাচ্ছি। বলো তো তোমার জন্য কী আনতে হবে ?

গুলতেকিন বলল, তুমি চট করে মেয়েদের আমেরিকা যাওয়ার কথা বললে, সব ফাইনাল করে তারপর বলার দরকার ছিল—যদি টাকার জোগাড় না হয়।

টাকার ব্যবস্থা করে ফেলব।

ভিসা সমস্যা হয়তো হতে পারে। পুরো পরিবারকে কি আর একসঙ্গে ভিসা দেবে ? ওদের ভিসার যা কড়াকড়ি। ওরা আশা করে থাকল—তারপর দেখা যাবে ভিসা পাওয়া গেল না...

তাই তো, ভিসার কথা আগে মনে হয় নি—ফ্যাকড়া তো একটা রয়েই গেল।

বাংলাদেশের মানুষ তোমাকে খাতির করে। তারা তোমার নাটক-টাটক দেখেছে, বই পড়েছে। আমেরিকানরা তোমাকে খাতির করবে কেন? তারা তোমার নাটক দেখে নি, বইও পড়ে নি...।

ওরাও খাতির করল। এক মাসের ভিসা চেয়েছিলাম—ওরা সবাইকে এক বছরের ভিসা দিয়ে দিল।

এক সন্ধ্যায় কাঁধে ব্যাগ-প্যাক আর হাতে স্যুটকেস নিয়ে আমরা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে উঠলাম। আমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান নুহাশ খুব কথা শিখেছে। সে প্লেনে ওঠার আগে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎকার শুরু করল—আমি এত বড় প্লেনে উঠব না, ছোট প্লেনে উঠব।

নায়ে-গারা

আমি নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখতে চাই শুনেই আমার ছোটভাই জাফর ইকবাল এবং তার স্ত্রী ইয়াসমিন একসঙ্গে হেসে ফেলল। আমি তাদের হাসির কারণ ধরতে পারলাম না। পৃথিবীর সেরা জলপ্রপাতের একটি দেখতে চাওয়ার মধ্য হাস্যকর কী আছে ? আমি বোকার মতো ওদের দিকে তাকাচ্ছি। ইকবাল হাসির কারণ ব্যাখ্যা করল। তার কাছেই জানলাম—বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানি এই তিন জনগোষ্ঠীর কেউ আমেরিকা বেড়াতে এলে পকেটে করে কী কী দেখবে তার লিস্ট নিয়ে আসে। লিস্টের শুরুতে থাকে 'নায়েগ্রা ফলস'। এরা নায়েগ্রা ফলস না দেখে দেশে ফেরে না। অন্য কিছু দেখুক না-দেখুক নায়েগ্রা ফলস দেখবেই। ঢাকা শহরে গ্রাম থেকে কেউ বেড়াতে এলে যেমন চিড়িয়াখানা না দেখে ফেরে না, নায়েগ্রা ফলসও এশিয়ানদের চিড়িয়াখানা।

আমি বললাম, এটাই তো স্বাভাবিক। আমরা ছোটবেলা থেকে ভূগোল বইয়ে এই জলপ্রপাতের নাম পড়েছি। আমেরিকায় নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে—আমাদের ভূগোল বইয়ে তাদের তালিকা নেই। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কথাই শুধু আছে। কাজেই এই জলপ্রপাত নিয়ে আমাদের অনেক কল্পনাও আছে। আমেরিকায় আসব—কল্পনা বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব না ?

ইকবাল বলল, জলপ্রপাত তোমার না দেখাই ভালো হবে। কল্পনার সঙ্গে মিল খাবে না, মন খারাপ হবে। বর্তমানের নায়েগ্রা জলপ্রপাত হলো পোষা জলপ্রপাত।

পোষা জলপ্রপাত মানে ?

আমেরিকানরা জলপ্রপাতকে পোষ মানিয়ে ফেলেছে। একেবারে পুরোপুরি গৃহপালিত পশু। পাওয়ার জেনারেটর বসিয়েছে। মাঝে মাঝে এরা জলপ্রপাতের পানি পুরোটা বন্ধ করে দেয়। পানি বন্ধ করে পাওয়ারপ্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে। আবার পানি ছাড়ে। প্রাকৃতিক মহা বিস্ময়ের বিস্ময় এখন আর নেই।

তারপরেও আমি ঠিক করলাম, জলপ্রপাত দেখে যাই। আমাদের হিমছড়িতে একটা জলপ্রপাত আছে। ট্যাপের পানি যেমন পড়ে সেরকম ক্ষীণ জলধারা। অনেক ঝামেলা করে সেই জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছি। সেই টিপ টিপ করে পানি পড়া দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সিলেটের মাধবকুণ্ডের জলপ্রপাত দেখতেও কম ঝামেলা হয় নি। সেই জলপ্রপাত দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। নায়েগ্রা বাদ থাকবে কেন ?

আমার ব্যাটেলিয়ান পুত্র-কন্যা এবং স্ত্রী সব মিলিয়ে ছজন রওনা হলাম ট্রেনে করে। ভোর সাড়ে আটটায় রওনা হয়ে রাত সাড়ে আটটায় পৌঁছানো—বার ঘণ্টার যাত্রা। এর আগেও একবার এমট্রাকে করে দীর্ঘ ভ্রমণ করেছি। আইওয়া থেকে সানফ্রান্সিসকো প্রায় দুদিন দু'রাত। সে যাত্রায় আমার সঙ্গী ছিল গুলতেকিন। ভ্রমণ ছিল অসাধারণ। দোতলা

ট্রেন। একতলায় মালপত্র, বাথরুম, রেস্টুরেন্ট। দোতলায় যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা। অবজারভেশন ডেক নামে একটা কামরা আছে যার পুরোটাই কাচের তৈরি। এখানে বসে চারদিক দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। আমার দেখা জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য এই কামরায় বসেই দেখেছি। ট্রেন গিয়েছিল রকি মাউনটেইনের ভেতর দিয়ে। আহা কী দৃশ্য!

যাই হোক, নায়েগ্রাগামী এমট্রাকে চড়ে দারুণ হতাশ হলাম। কোনো অবজারভেশন ডেক নেই। ট্রেন চলছেও ধীরে ধীরে। আমার বড় মেয়ে বলল, বাবা, এরচেয়ে আমাদের বাংলাদেশের ট্রেনগুলো তো অনেক ভালো। জানালা খোলা যাচ্ছে না। জানালা দিয়ে মুখ না বের করলে ট্রেনে চড়ায় মজা কী?

আমারও কেমন যেন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে। দমবন্ধ কত প্রকার ও কী কী তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম আমি, যখন ট্রেনের ইন্টারকমে জানানো হলো—'এই ট্রেন পুরোটাই ধূমমুক্ত। কাজেই যাত্রীদের কেউ ধূমপান করতে পারবে না।' আমার পকেটে ভ্রমণের সময় আরাম করে টানার জন্য দু'প্যাকেট ডানহিল সিগারেট। ট্রেনে উঠে ধরাব বলে প্যাকেট এখনো খোলা হয় নি। এক-দু'ঘণ্টা হলে একটা কথা ছিল। পুরো বার ঘণ্টা সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বসে থাকব, খেতে পারব না—তা কী করে হয়? সিগারেট যারা খায় তারা তো কোনো অপরাধী না। কেন তাদের বেলাতেই এই শাস্তি? সিগারেট খাওয়া যাবে না, অথচ সমানে মদ বিক্রি হচ্ছে। একজন ট্রে তর্তি করে নিয়ে আসছে। আমার সামনের সিটের দুই আমেরিকান দুপুর পর্যন্ত মদ্যপান করে হেড়ে গলায় গান ধরল—

'লা, লা, ট্রা লা লা...'

মদ খেয়ে মাতাল হয়ে একটা কিছু ঘটানোর নজির আছে। সিগারেট খেয়ে কেউ কোনোদিন ভয়ংকর কিছু করেছে এমন নজির নেই। আমি দরবার করার জন্য গেলাম ট্রেনের কন্ডাকটরের কাছে। সে আমার যুক্তি মন দিয়ে শুনল। তারপর হতাশ তঙ্গিতে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, ট্রেন যখন কোনো স্টেশনে থামে তখন কি আমি নিচে নেমে সিগারেট খেতে পারি?

সে বলল, কোনো কোনো ট্রেনে এই ব্যবস্থা আছে, তবে এই ট্রেনে তাও নেই।

বলো কী!

তবে তোমার যদি প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকত তাহলে তুমি সিগারেট খেতে পারতে। প্রথম শ্রেণীর স্লিপিং কোচে সিগারেট খাওয়া যায়।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাচ্ছ যাদের ডলার আছে তারা নিষিদ্ধ কাজও করতে পারে?

কন্ডাকটর হেসে দিয়ে বলল, অবশ্যই পারে—এ তো অতি পুরাতন কথা। তুমি অস্থির হয়ো না। রাত আটটা কুড়ি মিনিটে ট্রেন নায়েগ্রা পৌঁছবে। তুমি আটটা একুশ মিনিটে সিগারেট ধরাতে পারবে।

ততক্ষণ আমি বেঁচে থাকব না। তার আগেই দমবন্ধ হয়ে মারা যাব।

সিগারেটের অভাবে এখন পর্যন্ত কেউ মারা গিয়েছে বলে শোনা যায় নি। তুমিও মারা যাবে না।

মারা গেলাম না ঠিকই, তবে অর্ধমৃত অবস্থায় নায়েগ্রা পৌঁছালাম। আমেরিকার ট্রেন লেট করে না যারা বলে তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আটটা কুড়িতে পৌঁছানোর কথা, আমরা পৌঁছালাম রাত দশটায়। স্টেশন থেকে হোটেলে যাব। ক্যাব ভাড়া করতে হবে। অনেক ক্যাব আছে, কেউ আমাদের নেবে না। কারণ আমরা হচ্ছি ছজন। পাঁচজনের বেশি ক্যাবে তোলার নিয়ম নেই। পুলিশ টিকিট দিয়ে দেবে। এত রাতে দুই ক্যাবে ভাগাভাগি করে যেতেও ইচ্ছা করছে না।

শেষ পর্যন্ত একজনকে পাওয়া গেল যে কিছু বেশি ডলারের বিনিময়ে এই বেআইনি কাজটি করতে রাজি আছে। শর্ত একটাই—একজনকে মাথা নিচু করে বসতে হবে যাতে পুলিশ দেখতে না পায়। আমি নিজেই মাথা নিচু করে বসতে রাজি হলাম। এসব ভেবেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ মাথা নিচু করার প্রার্থনা জানিয়ে কবিতা লিখেছেন।

হোটেলে পৌঁছেও আরেক বিপদ। আমরা একই পরিবারভুক্ত হলেও আমাদেরকে ফ্যামিলি রুম দেওয়া যাবে না। আমেরিকার আইন পাঁচ সদস্য পর্যন্ত পরিবার স্বীকার করে। ছয় সদস্যের পরিবারকে দুটো রুম নিতে হবে। নিলাম দু'টা ঘর। দুই রাত থাকতে হবে—গুনে গুনে চার শ' ডলার দিতে হলো। নিউজার্সি থেকে ট্রেন ভাড়া, হোটেল ভাড়া সব হিসাব করে দেখি, পনের শ' ডলারের চক্করে পড়ে গেছি। বাংলাদেশি টাকায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। এত টাকা খরচ করে শেষটায় কী দেখব? পোষা জলপ্রপাত?

সাদা চামড়ার প্রথম যে মানুষটি নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখেন তাঁর নাম জন লুইস হেনিপ্যান। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক। রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে যিশুর বাণী পৌঁছানোর জন্য যিনি নিজের জীবন নিবেদন করেছিলেন। ১৬৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সকালে তিনি এই জলপ্রপাতের সামনে এসে উপস্থিত হন। বিস্ময়ে তাঁর বাক রুদ্ধ হয়ে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনায় বসেন। প্রার্থনা শেষে উচ্চস্বরে বলেন—'প্রকৃতির এ মহা জলরাশির তুল্য কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও নেই। থাকতে পারে না।'

ফাদার জন লুইস হেনিপ্যানের বিস্ময় তিন শ' ষোল বছর পরে কতটুকু অবশিষ্ট আছে তা দেখার জন্য ভোরবেলা রওনা হলাম। গাইডেড ট্যুর। আমেরিকান গাইড রোবটের মতো কথা বলে যাচ্ছে। কেউ শুনছে কি শুনছে না তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। একগাদা তথ্য। একের পর এক দিয়ে যাওয়া। পানি পড়ছে ১৬৭ ফুট উপর থেকে। প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিয়ন গ্যালন। নায়েগ্রা নামটি এসেছে নায়া-গারা থেকে। নায়া-গারার অর্থ হলো দেবতার গর্জন।... ব্যাটা ঘ্যানঘ্যান করেই যাচ্ছে। তেরজন সদস্যের সে হচ্ছে গাইড। আমরা তেরজনই মহা বিরক্ত। আমাদের দলে আছেন রিপাবলিক অব কোরিয়ার এক রিটায়ার্ড জেনারেল। নাকচ্যাপ্টা মানুষেরা সাধারণত সহনশীল হয়। একপর্যায়ে তিনিও নাকচ্যাপ্টা হওয়া সত্ত্বেও মহা বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, গাইডের কথা তো কেউ শুনছে না—তারপরও সে বকবক করছে কেন?

গাইড বকবকানির চেয়েও খারাপ কাজ যা করছে তা হচ্ছে—আমাদের সব আজেবাজে জায়গায় ঘুরাচ্ছে। মূল জলপ্রপাতের কাছে নিচ্ছে না। প্রথম নিয়ে গেল হাইড্রলিক পাওয়ারপ্ল্যান্টে। মোসেস নামের এক ইঞ্জিনিয়ারের নামে পাওয়ারপ্ল্যান্টের

নাম। পাওয়ারপ্ল্যান্টের খুঁটিনাটি বিষয়ে সে দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করল। এক একটা টারবাইনের ওজন কত, কীভাবে তা বসানো হলো, বসাতে গিয়ে কতজন মারা গেল। বিতং বর্ণনা! আমরা এসেছি জলপ্রপাত দেখতে, পাওয়ারপ্ল্যান্টের টারবাইন কীভাবে কাজ করে সেটা জেনে কী হবে।

ঝাড়া দেড় ঘণ্টা পাওয়ারপ্ল্যান্টের বক্তৃতা শোনার পর সে আমাদের এক স্যুভেনিয়ারের দোকানে নিয়ে উপস্থিত করল। হাসিমুখে বলল, স্যুভেনিয়ার নাও। খালি হাতে ফিরলে বন্ধু-বান্ধবদের দেখাবে কী ?

আমরা স্যুভেনিয়ার কিনলাম। আকাশছোঁয়া দামে আজেবাজে জিনিস। দেশে ফিরে প্রথমই হবে এইগুলো ফেলে দেওয়া।

স্যুভেনিয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর সে আমাদের নিয়ে গেল নায়েগ্রা নদীর এক জায়গায়, যেখানে ঘূর্ণি হয় তা দেখাতে। আরে ব্যাটা, নদীর ঘূর্ণি দেখার জন্য তো এখানে আসি নি। এ তো দেখি মহা বিপদে পড়া গেল। সে এইখানে তার দীর্ঘতম বক্তৃতা শুরু করল। বক্তৃতার বিষয়বস্তু—ঘূর্ণিটা কেন হচ্ছে। তার বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছে সে নদী বিশেষজ্ঞ একজন। পিএইচডি প্রোগ্রামে বক্তৃতা দিচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে ব্যাটাকে ধাক্কা দিয়ে ঘূর্ণিতে ফেলে দিতে।

নয়টার সময় গাইডের সঙ্গে বের হয়েছি, এখন বাজে বারটা। সাড়ে তিন ঘণ্টার ট্যুরে তিন ঘণ্টা চলে গেছে, বাকি আছে আধ ঘণ্টা। এখনো মূল জলপ্রপাত দেখি নি। এর মানে কী ? আমার ক্ষীণ সন্দেহ হতে শুরু করল—হয়তো জলপ্রপাতই নেই। আজ বোধহয় পানি বন্ধ করে দিয়েছে। পানি থাকলে এর মধ্যে সে নিশ্চয়ই দেখাত।

বারটা দশ মিনিটে গাইড আমাদের নিয়ে গেল ছাগল দ্বীপে (গোট আইল্যান্ড)। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। এই প্রথম সে কোনো বক্তৃতা করল না। আমাদের মতোই মুখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল জলপ্রপাতের দিকে।

দীর্ঘ সময় চুপচাপ থাকার পর আমার মনে হলো—আমি এটা কী দেখছি ? যে বিস্ময় তিন শ' বছর আগে ফাদার হেনিপ্যানকে অভিভূত করেছিল, সেই বিস্ময় আমাকেও গ্রাস করল। আমার মনে হলো, প্রকৃতি নিজেকেই তার সৃষ্টিতে নানান ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেন। এখানে তিনি ভয়ংকর সুন্দররূপে নিজেকে প্রকাশ করছেন। যে মানুষ এই ভয়াবহ জলরাশিকে পোষ মানিয়েছে—প্রকৃতি নিজেকে তাদের ভেতরও প্রকাশ করেছেন। সেই মানুষও নমস্য।

আকাশ-চিঠি

বাচ্চারা আজ 'লায়ন কিং' দেখে এল। ওয়াল্ট ডিজনি প্রডাকশনের ছবি। আমেরিকায় সুপারহিট করেছে। আমেরিকার 'বেদের মেয়ে জোছনা'। আমেরিকা এখন লায়ন কিংময়। লায়ন কিং টি-শার্ট, লায়ন কিং খেলনা, লায়ন কিং জুতা, জামা-কাপড়। লায়ন কিংয়ে লায়ন কিংয়ে সয়লাব।

আমি নুহাশকে নিয়ে ঘরে বসে রইলাম। তাকে নিয়ে ছবি দেখতে যাওয়া যাবে না। হলের বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে সে বলবে, 'অন্ধকার হচ্ছে কেন?' তারপরই বিকট কান্না শুরু করবে। ইদানীং তার অন্ধকার ফোবিয়া হয়েছে।

মা এবং বোনেরা যে তাকে ফেলে চলে গেছে তা নিয়ে তাকে বিচলিত হতে দেখলাম না। সে এক হাতে পটেটো চিপস-এর প্যাকেট নিয়ে বিড়ালছানার পেছনে পেছনে ছোটাছুটি শুরু করল। আমার কিছুই করার নেই। বই পড়ব সে উপায় নেই। বইয়ে একবার মন বসে গেলে আশপাশের কোনো কিছু আমার খেয়াল থাকে না। সেই সময়ে নুহাশ রাস্তায় নেমে যেতে পারে। আমেরিকান বাড়িগুলো চারদিকে দেয়াল নেই, গেট নেই—বাচ্চাদের রাস্তায় নেমে যাওয়া খুব সহজ।

লায়ন কিং দেখে ওরা ফিরল ছ'টার সময়। বাচ্চারা অভিভূত। এত সুন্দর ছবি তারা নাকি জীবনে দেখে নি। এখন পর্যন্ত তারা যা দেখেছে সবই নাকি এই ছবির কাছে তুচ্ছ। বিপাশা ঘোষণা করল সে আরেকবার লায়ন কিং না দেখে আমেরিকা থেকে যাবে না, প্রয়োজনে সে তার নিজের টাকা থেকে টিকিট কাটবে।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল ছবি দেখার পর সবাই একসঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরে সূর্যাস্ত দেখব। বাচ্চারা যেতে রাজি হলো না। তাদের মাথায় তখনো ঘুরছে লায়ন কিং। তারা গোল হয়ে বসে সিংহের কাণ্ডকারখানার গল্প করবে। সমুদ্রে সূর্যাস্ত এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কক্সবাজারে সেই দৃশ্য অনেকবার দেখা হয়েছে।

ওদের ছাড়াই আমি রওনা হলাম। বাচ্চাদের মা'রও মনে হয় সূর্যাস্ত দেখার ইচ্ছা ছিল না। আমাকে ফেলে ছবি দেখতে গেছে এই অপরাধবোদের কারণেই হয়তো সে রওনা হলো।

ফজলু গাড়ি চালাচ্ছে, আমি বসেছি তার পাশে। গুলতেকিন পেছনে। গাড়ি যাচ্ছে হানটিংটন বিচের দিকে। আমেরিকানরা বলে হানংটন। মাঝখানের 'টি' তারা উচ্চারণ করে না। আমেরিকান একসেন্ট আর ব্রিটিশ একসেন্টের অনেক তফাতের একটি হচ্ছে 'টি'-এর উচ্চারণ। আমেরিকানরা 'টি' উচ্চারণ করবে না, ব্রিটিশরা করবে। আমেরিকানরা 'ওয়াটরকে' বলবে 'টি' বাদ দিয়ে—। সে এক আশ্চর্য কৌশল।

যাই হোক, আমরা বিচের দিকে যাচ্ছি। ফজলু আমাকে বুঝাচ্ছে ফ্রাইওয়ে এবং হাইওয়ের ভেতর তফাতটা কী। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল আকাশে। আকাশের গায়ে কী

যেন লেখা হচ্ছে—লেখা ঠিক না, ছবি আঁকা হচ্ছে। ব্যাপারটা কী ? এই জিনিস তো আগে দেখি নি। ফজলু বলল, প্রচুর ডলার খরচ করে আমেরিকানরা মাঝে মাঝে আকাশে ছবি আঁকে, ম্যাসেজ লেখে। ব্যাপারটা করা হয় ধোঁয়া দিয়ে। প্লেন থেকে ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে লেখার কাজটা করা হয়।

কী ধরনের লেখা ?

এই পদ্ধতি সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের মন জয় করার জন্য ব্যবহার করে। যেমন একটা হার্ট এঁকে তার নিচে লেখা হলো—'এলিজাবেথ, অ্যাই লাভ ইউ।' এলিজাবেথ যখন আকাশের গায়ে এই লেখা দেখল তখন সংগত কারণেই তার মন দ্রবীভূত হলো।

বাহ্‌, চমৎকার তো!

প্রপোজ করার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। বিকেলের দিকে হঠাৎ দেখবে আকাশে লেখা, 'ক্যাথিরিন, উইল ইউ মেরি মি ?—বব।'

টাকা কেমন লাগে ?

প্রচুর লাগে। উদ্ভট কোনো কিছুতে খরচ করতে আমেরিকানরা পিছপা হয় না।

উদ্ভট বলছ কেন, আমার কাছে তো খুবই মজা লাগছে।

মজা লাগলে পাঁচ হাজার ডলার খরচ করে তুমিও একটা ম্যাসেজ দিয়ে দাও।

আমি এবং গুলতেকিন গভীর আগ্রহ নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। কী লেখা হয় দেখার চেষ্টা করছি। যে লিখছে তার খুব কষ্ট হচ্ছে, কারণ প্রচণ্ড বাতাস। বাতাসে লেখা মুছে যাচ্ছে।

গুলতেকিন বলল, এত ঝামেলা, এত অর্থ ব্যয়ের পর যে বিয়ে সেই বিয়ে হয় ক্ষণস্থায়ী, এটাই আশ্চর্য।

ফজলু বলল, আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে, ওদের কাছে না। ওদের কাছে এটাই স্বাভাবিক। ওরা বলে, আমরা যতক্ষণ একসঙ্গে থাকি তীব্র ভালোবাসা নিয়ে থাকি। মোটামুটি ধরনের ভালোবাসা নিয়ে চল্লিশ বছর পাশাপাশি বাস করার চেয়ে তীব্র ভালোবাসা নিয়ে চার বছর জীবনযাপন করা অনেক ভালো।

আকাশে লেখা শেষ হয়েছে। দুটা প্রকাণ্ড হার্ট। হার্টের নিচে লেখা—'লুসি, ডোন্ট গো অ্যাওয়ে।'—লুসি চলে যেয়ো না।

লুসি কে আমরা জানি না। বান্ধবী না স্ত্রী ? না জানলেও আমরা বুঝতে পারি, লুসি বলে একজন কেউ ছিল, সে চলে যেতে চাচ্ছে। তাকে আটকানোর জন্য আকাশের গায়ে চিঠি লেখা হলো। হৃদয়ের হাহাকার ছড়িয়ে দেওয়া হলো আকাশে।

প্রশান্ত মহাসাগরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে সমুদ্র এবং আকাশ! এই ভয়াবহ সৌন্দর্যের ভেতর এক আমেরিকান যুবক কেঁদে কেঁদে বলছে, 'লুসি, ডোন্ট গো অ্যাওয়ে।'

আমি এবং গুলতেকিন মন খারাপ করে আকাশের গায়ে লেখার দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা দুজনই মনে মনে বললাম, লুসি তুমি যেয়ো না। তুমি থাকো। তুমি থাকো।

নিলামওয়ালা ছ' আনা

নিলামওয়ালা ছ' আনার দোকান এখন নেই। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এই জাতীয় দোকান ছিল। রঙ-বেরঙের জিনিস দিয়ে দোকানগুলো থাকত ঠাসা। দোকানির হাতে থাকত ঝুমঝুমি, মাথায় সঙ-এর টুপি। সে প্রাণপণে ডুগডুগি বাজিয়ে চিৎকার করত—

নিলামওয়ালা ছ' আনা
যা নিবি তাই ছ' আনা

আমেরিকায় গিয়ে আমার বাচ্চারা নিলামওয়ালার দোকান খুঁজে পেল। এদের স্থানীয় নাম নাইন্টি নাইন সেন্ট স্টোর। দোকানের সব জিনিসের দাম নাইন্টি নাইন সেন্ট। এক সেন্ট বেশি নয়, এক সেন্ট কমও নয়। আমেরিকার সব শহরে এ জাতীয় দোকান আছে—একাধিক আছে। এদের বিক্রিও ভালো। আমার ধারণা, এরা যেখানে যত বাজে জিনিস বা নকল জিনিস পায় কিনে নিয়ে এসে দোকানে সাজায়। নয়তো কী করে চুলের শ্যাম্পু নাইন্টি নাইন সেন্টে দেবে? বাইরে যার দাম ৩-৪ ডলার...।

যাই হোক, আমার তিন কন্যা দোকান দেখে মুগ্ধ। যা-ই দেখে তা-ই তাদের মনে ধরে যায়। ওই যে চুলের ক্লিপ, কী সুন্দর! কী সুন্দর! ওই যে সাবান। ওমা, কী সুন্দর কাচের বাক্সে সাবান! ঘুড়ি পাওয়া যাচ্ছে, ঘুড়ি কিনে নিয়ে যাব। দেশে নিয়ে ওড়াব।

ক্লিপ কেনা হলো, সাবান কেনা হলো, ঘুড়ি কেনা হলো। একজন যা কিনবে বাকি দুজন তা-ই কিনবে... দোকানময় ছোটাছুটি। মেয়েদের মা কড়া ধমক দিল—করছ কী তোমরা? আজেবাজে জিনিস দিয়ে স্যুটকেস বোঝাই করছ। মেজো মেয়ে বলল, তুমি চুপ করে থাকো, বাবা বলেছে আমেরিকায় আমরা যা কিনতে চাই কিনতে পারব। তুমি আর বাবা দুজন দোকানের বাইরে গিয়ে একটু দাঁড়াও না। কড়া চোখে তাকিয়ে থাকলে কিনব কী করে?

আমি বাইরে গিয়ে সিগারেট ধরালাম। গুলতেকিনকে দোকানে রেখে গেলাম যদি সে মেয়েদের কেনাকাটা বলে কয়ে কিছু কমাতে পারে। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলাম, সে নিজেও জিনিস কেনায় লেগে পড়েছে। তার হাতেও একটা শপিং কার্ট। সেটিও মেয়েদের মতোই উপচে পড়ছে।

এক মেয়ে হয়তো কিছু-একটা পেয়ে শপিং কার্টে ভরল, অমনি বাকি দুবোন এবং তাদের মা ছুটে গেল সেদিকে। সেই জিনিস চারটা উঠে এল চারজনের শপিং কার্টে।

ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমেরিকান দোকানগুলোর সাজানোর কায়দা অসাধারণ। অতি তুচ্ছ জিনিসও এরা এত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবে, এত সুন্দর করে তার ওপর আলো ফেলবে, এমন লোভনীয় করবে যে দেখামাত্রই মনে হবে—কিনে ফেলা যাক। এরা পৃথিবীর সেরা সেলসম্যান। ক্রেতার সাইকোলজি নিয়ে এদের গবেষণার অন্ত

নেই। সুন্দর করে জিনিস সাজিয়েই তারা বসে নেই; দোকানে বাজছে মিউজিক, যে মিউজিক ক্রেতাকে জিনিস কিনতে প্রলুব্ধ করবে (গবেষণা করে বের করা)। মিউজিকের ফাঁকে ফাঁকে আছে সাবলাইন ইনফরমেশন—অর্থাৎ কানে শোনা যায় না এমন ফ্রিকোয়েন্সিতে বলা হবে—কিনে ফেলো, জিনিস কিনে ফেলো। সেই বাণী ক্রেতাকে সাব কনসাস স্তরে প্রলুব্ধ করবে। মিউজিকের সঙ্গে আছে সুঘ্রাণ। যে ঘ্রাণও দর্শককে কাছে টানবে। আপনি হয়তো কোনো কিছুর সামনে এসে দাঁড়ালেন, কিছুক্ষণের মধ্যে রূপবতী তরুণী সেলসগার্ল এসে বলবে, আমি কি তোমাকে কেনাকাটায় সাহায্য করব? আপনি যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলেই সর্বনাশ। একপর্যায়ে দেখা যাবে, একগাদা জিনিসপত্র কিনে বসে আছেন, যার কোনোটিই আপনার দরকার নেই।

গুলতেকিন একবার একটা লিপস্টিক কেনার জন্য গিয়েছে। যথারীতি এক তরুণী গেল তার সাহায্যে। তাদের কথোপকথনের অংশবিশেষ এরকম :

সেলসগার্ল : তুমি এই রঙ পছন্দ করেছ? বাহ্ তোমাকে এই রঙে খুব মানাবে। তোমার যা সুন্দর চেহারা—এই রঙের সঙ্গে একটা গাঢ় রঙ নিয়ে নাও। পার্টিতে পরবে।

গুলতেকিন : গাঢ় রঙ আমি পরি না।

সেলসগার্ল : ঠোঁটে দিয়ে আয়নার সামনে একটু দাঁড়াও—আমি দেখি তোমাকে কেমন লাগে। ওই আয়না।

(ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়া হলো। আয়নার সামনে দাঁড়ানো হলো)

সেলগার্ল : তোমাকে তো প্রিন্সেসের মতো লাগছে—ও মাই গড!

গুলতেকিন : দাও, আমাকে গাঢ় রঙের একটা দাও।

সেলসগার্ল : একটা কেন? তিনটা একসঙ্গে কিনলে কমিশন আছে...।

গুলতেকিন : দাও, তিনটাই দাও।

সেলসগার্ল : মেকাপের আগে ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হয়। তুমি ক্লিনজার নিয়েছ?

গুলতেকিন : আমার ক্লিনজার লাগবে না।

সেলসগার্ল : আমরা কিন্তু সেলে দিচ্ছি। স্পেশাল সেল শুধু এই সপ্তাহের জন্য...।

গুলতেকিন : দেখি জিনিসটা কেমন?

ঘণ্টাখানিক পর গুলতেকিন দোকান থেকে বের হলো। তার ব্যাগভর্তি মেকাপের জিনিস। একসঙ্গে এত টাকার জিনিস কিনে ফেলার জন্য মুখে অপরাধবোধের হাসি। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিকের কারণে পরিচিত হাসিও আমার কাছে লাগছে অপরিচিত।

কেনাকাটার সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো দরদামে দোকানির সঙ্গে ক্রেতার যুদ্ধে। সেই আনন্দ থেকে আমেরিকানরা আমাদের বঞ্চিত করছে। এ দেশে দরদামের উপায় নেই—জিনিসের গায়ে যা লেখা তা-ই দিতে হবে। তবে ব্যতিক্রম আছে—চায়নিজরা

বেচাকেনায় নতুন ধারা নিয়ে এসেছে—হাগলিংয়ের ধারা। নিউইয়র্কে চায়না টাউনের চারপাশের এলাকার দোকানগুলোতে চলে ওরিয়েন্টাল ধাঁচে কেনাবেচা। দোকানিরা আকাশছোঁয়া দাম হাঁকছে, আপনি পাতাল ঘেঁষে একটা দাম বলবেন। দড়ি টানাটানি চলতে থাকবে। খোদ আমেরিকায় এই অভিজ্ঞতা হলো ঝাড়বাতি কিনতে গিয়ে।

নিউইয়র্কের বাউরি বলে একটা জায়গায় ঝাড়বাতির দোকান। একটা দু'টো না, অসংখ্য। দোকানের মালিক বেশির ভাগই চায়নিজ, অল্প কিছু ইহুদি। আমরা একটা দোকানে ঢুকলাম। আমাদের সঙ্গে আছেন এমন এক এক্সপার্ট বাঙালি, যিনি এই অঞ্চলে কেনাকাটার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। দোকানে ঢোকামাত্র এক চায়নিজ মহিলা (দোকানের মালিক) হাসিমুখে উঠে এলন। মুখভর্তি হাসি দিয়ে দীর্ঘদিনের পরিচিতের মতো বললেন, তোমরা কেমন আছ ?

আমরা কেমন আছি সেটা জানালাম এবং একটা ঝাড়বাতি দেখতে এসেছি সেটাও জানানো হলো।

পছন্দ করো। যেটা তোমার ভালো লাগে সেটাই আজ তোমাদের আমি দিয়ে দেব। তোমাদের আমার পছন্দ হয়েছে।

পছন্দ হয়েছে কেন ?

বুঝতে পারছি না। তোমাদের চেহারার মধ্যে কী যেন আছে। রহস্য আছে । আচ্ছা শোনো, তোমরা কি চায়নিজ ?

আমার সঙ্গের এক্সপার্ট বাঙালি বললেন, আমি পুরোপুরি চায়নিজ না, তবে আমার শরীরে খানিকটা চায়নিজ রক্ত আছে। আমার গ্রান্ডফাদারের ফাদার ছিলেন চায়নিজ।

হাউ নাইস!

এই ঝাড়বাতিটা আমার পছন্দ, এর দাম বলো।

দাম বলব কী, দাম তো লেখাই আছে।

লেখা আছে দু' হাজার ডলার। একটা খেলনার দাম তো আর দু' হাজার ডলার হতে পারে না।

খেলনা মানে ? তুমি কী বলছ! এগুলো লেড ক্রিস্টেল। থার্টি পারসেন্ট লেড।

এক শ' পারসেন্ট লেড হলেও এর দাম দু' হাজার ডলার হবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি পঞ্চাশ ডলার কম দাও। এই খাতিরটা শুধু তোমাকেই করছি—তোমার শরীরে আছে চায়নিজ ব্লাড।

আমি তিন শ' ডলারের বেশি এক সেন্টও দিতে পারব না।

তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ।

মোটেই ঠাট্টা করছি না। ঠাট্টা করছ তুমি। দু' শ ডলারের জিনিস দু' হাজার ডলার চাচ্ছ।

আমরা দোকান থেকে বের হওয়ার ভঙ্গি করতেই মহিলা কাউন্টার ছেড়ে এসে এক্সপার্ট বাঙালির হাত ধরে ফেলে আদুরে গলায় বলল, ও কী, রাগ করছ কেন ? আচ্ছা যাও, ফর ইউ ওনলি—ওয়ান থাউজেন্ড ডলার।

আমি হতভম্ব। বলে কী! এক ধাক্কায় দাম দু' হাজার ডলার থেকে এক হাজারে নেমে এল—আরও কত নামবে কে জানে!

এই পদ্ধতির বেচাকেনা আমেরিকায় জনপ্রিয় হওয়ার কথা নয়। দরদাম করে নষ্ট করার সময় এদের নেই। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণই প্রাচ্যদেশীয়, যেখানে সবার হাতেই অফুরন্ত সময়। তারপরেও এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে। চায়নিজরা চুটিয়ে ব্যবসা করছে। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয়রা। আমরা বাঙালিরাও পিছিয়ে নেই। ওপি ওয়ানের বাঙালিদের বেশ একটা বড় অংশ নেমেছেন ব্যবসায়। ফেরি করা ব্যবসা। কিছু মালপত্র নিয়ে ফেরি করা। এদের ব্যবসা-পদ্ধতি ভিন্ন। খোদ নিউইয়র্ক শহরে ওপি ওয়ানে আসা জনৈক বাঙালি গরম গরম সিঙ্গাড়া ভেজে বিক্রি করেন। টু ফর এ ডলার। তেঁতুলের চাটনি দিয়ে প্লেটে দুটা সিঙ্গারা দিয়ে দেওয়া হয়। সাহেব-মেমরা তেমন খায় না। স্প্যানিশরা খায়, কালো আমেরিকানরা খায়। সিঙ্গাড়ার রমরমা ব্যবসা।

নাইন্টি-নাইন সেন্ট দোকানের কথায় ফিরে যাই। আমার স্ত্রী ও বাচ্চাদের কেনাকাটা শেষ হলো—আমি দাম দিতে গেলাম। ক্রেডিট কার্ড নেই। নগদ পয়সায় দাম দেব। এক শ' ডলারের একটা নোট দিলাম। দোকানি নানা পদ্ধতিতে সেটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কী একটা কলমে নোটে দাগ দিয়ে দেখল জাল নোট কি না। নিশ্চিত হয়ে ভাঙতি ফেরত দিল এবং এত কিছু কেনার জন্য উপহারস্বরূপ আমাকে এক প্যাকেট তাস দিল। হোটেলে ফিরে এসে দেখি, সেই তাসের প্যাকেটে কোনো সাধারণ তাস নেই। আছে অসাধারণ তাস। বাহান্নটা তাসে বাহান্নটা সম্পূর্ণ নগ্ন নারী। বাহান্নজন অপূর্ব মায়াবতী বাহান্নটা ভয়ংকর পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে। কী সর্বনাশ!

কোস্ট টু কোস্ট

আমেরিকা সিবিএস টেলিভিশনের একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের নাম 'ডেভিড লিটাবম্যান শো'। প্রতি সোমবার রাতে ডেভিড লিটারম্যান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। হালকা বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান—কথাবার্তা, মজার মজার ইন্টারভিউ, রসিকতা...। বিল ক্লিনটনের মতো ব্যক্তিত্ব যেমন এই অনুষ্ঠানে আসেন, তেমনি আসেন সাধারণ সব মানুষ—রেস্টুরেন্টের ওয়েটার থেকে রাস্তার পাশের দোকানের সামান্য এক সেলসম্যান। যেমন এসেছিলেন মুজিবর ও সিরাজুল নামের দুই বাংলাদেশি। দুজনের চেহারায় এবং কথাবার্তায় 'হাবাটাইপ' একটা ব্যাপার আছে (মুজিবর ও সিরাজুল সাহেব, মন্তব্যের জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যেমন শুনেছি তেমন লিখছি)।

সিবিএস ইন্টারভিউ করছিল মুজিবরকে। মুজিবর সাহেবের ইংরেজি তেমন আসে না। তারপরেও তিনি প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া শুরু করেন। কিন্তু শেষ করতে পারেন না। তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে জবাব দিয়ে ফেলেন সিরাজুল। একপর্যায়ে আহত হয়ে মুজিবর সাহেব অন্য এক দৃষ্টিতে তাকালেন সিরাজুলের দিকে। সেই দৃষ্টিতে ছিল অভিমান, ক্ষোভ, রাগ, খানিকটা ঘৃণা। বলা হয়ে থাকে মুজিবর যে Look দিয়েছিল সেই Look হলো মিলিয়ন ডলার Look, দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে গেল।

ডেভিড লিটারম্যান পরের অনুষ্ঠানে আবারও এই দুজনকে নিয়ে এলেন। তার পরের অনুষ্ঠানে আবার। আমেরিকান দর্শক এই দুই বাংলাদেশির কথাবার্তায়, হাবভাবে মুগ্ধ, বিস্মিত, যেন নতুন আঙ্গিকে আবার ও হার্ডি এসেছে লরেল অ্যান্ড হার্ডি। দুই কমেডিয়ান জুটি। না, তারা কোনো রসিকতা করে না, মজার গল্প করে না। তারা নানান বিষয়ে কথাবার্তা বলে, তাদের সুচিন্তিত (?) অভিমত দেয়—এতেই আমেরিকান দর্শক হেসে কুটিকুটি। এই দুই বাংলাদেশি রাতরাতি হয়ে গেল সিবিএস টিভির সুপারস্টার। দুজনকে কিছুদিনের জন্য টিভিতে ডাকা হয় নি—সেই কিছুদিন সিবিএস-এর রেটিং আশঙ্কাজনকভাবে নেমে গিয়েছিল। কাজেই তাদের জন্য চালু করা হলো ডেভিড লিটারম্যান শো'র বিশেষ একটা অংশ। সেই অংশের নাম 'কোস্ট টু কোস্ট'। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু হলো—আমেরিকার পথে-প্রান্তরে দুই বাংলাদেশি বন্ধু টিভির খরচায় পুরো আমেরিকা ঘোরে। তাদের সঙ্গে থাকে টিভি ক্রু, ক্যামেরা। তারা থাকে পাঁচতারা হোটেলে। ডেভিড লিটারম্যান শো যখন শুরু হয় তখন দুজন যেখানে থাকে সেখান থেকে তাদের ইন্টারভিউ সম্প্রচার করা হয়। ইন্টারভিউর নমুনা দিচ্ছি। 'কাস্ট টু কোস্ট' অনুষ্ঠান শুরু হলো। ডেভিড লিটারম্যান বললেন—

আসুন টিভি দর্শকরা, দেখা যাক মুজিবর-সিরাজুল কী করছে।

পর্দায় দু'জনের হাসিমুখ দেখা গেল। দুজনই স্নানের পোশাক পরে ফ্লোরিডায় সমুদ্রস্নান করছে।

ডেভিড লিটারম্যান	: কেমন আছ মুজিবর ?
মুজিবর	: ভেরি গুড, থ্যাঙ্ক ইউ।
সিরাজুল	: আই অ্যাম অলসো ভেরি গুড। থ্যাঙ্ক ইউ।

আমেরিকান দর্শকদের আনন্দ কে দেখে! হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। এক-একজনের চোখে হাসির কারণে পানি পর্যন্ত এসে গেল...

মুজিবর ও সিরাজুলের জনপ্রিয়তার একটি নমুনা হচ্ছে, এরা পথে বের হতে পারে না। আমেরিকানরা তাদের ছেঁকে ধরে। অটোগ্রাফ চায়। অটোগ্রাফ দিতে দিতে দুই বন্ধুর ডান হাতের মাংসপেশিতে টান পড়ে। এদের ছবি লাগানো টি-শার্ট বিক্রি হয়, পোস্টারও পাওয়া যায়। এমনই অবস্থা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে—বেশিরভাগ বাঙালি মুজিবর ও সিরাজুলের ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারে নি। তাদের ধারণা, এই দুজনের ভুল-ভাল ইংরেজি, হাবার মতো হাবভাব বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। এ ধরনের বক্তব্য নিয়ে বেশ কিছু চিঠি *নিউইয়র্ক টাইমস*সহ নানা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

অষ্টম নর্থ আমেরিকা-বাংলাদেশ সম্মেলনে আমাকেও প্রশ্ন করা হলো, এই যে দু'জন ভাঁড়ামি করছে এবং বাংলাদেশের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে—এ প্রসঙ্গে আপনার প্রতিক্রিয়া কী ?

আমি বললাম, আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা খুব মজার মনে হচ্ছে।

এরা দু'জন যেভাবেই হোক আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করেছে। ভাঁড়ামি করছে কি না আমি জানি না, করলেও ক্ষতি নেই। ভুল-ভাল ইংরেজি বলছে ? তাতে কী হয়েছে ? আমেরিকানরা যখন বাংলা শেখে, বাংলা বলে, তখন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভুল-ভাল বলে। তাতে যদি তাদের অপমান না হয় আমাদের অপমান হবে কেন ?

খুব আগ্রহ নিয়ে ডেভিড লিটারম্যান শো এক রাতে দেখলাম। দুই বন্ধুর কথাবার্তা শুনলাম। আমার কাছে মনে হলো, এরা দুজন সহজ-সরল ভঙ্গিতে আন্তরিকতার সঙ্গে ডেভিড লিটারম্যানের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। এর বেশি কিছু না।

কে জানে, সহজ-সরল আন্তরিক কথাবার্তাই বোধহয় এখনকার আমেরিকানদের কাছে খুব ফানি মনে হয়। হাসতে হাসতে তারা বিষম খেতে থাকে।

মুজিবর ও সিরাজুলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

তারা কেমন আছে ?

আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিদের আমি তিন ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগে আছেন বাংলাদেশের সেরা ছেলেমেয়েরা। এঁরা বিভিন্ন সময়ে পিএইচডি করার জন্য দেশ ছেড়েছেন। কেউ এসেছেন অ্যাসিস্টেন্টশিপ নিয়ে, কেউ স্কলারশিপে। ডিগ্রি হওয়ার পর দেশে ফিরে যান নি। আমেরিকার মূল স্রোতে দ্রুত মিশে যেতে চেয়েছেন। তারা সবাই খুব ভালো অবস্থায় আছেন। গাড়ি, বাড়ি, টাকাপয়সা সবই হয়েছে। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তারা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ করতে পেরেছেন। পারবারই কথা। আগেই বলেছি, এঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশের স্বর্ণ ফসল। আমরা এঁদের ধরে রাখতে পারি নি—কিংবা বলা চলে, এঁরা আমাদের ধরে রাখতে চান নি। দেশ এবং দেশের মানুষের চেয়ে তাদের কাছে ব্যক্তিগত সাফল্য বড় মনে হয়েছে।

ছুটিছাটায় দেশে না গিয়ে এঁরা ইউরোপ ট্যুরে যেতে বেশি পছন্দ করেন। কারণ দেশের প্রতি মমত্ববোধের অভাব নয়, কারণ হলো—দেশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। দেশের নোংরা পানি খেয়ে ডায়রিয়া হতে পারে। জীবাণুতে গিজগিজ করছে এমন জায়গায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া কি ঠিক ? দেশ প্রিয়। দেশের জীবাণু প্রিয় নয়।

দ্বিতীয় দলে আছেন—ট্যুরিস্ট ভিসায় এসে থেকে যাওয়া মানুষ, জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে সাঁতরে ওঠা মানুষ, আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পড়তে আসা অ্যাডভেঞ্চার-পিপাসী ছেলেমেয়েরা। দেশ এঁদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। এরা সারাক্ষণই দেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। যেতে পারেন না, কারণ তাঁরা সবাই প্রায় ইল্লিগ্যাল অ্যালিয়েন। অনেকের কাছেই দেশে ফেরার টিকা নেই। তাঁরা আমেরিকার মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে পারেন না। নিজেরা নিজেরা জোট বেঁধে একসঙ্গে থাকতে পছন্দ করেন। ছুটিছাটায় সবাই একত্র হয়ে ইন্ডিয়ান স্টোর থেকে ইলিশ মাছ কিনে এনে ভাজা করেন। ইলিশ মাছ ভাজা মুখে দিয়ে করুণ গলায় বলেন, আহা, যদি সাতদিনের জন্য দেশে যেতে পারতাম!

তৃতীয় দলে আছেন ওপি-ওয়ানরা। এরা দলে দলে দেশ ছেড়ে এ দেশে এসেছেন। আইনসংগতভাবে এসেছেন। এই দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যেমন আছেন—রিকশাওয়ালাও আছেন। নতুন দেশে তাঁরা কেমন আছে তাই নিয়ে এই লেখা।

যখন ওপি-ওয়ান শুরু হলো তখন দেশে খুব হইচই। সবাই মজা পাচ্ছে। লাখ লাখ মানুষ ওপি ওয়ান-এর ফরম ফিলআপ করছে। ফরম বিক্রি হচ্ছে যেখানে সেখানে। ফরম ফিলআপ করার কায়দাকানুন বাতলে দিতে কোম্পানি গজিয়ে গেছে। পত্রিকায় মজার মজার সচিত্র ফিচার—কাজের বুয়া ওপি-ওয়ান-এর ফরম ফিলআপ করে—আমেরিকার স্বপ্ন দেখছে। ৮০ বছরের চোখে ছানিপড়া বৃদ্ধ ফরম ফিলআপ করছে। লেখাপড়া জানে না, নাম সই যেখানে করার কথা সেখানে টিপসই করছে। তাদের নিয়ে কত হাসাহাসি।

অথচ যে দলটিকে নিয়ে হাসাহাসি হওয়ার কথা তাদের নিয়ে কোনো হাসাহাসি নেই। সেই দলে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি বড় আমলা।

যারা নিতান্তই দরিদ্র, জীবন যাদের কিছুই দেয় নি, তারা তো ভাগ্য উন্নয়নের স্বপ্ন দেখবেই। তাদের নিয়ে আমরা হাসাহাসি করব কেন ? এই ব্যাপারটা কখনোই আমার মাথায় আসে নি। আমার কিছু অতি কাছের বন্ধু বিরক্ত মুখে বলেছেন, ক অক্ষর শূকর মাংস। এরা আমেরিকায় গিয়ে করবে কী ? ভিক্ষা যে করবে সে উপায়ও তো নেই—আমেরিকায় কেউ ভিক্ষা দেয় না।

আমার সবসময় মনে হয়েছে এদের তেমন কোনো সমস্যা হবে না। এদের মাথায় আছে বুদ্ধি, চোখে আছে স্বপ্ন। এরা কাজ করতে পারবে, পরিশ্রম করতে পারবে, এরা টিকে যাবে।

আমেরিকায় নেমেই আমি এদের সম্পর্কে জানতে চাইলাম। কেউ কিছু বলতে পারল না, কারণ আমি যাদের সঙ্গে আছি—তারা প্রথম ভাগের। দেশের সেরা প্রবাসী সন্তানেরা। এরা ওপি-ওয়ানওয়ালাদের ব্যাপারে কিছু জানে না। জানার তেমন প্রয়োজনও বোধ করে না। মনে হয় তারা ওপি-ওয়ানওয়ালাদের নিয়ে খানিকটা লজ্জিত। আমরা যেমন বড়লোক বন্ধুদের কাছে গরিব আত্মীয়দের দেখাতে লজ্জা বোধ করি—সে রকম। শুধু জানলাম তারা আছে—ভালোই আছে। কেউ ওয়েল ফেয়ারে নেই। কাজ করছে।

শুরুতে অসুবিধা হয় নি ?

ঠিক জানি না। হয়েছে হয়তো।

শুনতে পেলাম নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত *প্রবাসী* পত্রিকায় এদের বিষয়ে অনেক লেখা ছাপা হয়েছে। এদের অনেক চিঠিপত্র ছাপা হয়েছে।

আমি প্রবাসী সম্প্রদায়কে অনুরোধ করলাম *প্রবাসীর* পুরোনো সব সংখ্যা আমাকে দিতে। নিউ জার্সির বাংলাদেশ সম্মেলনে খোঁজ করতে লাগলাম ওপি-ওয়ান এর কেউ এসেছে কি না। ওরাই ওদের কথা ভালো বলতে পারবে।

পেয়ে গেলাম—অনেকেই এসেছে। বাংলাদেশ সম্মেলনে তাদের আগ্রহ, তাদের আনন্দই সবচেয়ে বেশি। সেই অনেকের একটা বড় অংশ সম্মেলনে নাম রেজিস্ট্রি করে নি। রেজিস্ট্রেশন ফি কুড়ি ডলার দেওয়ার তাদের সামর্থ্য নেই। তারা মূল অনুষ্ঠানে ঢুকতে পারছে না—লবিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এতেই তারা খুশি। সবার হাতে সস্তা ধরনের ইন্সটেমেটিক ক্যামেরা। ঝপাঝপ ছবি তুলছে।

একজনকে দেখলাম গরমের মধ্যে থ্রিপিস স্যুট পরে এসেছে। গলায় চকচকে টাই। সে একফাঁকে আমাকে কানে কানে বলল, সাত হাজার ডলার জমিয়ে ফেলেছি স্যার।

খুব ভালো। কী করেন আপনি ?

ছুটির দিনে ট্যাক্সি চালাই।

খুব ভালো। দেশে কী করতেন ?

কিছু করতাম না। বেকার ছিলাম।

পড়াশোনা কী করেছেন ?

ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি।

উইকএন্ডে ট্যাক্সি চালান বললেন, সপ্তাহের অন্যদিনগুলোতে কী করেন ?

সে লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকে বলল, কলেজে ভর্তি হয়ে গেছি স্যার। নিউইয়র্কের সিটি কলেজ।

বাহ্ বাহ্।

আমি বললাম, আপনারা কেমন আছেন ?

স্যার, আমরা ভালো আছি।

শুরুতে অসুবিধা হয় নি ?

হয়েছে। এখন অসুবিধা নেই। কাজ করে খাই।

কী ধরনের কাজ ?

ছোট কাজ। কেউ কেউ ব্যবসা শুরু করেছে। এরা ভালো করছে।

দেশের জন্যে কী করছেন আপনারা ?

দেশের জন্য কিছু করতে পারছি না স্যার। এইজন্য মনটা খুব খারাপ। কী করব বলে দেন।

আপনারা ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। এতেই দেশের জন্য করা হবে।

দেশের অবস্থা কী স্যার ?

ভালো। খুব ভালো।

এরা আমার কথা শুনে খুব খুশি।

আমার সবসময়ই মনে হয়েছে, আমাদের দেশের সেরা সন্তানরা দেশের জন্য তেমন কিছু করতে পারবে না, কিন্তু এরা করবে। এরা দেশে ডলার পাঠাবে। সেই ডলারে দেশের অর্থনীতি শক্ত হবে। দেশে কলকারখানা হবে। আমরাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠব।

তাদের কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা—

স্যার, টিভিতে এখন ধারাবাহিক নাটক কি হচ্ছে ?

খালেদা জিয়া দেশ কেমন চালাচ্ছেন ?

আওয়ামী লীগ কি ক্ষমতায় যাবে ?

গোলাম আযমকে ছেড়ে দিল কেন ?

দেশে এখন চালের দর কত ?

এবার নাকি ফসল ভালো হয়েছে ?

গত সাইক্লোনে মানুষ কত মারা গেছে ?

আমি সব প্রশ্নের জবাবও দিতে পারছি না।

আমার এত ভালো লাগল। বাংলাদেশ তারা পেছনে ফেলে আসে নি। রুমালে বেঁধে পকেটে করে নিয়ে এসেছে। রুমাল খুলে সেই দেশকে তারা দেখে, মাঝে মাঝে সেই রুমালে তারা চোখ মোছে।

মরুভূমির জোছনা

যাঁরা আমার লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা হয়তোবা আমার জোছনাপ্রীতির কথা জানেন। সূর্য থেকে ধার করা চাঁদের কৃত্রিম আলো আমাকে সবসময়ই অভিভূত করে। নানান পরিবেশে জোছনা দেখার জন্য এই জীবনে আমি অনেক পাগলামি করেছি। পানিতে জোছনা কেমন ফুটে দেখার জন্য এক রাত আমি বিলের ওপর বানানো টংঘরে ছিলাম। মাঝরাতে সেই টংঘর ভেঙে পানিতে পড়ে গিয়ে প্রায় জীবনসংশয় হয়েছিল। তারপরও মনে হয়েছে, এই অলৌকিক সৌন্দর্যের জন্য জীবনসংশয় করা যেতে পারে।

শান্ত পানিতে জোছনা, ভয়ংকর সমুদ্রে জোছনা, বনের ভেতর জোছনা, বরফঢাকা প্রান্তরে জোছনা, পাহাড়ের গায়ে জোছনা—সবই দেখা হয়েছে। শুধু দেখা হয় নি মরুভূমিতে জোছনা। দিগন্তবিস্তৃত বালি, মাঝে মাঝে সেন্ড ডিউমস, তার ওপর পড়ল জোছনার আলো। দৃশ্যটা কেমন হবে? দেখা হয় নি। দেখার খুব ইচ্ছা। হাতের কাছে ভারতের রাজস্থান—গোবি মরুভূমি। রাজস্থানে গেলাম। জোছনা দেখা হলো না। চাঁদের দিন-ক্ষণ হিসাব করে যাই নি।

এবারে আমেরিকা ভ্রমণে আগেভাগেই ঠিক করে রেখেছি, ভরা পূর্ণিমা কাটাব কোনো-একটা মরুভূমিতে। পূর্ণিমার সময়টা থাকব নাভাদা স্টেটে। সেখানে আছে মাহজি ডেজার্ট। ভয়াবহ মরুভূমি। মাহজি ডেজার্টেই পৃথিবীবিখ্যাত 'ভ্যালি অব ডেথ'। মৃত্যুর উপত্যকা। পৃথিবীর জনমানবশূন্য উষ্ণতম স্থানের একটি। ভরা পূর্ণিমা ভ্যালি অব ডেথ থেকে দেখলে কেমন হয়? সবাই বলল, বড় ধরনের পাগলামি হয়, আর কিছুই হয় না। ভ্যালি অব ডেথে অসহনীয় গরম ছাড়া আর কিছু নেই। গরম কী বুঝতে চাইলে ওভেনের ভেতর বসে থাকলেই হয়, ভ্যালি অব ডেথে যাওয়ার দরকার কী?

একজনকেও পেলাম না যে বলল, ভ্যালি অব ডেথে যাওয়া যেতে পারে—দর্শনীয় স্থান। তারপরেও ঠিক করলাম, যাব। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মাত্র পাঁচ শ' মাইল। এমন কিছু দূরে নয়। সমস্যা হলো, আমাকে নিয়ে যাবে কে? ভ্যালি অব ডেথে ট্যুর বাস যায় না। গাড়ি ভাড়া করতে পারি। সে ক্ষেত্রে আমাকে গাড়ি চালাতে হবে। এক যুগ আগে আমেরিকায় গাড়ি চালিয়েছি। এক যুগ আগের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এখন কাজে লাগবে না। বন্ধু-বান্ধবের কেউ আমাকে গাড়ি করে নিয়ে যেতে রাজি হলো না। কাজেই মনের দুঃখ মনে চেপে ভ্যালি অব ডেথে যাওয়া বাতিল করলাম। আর দশজন ট্যুরিস্টের মতো ভ্যালি অব ডেথে না গিয়ে রওনা হলাম লাস ভেগাসে। প্রকৃতি তখন আমার সঙ্গে একটা মজা করল। সম্পূর্ণ ভরা জোছনায় ভ্যালি অব ডেথের পাশে দিগন্তবিস্তৃত বালিরাশির কাছে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। কীভাবে করল সেই গল্পটা বলি।

লাস ভেগাস থেকে ভ্যান-এলেন কোম্পানির ট্যুর বাসে ফিরছি। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে আমি, একদল জাপানি, কিছু আমেরিকান বুড়োবুড়ি। লাস ভেগাসের হোটেল আলাদীন

থেকে সন্ধ্যা ছটায় বাস ছেড়েছে। বিশাল বাস, দোতলা, সমান উঁচু ছাদ। আরাম-আয়েসের ঢালাও ব্যবস্থা। একজন মহিলা অ্যাটেনডেন্ট কিছুক্ষণ পর পর যাত্রীদের চা কফি দিচ্ছে। মদ্যপানের ব্যবস্থাও আছে। সন্ধ্যা সাতটায় ডিনার দেওয়া হলো। বেশ ভালো খাবার। খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমাচ্ছে। আমেরিকান বাসগুলোতে চড়লেই ঘুম পায়। আমি জেগে আছি। রিডিং লাইট জ্বালিয়ে বই পড়ার চেষ্টা করছি। পড়ে আরাম পাচ্ছি না। দার্শনিক ধরনের বই, আর্নেস্ট ক্যারনের—*In Search of God.* চলন্ত বাসে এই বই পড়া যায় না। চলন্ত বাসে পড়তে হয় রগরগে ডিকেটটিভ বই, যার পাতায় পাতায় খুন-খারাবি।

ড্রাইভার বলল, আমরা মাহজি ডেজার্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। পাশেই ভ্যালি অব ডেথ। জানলা দিয়ে তাকাও, বিশাল এক থার্মোমিটার দেখবে। থার্মোমিটারে লেখা ১৩৮। কারণ গত বছর ভ্যালি অব ডেথে ১৩৮ ডিগ্রি তাপ উঠেছিল। এটিই রেকর্ড তাপমাত্রা। কাজেই বিষয়টি স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৩৮-এর থার্মোমিটার বানানো হয়েছে।

যাত্রীদের মধ্যে কোনোরকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না, কারণ তারা ফিরছে লাস ভেগাস থেকে। লাস ভেগাস-ফেরত যাত্রীদের চিন্তাচেতনা কিছুটা ভোঁতা হয়ে থাকে। তারা উত্তেজিত হওয়ার ক্ষমতা সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলে।

হঠাৎ ঘ্যাস করে শব্দ হলো। গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার লজ্জিত গলায় বলল, গাড়ির ট্রান্সমিশনে সামান্য সমস্যা হচ্ছে। একটু দেখে নিচ্ছি। তোমরা কেউ যদি একটু হাত-পা নাড়াতে চাও নাড়াতে পার। যারা সিগারেট খাও তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। নিচে নেমে সিগারেট খেতে পারবে।

আমি সিগারেট টানার জন্যেই গাড়ি থেকে নামলাম। নেমেই হতভম্ব—এ কী! আকাশে ভরা পূর্ণিমা চাঁদ। চারদিকে মরুভূমি। এই তো একটু দূরেই ভ্যালি অব ডেথ। আজ পূর্ণিমা, তা তো মনে ছিল না।

সৃষ্টিকর্তাকে সরাসরি দেখার কোনো উপায় নেই। মানুষকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। তবে সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করতে চাইলে করা যায়। আগে একবার বলেছি, এখনো একবার বলছি, সৃষ্টিকর্তা তাঁর নানান সৃষ্টির ভেতর নিজেকে প্রকাশ করেন। আমি তাঁর প্রকাশ দেখলাম মরুভূমির জোছনায়। এই জোছনা সম্পূর্ণ আলাদা—এই জোছনা মানুষের ভেতর শূন্যতা ও হাহাকার জাগিয়ে তোলে। তীব্র ভয়ের এক ধরনের অনুভূতি হয়, নিজেকে অসহায় লাগে।

আমি মাহজি ডেজার্টে জোছনা দেখছি। এই রূপের বর্ণনা করি সেই ক্ষমতা আমার নেই। কিছু কিছু দৃশ্য আছে যা বর্ণনায় ধরা পড়ে না, যাকে ধরতে হয় চেতনার উপলব্ধিতে। আমার সঙ্গে দামি ক্যামেরা আছে। হাজার চেষ্টাতেও সেই ক্যামেরায় আমি যেমন জোছনার এই রূপ ধরতে পারব না, ঠিক তেমনি আমার সঙ্গে যেসব কলম আছে, তা দিয়েও আমি এই জোছনার বর্ণনা করতে পারব না। এত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয় নি।

আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। চারদিক চকচক করছে বালি। জোছনা বালিতে প্রতিফলিত হয়ে এক ধরনের বিভ্রম সৃষ্টি করছে। সমুদ্রসম বালুকারাশিতে আছে বিচিত্র সব ক্যাকটাস। ক্যাকটাসের গায়ে জোছনা পড়েছে। এদের গায়ের কাঁটাগুলো দিনের আলোয় এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, জোছনায় দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠল। হাওয়ার সঙ্গে বালি উড়ছে, বালির সঙ্গে বালির গায়ে গায়ে জোছনা উড়ছে। যেন মরুভূমির হাওয়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জোছনা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য পৃথিবীর দৃশ্য নয়। এ এক অলৌকিক দৃশ্য।

ড্রাইভার বলল, গাড়ি ঠিক হয়েছে, উঠে এসো। আমি উঠে এলাম। এত তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠতে হলো বলে আমার মনে কোনো আফসোস হলো না, কারণ ভয়াবহ সৌন্দর্যের সামনে বেশিক্ষণ থাকতে নেই।

শুভঙ্করের ফাঁকি

প্রবাসী বাঙালিদের একটা ব্যাপার আমার খুব পছন্দ হলো। এরা তাদের বাবা-মাকে নিয়ে এসে মাসখানেক সঙ্গে রেখে দেশে পাঠিয়ে দেয়, আবার বছরখানেক পর নিয়ে আসে। আমি যে বাড়িতে গিয়েছি, সেখানেই শুনেছি—মা এসেছিলেন, চলে গেছেন। আবার সামনের নভেম্বরে বা জুনে আসবেন। দেশকে ভুলে গেলেও বৃদ্ধ বাবা-মাকে এরা ভোলে নি।

কয়েকজন মার সঙ্গে দেখা হলো। জড় পদার্থের মতো মা। এক জায়গায় মূর্তির মতো বসে থাকেন। মুখভর্তি করে পান খান। পানের পিক কোথায় ফেলবেন তা নিয়ে খুব চিন্তিত বোধ করেন। একসময় বেসিন লাল করে পিক ফেলেন। সেই লাল বেসিনের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকেন। ছেলে বা ছেলের বউ ছুটে এসে পানি ঢেলে বেসিন পরিষ্কার করেন।

এইসব মা'র কিছু করার নেই। যে সংসারে এসেছেন সেই সংসারের সঙ্গে তাদের যোগ প্রতিষ্ঠিত হয় না। পুত্র এবং পুত্রবধূ দু'জনই কাজে চলে যায়। বাচ্চারা যায় স্কুলে। বিশাল বাড়িতে বৃদ্ধাকে একা একা বসে থাকতে হয়। বিকেলে বাচ্চারা ফেরে। দাদিমার সঙ্গে গল্প করতে তারা আগ্রহী হয় না, কারণ তারা বাংলা জানে না, দাদিমাও ইংরেজি জানেন না। কাজ শেষ করে ছেলের বউ ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে। ফিরে এসেই রান্না চড়ায়। তার সঙ্গেও কথা হয় না। উইকএন্ডে তারা বেড়াতে যায়। তিনিও সঙ্গে যান। শীতের সময় এই ষাট বছরের মহিলাকেও শার্ট-প্যান্ট পরতে হয়। তাঁর খুবই লজ্জা লাগে, কিন্তু কী আর করা!

এরকম একজন মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। কেন জানি শুরুতে তিনি খুব ভয়ে ভয়ে আমার কথার জবাব দিচ্ছিলেন। শেষে খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে অনেক কিছুই বললেন।

আমেরিকা আপনার কেমন লাগছে?

ভালো লাগতাছে।

কী কী দেখেছেন?

অনেক কিছু দেখলাম। নায়েগ্রা জলপ্রপাত। স্ট্যাচু অব লিবার্টি। আর কিছু দেখনের নাই।

এখন কী করেন? ঘরে বসে থাকেন?

হ।

সময় কাটে কীভাবে?

ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন না। বিষণ্ন চোখে তাকালেন। বোঝাই যাচ্ছে তাঁর সময় কাটে না।

টিভি দেখেন না ?

এরার টিভি ভালো পাই না, নাটক হয় না ।

রান্নাবান্না করেন না ?

এরার চুলাও ভালো পাই না। আর কী রানমু ? নাতি-নাতনিরা ভাত-মাছ খায় না। এরা হট ডগ খায়, পিজা খায়।

ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন ?

হ।

দেশে কবে ফিরবেন ?

গত মাসে পাঠানোর কথা হইল। লোক পায় না বইল্যা পাঠাইতে পারে নাই। লোক পাইলে পাঠাইব।

আমেরিকা কি আপনি প্রথম এলেন, না আগে আরও এসেছেন ?

বাবা, আমি আগেও আসছি। এর আগে চাইরবার আসছি। এইটা নিয়ে পাঁচবার হইল।

আরও আসবেন ?

ইচ্ছা করে না বাবা। কিন্তু কী করব! ছেলে চায়।

ভদ্রমহিলার জন্য আমার খারাপই লাগল।

ছোট ভাই জাফর ইকবালের সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার কষ্টের কথা বলছিলাম। শুনে সে হাসল। আমি বললাম, ভালোবাসা মাঝে মাঝে খুব কষ্টকর হয়। ছেলের প্রবল ভালোবাসার কারণে এই বৃদ্ধা মা-কে কী কষ্টটাই না করতে হচ্ছে!

ইকবাল বলল, দাদাভাই, এই ভালোবাসায় ফাঁকি আছে। তোমরা যারা বাইরে থেকে আস তাদের পক্ষে এই ফাঁকি চট করে ধরা সম্ভব নয়। আমরা ফাঁকিটা জানি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী ফাঁকি ?

শুভঙ্করের ফাঁকি।

সেটা কী ?

এরা যে প্রতি বছর বৃদ্ধা মা-কে টেনে আনছে তার কারণ মা'র প্রতি ভালোবাসা নয়। মা'র প্রতি যার ভালোবাসা থাকবে, সে মা-কে এই কষ্ট দেবে না। তারা মা-কে আনে, কারণ মা'র জন্য তারা গ্রীন কার্ড করিয়েছে। গ্রীন কার্ড যারা করে তাদের গ্রীন কার্ড বহাল রাখার জন্য কিছুদিন পরপর আমেরিকা আসতে হয়, নয়তো সিটিজেনশিপ পাওয়া যায় না। মা প্রথম সিটিজেন হবেন। তিনি সিটিজেন হওয়ার পর তাঁর অন্য ছেলেমেয়েদের স্পনসর করবেন ইমিগ্রেশনের জন্য—এই হলো চক্র। এই চক্র ভালোবাসার চক্র নয়, শুভঙ্করের ফাঁকির চক্র।

কী আনন্দ! কী আনন্দ!!

মনে করা যাক, আপনাকে কেউ-একজন একটা পনের তলা উঁচু দালানে নিয়ে তুলল। আপনার পায়ের গোড়ালিতে দড়ি বাঁধল। সাধারণ দড়ি না, রাবারের দড়ি, টানলেই লম্বা হয়। তারপর পনের তলা উঁচু থেকে নিচে ছেড়ে দেওয়া হলো। আপনি শাঁ শাঁ করে নিচে নামছেন। কলমা-কালাম যা জানা আছে সব পড়ে ফেলেছেন, একসময় পায়েব দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়ল, আপনার গতি বাধাপ্রাপ্ত হলো। রাবারের দড়ি লম্বা হচ্ছে, প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই অবস্থায় আপনি থামলেন, চোখ মেলে দেখলেন এখনো বেঁচে আছেন। আপনার মনে গভীর আনন্দ হলো।

আপনি এই আনন্দ পেতে আগ্রহী? আমেরিকানরাও কিন্তু আগ্রহী। আমেরিকানদের প্রিয় পাস্টটাইমের মধ্যে সম্প্রতি এটি যুক্ত হয়েছে। এই খেলার নাম বাংগি জাম্পিং। ক্রমেই এই খেলা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংগি জাম্পিংয়ে বেশকিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। দড়ি যতটুকু লম্বা হওয়ার কথা, তারচেয়ে বেশি হয়েছে—মাথা মেঝেতে লেগে ফেটে চৌচির হয়েছে। বিপদের কারণে আমেরিকার সব স্টেটে এই খেলা খেলতে দেওয়া হচ্ছে না। আমার জানা মতে, ছয়টি স্টেটে এই খেলার অনুমতি আছে। আগ্রহী আমেরিকানরা এই ছয় স্টেটে ভিড় করে।

উত্তেজনা ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। বাংগি জাম্পিংয়ে আছে উত্তেজনা। কাজেই বেঁচে থাকার জন্য দরকার বাংগি জাম্পিং।

আটলান্টিক সিটিতে বাংগি জাম্পিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এক-একবার ঝাঁপ দিতে ৫০ ডলার লাগে। ব্যাপারটা কী দেখতে গেলাম। দেখলাম দুই তরুণ-তরুণীর কোমরে দড়ি বাঁধা হচ্ছে (পায়ে বাঁধাই নিয়ম, নিরাপত্তার জন্য কোমরে)। দু'জনই বড় আনন্দিত। চোখ ঝলমল করছে। নিমিষে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। তারপর কপিকল দিয়ে দুজনকে টেনে তোলা হতে লাগল। ঝমঝম করে বাজনা বাজছে। বাংগি জাম্পের দুই তরুণ-তরুণী দর্শকের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। ফ্লাইং কিস ছুড়ে দিচ্ছে। দর্শকেরাও হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করছে। এরা উপরে উঠছে তো উঠছেই। একসময় বিন্দুর মতো ছোট হয়ে গেল।

তারপর?

তারপর এরা ঝাঁপ দিল। বিদ্যুতের মতো নিচে নেমে আসছে। কী অকল্পনীয় গতি! আমি শুধু দেখছি, এতেই আমার গা ঘেমে গেল। যদি দড়ি ছিঁড়ে যায়? যদি দড়ি বেশি লম্বা হয়ে যায়, মাথা ঠেকে যায় মেঝেতে!

কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না। তরুণ-তরুণীরা বাংগি জাম্পিং শেষ করে এল। তাদের লাল মুখ নীলচে হয়ে গেছে, কিন্তু মনে খুব ফুর্তি। প্রথম কথা যা বলল, তা হলো, গ্রেট ফান! প্রচণ্ড আনন্দ হয়েছে।

আনন্দই তো জীবন। ফান চাই। ফান।

ফান না হলে বেঁচে থেকে লাভ কী? এখন কথা হলো—একসময় তো বাংগি জাম্পিংও পুরনো হয়ে যাবে। তখন তারা ফানের জন্য কী করবে? এরচেয়েও ভয়ংকর কিছু তাদের খুঁজে বের করতে হবে। কিছুদিন পর সেটিও পুরনো হবে, তখন আরও ভয়ংকরের খোঁজ করতে হবে। কী হবে সেই ভয়ংকর?

এই আমেরিকারই এক মহান লেখক এডগার এলেন পো ভয়ংকর আনন্দের বর্ণনা দিয়ে একটি গল্প লিখেছিলেন। সেই গল্পে আনন্দের জন্য পশুর বদলে মানুষ শিকার করা হয়। একজন বন্দুক নিয়ে নামেন। আরেকজন নিরস্ত্র। গভীর জঙ্গলে বন্দুকধারী খুঁজে নিরস্ত্রকে। যে নিরস্ত্র সে পশু না, মানুষ, কাজেই তাঁর বুদ্ধি অনেক। সে বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচতে চায়। বন্দুকধারীর ওপর মরণ আঘাত করতে চায়। ভয়ংকর উত্তেজনার ভয়াবহ এক গল্প।

কে জানে, আমেরিকানরা হয়তো সেই ভয়ানক আনন্দের দিকেই যাচ্ছে।

তলাবিহীন ঝুড়িতে বুনো ফুল

বাংলাদেশের এক ছেলে আমেরিকায় বিয়ে করেছে। সেই বিয়ের খবর এবং বর-কনের ছবি পত্রপত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়।

বিস্মিত হওয়ার মতোই ঘটনা। বিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলেও পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ না। বাংলাদেশি ছেলে এই কাজটা কী করে করল ? নিজের বিয়েটা এত গুরুত্বপূর্ণ করল কীভাবে ? রহস্যটা কী ?

রহস্য হচ্ছে—বাংলাদেশের এই ছেলে কোনো মেয়েকে বিয়ে করে নি—বিয়ে করেছে আরেকটি ছেলেকে। ছেলে আমেরিকান।

আমেরিকায় এখন সমকামী বা 'গে'-রা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাদের স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই তারা এখন জাঁকজমক করে বিয়ে করছে। সেই বিয়ের খবর পত্রিকায় ছাপছে।

বাংলাদেশি এই ছেলে ফ্রি সোসাইটির সুযোগ গ্রহণ করে বিয়ে করে ফেলেছে আমেরিকান ওই ছেলেকে। সে কি অন্যায় কিছু করেছে ? রবীন্দ্রনাথ তো বলেই গেছেন, 'ন্যায় অন্যায় জানি না জানি না, শুধু তোমায় জানি।' কাজেই ছেলেটিকে দোষ দিয়ে কী হবে ? দেশে উদ্ভট কেউ কিছু করে বসলে তাকে মার দেওয়ার বিধান আছে। এতে একেবারে যে কাজ হয় না তাও না। কাজ হয় বলেই আমরা বলি—মারের উপর ওষুধ নেই। আমেরিকার মতো সুসভ্য (!) সমাজে মার দেওয়ার উপায় নেই। আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে এই নবদম্পতির জীবন যেন সুখময় হয় সেই প্রার্থনা। তাদের ঘরকন্না আনন্দময় হওয়ার কল্যাণ কামনা।

বাংলাদেশকে তো আমেরিকানরা কেউ চিনত না। এই ছেলের কারণে অনেকেই বাংলাদেশের নাম জেনেছে। সেটা ভেবেই আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করা যাক। এছাড়া আমরা আর কী-ইবা করতে পারি!

এই ছেলের মতো বাংলাদেশি এক রূপবতী তরুণীও দেশকে পরিচিত করার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। সে তার নগ্ন ছবি ছাপিয়ে যাচ্ছে পিনআপ পত্রিকায়। ছবির ক্যাপশন—

Flower from Bangladesh.

বাংলাদেশের পুষ্প। আফসোস এই, পুষ্পের সৌন্দর্য দর্শনে বাংলাদেশবাসী ব্যথিত হলো। সৌন্দর্য দেখছে আমেরিকানরা। দেখুক—সব সৌন্দর্য সবার জন্য নয়।

হেনরি কিসিঞ্জার একসময় তলাবিহীন ঝুড়ি বলে বাংলাদেশকে খুব অবজ্ঞা করেছিলেন। সেই অপমানের শোধ নিতে হবে। দেখাতে হবে তলাবিহীন ঝুড়িতে

ফুলও আছে। আমার খুব ইচ্ছা করেছিল মেয়েটিকে টেলিফোন করে বলি—খুকী! তোমার ছবি খুব সুন্দর আসে। তুমি যত ইচ্ছা ছবি ছাপাও। শুধু তুমি যে বাংলাদেশের সেটা চেপে যাও। এত সুন্দব মেয়ে আমাদের দেশে আছে—এটা বিদেশিদের আমরা জানাতে চাই না।

'Ten most wanted men' বলে FBI ভয়ংকর দশজন অপরাধীকে খুঁজছে। খুন এবং রেপ করে এরা ফেরার হয়েছে। কেউ কেউ একাধিক খুন করেছে। পোস্টার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দশজনের নাম প্রচার করা হচ্ছে। আমাদের আহ্লাদিত হওয়ার কারণ ঘটেছে। দশজনের মধ্যে দু'জন বাংলাদেশি।

আমার মা'র আমেরিকা

বছর তিনেক আগে আমার মা আমেরিকা ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি তাঁর মেজো ছেলের কাছে চার মাস ছিলেন। এই চার মাসে পুরো আমেরিকা ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেশে ফেরার পর আমরা তাঁকে ঘিরে ধরলাম। কী দেখলেন আমেরিকায় বলুন? তিনি বিরস মুখে বললেন, তেমন কিছু দেখি নাই।

আমরা বিস্মিত হয়ে বললাম, সে কী! নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখেছেন?

হুঁ।

কেমন লাগল?

আছে। মন্দ না।

বিশাল বিশাল দোকানপাট দেখেন নি?

হুঁ।

কেমন?

আছে। মন্দ না।

বিশাল আমেরিকা মা'কে তেমন অভিভূত করতে পারে নি। নেত্রকোনার কোনো গণ্ডগ্রামে বেড়াতে যাওয়ার পর ফিরে এসে তিনি যত গল্প করেন তার এক শ' ভাগের এক ভাগ গল্পও আমেরিকা নিয়ে করেন নি। কারণটা কী? এবার আমেরিকা গিয়ে ছোটভাইকে জিজ্ঞেস করলাম। সেও বলল—মা নাকি চার মাস খুব নস্টালজিক ছিলেন। তাঁর মুখে শুধুই দেশের কথা। আমেরিকা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো—এ দেশে লোকজন নেই। শুধু বাড়িঘর আর গাড়ি। জনমানব নেই। চারদিক খাঁ খাঁ।

তাঁকে জনতার ভিড় দেখানোর জন্য নিউইয়র্কে নিয়ে দীর্ঘ সময় রাস্তায় হাঁটানোর পর আমার ভ্রাতৃবধূ ইয়াসমিন বলল, মা, এখন দেখেছেন কত মানুষ?

মা শুকনো গলায় বললেন, কই, আমাদের দেশের মতো তো না। লোক তো এখানেও কম।

লোক বেশি থাকা কি ভালো?

মা শান্ত গলায় বললেন, ভালো। মানুষ নেই দেশের দাম কী?

চার মাসের জীবনে মা'র কীর্তিকলাপের একটা গল্প আপনাদের বলি। সেই দেশে খাওয়া-দাওয়া ঘুমানো ছাড়া মা'র কিছুই করার নেই। বলতে গেলে বন্দি জীবন। ভাইয়ের ছেলেমেয়ে দু'টিকে প্রবল আগ্রহে বাংলা শেখাতে বসতেন। নিয়মিত স্বরে অ, স্বরে আ করেন। বাচ্চা দুটি খুব মজা পায়। গ্র্যান্ড মা'কে খুশি করার জন্য খানিকটা স্বরে অ, স্বরে আ করে তাদের ইংরেজি গল্পের বই পড়তে বসে কিংবা কম্পিউটারে ছবি আঁকতে শুরু করে। মার আর সময় কাটে না। বিকেলে একা একাই এদিক-ওদিক ঘুরতে

বের হন। আধ ঘণ্টাখানেক হেঁটে এসে প্রতিদিনই বলেন, বউ-মা, এতক্ষণ হাঁটলাম, জনমানুষ চোখে পড়ল না।

একদিন বাসায় ফিরে খুব খুশি। আনন্দিত গলায় বললেন, বউ-মা, আজ একটা কবরস্থান দেখে এলাম। আমেরিকানগুলোর অন্তর ভালো, এরা কবরস্থানগুলো এত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে! কবরস্থান দেখে মনটা ভালো হয়ে গেছে। ঠিক করছি কাল আবার যাব।

বেশ তো মা, যাবেন। আপনার যেখানে ভালো লাগে যাবেন।

ওদের জন্য অজিফা পাঠ করে কিছু দোয়া-খায়েরও করব। এতে দোষ হবে না তো মা?

দোষ হবে কেন?

খ্রিষ্টান তো। এইজন্য বলছি।

খ্রিষ্টানদের জন্য দোয়া করলে কোনো দোষ হবে না। যিশুখ্রিষ্টকে আমরা নবী হিসেবে মানি। আপনি দোয়া করতে চাইলে করবেন।

এরপর থেকে মা প্রায়ই যান। অজিফা পাঠ করে দোয়া করেন। যে কবরস্থান মা'র এত পছন্দ সেই কবরস্থান আমার ছোটভাই একদিন দেখতে গেল। কবরস্থান দেখে তার চোখ কপালে উঠে গেল। নিউজার্সির হিউম্যান সোসাইটির কবরস্থান। সেখানে শুধু কুকুর ও বিড়ালের কবর দেওয়া হয়।

ব্যাপার শুনে মা খুবই অপমানিত বোধ করলেন। লজ্জা এবং দুঃখে রাতে ভালো খেলেন না। আমার ভাই বলল, মন খারাপ করার কী আছে? এত মন খারাপ করছেন কেন?

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আমি কুকুর বিড়ালের জন্য অজিফা পাঠ করেছি?

আপনার অজিফা পাঠের কারণে যদি তাদের একটা গতি হয় সেটা মন্দ কী?

চুপ কর।

কাল আমার সঙ্গে চলুন, ওদের একটা আসল কবরস্থান দেখিয়ে আনব।

মা কঠিন গলায় বললেন, আসল নকল কোনো কিছুই আমি দেখব না। ফাজিল আমেরিকানদের কোনো কিছুই আমি দেখতে চাই না।

মালিন্ডা, ফার্স্ট লেডি অব ম্যাজিক

হোটেলের নাম আলাদিন।

বাঙ্গাল উচ্চারণে আলাউদ্দিন হোটেল। লাস ভেগাসের সবই হুলস্থুল—আলাদিন হোটেলও সে রকম। হোটেল তো না, ছোটখাটো উপনিবেশ। আলাদিনের পাশেই এম.জি এম গ্র্যান্ড। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হোটেল। রুমের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি...। থাকবই যখন এমন এক হোটেলে থাকা যাক, যাতে দেশে ফিরে বলতে পারি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হোটেলে রাত কাটিয়েছি। টাকায় কুলাল না। সাধ ও সাধ্যের চিরন্তন সমস্যা।

হোটেল আলাদিনও মন্দ না। ঝকঝক তকতক করছে। ঘরে ঢুকলেই 'আহ্ কী সুন্দর' জাতীয় বাক্য আপনাতেই মুখে চলে আসে। কন্যারা খুব খুশি। তাদের আলাদা ঘর। বাবা মা-র চোখের সামনে থাকতে হবে না। দরজা বন্ধ করে মনের সাধ মিটিয়ে চিৎকার হইচই করতে পারবে। স্বাধীনতার আনন্দের মতো বড় আনন্দ আর কী হতে পারে?

বড় মেয়ে নোভা যথারীতি তাঁর ফিজিক্স বই নিয়ে বসে পড়েছে। নিরিবিলিতে সে নাকি খানিকক্ষণ পড়াশোনা করবে। আমি বললাম, মা, লাস ভেগাসে কেউ ফিজিক্স পড়তে আসে না। সে ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, লাস ভেগাসে কী করতে আসে?

আনন্দ করতে আসে। লাস ভেগাস হচ্ছে আনন্দ নগরী।

তোমরা আনন্দ করো। আমার আনন্দ করতে ইচ্ছা করছে না।

বড় বোন যা করে ছোট দুই বোনও তা-ই করে। তারাও বিরস গলায় বলল, আমাদেরও আনন্দ করতে ইচ্ছা করছে না।

তোমরাও কি ফিজিক্স পড়বে?

আমরা টিভি দেখব। ডিজনি চ্যানেল।

সবচেয়ে ছোট মেয়ে বিপাশা হলো চ্যানেল বিশেষজ্ঞ। সে মুহূর্তের মধ্যে নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডিজনি চ্যানেল বের করে ফেলল। ডিজনি চ্যানেলে দেখাচ্ছে লিটল মারমেইড।

ওদের ঘরে রেখে আমি গুলতেকিনকে নিয়ে নিচে নেমে এলাম। দুপুরে কোথায় খাব সেটা খুঁজে বের করতে হবে। হামবার্গারের হাত থেকে বাঁচা যায় কি না সেই চেষ্টা চালাতে হবে। হামবার্গার অসহ্য বোধ হচ্ছে। ভারতীয় রেস্টুরেন্ট পাওয়ার তেমন সম্ভাবনা নেই। চায়নিজ রেস্টুরেন্ট খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। জাপানি রেস্টুরেন্ট পেলে চলে। ওরাও ভাত খায়।

রাস্তায় নেমেই মনে হলো, আমি বড় ধরনের ভুল করেছি—মেয়েদের নিয়ে লাস ভেগাসে আসা ঠিক হয় নি। লাস ভেগাস আনন্দ নগরী, তবে এই আনন্দের জাত আলাদা। এই আনন্দ আদিম আনন্দ, নিষিদ্ধ আনন্দ।

পথের দু'পাশেই অসংখ্য নিউজ স্ট্যান্ড। নিউজ স্ট্যান্ডে থরে থরে সাজানো সম্পূর্ণ নগ্ন নারী মূর্তির ছবির প্যাম্পলেট। চোখ পড়বেই। এক একবার আমার চোখ পড়ছে, আমি আঁতকে উঠছি।

একটু দূরে দূরে পিম্প জাতীয় নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা হাতে প্যাম্পলেট গুঁজে দিচ্ছে। প্যাম্পলেটের ভাষার একটি নমুনা দিই—

লাস্যময়ী পামেলা

> আপনি আপনার হোটেলের কক্ষ নম্বর টেলিফোন করে জানালেই আমি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় আপনার কক্ষে উপস্থিত হব। যদি আমাকে আপনার পছন্দ হয় তবেই আমি থাকব। এক রাত্রির জন্যে আপনাকে দিতে হবে মাত্র ১০০ ডলার। আপনার আনন্দ বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি আমার এক বান্ধবীকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে পারি। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দিতে হবে মাত্র ১৫০ ডলার।
>
> আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, লাস ভেগাসে এই আনন্দ সম্পূর্ণ লিগ্যাল।

লাস্যময়ী পামেলা এবং পামেলার বান্ধবীর তিন চারটি ছবি দেওয়া আছে। সেইসব ছবি হাতে ছুঁলেও কার্বলিক সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হয় এমন অবস্থা। এটা অবশ্যি স্বীকার করতে হবে, মেয়েগুলো রূপবতী। অসম্ভব রূপবতী। শারীরিক সৌন্দর্য প্রকৃতির বড় উপহারের একটি—মেয়েগুলো এই মহান উপহারের কী কদর্য ব্যবহারই না করছে!

নিষিদ্ধ আনন্দের নগরী সারা পৃথিবীর ছেঁকে জোগাড় করেছে রূপবতীদের। মধ্যযুগের আনন্দকে বিংশ শতাব্দীর মোড়কে উপস্থিত করেছে। টপলেস বার আগেই ছিল। নগ্নবক্ষ দেখে দেখে লোকজন হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই এবার বটমলেস বার। বুকে কাপড় থাকবে, কিন্তু নাভীর নিচ থেকে কোনো কাপড় থাকবে না।

গুলতেকিন রাগী গলায় বলল, লাস ভেগাস আসার বুদ্ধি তোমাকে কে দিল?

আমি ভীত গলায় বললাম, কেউ দেয় নি। আমি নিজেই মাথা খেলিয়ে বের করেছি। অন্যের বুদ্ধির ওপর ভরসা করি নি।

কেন?

আমেরিকা জানতে হলে লাস ভেগাসে আসতে হবে।

আমেরিকা তোমাকে জানতে হবে কেন?

আমি লেখক মানুষ না?

লেখালেখির দোহাই দিবে না। বাচ্চারা রাস্তায় বের হয়ে যখন এইসব দৃশ্য দেখবে তখন তাদের কেমন লাগবে বলো তো!

খুবই খারাপ লাগবে।

আমার নিজেরই মাথা ঘুরছে। চলো হোটেল ফিরে যাই।

দুপুরে কিছু খাব না ?

হোটেলে রুমসার্ভিসে যা পাওয়া যায় তা-ই খাব।

আমি বললাম, তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে, আমরা দুদিন দুরাত হোটেলে দরজা বন্ধ করে রুমে বসে থাকব ?

হ্যাঁ, আমি আমার মেয়েদের রাস্তায় নিয়ে শক থেরাপির ব্যবস্থা করব না। ওরা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছে—দুদিন বিশ্রাম করুক। শুনেছি, লাস ভেগাসে খুব ভালো ভালো শো হয়। বাচ্চাদের কোনো শো যদি থাকে সেখানে ওদের একবার নিয়ে যেয়ো।

তাহলে হোটেলেই ফিরে যাই।

অবশ্যই হোটেলে ফিরে যাব।

হোটেলে ফেরামাত্র বড় মেয়ে বলল, তার ফিজিক্স পড়তে একদম ভালো লাগছে না, সে রাস্তায় ছোটবোনকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। আমাদের সঙ্গে নেবে না। আমরা শুধু উপদেশ দিই, আমাদের উপদেশ অসহ্য।

আমি মধুর গলায় বললাম, মা, তুমি ফিজিক্স পড়ো। সেটাই ভালো।

আনন্দ নগরীতে আমি ফিজিক্স পড়ব কেন ?

জ্ঞান সাধনাতেও আনন্দ আছে রে মা।

প্রথম রাতে হোটেলেই রইলাম, বের হলাম না। বাচ্চারা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর গুলতেকিনকে নিয়ে স্লট মেশিনে জুয়া খেলতে গেলাম। লাস ভেগাসে যাব, জুয়া খেলব না, তা তো হয় না। তা ছাড়া স্লট মেশিনগুলো অনেকটা শিশুদের খেলনার মতো। ঝনঝন শব্দ হয়, বাজনা বাজে। জুয়াটিকে ঠিক জুয়া বলে মনে হয় না। এক ধরনের মজার খেলা বলে মনে হয়। তবে জুয়া তো বটেই।

আমরা ঠিক করলাম, সর্বমোট দু শ' ডলার হারব। এর বেশি এক সেন্টও নয়। আমি এক শ' ডলার, গুলতেকিন এক শ'। ভাগ্য ভালো থাকলে জিতেও তো যেতে পারি। অনেকেই জেতে। স্লট মেশিনে খেলে মিলিয়ন ডলার জেতার ঘটনা তো ঘটেছে।

গুলতেকিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল দু শ' ডলার হারার পর আর খেলা যাবে না, কিছুতেই না। গুলতেকিন বলল, আঠার বছরে তোমাকে চিনতে আমার বাকি নেই, অল্পতেই তোমার নেশা লেগে যায়। খেলা শুরু করলেই তোমার নেশা লাগবে—তুমি খেলতেই থাকবে। কাজেই তুমি তোমার সবচে প্রিয় জিনিসের নামে শপথ করো। আমি বললাম, বেশ যাও, জোছনার শপথ। এক শ' ডলারের বেশি খেলব না।

জোছনার শপথে খেলা শুরু করলাম। খেলাটা এ রকম—স্লট মেশিনের ফুটো দিয়ে একটা কোয়ার্টার ফেলে হাতল ধরে টানতে হয়। তিনটি চাকা ঘুরতে থাকে। চাকাগুলোতে নানান সংখ্যা লেখা ছবি আঁকা। যদি তিনটি চাকাতেই ৭ সংখ্যাটি উঠে আসে তবে খেলোয়াড় এক ধাক্কাতেই পেয়ে যাবে দশ হাজার ডলার। আমি যে মেশিনে খেলছি তাতে পাঁচ হাজার ডলার হলো লিমিট। জুয়া খেলা বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করা যায় না। মনের ভুলে বিসমিল্লাহ্ বলে ফেলে খুব আফসোস হতে লাগল। তারপরেও মনে হলো—দান লেগে যাবে। আমরা দু শ' ডলার খেলব, আট শ' বার খেলা হবে—আট শ' বারে কি একবারও দান উঠবে না ? স্ট্যাটিসটিকস কী বলে ?

প্রথম হাতল টানতেই মেশিনের বাতি জ্বলে উঠল। নানান বাদ্য-বাজনা বাজতে থাকাল, ঝনঝন শব্দে কোয়ার্টার বেরুতে লাগল। তিনটা ৭ উঠে নি, তবে তিনটি চেরীফুল উঠেছে। তিনটা চেরীফুলের জন্য আমি পাচ্ছি চার শ' কোয়ার্টার অর্থাৎ এক শ' ডলার। ঝনঝন শব্দে কোয়ার্টার পড়ছে। আশপাশের সবাই তাকাচ্ছে আমার দিকে। প্রায় নগ্ন হোটেল পরিচারিকা হাসিমুখে ট্রে হাতে উপস্থিত হলো। ট্রেতে নিষিদ্ধ পানীয়। জুয়াড়িদের হোটেলের খরচে মদ্যপান করানো হয়। আমার কিছু বলার আগেই গুলতেকিন বলল, ও এসব খায় না। থ্যাঙ্ক ইউ।

পরপর দু'বার জেতা নিতান্তই অসম্ভব। সেই অসম্ভবও সম্ভব হলো। পরের দানেও আমি এক শ' ডলার জিতে নিলাম। এখন যদি আমি খেলা বন্ধ করে উঠে যাই তাহলে দু শ' ডলার জেতা থাকে। এই দু শ' ডলারে কত কি কেনা যায় ? মাইক্রোওয়েভ ওভেন খুব সস্তা—দেড়শ ডলার। দেশে এর দাম কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা। আমার একটা ভালো দূরবীনের খুব শখ। আমার যেটা আছে তা দিয়ে শনিগ্রহের বলয় দেখা যায় না। দু শ' ডলারে শনিগ্রহের বলায় দেখার মতো দূরবীন হতে পারে।

আচ্ছা ব্যাপারটা কী—একের পর এক দান পড়ছে। মনের ভুলে বিসমিল্লাহ্ বলায় কি আমার কপাল খুলে গেল ? কোয়ার্টার রাখার জায়গা নেই। অথচ কুড়ি ডলারও খেলা হয় নি।

গুলতেকিন বলল, তুমি আমার একটা কথা শুনবে ? অনেক জিতেছ, এখন খেলা বন্ধ করো। চলো কোয়ার্টার ভাঙিয়ে ডলার করে হোটেলে যাই। দেশে ফিরে বলতে পারব, আমরা লাস ভেগাস থেকে জিতে ফিরেছি। কেউ তো ফেরে না।

আমি বললাম, চুপ করো।

তোমার চোখ-মুখ যেন কেমন হয়ে গেছে। তোমার নেশা ধরে গেছে। প্লিজ চলো।

চুপ করো।

ধমকাচ্ছ কেন ?

ধমকাচ্ছি না, চুপ করতে বলছি।

গুলতেকিন চুপ করে গেল। আমি খেলতেই থাকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে জেতা টাকা চলে গেল। তারপর গেল মূলধন। জোছনার নামে শপথ করেছিলাম—দু শ' ডলারের বেশি খেলা হবে না। হঠাৎ মনে হলো, শপথে কি যায় আসে ? জোছনা একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। আমার শপথে তার কিছু যাবে আসবে না। আমি হারি বা জিতি প্রতি পূর্ণিমায় আকাশ ভেঙে জোছনা আসবে।

আমার মনের একটি অংশ ফিসফিস করে বলল, জুয়া খেলে এত টাকা নষ্ট করা কি ঠিক হবে ?

মনের অন্য অংশটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আহা তুমি তো আর রোজ রোজ খেলছ না। লাস ভেগাসে তো প্রতিদিন আসা যায় না। একবারই এসেছ। আবার কবে আসবে কে জানে! খেলে যাও।

মনের সু অংশ বলল, তোমার স্ত্রী কিন্তু রাগ করছে।

মনের কু অংশ বিরক্ত গলায় বলল, করুক রাগ। তুমি তো আর তার টাকায় খেলছ না। তুমি খেলছ তোমার নিজের টাকায়। তার এত রাগ করার কী আছে? তুমি তোমার স্ত্রীর কঠিন দৃষ্টি উপেক্ষা করে খেলে যাও।

আমি খেলে গেলাম। রাত তিনটার দিকে মানিব্যাগের সব ডলার (প্রায় চার শ') শেষ হয়ে গেল। আর যে খেলব, সে উপায় নেই। ডলার শেষ। গুলতেকিনের ট্রাভেলার্স চেক আছে। সে সেই চেক ভাঙিয়ে আমাকে ডলার দেবে—এ দুরাশা না করাই ভালো। আমি স্লট মেশিন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। গুলতেকিনের দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হেসে বললাম, চলো যাওয়া যাক।

গুলতেকিন বলল, এতগুলো টাকা হেরে তোমার খারাপ লাগছে না?

আমি বললাম, না। খেলতে গিয়ে যে তীব্র উত্তেজনা বোধ করেছি তার দাম হাজার ডলারের মতো। আমি হেরেছি মাত্র চার শ' ডলার।

তোমার রক্তের মধ্যে আছে জুয়া, তা কি তুমি জানো?

খুব ভালো করে জানি। পৃথিবীর সব সৃষ্টিশীল মানুষদের থাকে জুয়ার প্রতি আসক্তি। আমি নিজেকে সৃষ্টিশীল মানুষ মনে করি। মনের সাধ মিটিয়ে খেলতে পারলাম না এই আফসোস।

সাধ মেটে নি?

না।

গুলতেকিন আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল, আমি তোমাকে ডলার ভাঙিয়ে দিচ্ছি—যাও খেলে আসো। আফসোস রাখাটা ঠিক না। বুকে তৃষ্ণা নিয়ে ঘুমাতে যাবে কেন? যাও তৃষ্ণা মেটাও।

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ।

আমি আরও এক শ' ডলার ভাঙিয়ে স্লট মেশিনের কাছে ছুটে গেলাম—তখন মনে হলো—আরে, আমি এ কী করছি। মানুষের সব তৃষ্ণা মেটার নয় জেনেও তৃষ্ণা মেটাতে ছুটে যাচ্ছি? আমি না খেলেই উঠে এলাম। ঝনঝন শব্দে স্লট মেশিনটা আমাকে ডাকতে লাগল—এই আয় না, আয়। যাচ্ছিস কোথায়? বোকা ছেলে। নাইট ইজ স্টিল ইয়াং।

পরের দিন রাতের কথা। স্লট মেশিনের ধারে কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে বাচ্চাদের নিয়ে সময় কাটানোর পরিকল্পনায় বসলাম।

বাচ্চাদের দেখানো যায় এমন একটা শো খুঁজে পাওয়া গেল। মালিন্ডা ফার্স্ট লেডি অব ম্যাজিক। এই তরুণী গত আট বছর ধরে লাস ভেগাসে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। প্রতি রাতে দুটা শো করেন। রাত আটটায় একটা, সেখানে বাচ্চারা যেতে পারে। রাত দশটায় একটা, সেখানে ১৮ বছরের নিচের কেউ যেতে পারে না। ম্যাজিকের মতো ব্যাপারে এমন কী থাকতে পারে যে আঠার বছরের নিচের কেউ যেতে পারে না তা আমার মাথায়

ঢুকল না। বাচ্চাদের জন্য টিকিট কাটলাম। তিরিশ ডলার করে টিকিট। বাংলাদেশি টাকায় প্রতি টিকিটের দাম বার শ' টাকা। মনটা একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল। এত টাকা খরচ করে যাচ্ছি, যদি ম্যাজিক শো মনমতো না হয়? আমরা ম্যাজিকের দেশের মানুষ। অসাধারণ সব ম্যাজিক দেখে আমরা অভ্যস্ত।

রাত আটটায় শো শুরু হলো। হল অন্ধকার। অপূর্ব বাজনা বাজছে। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে ক্ষীণ আলোর ইশারা দেখা গেল। অপূর্ব বাজনা। আলো ও আঁধারে শূন্য থেকে আবির্ভূত হলেন ম্যাজিকের ফার্স্ট লেডি জাদুরানী মালিন্ডা।

মালিন্ডাকে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। কারণ তিনি প্রায় নগ্ন হয়েই আবির্ভূত হয়েছেন। নারীদেহের যেসব অংশ দর্শনীয় বলে বিবেচনা করা হয় তার সবই দেখা যাচ্ছে। একটা সাধারণ রুমালে যতটুকু কাপড় থাকে ততটুকু কাপড়ও এই ফার্স্ট লেডি অব ম্যাজিকের গায়ে নেই। গুলতেকিন আঁতকে উঠে বলল, তুমি না বললে এটা বাচ্চাদের শো!

আমি ঢোক গিলে বললাম, টিকিটে তো তা-ই লেখা।

আমার তিন কন্যার দুই কন্যা হাঁ করে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে। তৃতীয় জনের লজ্জা একটু বেশি। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

জাদুকন্যার সাথীরা আবির্ভূত হলেন। মাশাআল্লাহ তাঁরা আরও এক ডিগ্রি উপরে। সূর্যের চেয়ে বালি গরম। বড় বড় ফুটার মাছধরা জালের জাতীয় এক ধরনের কাপড়ে তাঁরা শরীরের লজ্জা (যদি কিছু থেকে থাকে) নিবারণ করছেন। শুরু হলো নাচ। কিছুক্ষণ নাচ চলে—নাচের ফাঁকে ম্যাজিক, আবার নাচ।

ম্যাজিকগুলো কেমন?

ভালো। শুধু ভালো না, বেশ ভালো। তবে সমস্যা হচ্ছে ম্যাজিকের দিকে কারোর চোখ থাকে না—চোখ পড়ে থাকে মালিন্ডার দুগ্ধফেননিভ নগ্ন শরীরে।

শোর মাঝখানে একজন জাগলার এসে জাগলিং করলেন। তিনি পৃথিবীর সেরা জাগলার—গিনিস বুক অব রেকর্ডে তাঁর নাম আছে। জাগলিং দেখে আমরা হতভম্ব হলাম। আমার তিন কন্যা হাততালি দিতে দিতে হাত লাল করে ফেলল। একপর্যায়ে চীনদেশীয় দুই ভাই এসে ছুরি চাকু দিয়ে কিছু খেলা দেখিয়ে সবার চুল খাড়া করে দিল। তিন কন্যার হাততালি আর থামেই না। শুধু যখন মালিন্ডা ম্যাজিক দেখাতে আসে, তখন আমার কন্যারা ঝিম মেরে যায়। ঝিম মেরে যাওয়ারই কথা।

জাদু দেখে হোটেলে ফিরছি—আমি বললাম, মায়েরা, ম্যাজিক কেমন দেখলে?

কেউ জবাব দিল না।

আমি বললাম, মেয়েটি কী পোশাক পরে ম্যাজিক দেখিয়েছেন সেটা বড় কথা না। ম্যাজিক কেমন দেখিয়েছেন সেটা বড় কথা। আমরা তাঁর সৃষ্টিকে দেখব। তাঁকে দেখব না। এখন বলো, ম্যাজিক কেমন দেখলে?

তিনজনই একসঙ্গে বলল, অসাধারণ।

আমরা একটা সার্টিফিকেট পেয়েছি, হুয়ালপাই ট্রাইব ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনের প্রধান এবং ভ্যালেন ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি যৌথভাবে এই সার্টিফিকেট দিয়েছে। সেখানে লেখা—

OFFICIAL

GRAND CANYON EXPLORER AWARD

Be it show by this certificate that
The HUMAYUN AHMED FAMILY
has succesfully braved the Great Mojave Desert
and travelled the gruelling 45 mile Great Hualapai
Indian Reservation wilderness road... to physically
walk, without guard nor parachut, the mile high rim
of the Great American Grand Canyon thereby
earning the right to be called American Explorer and
Adventurer on this 14th day of September 1994.

বঙ্গানুবাদ হলো—

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অভিযাত্রী সম্মান

এই সার্টিফিকেটের দ্বারা প্রত্যয়ন করা হচ্ছে যে
হুমায়ূন আহমেদ পরিবার
সাফল্যজনকভাবে অসীম সাহসিকতায় মহা মোজাবি মরুভূমি
অতিক্রম করে হুয়ালপাই ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনের ভেতর দিয়ে
দীর্ঘ ভয়াবহ পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের
এক মাইল গভীর খাদ পরিদর্শন করেছেন। তাঁরা যেখান দিয়ে
হেঁটেছেন সেখানে কোনো রেলিং ছিল না, তাঁরা সাবধানতার
জন্যে কোনো প্যারাসুটও পরেন নি। তাঁরা এই অসীম
সাহসিকতা দেখানোয় যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাঁদেরকে এখন
আমেরিকান অ্যাডভেঞ্চারার বলা যায়...।

আমাদের এই সার্টিফিকেট অর্জনের শানে নুজুল এখন বলা যাক।

ভ্যান এলেন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অতিথি হয়ে এক ভোরবেলায় লাস ভেগাস রওনা হলাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নকে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সাত

প্রাকৃতিক আশ্চর্যের প্রধান আশ্চর্য। আমাদের ভূগোল বইতে আমরা ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের কথা পাই, নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা পাই, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কথা পাই না। কাজেই এই অসাধারণ প্রাকৃতিক বিস্ময় সম্পর্কে আমরা মোটামুটি অজ্ঞই বলা চলে। আমি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সম্পর্কে প্রথম পড়ি আমেরিকান নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখক জন স্টেইনবেকের রচনায়। এই লেখক একসময় পায়ে হেঁটে পুরো আমেরিকা ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা করেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের পাশে এসে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে লেখেন—যে-কোনো নাস্তিক এই জায়গায় এসে দাঁড়ালে আস্তিক হতে বাধ্য।

আগেও একবার লাস ভেগাসে আসার সুযোগ আমার হয়েছিল। পিএইচডি ছাত্র হিসেবে লাস ভেগাসে একটা কনভেনশনে এসেছিলাম। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন লাস ভেগাস থেকে মাত্র দেড় শ' মাইল। গ্র্যান্ড ক্যানিযন তখন দেখা হয় নি, কারণ মহা বিস্ময়কর কোনো কিছু আমার একা দেখতে ভালো লাগে না। প্রিয়জনদের নিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কোনো একটা কিছু দেখে প্রিয়জনের বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার দৃশ্য দেখে আমি অনেক মূল্যবান দৃশ্য দেখার চেয়েও বেশি আনন্দ পাই। তখন এমন একটা ভাব মনের ভেতর হয় যেন এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি আমিই তৈরি করেছি। সেবার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন যাওয়া প্রায় ঠিক হয়েছিল—হঠাৎ মনে হলো বেচারি গুলতেকিন একা একা ফার্গো শহরে পড়ে থাকবে আর আমি মহানন্দে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখব—এটা ঠিক না। যাওয়া বাতিল হলো। এবার সে সমস্যা নেই, এবারে আমি বউ-বাচ্চা নিয়ে প্রস্তুত...।

বাস ছাড়ল ভোরবেলা। শহর ছাড়িয়েই মরুভূমি। মরুভূমির ক্লান্তিকর দৃশ্য বাসের জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল। কয়েকবারই মনে হলো—আমাদের কী সৌভাগ্য, প্রকৃতি সারা পৃথিবীকে মরুভূমি বানান নি। তিনি ইচ্ছা করলেই তো সারা পৃথিবী মরুভূমি বানিয়ে পাঠাতে পারতেন। সেই মরুভূমিতে মানুষ সৃষ্টি না করে বিচিত্র কোনো পোকা বানিয়ে আমাদের পাঠাতে পারতেন। মরুভূমির আগুনগরম বালিতে আমরা দশ পায়ে হেঁটে বেড়াতাম আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম একফোঁটা বৃষ্টির জন্য...।

বাস এবার উঁচুতে উঠছে। দুদিকে পাথরের পাহাড়। ঘাসপালা, গাছ কোনো কিছুর চিহ্ন নেই। যেন আমরা চলে এসেছি পৃথিবীর জীবন-বর্জিত অংশে। এখানে শুধুই পাথর—কঠিন গ্রানাইট। আমাদের গাইড এখন মাইক হাতে তুলে নিলেন। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক। গাইডরা সাধারণত রেকর্ড বাজানোর মতো করে মুখস্থ কথা বলে। যা ভয়াবহ ধরনের ক্লান্তিকর হয়ে থাকে। এই ভদ্রলোক কথা বলছেন সুন্দর করে। তাঁর কথা শুনেই মনে হচ্ছে—ভদ্রলোকের জীবন থেকে বিস্ময় পুরোপুরি দূর হয় নি। ভদ্রলোক বলছেন,

> ডিয়ার ফ্রেন্ডস, প্রিয় বন্ধুরা, আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে এখন বিকল্প রাস্তায় নেমে যাব। রাস্তাটা সরু, মাঝে মাঝে ভাঙা, প্রচুর আপস অ্যান্ড ডাউন্স আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের রোলার কোস্টারে চড়ার অভিজ্ঞতা হবে। বিকল্প পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি,

কারণ আপনাদের একটা অসাধারণ দৃশ্য দেখানো হবে। ছোট্ট একটা বন। অরণ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

এই অরণ্যে সব এক ধরনের গাছ। সংখ্যায় খুব যে বেশি তা না। তারপরেও এই অরণ্য অসাধারণ অরণ্য, কারণ এই অরণ্য সম্ভবত আপনারা আগে দেখেন নি। বিশ্বের এই একটি জায়গাতেই এই অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। আর কোথাও নেই। গ্রান্ড ক্যানিয়নে দ্বিতীয়বার এসেও যে এই অরণ্য দেখবেন সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কাছে আসতে হলে যে কষ্ট করতেই হয়, সেই কষ্ট করতে কেউ সহজে রাজি হয় না।

যাই হোক, অরণ্য সম্পর্কে বলি। যে গাছে এই অরণ্য সেই গাছের নাম যশোহা বৃক্ষ। এগুলো হচ্ছে এক ধরনের দৈত্যাকৃতি ক্যাকটাস। এর বেশি আপনাদের কিছু বলব না, শুধু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিব যে, যশোহা বৃক্ষে হাত দেবেন না। ভয়ংকর কাঁটা। শুধু ছবি তুলবেন, স্যুভেনিয়ার হিসেবে কেউ যেন ভুলেও গাছের অংশবিশেষ কেটে না নেন। গাছগুলো সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। এই গাছের কোনো ক্ষতি করলে বা করার চেষ্টা করা হলে এক হাজার ডলার জরিমানার বিধান রয়েছে।

ক্যামেরা রেডি করে রাখুন—আমরা চলে এসেছি। প্রাণ ভরে দেখুন যশোহা বৃক্ষ। আপনাদের দশ মিনিট সময় দেওয়া হলো।

আমরা পঞ্চাশজন ট্যুরিস্ট—নেমে এলাম। অন্যদের কথা বলতে পারি না, আমি গেলাম হকচকিয়ে—এ কী! কী দেখছি চারপাশে ? এই বৃক্ষরাজি তো পৃথিবীর হতে পারে না—নিশ্চয়ই অন্য কোনো গ্রহের। ট্যুরিস্টরা পাগলের মতো ছবি তুলছে। জাপানিরা এমনিতেই স্বল্পভাষী—এদের কথা বলতে শোনাই যায় না—এরা এখন সমানে ক্যাচ ক্যাচ করে যাচ্ছে। এক জাপানি তরুণীর শখ হলো যে গাছে হাত দিয়ে ছবি তুলবে। তার স্বামী ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াচ্ছে—হাত দিয়ে গাছ স্পর্শ করতেও তার ভয় লাগছে, আবার স্পর্শ করার লোভও সামলাতে পারছে না।

গাছগুলো কেমন ? দৈত্যাকৃতি ক্যাকটাস গাছ। আবার ঠিক ক্যাকটাসও নয়—কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এদেরকে লোমশ প্রাণীর মতো মনে হয়। যেন একদল লোমশ প্রাণী ওঁৎ পেতে বসে আছে, এক্ষুনি লাফিয়ে পড়বে।

আমি গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম, যশোহা বৃক্ষে ফুল ফোটে ?

হ্যাঁ, ফোটে।

সেই ফুলগুলো কেমন ?

গাছ যেমন অদ্ভুত, ফুলও অদ্ভুত। হলুদ রঙের ফুল, তীব্র ধরনের ফুল (sharp flower)। গাড়িতে ওঠো। গাড়িতে ওঠো। দশ মিনিট পার হয়েছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখনো অনেক দূর যেতে হবে।

আমাব নড়তে ইচ্ছা করছিল না। ভাবলাম গাইডকে বলি, তুমি আমাকে এখানে রেখে যাও, আমি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যশোহা বৃক্ষের অরণ্যে ঘুরব। ফেরার পথে আমাকে তুলে নিয়ে যেয়ো..।

বলা হলো না। গাড়িতে উঠলাম, মন পড়ে রইল যশোহা বৃক্ষের নিচে। মন ফেলে এসেছিলাম বলেই কি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আমাব মনে ধরল না ?

না, গ্র্যান্ড ক্যানিযন আমার ভালো লাগে নি। সম্ভবত পর পর দুবার বিস্মিত হওয়া যায় না বলেই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখে বিস্ময় বোধ হলো না—অথচ সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসছে প্রকৃতির এই আশ্চর্য খেলা দেখতে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন একমাত্র জায়গা যেখানে প্লেন টেকঅফ করে আকাশে না গিয়ে নিচে নেমে যায়। মানুষ প্যারাসুট করে ক্যানিয়নে ঝাঁপ দেয়।

গাধা এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে ট্যুরিস্টের দল গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে নামে। নামতে লাগে পুরো দুদিন, উঠতে লাগে তিন থেকে চার দিন। পুরো এক মাইল নামা, আবার এক মাইল উঠা তো সহজ কথা নয়। এখানে রঙের খেলাও আছে—গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সকালে এক রঙ, দুপুরে অন্য, বিকেলে আরও ভিন্ন এক রঙ...।

তারপরেও আমার মন লাগল না—বারবার মনে হতে লাগল যশোহা বৃক্ষের কাছে না থেকে কোথায় এসেছি! ফেরার পথে পাঁচ ডলার দিয়ে যশোহা বৃক্ষের বীজ কিনলাম।

আমাদের গাইড বলল, তুমি করেছ কী ? পাঁচ ডলার খামাখা নষ্ট করলে ? এই গাছের বীজ থেকে কখনো গাছ হয় না। বিশাল মোজাবি ডেজার্টের একটা ক্ষুদ্র অংশেই শুধু এই গাছ হয়। তুমি বীজ ফেরত দিয়ে ডলার নিয়ে এসো। ডলার নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

আমি ডলার ফেরত নিলাম না—পৃথিবীর সবকিছুই তো নষ্ট হয়ে যায়, ডলার নষ্ট হবে তা এমন বেশি কি। থাকুক না আমার পকেটে ঘুমন্ত কিছু যশোহা বৃক্ষ।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। আবার যশোহা বৃক্ষ দেখা যাবে এই আশায় আমি জানালার পাশে বসে আছি। বাস খুব দুলছে, দুলুনিতে ঘুম এসে যাচ্ছে। প্রাণপণে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেল যশোহা অরণ্য। দ্বিতীয়বার দেখা হলো না। সেই ভালো—অলৌকিক সৌন্দর্য দ্বিতীয়বার দেখতে নেই।

ধাঁধা

গত নব্বইয়ের অক্টোবরে আমেরিকায় একটা ঘটনা ঘটল। যে ঘটনায় পৃথিবীর মানুষ নিদারুণ আতঙ্কে নড়ে উঠল। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে ঘটনাটির বিবরণ ছাপা হলো। আমি আমার দেশের সংবাদপত্রে ঘটনাটি প্রথম পড়ি। পরে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পড়ি সাপ্তাহিক *টাইম* পত্রিকায়।

ঘটনাটা এ রকম—হ্যালোইনের রাত। আমেরিকান শিশুরা ভূতের মুখোশ পরে হইচই করছে, আনন্দ করছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছে, ট্রিট অর ট্রিক। চকলেট দাও, নয় তো ভয় দেখাব...। এইসময় ঘর ছেড়ে বের হলো জাপানি এক তরুণ। আমেরিকা নামক স্বপ্নের দেশে সে বেড়াতে এসেছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছে স্বপ্নের আমেরিকা। যা দেখছে তা-ই তার ভালো লাগছে। হ্যালোইন দেখেও সে খুব মজা পাচ্ছে—বাহ্ কী সুন্দর ভূত উৎসব!

আমেরিকান এক বাড়িতে রাতে তার খাওয়ার নিমন্ত্রণ। সে ঠিকমতোই এসেছে, তবে কোন বাড়ি সে ধরতে পারছে না। সব বাড়ি তার কাছে একরকম লাগছে। সে ভুলে অন্য এক বাড়িতে উপস্থিত হলো। বেল টিপল, গৃহকর্তা পিপহোল দিয়ে দেখলেন অচেনা একটি ছেলে। তিনি ইংরেজিতে বললেন, তুমি কে? কী চাও? জাপানি ছেলে ইংরেজি জানে না। সে চুপ করে রইল। গৃহকর্তা বললেন, তোমাকে আমি চিনি না। তুমি আমার বাড়ির সীমানায় ট্রেসপাস করেছ। চলে যাও।

যুবকটি চুপ করে আছে। সে কথাবার্তা কিছুই বলছে না।

গৃহকর্তা তখন শটগান হাতে নিলেন—জানালা দিয়ে ছেলেটিকে তাক করে গুলি করে মেরে ফেলে পুলিশে খবর দিলেন।

আমেরিকান আইনে গৃহকর্তার কোনো সাজা হলো না। কারণ তার অধিকার আছে নিজেকে রক্ষার। ছেলেটি তার বাড়ির সীমানায় ট্রেসপাস করেছে। চলে যেতে বলার পরেও যায় নি। দাঁড়িয়ে ছিল।

ছেলেটির ডেডবডি দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাপান থেকে এল ছেলের বাবা মা। মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার ছেলে ঠিকানা ভুল করে অন্য এক বাড়িতে উঠেছে বলে তাকে মেরে ফেলতে হবে? তোমরা কেমন মানুষ?

তারা পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য (!) দেশের মানুষ। তারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করছে। এই সুসভ্য মানুষদের কাছে যাওয়ার জন্য, তাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। তাদের বুকের রক্ত স্পন্দিত হয়ে বাজছে—আমেরিকা! আমেরিকা! আমেরিকা! ভিসার জন্য রাত তিনটা থেকে অ্যাম্বেসির সামনে লাইন পড়ে। লোকজন বাড়ির দলিল, গাড়ির ব্লু বুক কোলে নিয়ে বসে থাকেন—যাতে

ভিসা অফিসারকে বলতে পারেন, আমার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। আমি তোমাদের দেশে থাকব না, চলে আসব। শুধু একবার তোমাদের দেশে আমাকে যেতে দাও। প্লিজ প্লিজ, দয়া করো।

পাদটীকা

প্লেনে ঢোকার আগে যাত্রীদেব খুব ভালো করে চেক করা হয়। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না দেখা হয়। যাত্রীদের মেটাল ডিটেকটরের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এ জাতীয় মেটাল ডিটেকটর এখন আমেরিকান স্কুলগুলোতে বসানো হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এখন মেটাল ডিটেকটরের ভেতর দিয়ে স্কুলে যেতে হয। কেন ? এটা একটা ধাঁধা, জবাব আপনারা খুঁজে বের করুন।

হে বন্ধু, বিদায়

আমি খুব বন্ধুবৎসল নই।

দীর্ঘদিন কেউ আমাকে সহ্য করতে পারে না। সম্ভবত আমিও পারি না। তবে পুরোনো পরিচিতরা হঠাৎ উপস্থিত হলে খুব ভালো লাগে। ফেলে আসা দিনের গল্প করতে ভালো লাগে। অকারণে হো হো করে হাসতে ভালো লাগে। এই সৌভাগ্য আমার কমই হয়। পরিচিতরা আমাকে এড়িয়ে চলেন।

আমেরিকায় ভিন্ন ব্যাপার হলো। কলেজ-জীবনের বন্ধুরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা একের পর এক টেলিফোন করতে লাগল। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। সবার একই কথা—গাড়ি নিয়ে আসছি, তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাব। আমেরিকায় কোথায় কোথায় ঘুরতে চাও সেই ব্যবস্থা করব।

আমেরিকাপ্রবাসী আমার বন্ধুরা প্রত্যেকে বিত্তবান। কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করছে, কেউ বড় বড় কোম্পানিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে আছে। পড়াশোনায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি পিএইচডি সবারই আছে। সায়েন্টিফিক জার্নাল খুললেই ওদের নাম পাওয়া যায়। তারা সর্ব অর্থে সফল মানুষ।

এমনই একজন ড. আবদুল মজিদ। আমরা একসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M.Sc. করি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে যোগ দেই, সে যোগ দেয় ফার্মেসি বিভাগে। দুজন একসঙ্গে পিএইচডি করতে যাই। আমি পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরে আসি। সে থেকে যায় এবং একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। বিশাল বাড়ি কিনে হুলস্থূল কারবার করে ফেলে।

আমেরিকা গিয়ে মজিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। সেও অন্যদের মতো বলল, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি। থাকি অবশ্যি সাত শ' মাইল দূরে। আমেরিকায় এই দূরত্ব কিছুই না। তুমি হ্যাঁ বলো, আমি চলে আসছি।

আমি বিনয়ের সঙ্গে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। টেলিফোনে জমিয়ে গল্প করছি। একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করলাম—চাকরিতে কি আরও উন্নতি করেছ? নতুন কোনো পালক কি যুক্ত হয়েছে?

মজিদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি শোনো নি? আমার চাকরি নেই।

চাকরি নেই মানে?

নেই মানে নেই। কোম্পানি বেশকিছু লোক ছাঁটাই করেছে—আমি তার মধ্যে পড়ে গেছি।

সে কী!

আমেরিকায় এরকম তো অহরহই ঘটছে। নতুন কিছু তো না। একসময় আমাকে তাদের খুব প্রয়োজন ছিল। আগ্রহ করে রেখেছে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে, বিদায় করে দিয়েছে।

এখন কী করবে ?

নতুন চাকরি খুঁজব। তুমি এত হকচকিয়ে গেছ কেন ?

মজি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে, আমি আর স্বাভাবিক হতে পারছি না। এই বয়সে একজন নতুন চাকরি খোঁজে—ভাবতেই কেমন লাগে।

মজিদ, চাকরি পাবে তো ?

পাব। অবশ্যই পাব।

যদি না পাও ?

একটা-কিছু হবেই, এখন বলো, দেশের খবর বলো..।

আলাপ আর জমল না। আমি বিষণ্ন হয়েই টেলিফোন রাখলাম। অনিশ্চয়তা মাথায় নিয়ে একজন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কী করে টেলিফোন করছে তা-ই আমার মাথায় আসছে না। এই অনিশ্চয়তায় আমেরিকানরা অভ্যস্ত। আমরা অভ্যস্ত নই। অভাবের দেশের মানুষ বলেই আমরা চাকরির অনিশ্চয়তায় অস্থির বোধ করি।

একজন খুব বড় চাকুরে ভোরবেলা অফিসে গিয়ে শুনবে তার চাকরি নেই, এরকম আমাদের দেশে সাধারণত ঘটে না। আমাদের দেশে চাকরি পাওয়া যেমন জটিল, চাকরি খোয়ানো তারচেয়েও জটিল। ভয়াবহ সব অপরাধের পরেও আমাদের দেশে চাকরি যায় না। যিনি চাকরি নট করবেন তিনি অপরাধীর সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের কথা চিন্তা করেন। চাকরি চলে গেলে ওরা খাবে কী—এই ভেবে বলেন, থাক। পরের বার যদি আবার অপরাধ করে তখন দেখা যাবে। লোকটি আবারও অপরাধ করে। তখন বলা হয়, আচ্ছা আরেকটা চান্স দিয়ে দেখি। চান্সে লাভ হয় না। যার শাস্তির ভয় নেই সে তো অপরাধ করবেই। তখন বলা হয়—এটাই সর্বশেষ সুযোগ। আর না। যথেষ্ট হয়েছে...।

বলাই বাহুল্য, সর্বশেষ সুযোগ হারাবার পরেও চাকরি থাকে।

আমেরিকায় এই ব্যাপার নেই। সারভাইভাল ফর দি ফিটেস্ট। তুমি যদি ফিট হও সারভাইভ করবে। আনফিট হলে গো অ্যাওয়ে। দখিন দুয়ার খোলা।

ধরা যাক, একজন আমেরিকান খুব ভালো চাকরি করছে। বছরে আশি নব্বই হাজার ডলার পাচ্ছে। হঠাৎ তার চাকরি চলে গেল। পরবর্তী ঘটনাগুলো কী ঘটে তার সিনারিও তৈরি করা থাকে।

প্রথম চার মাস তার কোনো সমস্যা নেই। চাকরি যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে সে ইন্স্যুরেন্স করে রেখেছিল। সেই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চার মাস (ক্ষেত্রবিশেষে ছয় মাস) তাকে আগে যে বেতন পেত সেই বেতন দেবে। এই চার মাসে সে যদি চাকরি জোগাড় করতে পারে তাহলে ভালো কথা, যদি না পারে তখন কী ?

(ক) প্রথমে চলে যাবে তাঁর সুরম্য গাড়ি। এই বাড়ি তার কেনা হলেও ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ রাখা। মাসে মাসে সে মর্টগেজ দিচ্ছিল। মাসিক পেমেন্ট বাকি পড়লে ব্যাংক বাড়ি নিয়ে নেবে।

(খ) তারপর যাবে তাঁর গাড়ি (সম্ভবত তিনটি গাড়ি। একজন আমেরিকানের গড়পড়তায় তিনটি গাড়ি থাকে)। বাড়ির মতো গাড়িগুলোও সে মাসিক কিস্তিতে কিনেছে।

(গ) তার জিনিসপত্র—ফ্রিজ, টিভি, আসবাবপত্র চলে যাবে। এগুলোও মাসিক কিস্তিতে কেনা।

(ঘ) চলে যাবে তার স্ত্রী। বেকার স্বামী, যে ওয়েলফেয়ারে জীবনযাপন করছে, তার সঙ্গে বাস করবে আমেরিকান স্ত্রী ? হতেই পারে না। চাকরি যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে আমেরিকায় ডিভোর্সের হার ৭০ ভাগ। এই স্ট্যাটিসটিকস আমি আমেরিকা থেকে নিয়েছি। মনগড়া স্ট্যাটিসটিকস নয়।

আমাদের দেশের স্ত্রীরা যে স্বামীকে ছেড়ে মাঝে মাঝে চলে যান না তা না, তবে স্বামী অভাবে পড়ছে সেই কারণে কোনো স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে—এটা প্রায় কখনোই ঘটে না।

বরং উল্টোটা ঘটে। আমি এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে চিনতাম—যার স্ত্রী তাকে ছেড়ে বাপ-মার কাছে চলে গিয়েছিলেন। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর পর ভদ্রলোকের ব্যবসায় অবস্থা খারাপ হলো। দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা। খবর পেয়ে স্ত্রী ছুটে এলেন। তার বক্তব্য হচ্ছে—ওর এমন খারাপ অবস্থায় আমি ওকে ছেড়ে থাকব তা কী করে হয় ?

আমি ভদ্রমহিলাকে বললাম, ভাবি! এখন আপনার কল্যাণে তিনি যদি আবার মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়ান তখন আপনি কি চলে যাবেন ?

তিনি বললেন, অবশ্যই। ওই বদমাশের সঙ্গে আমি থাকব ? আমার কি বাপ-ভাই নেই ? আমি কি জলে ভেসে এসেছি ?

আচ্ছা, বাংলাদেশের মেয়েগুলো এত ভালো কেন ?

মিলিয়ন ডলার মামা

মে ফ্লাওয়ার নামের বইয়ে আমি লিখেছিলাম—প্রতিটি আমেরিকানের স্বপ্ন হলো মিলিওনিয়ার হওয়া। এটি তাঁদের প্রথম স্বপ্ন এবং অনেকের জন্য এটিই তাঁদের শেষ স্বপ্ন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তবে খুব অল্প সংখ্যকই দেখেন। লাখ টাকার স্বপ্ন দেখাটাকে ভালো চোখেও দেখা হয় না। অর্থটা খুব খারাপ জিনিস, তা ছোটবেলা থেকেই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া চেষ্টা করা হয়। আমাদের কবিরা লেখেন—

'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।'

দারিদ্র্য আমাদের আসলে মহান করে না, মনের দিক দিয়ে ছোট করে তা পরের কথা কিন্তু ছেলেবেলাতেই কবির কথার ভাবসম্প্রসারণ করতে গিয়ে দারিদ্র্য সম্পর্কে আমাদের অনেক ভালো কথা লিখতে হয়।

জাগতিক স্বপ্নকে তুচ্ছ করে অন্য ধরনের স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টার জন্যই রবীন্দ্রনাথও লেখেন—

'ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা—
করেছিনু আশা'...

জীবনানন্দ দাশ আরেকটু অন্যরকম ভঙ্গিতে বলেন—

'অর্থ নয় কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা নয়
আরও এক বিপন্ন বিস্ময়।'

এইসব কারণে আমরা অর্থকে তুচ্ছ করে বড় হওয়ার চেষ্টা করি—মিলিওনিয়ার ড্রিম থেকে দূরে থাকি। যারা তার পরেও মিলিওনিয়ার হয়ে যায় তাদের দিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকাই। সেই তাকানোয় বলার চেষ্টা করি—ব্যাটা তুই দলছুট মানুষ। আমরা ধরেই নিই যেহেতু তার প্রচুর অর্থ, সেহেতু সে মহা অসুখী একজন মানুষ। তার জীবন কাটছে মদে, মেয়েমানুষে এবং তার অর্থের পুরোটাই অসৎ পথে আসা। তার জন্য অপেক্ষা করছে নরকের তীব্র হুতাশন।

দেশ ছেড়ে যারা আমেরিকা নামক নেতার নেতার ল্যান্ডের উদ্দেশে পাড়ি দেন, নতুন দেশে তাঁদের চিন্তা-চেতনা দ্রুত বদলাতে থাকে। একসময় নিজের অজান্তেই তারা বুঝতে পারেন সুদূর শৈশবের শেখা 'অর্থই অনর্থের মূল'—এই আপ্তবাক্য সঠিক নয়, বরং অর্থের অভাবই অনর্থের মূল। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন অর্থের সংগ্রহে এবং একসময় আমেরিকানদের মতো মিলিয়ন ডলারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ক'জনের স্বপ্ন সফল হয়? আমি বলতে পারছি না, কারণ আমার কাছে কোনো স্ট্যাটিসটিকস নেই। তবে

জানার চেষ্টা করেছি। যে শহরেই গিয়েছি জিজ্ঞেস করেছি—আচ্ছা বাংলাদেশের কেউ কি মিলিওনিয়ার হয়েছে ? না-সূচক জবাবই পেয়েছি। শুধু লস এঞ্জেলসে এক সিলেটি ভদ্রলোক সম্পর্কে বলা হলো—সম্ভবত তিনি মিলিওনিয়ার। কারণ ভদ্রলোক ক্যাডিলাক গাড়ি চালান, পাহাড়ের উপর বিশাল বাড়ি করেছেন। তবে নিশ্চিভাবে কেউ কিছু বলতে পারল না।

আমি একজন বাংলাদেশি সম্পর্কেই এক শ' ভাগ নিশ্চিত যে, তিনি মিলিওনিয়ার এবং মিলিয়ন ডলার তিনি কোনোরকম পরিশ্রম ছাড়া সংগ্রহ করেছেন। ভদ্রলোক দেশে বামপন্থী রাজনীতি করতেন। একদিন বামপন্থী রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিংবা জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয়ে আমেরিকা চলে গেলেন। কাজকর্ম করে খাওয়ার ট্রেনিং রাজনীতিবিদদের থাকে না। কাজেই আমেরিকা গিয়ে তিনি মহা বিপদে পড়ে গেলেন। আমেরিকায় প্রবাসী আত্মীয়স্বজনদের বাসায় বাসায় থাকেন—ছোটখাটো কাজ এখানে ওখানে কিছুদিন করেন, আবার ছেড়ে দেন। যাকে বলে চরম সংকট।

সংকট মোচনের জন্য আমাদের শেষ আশা হলো লটারি। ভদ্রলোক সেই পথ ধরলেন—অল্প কিছু টাকা হলেই লটো নামক আমেরিকান লটারির টিকিট কেনেন। টিকিট কেনার পর কিছুদিন তাঁর খুব ভালো যায়। তাঁর মন বলে—সব সমস্যার সমাধান হলো, এবার পেয়ে যাচ্ছি। লটারির ফল বের হওয়ার পর আবার বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তবে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পরবর্তী লটোর টিকিটের ডলার সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

পরিচিতদের বলেন এবার পাব, আমার মন বলছে পাব।

সবাই হাসে। লটোর লটারি কেউ জেতে না। যারা জেতে তারা অন্য গ্রহের জীব।

ভদ্রলোক কিন্তু লটো জিতে গেলেন। এক মিলিয়ন ডলার পেয়ে গেলেন লটোতে। অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় ব্যাপার—অর্থের পরিমাণ বাংলাদেশি টাকায় চার কোটি টাকারও বেশি। ভদ্রলোক টিকিট জমা দিলেন। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এক মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার হয়ে গেল। তিনি অনেকদিন পর শান্তিতে ঘুমাতে গেলেন।

তাঁর নাম আতিকুর রহমান সালু। তিনি গুলতেকিনের আপন ছোটমামা। থাকেন নিউজার্সিতে। কী করেন ? কিছুই করেন না। লটোর টাকা ভাঙিয়ে খান। তাঁর বাড়ি, গাড়ি, সংসার খরচ সবই লটোর কল্যাণে এবং তিনি আছেন মহা সুখে। কবিতা লেখেন, গান লেখেন, সেই গানে নিজের সুর দেন। নিজেই গান। সবই রাজনৈতিক কবিতা। রাজনৈতিক গান। একটি গানের প্রথম কলি হলো—

> 'মওলানা ভাসানী, তুমি কোথায় ?
> তুমি কোথায় ?'

যেহেতু হাতে প্রচুর অবসর সময় সেহেতু নিজেকে রাজনীতিতে আবার জড়িয়ে দেন। এবং আমেরিকান রাজনীতি। এদের পলিটিক্যাল মিটিং তিনি মিস করেন না। স্থানীয় সিনেটরের সঙ্গে তাঁর সখ্য হয়েছে। নর্থ আমেরিকার বাঙালি রাজনীতির সঙ্গেও

তিনি জড়িত। তাঁর মাথায় এখন আছে বাংলাদেশের ফারাক্কা সমস্যা। তিনি ফারাক্কা কমিটির সেক্রেটারি। সম্প্রতি ফারাক্কা কমিটি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সাফল্যজনকভাবে শেষ করেছে। ফারাক্কা বিষয়ে একটি শক্ত আমেরিকান লবি তৈরিতে তাঁর ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। নিউজার্সি এলাকার নির্বাচিত সিনেটর তাঁকে একটি চিঠি লিখেছেন—সেই চিঠি আমিও পড়লাম। চিঠিতে সিনেটর লিখেছেন—ফারাক্কার এই সমস্যা তুলে ধরার ব্যাপারে আমার যা করণীয় তা আমি অবশ্যই করব।

আমার স্ত্রী তাঁর এই মামার খুব ভক্ত। তার কাছে শুনেছি—ভদ্রলোক বিচিত্র স্বভাবের মানুষ, অতি ভালো মানুষ। দেশে বেশিরভাগ সময় থাকতেন জেলে। ছাড়া পেলে গুলতেকিনদের বাসায়। গুলতেকিনের ভাষায়—আমার ছোট মামার মতো মজার মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি নি। তাঁর দোষ থাকলে থাকতে পারে, মানুষ মাত্রই দোষ থাকে। কিন্তু আমার এই মামার সৎগুণের সঙ্গেই শুধু আমরা পরিচিত। সেই সৎগুণের একটা হলো—দিলদরিয়া স্বভাব। তাঁর মজার সব পাগলামি ছোটবেলায় আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখতাম।

আমেরিকায় তাঁর পাগলামি বেড়েছে না কমেছে তা দেখার জন্য সপরিবারে তাঁর বাড়িতে গেলাম। ছোটমামা সঙ্গে সঙ্গে এই উপলক্ষে একটা গান রচনা করলেন এবং সুর দিয়ে গাইলেন। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, আমার ভাগ্নি-জামাই লেখালেখি করে। লোকজন তার লেখা পড়ে। কেউ যখন তার নাম বলে তখন আমার খুব ভালো লাগে। আমি তাকে সোনার দোয়াত-কলম উপহার দিতে চাই। বলেই নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আমার কিছুতেই মাথায় আসছে না এই আমেরিকায় তিনি সোনার দোয়াত-কলম কোথায় পাবেন! ঘণ্টাখানেক পর তিনি এক বোতল পেপসি নিয়ে উপস্থিত হলেন। সোনার দোয়াত-কলম সম্পর্কে আর কোনো সাড়াশব্দ করলেন না।

আমি মজা পেলাম। মামার বাড়িতে তিন ঘণ্টা থাকার পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছিলাম—থাকলাম তিন দিন। গল্পগুজব, হাসি-তামাশা চলতে লাগল। মামিকেও আমার খুব পছন্দ হলো—সহজ-সরল, হাসি-খুশি মানুষ। খাঁটি বাংলাদেশি মেয়ে। স্বামীর নানাবিধ পাগলামিতে বিপর্যস্ত...। একপর্যায়ে আমাকে বললেন, দেখুন না আপনার মামার কাণ্ড—আপনার মামা বলছে পুরোপুরি দেশে চলে যাবে। জিনিসপত্র সব বাঁধাছাদা করে এক বছর ধরে বসে আছি।

বলেন কী?

সত্যি কথা। এই যে আপনাদের খেতে দিচ্ছি, থালাবাসন নতুন করে কিনতে হয়েছে, আমাদের সবকিছু প্যাক করা।

বাহ্ ইন্টারেস্টিং তো!

ইন্টারেস্টিং মোটেই না। আমেরিকান সিটিজেনশিপ থাকলে কত সুবিধা। আমি সিটিজেন হয়েছি। বাচ্চা দুটি তো জন্মসূত্রেই সিটিজেন। কিন্তু আপনার মামা সিটিজেনশিপ নেবে না। সিটিজেনশিপ নিলে নাকি বাংলাদেশকে খাটো করা হবে। এটা

সে করবে না। আচ্ছা আপনি বলুন—তার একার সিটিজেনশিপ নেওয়া না নেওয়ায় বাংলাদেশের কী যায় আসে ?

বাংলাদেশের কিছু যায় আসে না, উনার যায় আসে। একেকজন মানুষ একেক রকম। আপনি কি কখনো অন্য কোনো বাঙালিকে শুনেছেন—আমেরিকায় গাড়ি চালাতে চালাতে মওলানা ভাসানী বিষয়ক গান গাইতে ?

তিন দিন পার করে ফিরছি, মামা আমার হতে একটা প্যাকেট তুলে দিলেন। খুলে দেখি সত্যি সত্যি সোনার কলম। মামা বললেন, ১৮ ক্যারেট গোল্ড। পুরোপুরি গোল্ড হলে ভালো হতো। পুরোপুরি সোনা দিয়ে ওরা কলম বানায় না। জামাই, কলম পছন্দ হয়েছে ?

সোনার কলম আমার পছন্দ হয় নি। কারণ আমি লিখি বলপয়েন্টে। তবে মানুষটিকে পছন্দ হয়েছে। সোনামোড়া কলম পাওয়া যায়, সোনামোড়া মানুষের বড়ই আকাল।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

দেশের সব পত্রিকায় হাস্যকর একটা কলাম থাকে—আজকের দিনটি কেমন যাবে ? হরোস্কোপ। মানা না-মানা পরের ব্যাপার। এই অংশটুকু সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েন। আমি নিজে এই জাতীয় ব্যাপারগুলোর ঘোর বিরোধী। তারপরেও চট করে একফাঁকে দেখে নিই বৃশ্চিক জাতকের জন্য আজকের দিনটি কেমন যাবে।

আমেরিকান পত্রিকাগুলোতেও এরকম কলাম আছে। এক মাস ধরে সেই কলাম পড়লাম। মজার একটা ব্যাপার দেখলাম—ওদের দিন কেমন যাবের সঙ্গে আমাদের দিন কেমন যাবের মিল নেই। যেমন একবার দেখলাম লেখা আছে—

> বৃশ্চিক রাশির জন্যে এই দিন শুভ।
> জাতকের নতুন অটোমোবাইল কেনার সম্ভাবনা আছে।

আমাদের দেশে কখনোই কোনো জাতকের বেলাতে লেখা হবে না—মোটরগাড়ি কেনার সম্ভাবনা আছে।

আরেকদিন দেখলাম লেখা হলো—

> আজকের দিনটি সাবধানতার সঙ্গে পার করা উচিত।
> অপরিচিত কারোর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক বিপজ্জনক হতে পারে।

তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে, হরোস্কোপ শুধু কোন দিনে জন্মগ্রহণ করেছে তার ওপর নির্ভর করবে না, কোন দেশে জন্ম হলো তার ওপরও নির্ভর করবে ? নাকি দেশের রুচি অনুযায়ী এইসব তৈরি করা হয় ?

আমার ইচ্ছা আছে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে পৃথিবীর সব দেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হরোস্কোপ নিয়ে একটি লেখা তৈরি করার। লেখাটা এ রকম হবে, বৃশ্চিক রাশির জাতক—বাংলাদেশে জন্মালে ওই দিনে কী হবে ? চীনে জন্মালে কী ? ফ্রান্সে কী ? আমেরিকায় এবং রুয়ান্ডায় কী ?

হরোস্কোপ ছাড়াও আমেরিকান পত্রিকায় আর যেসব জিনিস মন দিয়ে পড়েছি তা হলো—হাজার হাজার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন। কিছু কিছু বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পড়ে আক্কেলগুড়ুম হওয়ার মতো অবস্থা। মেয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—

> আমার বয়স ২৫, আমি দেখতে অ্যাট্রাকটিভ, চুলের রঙ ব্লন্ড, চোখ বাদামি। ওজন ১৩৫ পাউন্ড। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুরুষদের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্ক (intimate relation) স্থাপনে আগ্রহী। পঁয়ত্রিশ বছরের কম বয়সী পুরুষেরা যোগাযোগ করুন।

আরেকটি মেয়ের বিজ্ঞাপন—

> শরীরের বিনিময়ে (In exchange of sex) কোনো পুরুষের অ্যাপার্টমেন্টে শেয়ার হতে চাই। আলাদা ঘর থাকতে হবে। এবং অবশ্যই আলাদা বাথরুম।

ওদের পত্রিকা পড়লে একটা জিনিস বোঝা যায়—এরা খুব রসিক। পত্রিকার খবরগুলো মজা করে লেখা হয়, শিরোনামেও রহস্য করার চেষ্টা করা হয়। পত্রিকার পুরো এক পাতা জুড়ে থাকে রসিকতা। এক স্ট্যাটিসটিকস বলছে, শতকরা ৮৫ ভাগ আমেরিকান শুধু ওই পাতাটাই পড়েন। শেষের দিকে আমারও আমেরিকানদের মতো অবস্থা হলো—আমিও খবরের কাগজের ওই পাতাটাই শুধু পড়া শুরু করলাম।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, আমাদের দেশের পত্রপত্রিকায় এডিটোরিয়াল নামক রচনা খুব গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়। এদের অনেক কাগজে দেখেছি যেখানে এডিটোরিয়াল বলে কিছু নেই। ওদের যুক্তি—যে রচনা কেউ পাঠ করে না সেই রচনা আমরা ছেপে শুধু শুধু পাতা নষ্ট করব কেন! বরং সেই পাতাটায় বিজ্ঞাপন ছাপা যায়।

আমেরিকা কি বিজ্ঞাপনের দেশ? পত্রিকা ওল্টালে তা-ই মনে হয়। ৬০ পৃষ্ঠার খবরের কাগজে ৪৫ পৃষ্ঠা থাকে বিজ্ঞাপন।

কিছু কিছু বিজ্ঞাপন অত্যন্ত জটিল ধরনের। বিশেষ কোনো খবর বিশেষ এক দল মানুষকে দেওয়া হচ্ছে—দলভুক্ত না হলে কেউ তার মর্ম বুঝবে না। এ রকম একটি বিজ্ঞাপন দিলাম, দেখুন তো আপনারা তার মর্ম উদ্ধার করতে পারেন কি না—

August 6

Anniversary of Electrocution

Greeting Cards on sale

বঙ্গানুবাদ—

আগস্ট ৬

বিদ্যুতে হত্যাবার্ষিকী

শুভেচ্ছা কার্ড সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে

পারলেন কিছু বুঝতে? আমি অনেক চেষ্টা করেও পারি নি।

চখা ও চখি

আমেরিকান প্রেমিক-প্রেমিকা এবং স্বামী-স্ত্রী পথে বের হলেই মনে হয় তারা একটা ঘোরের মধ্যে চলে এসেছেন। মেয়েগুলো সবসময় 'সখী ধর ধর' অবস্থা। সারাক্ষণ লেগেই থাকবে পুরুষের শরীরে। এতেও রক্ষা নেই। কিছুক্ষণ পর পর চোখ বন্ধ করে ঠোঁট উঁচিয়ে এমন ভঙ্গি করবে যেন এই মুহূর্তে তাকে চুমু না খাওয়া হলে সে হৃদয় যাতনায় মারা যাবে। কে দেখছে, কে দেখছে না তাতে কিছু যায় আসে না। যেন এই জগতে চখাচখিসম তারা দুজনই আছে। বাকি পৃথিবী বিলুপ্ত।

প্রথমদিকে বাচ্চাদের নিয়ে এই দৃশ্য দেখতে অস্বস্তি বোধ হতো। শেষটায় সহ্য হয়ে গেল। তরুণ-তরুণী লেপ্টালেপ্টি করছে না দেখলেই বরং খারাপ লাগত। মনে হতো ব্যাপারটা কী ? ওরা কি সুখে নেই ? ওদের হয়েছেটা কী ?

আমার অনেক খারাপ অভ্যাসের একটি হচ্ছে পথের মানুষদের দিকে তাকিয়ে থেকে তাদের হাবভাব, চালচলন দেখা। গুলতেকিনের কাছে এজন্য অনেক বকা খাই—কী ব্যাপার, হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন ?

ওদের দেখছি।

দেখো। মুখের হাঁ বন্ধ করে দেখো। হাঁ করে দেখতে হবে নাকি ?

আমেরিকান চখাচখিসম তরুণ-তরুণী দেখতে দেখতে ছোট্ট একটা আবিষ্কার করে ফেললাম। প্রৌঢ় আমেরিকানদের বিদেশিনী আঠার-উনিশ বছরের স্ত্রী কিংবা বান্ধবী। নাক চাপা দেখে মনে হয় এরা হয়তো ফিলিপিনো কিংবা চায়নিজ। এই মেয়েগুলো আমেরিকান মেয়েগুলোর চেয়ে এক কাঠি সরস। সারাক্ষণ বান্ধবের কোমর জড়িয়ে ধরে থাকে, মিনিটে একটা করে চুমু খায়, নানান ধরনের আদিখ্যেতা করে। আদিখ্যেতার বাড়াবাড়ি দেখে মনে হয় পুরোটাই নকল। ব্যাপারটা কী ?

ব্যাপার যথেষ্টই মজার। বর্তমান আমেরিকায় আন্তর্জাতিক বিবাহের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছে। বড় বড় কোম্পানি খোলা হয়েছে। এদের কাজ হলো—দরিদ্র দেশের অল্প বয়স্ক রূপবতীদের সঙ্গে ধনবান প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ আমেরিকানদের বিয়ের ব্যবস্থা করা। এমনিতে এই বুড়ো হাবড়াদের মেয়ে জুটছে না—তারা ভিড় করছে কোম্পানিগুলোতে। কোম্পানি ক্যাটালগ দিয়ে দিচ্ছে। ক্যাটালগে বিবাহযোগ্যা কন্যাদের নানা ভঙ্গিমার ছবি (নগ্ন ছবিও আছে)। একজনকে পছন্দ করা হলো। বিয়ে হয়ে গেল। আমেরিকানের স্ত্রী হিসেবে ভিসা পেয়ে এই মেয়ে চলে এল আমেরিকায়। সফল হলো আমেরিকা আসার স্বপ্ন। এখন সেই মেয়ে ধীরে ধীরে তার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে আনতে শুরু করবে। প্রয়োজনে বুড়ো স্বামী ডিভোর্স দিয়ে নতুন একজনকে নিয়ে নেবে। প্রধান ব্যাপার বিয়ে নয়, প্রধান ব্যাপার আমেরিকায় আসা। স্বামী যত বুড়ো হয় মেয়েগুলোর জন্য ততই সুবিধা। বেশিদিন বাঁচবে না। মৃত্যুর পর সম্পত্তির পুরোটাই তার।

কোন ধরনের মেয়ে আসছে? বলতে পারছি না। আমার কাছে তথ্য নেই। ফিলিপাইন, হংকং-এর মেয়েরাই ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। শিগগিরই হয়তো আরও সব দেশের মেয়েরা আসতে শুরু করবে। হেডোনিস্টিক সোসাইটির প্রলোভন এড়ানো খুব সহজ নয়।

আমেরিকান বুড়িদের জন্য বাইরে থেকে তরুণ স্বামী নেওয়া কখন শুরু হবে তা-ই ভাবছি। কারও কারও মাথায় এই আইডিয়া নিশ্চয়ই খেলতে শুরু করেছে। বিদেশি তরুণ স্বামী সাপ্লাইয়ের কোম্পানি রেজিস্টার্ড হবে কবে?

ডিজনিল্যান্ড

শেষপর্যন্ত আমার কন্যাদের সাধের ডিজনিল্যান্ড যাওয়া হচ্ছে। এনাহেইমের ডিজনি হোটেল থেকে টিকিট কেটে মনোরেলে উঠে বসেছি। মনোরেল প্রায় উড়ে যাচ্ছে। ডিজনিল্যান্ডকে একটা চক্কর দিয়ে মনোরেল ভেতরে ঢুকল, আমরা নামলাম—নেমেই মোহিত হয়ে গেলাম। বর্ণাঢ্য এক জগৎ, যে জগতের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জগতের কোনো মিল নেই। শিশুর কল্পনার জগৎ ওয়াল্ট ডিজনি সাহেবের মতো আর কেউ বোধহয় ধরতে পারেন নি। তাঁর ভেতরে নিশ্চয়ই একজন শিশু বাস করত। সে শিশু ডিজনি সাহেবকে কখনো ছেড়ে যায় নি। শিশুটি ছিল বলেই তাঁর চোখ দিয়ে তিনি এমন অপূর্ব এক সৃষ্টি করতে পারলেন।

ডিজনিল্যান্ড অনেক অংশে ভাগ করা—একদিকে রূপকথার জগৎ, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জগৎ। শিশুদের শহর ট্রিনটন, ওয়াইল্ড ওয়েস্ট—কী নেই! সবকিছু দেখে ঘরে ফিরতে তিন-চার দিন লাগার কথা। আমাদের হাতে আছে মাত্র একদিন। যা দেখার একদিনেই দেখতে হবে। কী দিয়ে শুরু করব ভাবছি, হঠাৎ আমার ছোট মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—মিকিমাউস আসছে! মিকিমাউস আসছে! মিকিমাউস সত্যি সত্যি হুপ হুপ শব্দ করতে করতে আমাদের দিকেই আসছে। বেঁটেখাটো কেউ একজন মিকি মাউসের পোশাক পরেছে। কী সুন্দর বানিয়েছে! বাচ্চাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করল। বাচ্চারা তার সঙ্গে ছবি তুলল। তাদের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে এতদিনে আমেরিকা আসা সার্থক হলো।

প্রথম যা দেখতে পেলাম তা হলো—চন্দ্রযানে করে গ্রহ-নক্ষত্র ভ্রমণ। স্টারওয়ার ছবির রকেটের মতো এক রকেটে আমাদের তোলা হলো। দরজা বন্ধ করা হলো। পর্দায় নির্দেশ ভেসে উঠল সিট বেল্ট বাঁধার। আমরা সিট বেল্ট বাঁধলাম। এক এক করে রকেটের ভেতরের বাতি নিভে গেল। রকেট যাত্রা শুরু করল। পুরো ব্যাপারটাই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিমুলেশনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। পর্দার ছবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে সিটে বসে আছি—সেই সিটগুলো কাঁপছে, বাঁকছে। এতই বাস্তব যে, আমি পর্যন্ত ঘাবড়ে গেলাম। রকেটের সামনে কোনো এক গ্রহ এসে পড়েছে, রকেট ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাঁক নিচ্ছে, ভয়ে আমরা সবাই চেঁচিয়ে উঠছি।

গ্রহ-নক্ষত্র পার হয়ে তীব্র গতিতে আমরা ছুটছি। গতির কাঁপন লাগছে শরীরে। রকেট এবার আলোর গতি অতিক্রম করছে—আর আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এরা এই জিনিস করল কী করে?

রকেট-যাত্রার পর সাবমেরিন-যাত্রা। সাবমেরিনে করে সমুদ্রপ্রাণী দেখা। সাবমেরিনে চড়লাম—ভুস করে সাবমেরিন চলে গেল পানির নিচে। সাবমেরিনের জানালার পাশে বসে দেখা হলো অদ্ভুত সব দৃশ্য। সেই অদ্ভুত দৃশ্যের একটি হলো

মৎস্যকন্যা। নকল সেই কন্যাকে দেখে কে বলবে এটি রাবারের প্রাণী। দীর্ঘ চুলের দীঘল চোখের মৎস্যকন্যা। কী মায়া নিয়ে তাকাচ্ছে। হাতছানি দিচ্ছে। ও কী? মৎস্যকন্যার দিকে ভয়ংকর এক শার্ক ছুটে আসছে। উত্তেজনায় আমাদের বুক টিপ টিপ করছে—কী হয় কী হয়!

ওয়াইল্ড ওয়েস্টে গিয়ে ট্রেনে চড়লাম। ভয়ংকর সেই ট্রেনযাত্রা। নিমিষে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাচ্ছে, নিমিষে নেমে যাচ্ছে। আবার উঠছে। সারাক্ষণ মনে হচ্ছে, এই বুঝি পাহাড়ের চূড়া থেকে ট্রেন ছিটকে পড়ে যাবে...।

বাচ্চাদের নিয়ে ভৌতিক বাড়িতে ঢুকলাম। সেখানে ভৌতিক সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। হলঘরে একদল নারী-পুরুষ নাচছে। না, তারা মানুষ নয়। ছায়ামূর্তি। এই তাদের দেখা যাচ্ছে—এই দেখা যাচ্ছে না। এইসব তারা করছে কী করে?

পপ গানের সুপারস্টার মাইকেল জ্যাকসন ডিজনিল্যান্ডের একটা অংশ নিজ খরচে তৈরি করে দিয়েছেন—অংশটির নাম 'পাইরেটস অব দি ক্যারিবিয়ান'। প্রাচীন জলদস্যুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটানোর জন্য উঠলাম নৌকায়—সেই নৌযাত্রা মনে রাখার মতো। একপর্যায়ে জলদস্যুদের কামানের গোলাগুলির ভেতর পড়ে যেতে হয়। সারাক্ষণ আতঙ্ক—এই বুঝি জলদস্যুদের কামানের গোলাগুলি এসে পড়ল আমাদের ওপর। নুহাশ তারস্বরে কাঁদছে। আর বলছে, বাংলাদেশে যাব, বাংলাদেশে যাব। অন্যেরা উত্তেজনায় কাষ্ঠ হয়ে আছে।

দুপুর দুটায় ডিজনিল্যান্ডে প্যারেড হয়। ডিজনির বিভিন্ন চরিত্র নাচ-গান করতে করতে একটা শোভাযাত্রা বের করে। আগেই শুনেছি, এই প্যারেড হচ্ছে ডিজনিল্যান্ডের প্রাণ। প্যারেড যেন মিস না হয় সে জন্য দুটার আগেই প্যারেডের নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হলাম।

প্যারেড শুরু হলো। বাচ্চাদের কথা দূরে থাকুক, প্যারেড দেখে আমি মুগ্ধ।

বাঘ আসছে, ভালুক আসছে, জেব্রা, জিরাফ আসছে—নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে আসছে। যেমন সুর, যেমন ছন্দ তেমনি গমগমে আওয়াজ। পুরো ডিজনিল্যান্ড গানের ঝংকারে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। প্যারেডের সৌন্দর্যের কাছে এতক্ষণ যা দেখেছি সব ধুয়ে মুছে গেল।

রাত আটটায় হয় আরেকটি ভুবনবিখ্যাত শো। ওয়াটার শো। পানির ঝরনা দিয়ে তৈরি হয় পর্দা। সেই পর্দায় দেখানো হয় জমকালো দৃশ্য। শুনলাম—দেখার মতো। অনেকেই বারবার ডিজনিল্যান্ডে ফিরে আসে শুধু এই জলবিষয়ক শো দেখার জন্য। খুব ভিড় হয়—আগেভাগে জায়গা না পেলে সমস্যা। আমরা এক ঘণ্টা আগে গিয়ে দেখি তিল ধারণের জায়গা নেই।

শো শুরু হলো। এই আসছে যুদ্ধজাহাজ। জাহাজে দেখা যাচ্ছে সিনডেরেলাকে। আসছে আকাশ-উঁচু ড্রাগন। ড্রাগন নিঃশ্বাস ফেলল—আগুন ধরে গেল চারপাশে। সহজ আগুন না, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। মিকিমাউস তার দলবল নিয়ে নৃত্য শুরু করল। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা দেখি!

রাত বারোটা পর্যন্ত রইলাম। শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন, পা চলতে চায় না; তবে মন প্রফুল্ল।

ফেরার পথে মনের প্রফুল্লতা অনেখানি কমে গেল। দেশে ফেলে আসা শিশুদের কথা মনে পড়তে লাগল। এই সুন্দর রূপকথার জগৎ দরিদ্র দেশে জন্মেছে বলেই ওরা দেখবে না। এর কোনো মানে হয়?

পৃথিবী কি চিরকাল এরকম থাকবে? বদলাবে না? আমরা কি একদিন আমাদের শিশুদের জন্য এমন জগৎ তৈরি করতে পারব না?

ক্যাম্পিং

আমেরিকায় এসে ক্যাম্পিং করব না তা তো হয় না। নর্থ ডাকোটায় যখন ছিলাম— ক্যাম্পিং নামক অবসর যাপন প্রায়ই করা হতো। তাঁবু নিয়ে চলে যেতাম জঙ্গলে। সাধারণ জঙ্গল না, গহীন জঙ্গল। তাঁবু খাটিয়ে জঙ্গলে রাত্রিবাস। রাতে বুনো পাখি ডাকবে, ভালুকের পায়ের শব্দ পাওয়া যাবে, ভয়ে গা ছমছম করবে, তবেই না মজা। এই মজা হাজার গুণে বেড়ে যাবে যদি রাতে আকাশে চাঁদ থাকে। চাঁদের আলোয় নৌকা নিয়ে লেকে বেড়ানো। দিনে বড়শি ফেলে মাছ ধরে সেই মাছ টাটকা ভেজে খাওয়া। আমেরিকান মাছগুলো আবার বোকা টাইপের। ছিপ ফেললেই ধরা দেয়। যে আমি জীবনে কোনোদিন ছিপ হাতে দিয়ে ধরি নি, সেই আমিও ছয় কেজি ওজনের রেইনবো ট্রাউট ধরেছিলাম। মাছগুলো এমনই বোকা।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ফজলুল আলমের বাড়িতে উঠেছি। তাকে ক্যাম্পিংয়ের কথা বলতেই সে বলল, কোনো সমস্যা নেই, আমি ক্যাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করছি। ক্যাম্পিংয়ের তাঁবু-টাবু সবই আমার আছে। হারিকেন আছে, স্টোভ আছে, মাছ মারা বড়শিও আছে। আমাব খুব উৎসাহ। আমাব কন্যাদের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। তারা ডিজনিল্যান্ড দেখতে এসেছে, জঙ্গলের ভেতর তাঁবু খাটিয়ে বসে থাকতে আসে নি। তা ছাড়া জঙ্গলে নিশ্চয়ই সাপখোপ আছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখবে বালিশে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে আছে র‍্যাটল স্নেক... কোনো দরকার নেই। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের রাজি করলাম। আমি এক শ' ভাগ নিশ্চিত জঙ্গলের তাঁবুতে রাত্রিবাস তাদের ভালোই লাগবে। মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা হবে।

দুপুরে লটবহর নিয়ে ক্যাম্পিং স্ট্যান্ডে উপস্থিত হলাম। আমার মন খারাপ হয়ে গেল—লেকের পাশে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। চারদিকে ধু ধু বালি—দু'একটা ন্যাড়া গাছ এদিকে ওদিকে দেখা যাচ্ছে। লেক যা আছে তাও কৃত্রিম, মানুষ মাটি খুঁড়ে পানি ভর্তি করে লেক বানিয়েছে। ফজলুলকে বললাম, জঙ্গল কোথায়—এ তো ধু ধু মরুভূমি।

ফজলুল বলল, গোটা ক্যালিফোর্নিয়াটাই তো মরুভূমি। জঙ্গল পাব কোথায়? মরুভূমির ক্যাম্পিংও খুব খারাপ না। অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা হবে। সে আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ভোরে এসে নিয়ে যাবে।

এখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করা আর বাড়ির পেছনে তাঁবু খাটিয়ে বাস করার ভেতর তফাৎ কিছু নেই। এতদূর এসে ফেরত যাওয়ার মানে হয় না। তাঁবু খাটানো হলো। খাবার ঘর থেকেই রান্না করে আনা হয়েছিল—সেই খাবার খাওয়া হলো।

আমি বাচ্চাদের বললাম, চলো যাই হ্রদের পানিতে গোসল করে আসি। কিছুটা মজা পাবে। তারা গম্ভীর মুখে বলল, তুমি একা যাও বাবা। আমরা নকল হ্রদে গোসল করব না। আমি একাই পানিতে দাপাদাপি করলাম। মেয়েরা থমথমে মুখ করে বসে রইল।

গরমেও তারা খানিকটা কাহিল। মরুভূমির বালি তেতে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। সবাই বলল, সন্ধ্যার পর তাপ কমতে থাকবে, তখন খানিকটা আরাম লাগতে পারে। রাতে ঠান্ডা পড়ারও সম্ভাবনা।

আশ্চর্য কাণ্ড, রাত আটটার দিকে ঝপ করে মাঘ মাসের শীত পড়ে গেল। থরথর করে কাঁপছি। বাইরে দাঁড়ানো যায় না এমন অবস্থা। সবাই তাঁবুর ভেতর ঢুকে চুপচাপ বসে আছি। শীত ক্রমেই বাড়ছে। আল্লাহ্-আল্লাহ্ করে রাতটা পার হলে বাঁচি—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারি। আমাদের আশপাশে অনেক তাঁবু পড়েছে। তাদের শরীরে মনে হয় গণ্ডারের চামড়া। শার্ট-প্যান্ট পরে ঘুরছে।

স্প্যানিশদের এক তাঁবু পড়েছে আমাদের গা ঘেঁষে। ওরা ছেলেপুলেসহ এমন নাচ শুরু করল। গান হচ্ছে—ওলা ওলা ওলা। সেইসঙ্গে উদ্দাম নৃত্য। এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণা হলো। ভাগ্য ভালো প্রচুর লেপ-তোষক, স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে আসা হয়েছে। শীতে জমে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা হয়তো ঘটবে না। রাত দুটা বাজার আগে সবাই শুয়ে পড়লাম। তখন আমার মেজোমেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাবা, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

সে কি, নিঃশ্বাস বন্ধ হবে কেন?

জানি না। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

টর্চ জ্বালিয়ে দেখি, সত্যি সত্যি তার চোখমুখ শক্ত হয়ে আছে। হাত-পা কাঁপছে। তাঁবু খুলে তাকে বাইরে আনতেই সে স্বাভাবিক। তাঁবুতে ঢুকলেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আধমরা হয় যায়, বাইরে আনলেই সুস্থ। বুঝতে পারছি ব্যাপার আর কিছুই না, ক্লাস্টোফোবিয়া। বন্ধ ঘরের ফোবিয়া। আমরা সবাই পারিবারিকভাবে নানান ফোবিয়ায় আক্রান্ত। গুলতেকিন ছাড়া সবারই আছে—এরাকনোফোবিয়া—মাকড়সা-ভীতি। একটা মাকড়সাকে পঞ্চাশটা বাঘের মতো ভয়ংকর মনে হয়। আমার আছে উচ্চতা-ভীতি। এবার একজনকে পাওয়া গেল ক্লাস্টোফোবিয়ার। কন্যাকে নিয়ে আমাকে রাত কাটাতে হবে তাঁবুর বাইরে। দুজন গরম কাপড় পরলাম। কম্বল দিয়ে নিজেদের মুড়ে তাঁবুর বাইরে বসে রইলাম। সারাক্ষণ বসে থাকা যায় না। মাঝে মাঝে হাঁটাহাঁটি করি। মেয়ে একসময় দয়াপরবশ হয়ে বলল, বাবা, তুমি তাঁবুতে শুয়ে থাকো। আমি একা বাইরে বসে থাকব, অসুবিধা হবে না। আমার মোটেই ভয় লাগছে না।

আমি তো আর আমেরিকান বাবা না যে, মেয়েকে তাঁবুর বাইরে একা বসিয়ে রেখে ঘুমাতে যাব। আমিও তার পাশেই বসে রইলাম। একটা লাভ হলো—মরুভূমির তারাভরা আকাশ মনের সাধ মিটিয়ে দেখা গেল। মরুভূমির আকাশের তারা কী যে সুন্দর, কী যে সুন্দর!

অষ্টম নর্থ আমেরিকা-বাংলাদেশ মহাসম্মেলন

যদিও নাম মহাসম্মেলন, তারপরেও আমি ভেবেছিলাম ছোটখাটো কোনো ঘরোয়া ব্যাপার হবে। আজকাল মহা বিশেষণটি আমরা যত্রতত্র ব্যবহার করি। ছোটখাটো মূর্খকেও বলি মহামূর্খ। কাজেই মহা বিশেষণের তেমন গুরুত্ব নেই।

সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আক্কেলগুড়ুম। মহা আসলেই মহা। হুলস্থুল ব্যাপার। হোটেল হিল্টন নামের অত্যাধুনিক হোটেলের চার শ' কামরা ভাড়া করা হয়েছে।

হোটেল লবিতে মেলা বসেছে—বাংলাদেশি বই, শাড়ি, গানের ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে। ইন্ডিয়ান বাঙালিরা দিয়েছেন গহনার দোকান, পোশাকের দোকান। এক কোনায় মিষ্টিপানের খিলি বিক্রি হচ্ছে। এক ডলারে এক খিলি মিষ্টি পান।

প্রবাসী বাঙালি ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে। বাংলাদেশ কখনো দেখে নি এমনসব ছেলেমেয়েরা অপূর্ব সব ছবি এঁকেছে। পাল তুলে নৌকা যাচ্ছে, বাঁশবনের মাথায় চাঁদ উঠেছে।

সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের একজন ড. নবীর সঙ্গে দেখা—হাতে ওয়াকিটকি নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে কোথায় যাচ্ছেন। আমি বললাম, নবী! এ তো দেখি মচ্ছব বসে গেছে।

নবী তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, সম্মেলন দু'ভাগ হয়ে গেছে। দু'ভাগ না হলে দেখতে কী অবস্থা।

দু'ভাগ হয়েছে মানে?

একইসঙ্গে বোস্টনেও আরেক সম্মেলন হচ্ছে।

আমি আতঙ্কিত হয়ে বললাম, কোনটা আসল কোনটা নকল?

আমাদেরটা আসল। ওরা আমাদের সম্মেলনের ওপর ইংজাংকশান জারি করার জন্য কেইস করে দিয়েছে। কেইসে আমরা জিতেছি।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, এরমধ্যে মামলা মোকদ্দমাও হয়ে গেছে?

নবী জবাব দিতে পারল না। তার ওয়াকিটকিতে পোঁ পোঁ শব্দ হচ্ছে—কেউ কোনো জরুরি ম্যাসেজ দিচ্ছে। আমি ঘুরে ঘুরে উৎসব দেখছি। আশ্চর্য! বাংলাদেশের এত মানুষ আছে আমেরিকায়? এত উৎসাহ তাদের সম্মেলন নিয়ে?

এক ছেলে ভিড় ঠেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, স্যার, আমি আপনার ভক্ত।

আমি বললাম, কী রকম ভক্ত? সাধারণ ভক্ত না মহাভক্ত?

মহা!

মহাভক্ত হলে প্রমাণ দাও। সারা দিন চা খেতে পারি নি। দেখি এক কাপ চা খাওয়াতে পার কি না।

ছেলে উধাও হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা নিয়ে উপস্থিত। আমি তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলাম—আমেরিকান ভাবভঙ্গি সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। একটা কান ফুটো করে এক কানে দুল পরেছে। এক কানে দুল পরা ছেলে ভক্ত আমার বেশি নেই বলেই আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলাম, কী নাম?

স্যার, আমার নাম আমান।

কানে দুল পরেছ কেন আমান?

আমান বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। দুল পরার রহস্য ফাঁস করল না।

সম্মেলন কেমন লাগছে?

খুব ভালো।

বাংলাদেশের এত মানুষ একসঙ্গে দেখে আনন্দ হচ্ছে না?

খুব আনন্দ হচ্ছে, স্যার।

বেশ তাহলে যাও—আনন্দ করো।

আমি আপনার জন্য এক কার্টন বেনসন সিগারেট নিউইয়র্ক থেকে নিয়ে এসেছি। আমি জানি আপনি বেনসন খান। আপনার সম্পর্কে আমি সবই জানি।

আমানের সিগারেটের কার্টন আমি নিলাম, এই সঙ্গে বুঝলাম আমাকে যতটা জানে বলে তার ধারণা ততটা সে জানে না। আমি বেনসন খাই না—ফাইভ ফাইভ হচ্ছে আমার প্রিয় ব্র্যান্ড। এই তথ্য অবশ্যি আমানকে জানিয়ে দিলাম না। আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, ডান কানের দুল ঝনঝন করতে করতে সেও আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে। সে এক মজার দৃশ্য।

মহাসম্মেলন উদ্বোধন করা হলো। যেহেতু আমি গেস্ট অব অনার—আমাকে মঞ্চে মূর্তির মতো বসে থাকতে হচ্ছে। বক্তৃতায় কী বলব কিছুই মাথায় আসছে না। গলা শুকিয়ে আছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরান পাঠ করা হলো। অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকেও পাঠ করার কথা—কিন্তু সেই সময় গীতা, ত্রিপিটক এবং বাইবেল পাঠের লোক পাওয়া গেল না, যাদের ঠিক করা হয়েছে তারা উধাও। এক দলের ধারণা হলো, লোক না পাওয়ার ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত।

বাংলাদেশ সরকার এই সম্মেলনকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন দেখে ভালো লাগল। খালেদা জিয়ার বাণীর পরপরই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের পাঠানো একটি বাণী পাঠ করা হলো। বিল ক্লিনটন বলছেন,

> মহান আমেরিকা পৃথিবীর নানা জাতির সংমিশ্রণেই মহান হয়েছে। এই মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের মানুষ যুক্ত হয়েছে। তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতি এনে মেশাচ্ছেন। এই মিশ্রণ অবশ্যই শুভ ও কল্যাণকর হবে...।

সুন্দর বাণী। আমাব বক্তৃতার সময় আসতেই উদ্যোক্তা মাইকে বললেন, হুমায়ূন আহমেদ এখন ছোট্ট একটা বক্তৃতা দেবেন, বড় বক্তৃতা পরে দেওয়া হবে। শুরুতেই বাধা পেয়ে আমি আমার ছোট্ট বক্তৃতা দিতে উঠলাম। তখন হঠাৎ মনে হলো, মঞ্চে আসার একটু আগেই তো বাথরুমে গিয়েছিলাম। প্যান্টের জিপার কি লাগানো হয়েছে? হায় আল্লাহ, এত মানুষের সামনে জিপার লাগানো হয়েছে কি না এই পরীক্ষাই বা করব কীভাবে? ভয়াবহ টেনশন নিয়ে কথা বলতে হলে গভীর আবেগের কোনো বিষয় নিয়ে আসতে হয়। যেন আবেগ টেনশকে ছাড়িয়ে যায়। আমিও সেই পথ ধরলাম। গভীর আবেগের কথা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলাম...।

> আমার মেজো মেয়ে শীলার জন্ম হয়েছিল আমেরিকার ফার্গো শহরে। জন্মের পর পর আমার মা চিঠি লিখে জানালেন—বাবা, তুমি দেশে ফেরার সময় ফার্গো শহরের কিছু মাটি সঙ্গে করে নিয়ে এসো। জন্মস্থানের মাটির জন্য মানুষ কাঁদে। মাটি না আনলে বাংলাদেশে এসে তোমার মেয়ে খুব কাঁদবে। আমি সত্যি সত্যি দেশে আসার সময় ফার্গো শহরের এক পট মাটি নিয়ে এসেছিলাম...।
>
> আপনারা যারা আমেরিকায় বাস করেছেন তাঁরা দেশ থেকে মাটি এনেছেন বলে মনে হয় না। আনেন নি বলেই সারাক্ষণ দেশের জন্য আপনাদের মন কাঁদে। মন কাঁদে বলেই আপনারা করেন উত্তর আমেরিকা-বাংলাদেশ মহাসম্মেলন যেখানে সারাক্ষণ বিষাদ ও আনন্দময় কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ...।

বক্তৃতায় আবেগের অংশ ক্রমেই বাড়তে লাগল, কারণ আমাকে জিপারের ব্যাপারটি ভুলে থাকতে হচ্ছে।

ছোট বক্তৃতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আমি রাজনীতিবিদদের মতো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ঘোষকের দিকে তাকালাম। ঘোষক কী পরিমাণ রাগ করেছেন সেটা দেখাই আমার উদ্দেশ্য। দেখা গেল তিনি হাসছেন, মনে হচ্ছে তেমন রাগ করেন নি।

বক্তৃতা শেষ করে চেয়ারে বসে লক্ষ করলাম, জিপার ঠিকই লাগানো আছে। এমন আবেগময় বক্তৃতা না দিলেও চলত।

রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথম অংশে স্থানীয় শিল্পীরা। শেষ অংশে ঢাকা থেকে নিমন্ত্রণ করে আনানো বিখ্যাত এক গায়িকা (নাম না বলাই সংগত মনে করছি)।

স্থানীয় অনুষ্ঠান শুরু হলো। অপূর্ব অনুষ্ঠান। আমেরিকায় বাস করছেন বাঙালিরা অপূর্ব অনুষ্ঠান করলেন—নাচ, গান, মূকাভিনয় দিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখলেন। ঢাকার বিখ্যাত গায়িকার আসার সময় হয়ে গেল—তিনি আসছেন না, দর্শকদের ভেতর মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো।

মূল শিল্পী মঞ্চে না এসে হোটেল কক্ষে বসে থাকার রহস্যটা বিচিত্র। তিনি বলেছেন, এক রাতে গান গাইবার জন্য আমাকে দু' হাজার ডলার দেওয়ার কথা। ডলার হাতে না নিয়ে আমি গান গাইতে যাব না।

তৎক্ষণাৎ তাঁকে দু' হাজার ডলারের চেক দেওয়া হলো। তিনি বললেন, না, আমি চেক নেব না। আমাকে নগদ দু' হাজার ডলার দিতে হবে।

উদ্যোক্তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আমেরিকায় সব কাজকর্ম চেকের মাধ্যমে। নগদ ডলারের লেনদেন নেই। এখন কোথায় পাওয়া যাবে দু' হাজার ডলার ? রাত দুটায় ব্যাংক খুলবে না। টেলার মেশিন আছে। সেখান থেকে দু' শ ডলারের বেশি পাওয়া যাবে না।

শিল্পীকে বুঝানোর চেষ্টা করা হলো। তাঁর এক কথা—নগদ ডলার হাতে না নিয়ে গান গাইব না।

রাত দু'টায় অনেক যন্ত্রণা করে দু' হাজার ডলার জোগাড় করা হলো। শিল্পী ডলার গুণে নিশ্চিত হয়ে গান গাইতে গেলেন। গানের অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হলো, সবাই গান শুনে মুগ্ধ শুধু সেই গান অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের স্পর্শ করল না—তাঁরা বিষণ্ন হয়ে রইলেন।

গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে আমার নিজের একটা দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আছে। সুযোগ যখন পাওয়া গেল তখন বলেই ফেলি। আমি তখন শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর। সংস্কৃতি সপ্তাহ উদ্‌যাপনের দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। প্রতিযোগিতামূলক গানের অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে আমি এ দেশের দু'জন নামি সংগীতশিল্পীকে নিয়ে এসেছিলাম। অনুষ্ঠান শুরু করার আগে তাঁদের একজন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আমাকে খরচ দিতে হবে।

খরচ দিতে হবে মানে ?

টাকা ছাড়া আমি বিচারকের দায়িত্ব পালন করব না।

বিচারকদের টাকা দেওয়ার কোনো নিয়ম তো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই, বাজেটও নেই।

তাহলে ভাই বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে পারছি না।

আমি অনেক কষ্টে আমার রাগ সামলে বললাম, আপনারা যে এসেছেন এতেই আমি খুশি। আসুন চা খান। চা খাওয়ার পর গাড়ি দিচ্ছি। গাড়িতে উঠে চুপি চুপি চলে যান।

চুপি চুপি চলে যাব কেন ?

টাকা না পেলে আপনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন না—এটা যদি আমার ছেলেরা জেনে ফেলে তাহলে সম্ভাবনা শতকরা ৬০ ভাগ যে ওরা আপনাকে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলবে। আজকালের উগ্র মেজাজের ছেলে। বুঝতেই পারছেন।

ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, আচ্ছা যান টাকা লাগবে না, কয়েক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দিন।

আমি দু' প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দিয়ে বললাম, আপনাকে বিচারক হিসেবে রাখব না। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমার পছন্দ হয় নি। আসুন গাড়িতে তুলে দিচ্ছি।

আমি যে টাকা চেয়েছি এটা কাউকে বলবেন না তো ?

নিশ্চিন্ত থাকুন। কোনোদিন কাউকে বলব না।

আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারি নি। লেখার মাধ্যমে দুঃখজনক ঘটনাটা বলে ফেললাম। নর্থ আমেরিকা-বাংলাদেশ মহাসম্মেলনে এই ঘটনা না ঘটলে কোনোদিনই হয়তো বলা হতো না।

যাই হোক, সম্মেলন প্রসঙ্গে ফিরে আসি। চমৎকার সম্মেলন হয়েছে। পলিটিক্যাল ফোরামে কিছু অসাধারণ প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে। দেশ প্রসঙ্গে প্রবাসীদের নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা-ভাবনায় একটা জিনিসই ফুটে উঠেছে—ভালোবাসি। দেশকে আমরা ভালোবাসি।

আলাদা করে সাহিত্য অনুষ্ঠান হলো। সভাপতিত্ব করলেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু পিন্টু। সেখানে প্রবাসী সাহিত্যসেবীরা হাহাকার নিয়ে প্রশ্ন করলেন—আমরা কাদের জন্য লিখব ? কী লিখব ? বহুদিন আগে যে দেশ ছেড়ে এসেছি, যার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সেই দেশ নিয়ে লিখব, না আমেরিকান জীবন যা এখন আমরা জানি তা নিয়ে লিখব ? কারা পাঠ করবেন আমাদের রচনা ?

তাঁদের হাহাকার আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে, কিন্তু আমি তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি। প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। আপনাদের কাছে কি আছে ?

আমার সোনার বাংলা

আমার পুত্র-কন্যারা দীর্ঘ একমাস আমেরিকা দেখল, দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবস্থা এমন হয়েছে কিছু দেখলেই বিরক্ত হয়। ওয়াশিংটন ডিসির স্পেস মিউজিয়ামে নিয়ে গিয়েছিলাম চাঁদের পাথর দেখার জন্য। তারা মুখ সরু করে বলল, চাঁদের পাথর এত ছোট ? আমি বললাম, পাথরটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে থাকো, আমি ছবি তুলে দিই। তারা নিতান্ত অনিচ্ছায় চাঁদের পাথরে হাত রাখল। তারপরেও কত কী দেখার বাকি—ল্যুরে কেভার্নে স্ফটিকের গুহা, বিখ্যাত স্ট্যাচু অব লিবার্টি—স্বাধীনতার মূর্তি, নিউইয়র্কের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম...তারা আর কিছু দেখবে না। তারা দেশে ফিরবে।

তাদের জিজ্ঞেস করলাম, এ পর্যন্ত যা দেখলে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগল কী ? তারা একসঙ্গে বলল, ডিজনিল্যান্ড।

তারপর ?

বাকি সবটাই একরকম।

আমেরিকার কোন জিনিসটি তোমাদের মুগ্ধ করেছে ?

বড় মেয়ে বলল, এদের পাবলিক টয়লেটগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে। যেখানেই গেছি দেখেছি, কী অপূর্ব ঝকঝকে তকতকে পাবলিক টয়লেট ! অথচ এই টয়লেট নিয়ে আমাদের কী কষ্ট...।

বিশাল আমেরিকায় তোমার পছন্দ হলো এদের পায়খানা ?

হ্যাঁ। পায়খানা শব্দটা তুমি উচ্চারণ না করলেও পারতে।

জিনিস কিন্তু একই মা। আগে আমরা বলতাম টাট্টি। শব্দটা দীর্ঘ ব্যবহারে নষ্ট হওয়ার পর বলা শুরু হলো—পায়খানা। এটিও যখন নষ্ট হয়ে গেল তখন বলছি টয়লেট। এই শব্দও এখন নষ্ট হয়ে গেছে। আমেরিকানরা এখন টয়লেট বলে না, বলে—'জন'। কিছুদিন পর 'জন' শব্দটাও নষ্ট হবে। তখন অন্য শব্দ বলতে হবে।

থাক। বক্তৃতা বন্ধ করো।

আমি বক্তৃতা বন্ধ করে মেজো মেয়েকে বললাম, আমেরিকার কোনো জিনিসটি তোমার ভালো লাগল ?

সে বলল, এরা যে কাউকেই যেখানে সেখানে সিগারেট খেতে দেয় না এটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। সিগারেটের গন্ধে আমার মাথা ধরে যায়, বমি আসে, অথচ দেশে যেখানে যাই সেখানেই সিগারেটের ধোঁয়া। অসহ্য! অসহ্য!

ছোট মেয়েকে বললাম, মা, তোমার কী ভালো লাগল ?

সে বলল, ডিজনিল্যান্ড।

ডিজনিল্যান্ডের কথা তো একবার বলেছ। আর কী ?

সে অনেকক্ষণ ভাবল। অনেক চিন্তা করে বলল, ডিজনিল্যান্ড আমার ভালো লেগেছে।

সব দেখা হয়েছে, শুধু যে জন্য আমেরিকা যাওয়া সেই নর্থ ডাকোটার ফার্গো শহর দেখা হয় নি। আমার জন্যই দেখা হয় নি। নর্থ ডাকোটা যাওয়ার পর সব পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পর মনে হলো—আমি একটা বড় ভুল করছি। পুরনো স্মৃতির কাছে কখনো ফিরে যেতে নেই। নর্থ ডাকোটায় এখন যদি যাই দেখব—সব বদলে গেছে। স্মৃতির সঙ্গে মিলবে না, মন খারাপ হবে; বরং স্মৃতি অবিকৃত থাকুক। টিকিট কেটেও ফেরত দিয়ে এলাম। এখন না, আরও পরে। যখন বুড়ো হয়ে যাব, স্মৃতি হবে বিবর্ণ ও ঝাপসা, তখন দেখা হবে হারানো বরফের শহর, স্মৃতিময় ফার্গো।

দেশে ফিরছি। ঢাকার কাছে প্লেন নামতে শুরু করেছে। প্লেনের ক্যাপ্টেন সিট বেল্ট বাঁধতে বলেছেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি—ঢাকা শহর দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, ওই যে ঢাকা সিটি।

অমনি আমার কন্যারা সিট বেল্ট খুলে জানালার কাছে ছুটে এসে চেঁচাতে লাগল, ওই যে ঢাকা, ওই যে ঢাকা...যেন তারা কত দীর্ঘদিন এই শহর দেখে নি।

আমার এই নোংরা ঢাকা শহর যে ডিজনিল্যান্ডের চেয়েও মোহনীয় তা কি আমার মেয়েরা বুঝতে পারছে ? তাদের আমি আমেরিকা দেখিয়ে এনেছি—এখন তারা অবশ্যই বুঝবে তাদের নিজের দেশ নেভার নেভারল্যান্ড আমেরিকার চেয়েও লক্ষগুণ সুন্দর। আমার জীবন ধন্য, আমি জন্মেছি এই দেশে।

ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন রানওয়ে টাচ করল। আমরা জন্মভূমি মায়ের কোলে ফিরে এসেছি। মা পরম আদরে আমাদের গ্রহণ করেছেন। এই আনন্দ আমি কোথায় রাখি ?

মে ফ্লাওয়ার

১

দেশের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগে আনন্দিত হন না—এমন মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প। আমি সেই খুব-অল্পদের একজন। বাইরে যাওয়ার সামান্য সম্ভাবনাতেই আমি আতঙ্কগ্রস্ত হই। আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কারণ আছে—এখন পর্যন্ত আমি কোনো বিদেশযাত্রা নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারি নি।

একবার কিছু লেখকের সঙ্গে চীন গিয়েছিলাম। আমাদের দলনেতা ফয়েজ ভাই। তিনি সারাক্ষণ আমাকে গার্ড দিয়ে রাখছেন যাতে হারিয়ে না যাই। তাঁর ধারণা প্রথম সুযোগেই আমি হারিয়ে যাব। হারালাম না, তবে চোখে খোঁচা লাগিয়ে মহা বিপদ ঘটালাম। ডাক্তার দুটি চোখ ব্যান্ডেজ করে বন্ধ করে দিলেন। পুরো অন্ধ। লেখকেরা মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি তাঁদের পেছনে তাদের হাত ধরে ধরে হাঁটছি। এই হচ্ছে আমার চীন দেখা।

পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে গিয়ে কী ঝামেলায় পড়েছিলাম একটু বলে নেই। সাত দিনের জন্যে গিয়েছি বোম্বে। এলিফেন্ট গুহা, অজন্তা-ইলোরা সব দেখা হলো। কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই হলো। এখন দেশে ফিরব। রাত তিনটায় প্লেন; বাংলাদেশ বিমান। বলা তো যায় না, আমার যা কপাল, প্লেন যদি আগেভাগে চলে আসে এই ভয়ে রাত ন'টা থেকে এয়ারপোর্টে বসে আছি। সঙ্গে অল্পপয়সা যা ছিল সব শেষ মুহূর্তের বাজারে শেষ করা গেল। এখন বিমানের জন্য প্রতীক্ষা। যথাসময়ে ইংল্যান্ড থেকে বিমান এল। বোর্ডিং পাস নিতে গেছি। বাংলাদেশ বিমানের লোকজন বলল, এথেন্স থেকে প্লেন ওভারবুকিং হয়ে এসেছে, আপনাকে নেওয়া যাবে না। আমি আঁৎকে উঠে বললাম, সে-কী, চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তো টিকিট ওকে করানো।

বললাম তো—যাত্রী বোঝাই। কিছু করা যাবে না।

প্লেন আমাকে রেখে চলে গেল। শীতের রাত। সঙ্গে একটা পয়সা নেই। এখানে কাউকে চিনিও না। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে...

এইসব তো ছোটখাটো বিপদ। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে একবার মহা বিপদে পড়েছিলাম। দুই কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরছি। পাসপোর্ট যাতে নিরাপদে থাকে সেইজন্যে গুলতেকিনের হ্যান্ডব্যাগে রাখা আছে। [গুলতেকিন, আমার স্ত্রীর নাম। এই ভয়াবহ নাম তার দাদা রেখে গেছেন। বিয়ের পর বদলাতে চেয়েছিলাম, পারি নি।]

লন্ডনে ছ' ঘণ্টার যাত্রাবিরতি। আমি মহানন্দে সিগারেট টানছি। গুলতেকিন বলল, মুখের সামনে সিগারেট টানবে না তো। বমি আসছে। অন্য কোথাও গিয়ে সিগারেট শেষ করে আসো। আমি বিমর্ষ মুখে উঠে গেলাম। এদিক-ওদিক ঘুরছি। এই উদ্দেশ্যহীন ঘোরাই আমার কাল হলো। একসময় দেখি—আমি এয়ারপোর্টের বাইরে। ভেতরে ঢুকতে গেলাম আর তো ঢুকতে পারি না, যতই বলি—আমি একজন ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার,

ভুল করে বাইরে চলে এসেছি, ততই তাদের মুখ অন্ধকার হয়। আমাকে নিয়ে গেল পুলিশের কাছে, মৈনাক পর্বতের মতো সাইজ। কথা বলছে না তো মেঘ গর্জন করছে।

তুমি বলছ, তুমি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার?

আমি বিনয়ে গলে গেলাম। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিনয়। আমি মধুর গলায় বললাম, ইয়েস স্যার।

দেখি তোমার পাসপোর্ট!

পাসপোর্ট আমার সঙ্গে নেই।

বিনা পাসপোর্টে তুমি সিকিউরিটি এলাকা অতিক্রম করে বের হলে কী করে?

আমি জানি না স্যার। হাঁটতে হাঁটতে কী করে যেন চলে এসেছি।

তোমার দেশ কোথায়?

বাংলাদেশ।

ও, আই সি।

এমনভাবে 'ও, আই সি' বলল যাতে মনে হতে পারে পৃথিবীর সব ভয়াবহ ক্রিমিনালের জন্মভূমি হচ্ছে বাংলাদেশ। আমি গলায় মধুর পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আপনি যদি আমাকে ট্রানজিট এরিয়াতে নিয়ে যান তাহলেই আপনার সব সন্দেহের অবসান হবে। আমার স্ত্রী দুই মেয়ে নিয়ে সেখানে আছে। তার হ্যান্ডব্যাগে আমার পাসপোর্ট।

এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আমি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রওনা হলাম। মনে হলো বিপদ কেটেছে। কিন্তু না, বিপদ কাটবে কোথায়, বিপদের সবে শুরু। সে আমাকে ছোট একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। হতভম্ব হয়ে লক্ষ করলাম, এটা একটা হাজত। ব্যাটা ফাজিল, আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমার বিদেশভীতির উৎস ধরে ফেলেছেন। আমার এই বিদেশাতঙ্কের কারণেই ইউএসআইএস-এর জনৈক কর্মকর্তা যখন টেলিফোন করে বললেন, আপনি কি কিছুদিনের জন্য আমেরিকা বেড়াতে যেতে আগ্রহী?

আমি খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললাম, জি-না।

কেন বলুন তো?

আমি ওই দেশে ছ'বছর থেকে এসেছি।

সে তো অনেক দিন আগের কথা। এখন যান, আপনার ভালো লাগবে। পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে লেখকেরা আসছেন। আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে আপনি যান।

কত দিনের ব্যাপার?

অল্পদিন—এক মাস।

এক মাস হলে ভেবে দেখি।

তাবাতাবির কিছু নেই। আমরা ব্যবস্থা করছি—আপনার নাম পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

তাঁরা যথাসময়ে যোগাযোগ করলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন—প্রোগ্রামে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। এক মাস নয়, থাকতে হবে প্রায় তিন মাস।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তিন মাস কী করে থাকব ?

আমার বিদেশযাত্রার সংবাদে কয়েকজনকে খুব উল্লসিত মনে হলো। তাদের অন্যতম আমার কনিষ্ঠ কন্যা বিপাশা। সে ঘোষণা করল, আমিও বাবার সঙ্গে যাব। আমার জন্য টিকিট কাটার দরকার নেই। আমি বাবার কোলে বসেই যেতে পারব।

সে তার ছোট স্যুটকেস অতি দ্রুত গুছিয়ে ফেলল; টুথব্রাশ, সাবান, তোয়ালে। তার কাণ্ড দেখে অন্যরা হাসছে, কিন্তু কষ্টে আমার কান্না পাচ্ছে—কী করে এদের ছেড়ে থাকব ? কী করে কাটবে প্রবাসের দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী ?

আমার প্রকাশকদের একজন 'কাকলী প্রকাশনী'র সেলিম সাহেবকেও আমার বিদেশযাত্রায় খুব আনন্দিত মনে হলো। তিনি দুই তাঁড় দই নিয়ে উপস্থিত হলেন। কোনোরকম আনন্দের ব্যাপার হলেই তিনি তাঁর দেশের বাড়ির মোষের টকদই নিয়ে উপস্থিত হন। অতি অখাদ্য সেই দই দেখলেই হৃৎকম্প হয়, তবু ভদ্রতা করে বলি—অসাধারণ।

সেলিম সাহেব দইয়ের তাঁড় রাখতে রাখতে হাসিমুখে বললেন, স্যার, শুনলাম আপনি আমেরিকা যাচ্ছেন। শুনে বড় ভালো লাগছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভালো লাগছে কেন বলুন তো!

সেলিম সাহেব লাজুক ভঙ্গিতে বললেন, ফিরে এসে 'হোটেল গ্রেভার ইন'-এর মতো একটা বই লিখে ফেলবেন। আমি ছাপব।

আমি তাঁর আনন্দের কারণ এতক্ষণে বুঝলাম। আমেরিকার অভিজ্ঞতা নিয়ে *হোটেল গ্রেভার ইন* নামে কিছু স্কেচধর্মী লেখা লিখেছিলাম। সেই বই পাঠকেরা আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন। এবং সেলিম সাহেব হচ্ছেন বইটির প্রকাশক।

স্যার, আপনি যাওয়ার আগে আগে আরও দই দিয়ে যাব। আমার ছোটভাইকে দেশে পাঠিয়েছি, ও নিয়ে আসবে।

থ্যাংকস।

অনেকেই এই দই পছন্দ করে না। একমাত্র আপনাকেই দেখলাম আগ্রহ করে খান। ভালো জিনিসের মর্যাদা খুব কম মানুষই বোঝে।

আমি শুকনো গলায় বললাম, খুবই খাঁটি কথা।

বইয়ের নামটা কি দিয়ে যাবেন ? নাম দিয়ে গেলে কভার করে রাখতাম।

বইটির নাম 'হোটেল মে ফ্লাওয়ার'।

'হোটেল মে ফ্লাওয়ার' ?

হ্যাঁ, যে ডরমেটরিতে থাকব তার নাম মে ফ্লাওয়ার...

আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। তাহলে কভার করে ফেলি ?

করে ফেলুন। আরেকটা কথা সেলিম সাহেব, ওই দইটা না আনলে হয় না ?

২

বাঙালির বিদেশযাত্রার প্রথম প্রস্তুতি হচ্ছে স্যুটকেস ধার করা। নিজেদের যত ভালো স্যুটকেসই থাকুক বিদেশযাত্রার আগে অন্যের কাছে স্যুটকেস ধার করতে হবে। এটাই নিয়ম।

গুলতেকিন অবশ্যি নিয়মের ব্যতিক্রম করল—স্যুটকেস কিনে আনল। হুলস্থূল ধরনের বিশাল এক বস্তু। আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, এটা কী!

সে বিরক্ত হয়ে বলল, সবসময় রসিকতা ভালো লাগে না। একটু বড় সাইজ কিনেছি, তাতে হয়েছে কী! স্যুটকেস হলো ঘড়ির মতো, যত ছোট তত দাম বেশি। বেশি দাম দিয়ে ছোট জিনিস কেন কিনব?

কিছু মনে কোরো না গুলতেকিন, এই বস্তু এরোপ্লেনের দরজা দিয়ে ঢুকবে না। দরজা কেটে ঢুকাতে হবে।

দরজা কেটে ঢুকাতে হলে দরজা কেটে ঢুকাবে। আর এই নাও তোমার হ্যান্ডব্যাগ।

হ্যান্ডব্যাগ দেখেও আমি চমৎকৃত হলাম। সেই হ্যান্ডব্যাগে নানান জায়গায় গোটা ত্রিশেক পকেট। আমি বিস্ময়মাখা গলায় বললাম, অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস তোমার চোখে পড়ে। এইটা তাহলে হ্যান্ডব্যাগ? ধরব কোথায়? হাতল বা কাঁধে ঝুলাবার ফিতা কোনোটাই তো দেখছি না।

দেখা গেল ওই হ্যান্ডব্যাগে হাতে নেওয়ার বা কাঁধে ঝুলাবার ব্যবস্থা নেই। বগলে নিয়ে ঘুরতে হবে। তা-ই সই।

যথাসময়ে হ্যান্ডব্যাগ বগলে নিয়ে এবং পর্বতপ্রমাণ স্যুটকেস টানতে টানতে এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলাম। যিনি বোর্ডিং কার্ড দেন তিনি বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে বললেন, এই স্যুটকেট আপনার? কোত্থেকে কিনেছেন বলুন তো?

বিমান আকাশে উড়ল এবং একসময় বিমানবালার গলায় শুনতে পেলাম—তীস্ হাহার ফুট উছতায়—অর্থাৎ আমরা ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় ভ্রমণ করছি।

বাংলাদেশ বিমান এই অদ্ভুত উচ্চারণের বাংলা কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে! বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক মরহুম আবু হেনা মোস্তফা কামালের এই বিষয়ে একটি থিওরি আছে। তিনি মনে করেন, এই উচ্চারণ ওরা পেয়েছে পাকিস্তানিদের কাছ থেকে। একসময় পিআইএ-র কোনো বাঙালি বিমানবালা ছিল না। উর্দুভাষী বিমানবালারা অনেক কষ্টে এইভাবে বাংলা বলত। সেই থেকে এটাই হয়ে গেল বিমানের স্ট্যান্ডার্ড বাংলা উচ্চারণ। পাকিস্তানি ভূত এত সহজে ঘাড় থেকে নামবার নয়। এখনকার বাঙালি বিমানবালারা অনেক কষ্টে উর্দু উচ্চারণে বাংলা রপ্ত করে। এই উচ্চারণ এদের অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষায় শিখতে হয়। ওদের ট্রেনিংয়ের এটাই সবচেয়ে শক্ত পার্ট।

হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছালাম ভোরবেলা। বিমান থেকে নেমে ট্রানজিট লাউঞ্জে যাওয়ার আগেই বিপদে পড়ে গেলাম। বিপদে পড়ব জানা কথা, এত আগে পড়ব বুঝতে

পারি নি। সম্ভবত আমাকে ড্রাগ ডিলারদের মতো দেখাচ্ছিল। জনৈক মেয়ে পুলিশ এগিয়ে এসে নিখুঁত ভদ্রতায় বলল, তুমি কি আমার সঙ্গে একটু আসবে?

আমি গেলাম তার সঙ্গে।

তোমার বগলের এই ব্যাগে কী আছে?

আমি জানি না কী আছে।

তোমার ব্যাগ, অথচ তুমি জানো না?

আমার স্ত্রী ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছে। কাজেই আমি জানি না কী আছে।

ব্যাগ খুলো।

খুললাম। প্রথম যে জিনিস বের হয়ে এল তা হচ্ছে গোটা পঞ্চাশেক প্যারাসিটামল ট্যাবলেট। আমার দীর্ঘদিনের সহচর—মাথাব্যথাকে বশে রাখার জন্য তিন মাসের সাপ্লাই। মহিলা পুলিশের চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। এই ঝিলিকের অর্থ হলো—পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে।

তুমি কি দয়া করে ব্যাখ্যা করবে এগুলি কী?

এগুলি হচ্ছে মাথা ধরার ওষুধ। কমার্শিয়াল নেম প্যারাসিটামল। এক ধরনের এনালজেসিক। কেমিক্যাল কম্পোজিশন এসিটামিনোফেন।

এগুলি তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

আমেরিকায়।

আমেরিকায় কি এ ধরনের ওষুধ পাওয়া যায় না?

পাওয়া যায় নিশ্চয়ই, তবু নিয়ে যাচ্ছি।

কী করবে?

খাব।

দেখি তোমার পাসপোর্ট।

দিলাম পাসপোর্ট। সে অতি মনোযোগে পাতা উল্টে দেখতে লাগল। যেন এটা জাল পাসপোর্ট। দেখা গেল আমার মতো আরও দুর্ভাগা আছে। সিলেটি এক পরিবার ধরা খেয়েছে। বাবা-মা এবং ছ'টি নানান সাইজের ছেলেমেয়ে। এদের একজনের হাতে পলিথিনের কাগজে মোড়া বিশাল আকৃতির দুটি মানকচু। পরিবারের কর্তা করুণ গলায় ক্রমাগত বলছে, আই ব্রিটিশ, ফ্যামিলি ব্রিটিশ। অল চিলড্রেন বর্ন ব্রিটিশ। আই ব্রিটিশ কান্ট্রি লিভ থার্টি ইয়ার।

যে পুলিশ অফিসার ওদের নিয়ে এসেছে সে এইসব কথাবার্তায় মোটেই কান দিচ্ছে না। সে সবার হাত থেকে পাসপোর্ট নিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে অন্য একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। পরিবারের কর্তা আমাকে বললেন, ওরা আফনারে দরল কী কারণ?

আমি বললাম, এখনো বুঝতে পারছি না।

ভাইছাব, মনে মনে দুয়া ইউনুস পড়েন। এরা বড় হারামি জাত।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

দরিদ্র দেশে জন্মগ্রহণের অনেক যন্ত্রণা।

৩

মাঝরাতে আমেরিকার আইওয়া স্টেটের ছোট্ট শহর সিডার রেডিস-এ বিমান থামল। প্রায় দশ বছর পর এই দেশে আসছি। চারদিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু দশ বছরে কী পরিবর্তন হলো তা দেখার তেমন আগ্রহ বোধ করছি না। আমেরিকা কতটুকু বদলাল তা দিয়ে আমার কী? আমার দেশে দশ বছরে কিছুই হয় নি, এ-ই আমার চিন্তা। চারদিকে তাকানোর উদ্দেশ্য—দেখা, কেউ আমাকে নিতে এল কি না। না এলে খুব চিন্তার কথা। অচেনা শহরে ট্যাক্সি ভাড়া করে হোটেলে উঠতে হবে। তাও দুপুররাতে। পকেটে এক শ' ডলারের একটা নোট, তা দিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া এবং হোটেল ভাড়া হবে কি না কে জানে। কাউকে দেখতে পেলাম না। এটাই স্বাভাবিক। আজ উইকএন্ডের রাত। আমেরিকানরা হইচই করে ছুটি কাটাচ্ছে। কার দায় পড়েছে মাঝরাতে এয়াপোর্টে এসে বসে থাকার?

আমি পুরো পরিস্থিতি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্য ভেন্ডিং মেশিন থেকে গরম কফি কিনলাম। সিগারেট ধরাব কি না বুঝতে পারছি না। সিগারেট খাওয়া এখানে ড্রাগ খাওয়ার মতো হয়ে গেছে। সব জায়গা নো স্মোকিং। সিগারেট ধরালেও সমস্যা—চারদিক এত ঝকঝক-তকতকে ছাই ফেলব কোথায়? যেখানে সেখানে ছাই ফেলার এবং ওয়াক থু বলে থুথু ফেলার যে মজা তা এরা কোনোদিন জানবে না।

কিছু মনে করবে না। তুমি কি বাংলাদেশের লেখক ড. হুমায়ূন?

আমি চমকে তাকালাম।

ইন্ডিয়ান-আমেরিকানদের মতো দেখতে বিশালদেহী এক যুবক দাঁড়িয়ে। মাথায় টেক্সানদের হ্যাট। মুখ হাসি হাসি। আমি হাসিমুখে মাথা নাড়লাম।

আমার নাম লেম। আমি আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের সঙ্গে জড়িত। আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে আমি তোমার উইকএন্ড মাটি করেছি।

তা করেছ। আমি অনেকক্ষণ থেকেই তোমাকে লক্ষ করছি। তুমি যে লেখক বুঝতে পারি নি। তোমার চেহারা লেখকদের মতো নয়।

লেখকদের চেহারা কেমন থাকে বলো তো?

লেম হাসতে হাসতে বলল, তাও তো জানি না। তোমার লাগেজ কোথায়?

আমি আমার স্যুটকেস দেখিয়ে দিলাম। লেম বিস্ময় মাখা গলায় বলল, হলি কাউ! এটা স্যুটকেস?

হ্যাঁ।

আমি ছোট গাড়ি নিয়ে এসেছি। এই জিনিস গাড়িতে ঢুকবে না। এটা বরং এখানে থাক। ভোরে বড় গাড়ি করে নিয়ে যাব।

বেশ তো, তা-ই করো।

আমরা যাব আইওয়া সিটিতে। তোমাকে তোমার আস্তানায় নামিয়ে দিয়ে চলে যাব। ভোরবেলা আবার এসে অন্য লেখকদের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেব।

ধন্যবাদ।

তুমি কি বাংলায় লেখালেখি করো ?

হ্যাঁ।

বাংলায় লেখালেখি করেন এমন লেখক এই প্রোগ্রামে খুব বেশি আসেন নি। একজন শুধু এসেছিলেন, দু'বার এসেছিলেন।

তাঁর নাম কী ?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তুমি কি তাঁকে চেনো ?

খানিকটা চিনি, তবে তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। লেম বলল, দয়া করে সিট বেল্ট বেঁধে নাও। আইওয়া রাজ্যে সিট বেল্ট না বাঁধলে সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের জরিমানা।

আমি সিট বেল্ট বাঁধলাম। গাড়ি ঝড়ের গতিতে উড়ে চলল। বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান হাইওয়ে। এই হাইওয়েতে গুলতেকিন ও আমার বড় মেয়ে নোভাকে নিয়ে কত না ঘুরা ঘুরেছি। এক শীতের রাতে ক্রমাগত গাড়ি চালানোর রেকর্ড করব ভেবে সারা রাত গাড়ি চালিয়েছিলাম। এক মুহূর্তের জন্যও না থেমে ফার্গো থেকে গিয়েছিলাম মন্টানার বনভূমিতে।

আমি পুরনো আমেরিকা দেখার চেষ্টা করছি। কুয়াশা পড়েছে। তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছপালা বা পাহাড় পর্বত চোখে পড়ছে না। মনে হচ্ছে প্রেইরির সমভূমি।

লেম!

ইয়েস প্লিজ।

তোমাদের এটা কি সমভূমি ? ফ্ল্যাট ল্যান্ড ?

না। এটাকে বলে রোলিং কান্ট্রি। ঢেউয়ের মতো উঁচু নিচু। আইওয়া হচ্ছে পৃথিবীর সেরা কর্ন প্রডিউসিং এলাকা।

লেম গাড়ির রেডিও চালু করে দিল। ভুলেই গিয়েছিলাম রাতের বেলা হাইওয়েতে গাড়ি নিয়ে নামলে এরা অবশ্যই রেডিও চালু রাখে। যাতে চলন্ত গাড়িতে ঘুমিয়ে না পড়ে। চোখ ও কান থাকে সজাগ। রেডিওতে একটি মেয়ে অত্যন্ত মিষ্টি গলায় গাইছে—

"I will love you on Tuesday."

মেয়েটি তার প্রেমিককে শুধু মঙ্গলবারে ভালোবাসতে চায় কেন ? সপ্তাহের অন্যদিনগুলি কী দোষ করল ? এই ভাবতে ভাবতে ঝিমুনি ধরে গেল।

হুমায়ূন। নামো, আমরা এসে গেছি।

চোখ কচলাতে কচলাতে গাড়ি থেকে নামলাম। আধো অন্ধকার, আধো ছায়ায় মেপল ও বার্চ গাছে ঢাকা বিশাল লাল ইটের দোতলা দালানের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হুহু করে বইছে শীতের হাওয়া। বিকট শব্দে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। আমেরিকান ঝিঁ ঝিঁ পোকা বড় বেশি শব্দ করে। আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, এইখানে থাকব ?

হুঁ।

আমি একা ?

হ্যাঁ।

সে-কী! আমাকে তো বলা হয়েছিল মে ফ্লাওয়ারে কথা।

তুমি দেরি করে এসেছ, তাই মে ফ্লাওয়ার তোমাকে দেওয়া যায় নি। আমরা তোমার জন্য এই বাড়ি ভাড়া করেছি। বাড়ি তোমার পছন্দ হবে। দেড় শ' বছরের পুরনো বাড়ি। একসময় স্কুল হাউস ছিল। ছোট ছোট বাচ্চারা পড়ত। তুমি শুনে খুশি হবে, এই বাড়ি হিস্টোরিক্যাল প্রিজার্ভেশন পুরস্কার পেয়েছে। আমরা অনেক খুঁজে পেতে এই বাড়ি বের করেছি।

আমি শুকনো গলায় বললাম, থ্যাংকস। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে আমার কাঁপুনি ধরে গেল। এই নির্জনপুরীতে একা থাকব কী করে ? ভয়েই তো মারা যাব। ভূতপ্রেত আছে কি না কে জানে। পুরনো বাড়ি ভূতদের খুব প্রিয় হয় বলে জানি।

হুমায়ূন, বাড়ি পছন্দ হয়েছে তো ?

হয়েছে। কিন্তু কথা হলো—ভূত-প্রেত নেই তো ?

লেম কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, থাকতেও পারে। পুরনো বাড়ি, বুঝতেই পারছ। গুড নাইট, স্লিপ টাইট।

স্লিপ টাইট মানে ? তবে আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। ঘুমুতে গেলাম ঘরের সব ক'টা বাতি জ্বালিয়ে। বলাই বাহুল্য ঘুম এল না। আমার তিন কন্যা এবং কন্যাদের মা'র জন্য বড্ড মন কেমন করতে লাগল। কেন বোকার মতো ওদের ছেড়ে এসেছি। কী আছে এখানে ? একা একা এই ভূতুড়ে বাড়িতে নিশিযাপনের কোনো মানে হয় ?

শেষরাতের দিকে মনে হলো কাঠের মেঝেতে পা টেনে টেনে কে যেন হাঁটছে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে—কেউ বোধহয় বাথরুমের দরজা খুলে বের হচ্ছে সেখান থেকে। পরিষ্কার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পেলাম। আমি ভয়ে আধমরা হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, Who is there ? ইংরেজিতে বললাম, কারণ আমেরিকান ভূত বাংলা নাও বুঝতে পারে। প্রশ্ন করে আরও ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ ভূত যদি সত্যি সত্যি প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহলে হার্টফেল করে মরে যাওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। মেঝেতে হেঁটে আসার শব্দ। আমার শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি নিশ্চিত এখন কেউ কোমল গলায় বলবে—হে বিদেশি, আমি এখানে বড়ই নিঃসঙ্গ। আমি খানিকক্ষণ তোমার সঙ্গে এই জীবনের হতাশা ও বেদনা নিয়ে কথা বলতে চাই। তুমি কি দয়া করে বাতি নিভিয়ে দেবে ?

তেমন কিছু হলো না। পদশব্দ দরজার কাছে থেমে গেল। ঘুমানোর চেষ্টা করা বৃথা। আমি হাত বাড়িয়ে কবিতার বই টেনে নিলাম। কবিতা পড়ে যদি ভূতের ভয় কাটানো যায়। হিথ্রো বিমানবন্দরে একগাদা বই কিনেছি। তার মধ্যে পণ্ডিত নেহেরুর প্রিয় কবি রবার্ট ফ্রস্ট আছেন। যার 'Stopping by woods on a snowing evening' কবিতার প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি তিনিই প্রথম আকৃষ্ট করেন।

কবিতা আমার প্রিয় বিষয় নয়, তবু এই ভয়ংকর রাতে কবিতাই আমাকে উদ্ধার করল। পড়তে পড়তে ভূতের ভয় কেটে গেল।

"The woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep."

৪

পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে পঁয়তাল্লিশ জন লেখক একত্র হয়েছেন। সবাই পরিণত বয়স্ক। অনেকেরই চুল-দাড়ি ধবধবে সাদা। নিজেকে এদের মধ্যে খুবই অল্পবয়স্ক লাগছিল। যদিও ভালো করেই জানি, মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। উনিশ বছরের যুক্তিহীন আবেগময় যৌবন পেছনে ফেলে এসেছি অনেক অনেক আগে।

লেখকদের কাউকেই চিনি না। কারও কোনো বইও আগে পড়ি নি। তবে ভাবভঙ্গিতে যা বুঝলাম, যাঁরা এসেছেন সবাই তাঁদের দেশের অতি সম্মানিত লেখক। সবার লেখাই একাধিক বিদেশি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। প্রোগ্রামটির পরিচালক প্রফেসর ক্লার্ক ব্লেইস নিজেও আমেরিকার নামকরা ঔপন্যাসিকদের একজন। তাঁর একটি উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে আমেরিকার একটি বড় ফিল্ম কোম্পানি এই মুহূর্তে ছবি তৈরি করছে।

প্রফেসর ক্লার্ক বুড়ো মানুষ। ধবধবে সাদা দাড়ি—ঋষি ঋষি চেহারা। এক পর্যায়ে তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে চমকে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, কেমন আছ হুমায়ূন?

উত্তর দেব কী, হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি। প্রফেসর ক্লার্ক আমার বিস্ময় খুব উপভোগ করলেন বলে মনে হলো। আমি কিছু বলার আগেই আমাকে আরও চমকে দিয়ে বললেন, আমি সম্পর্কে তোমাদের জামাই হই।

এর মানে কী? কী বলছেন উনি? আমাকে বেশিক্ষণ হতচকিত অবস্থায় থাকতে হলো না। প্রফেসর ক্লার্ক তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করলেন। ইংরেজিতে বললেন, আমি একটি বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছি, কাজেই আমি তোমাদের জামাই। আমার স্ত্রীর নাম ভারতী মুখোপাধ্যায়। কলকাতার মেয়ে।

বলো কি!

খুব অবাক হয়েছ?

তা হয়েছি।

বাংলাদেশের কোন জায়গায় তোমার জন্ম?

ময়মনসিংহ।

ভারতীর দেশও ময়মনসিংহ—মজার ব্যাপার না?

হ্যাঁ, খুবই মজার ব্যাপার।

তোমার সঙ্গে আমার আরও কিছু মিল আছে। কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম তুমি Ph.D. করেছ নর্থ ডাকোটা থেকে। আমার জন্মও নর্থ ডাকোটায়। এসো আমরা কফি খেতে খেতে গল্প করি।

কফির মগ হাতে তিনি দল ছেড়ে বাইরে গেলেন, আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। তিনি গলার স্বর নামিয়ে বললেন, ওয়াশিংটন থেকে টেলেক্স করে তোমার পারিবারিক দুর্ঘটনার খবর আমাকে জানিয়েছে। আমি খুবই দুঃখিত। তবু তুমি যে এসেছ, এতেও আনন্দ পাচ্ছি। বাংলাদেশ থেকে এই প্রথম ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামে কাউকে পেলাম।

আগে আর কেউ আসেন নি ?

না। তবে তোমাদের কবি জসীমউদ্‌দীনের মেয়ে হাসনা ছিল। সে অবশ্য রাইটিং প্রোগ্রামে ছিল না। সে ছিল আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তুমি কি তাকে চেনো ?

না, আমি চিনি না। আমার চেনাজানার গণ্ডি খুবই সীমিত।

ভারতীর সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। ও এখন আছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেও অধ্যাপনা করে। ভারতী এলে তোমাকে দেখিয়ে দেবে কোন গ্রোসারিতে হলুদ, মরিচ, ধনিয়া পাওয়া যায়। ও সব জানে।

ধন্যবাদ প্রফেসর ব্লেইস।

তুমি তো অনেক দিন পর এ দেশে এলে, কেমন লাগছে ?

এখনো বুঝতে পারছি না।

খুব শীত পড়বে কিন্তু। গরম কাপড় কিনে নিয়ো। কোনোরকম অসুবিধা হলে আমাকে জানিয়ো। আমি জানি, বাঙালিরা মুখচোরা ধরনের হয়। আমেরিকায় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমেরিকানদের মতোই থাকবে।

আমরা লেখকদের দলে ফিরে এলাম। লেখকদের মধ্যে একজন শাড়ি পরা মহিলা। সম্ভবত ভারতের কবি গগন গিল। এগিয়ে গেলাম। না, গগন গিল নন, ইনি শ্রীলঙ্কার কবি জেন, উনি সঙ্গে তাঁর স্বামীকে নিয়ে এসেছেন। স্বামী বেচারাকে মনে হলো স্ত্রীর প্রতিভায় মুগ্ধ। হাঁ করে সারাক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কবি জেন-এর কথা বলা রোগ আছে। মনে হয় অনেকক্ষণ কথা বলার কাউকে পাচ্ছিলেন না, আমাকে পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন। কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ খুলে এক তাড়া কাগজ বের করে বললেন, আমি 'গোয়া' নিয়ে একটি কবিতা লিখেছি। এসো তোমাকে পড়ে শোনাই। শুনতে আপত্তি নেই তো ?

প্রথম আলাপেই অভদ্র হওয়া যায় না, আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি শুরু করলেন ইংরেজি কবিতা। সেই কবিতাও মহাভারতের সাইজের, শেষ হতে চায় না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেল। এ-কি বিপদে পড়লাম! চোখেমুখে আগ্রহের ভাব ধরে রাখতে হচ্ছে। যাতে আমাকে দেখে মনে হয় কবিতার প্রতিটি শব্দ আমাকে অভিভূত করছে। এ বড় কঠিন অভিনয়। একসময় কাব্যপাঠ শেষ হলো। জেন উজ্জ্বল মুখে বললেন, কেমন লাগল বলো তো ?

অসাধারণ।

থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তোমার কি ধারণা কবিতাটা একটু অদ্ভুত ?

কিছুটা অদ্ভুত তো বটেই।

সবাই তা-ই বলে। জানো, আমি সহজ করে লিখতে চাই, কিন্তু মাঝামাঝি এসে সুররিয়েলিস্টিক হয়ে যায়। মনে হয়, অন্য কে যেন আমার মাঝে কাজ করে। সে আমাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেয়।

ভদ্রমহিলার স্বামী বললেন, ওগো, তুমি হুমায়ূনকে ওই কবিতাটা শোনাও—ওই যে কার্ফ্যুর রাতে তুমি রাস্তায় হাঁটছিলে।

জেন সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কবিতা বের করলেন। আয়তনে সেটি প্রথমটির দ্বিগুণ। দ্বিতীয় কবিতা শুনলাম, তারপর তৃতীয় কবিতা শুনলাম। এবং শুকনো মুখে বললাম, আমি এখন একটু করিডরে যাব। আমাকে সিগারেট খেতে হবে।

ভদ্রমহিলা ও তার স্বামী কবিতার গোছা নিয়ে অন্য একজনের কাছে ছুটে গেলেন। আমি সিগারেট ধরিয়ে অলস ভঙ্গিতে করিডর ধরে হাঁটছি। করিডরের শেষ প্রান্তে বিরস মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ইন্দোনেশীয় ঔপন্যাসিক তোহারি। আহমেদ তোহারি। ছোটখাটো মানুষ, দেখলেই স্কুলের নবম শ্রেণীর বালক বলে ভ্রম হয়। নতুন দাঁড়ি-গোঁফ গজানোর কারণে যে বালক বিব্রত এবং লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার রোগ যাকে সম্প্রতি ধরেছে।

আহমেদ তোহারি তাঁর দেশে অতি জনপ্রিয়। তাঁর পাঁচটি উপন্যাস জাপানি ভাষায় অনূদিত ও সমাদৃত হয়েছে। সম্প্রতি তিনি তাঁর দেশের সবচেয়ে বড় সাহিত্য পুরস্কারটি পেয়েছেন। বয়স ৪১। আমি নিজের পরিচয় দিতেই আনন্দিত হওয়ার ভঙ্গি করলেন। তাঁর ইংরেজি জ্ঞান ইয়েস এবং নো'র চেয়ে একটু বেশি, তবে খুব বেশি না। নিজেকে প্রকাশ করতে তাঁর প্রচুর সময় লাগে। মনে হলো এই নিয়েও তিনি বিব্রত। নিজেকে অন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার এটিও একটা কারণ হতে পারে।

আহমেদ তোহারি বললেন, তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কী সাহায্য?

তুমি কি একটা ভালো কম্পাস কিনে দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে? কম্পাস না থাকায় নামাজ পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। কাবার দিক ঠিক করতে পারছি না।

অবশ্যই কম্পাস কেনার ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করব। তবে আমি কি তোমাকে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে পারি?

হ্যাঁ পারো।

তুমি যখন জাকার্তা থেকে বিমানে করে ওয়াশিংটন এসেছ, তখন তোমাকে কুড়ি ঘণ্টা বিমানে থাকতে হয়েছে। এই সময়ে কয়েকবার নামাজের সময় হয়েছে, কাবা শরিফ তখন ছিল তোমার নিচে। সেই সময় নামাজ কীভাবে পড়েছ?

তোহারি জবাব না দিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুসলমান হয়ে এই কথা বলব তা তিনি সম্ভবত কল্পনা করেন নি। আমারও বেশ খারাপ লাগল। এই কূটতর্কের কোনোই প্রয়োজন ছিল না।

অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নিজেই একটা ভালো কম্পাস কিনে আনলাম। সেই রাতে লেখকদের সম্মানে ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক বিশাল এক পার্টির আয়োজন করেছে। ফরম্যাল ডিনার। খানার চেয়ে পিনার আয়োজন বেশি। অবাক হয়ে দেখি, আহমদ তোহারি রেড ওয়াইন নিয়ে বসেছেন এবং বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাচ্ছেন। আমি তাঁর পাশে জায়গা করে বসলাম এবং মধুর স্বরে বললাম, তুমি মদ্যপান করছ, ব্যাপারটা কী ?

তোহারি বললেন, মদ্যপান দোষের নয়। মওলানা জালালুদ্দিন রুমি মদ্যপান করতেন।

ও আচ্ছা। আমাদের প্রফেট কিন্তু করতেন না।

তোহারি আমার কথাবার্তা পছন্দ করলেন না। গ্লাস নিয়ে উঠে চলে গেলেন। আমার অপমানিত বোধ করার কথা, কেন জানি তা করলাম না। বরং মজা লাগল।

আমার বাঁ পাশে বসেছেন চৈনিক ঔপন্যাসিক জং ইয়ং। দেখেই মনে হয় খুব হাসিখুশি মানুষ। কথা বলতে গিয়ে দেখলাম তাঁর ইংরেজি জ্ঞান 'ইয়েসে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'ইয়েস' ছাড়া অন্য কোনো ইংরেজি শব্দ তিনি এখনো শিখে উঠতে পারেন নি বলে মনে হলো। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার কিছু নমুনা দেই।

আমার নাম হুমায়ূন। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশ—তোমরা যাকে বলো মানছাল্য।

ইয়েস। [মুখভর্তি হাসি। মনে হলো আমার পরিচয় পেয়ে খুব আনন্দিত।]

তুমি কি শুধু উপন্যাসই লেখো, না কবিতাও লেখো ?

ইয়েস। [আবার হাসি, খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে।]

আজকের পার্টি তোমার কেমন লাগছে ?

ইয়েস। ইয়েস। [হাসি এবং মাথা নাড়া। মনে হলো আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি খুব আরাম পাচ্ছেন।]

ভারতীয় মহিলা কবি গগন গিলের সঙ্গে দেখা হলো এই পার্টিতেই। লেখকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কমবয়েসী। চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হবে না। অত্যন্ত রূপবতী। মেরুন রঙের সিল্কের শাড়িতে তাঁকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। ভদ্রমহিলার হাতে মদের গ্লাস, নির্বিকার ভঙ্গিতে ভুসভুস করে সিগারেট টানছেন। শাড়ি পরা কোনো মহিলার মদ্যপান ও সিগারেট টানার দৃশ্যের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই বলে খানিকটা অস্বস্তি লাগছে, যদিও জানি অস্বস্তি লাগার কিছুই নেই। পুরুষরা যা পারে ওরাও তা পারে। ওরা বরং আরও বেশি পারে, ওরা গর্ভধারণ করতে পারে, আমরা পুরুষরা তা পারি না।

পার্টির শেষে আমি আহমদ তোহারিকে কম্পাসটা দিলাম। তিনি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমার কাছ থেকে এটা তিনি আশা করেন নি বলে মনে হলো। মানুষের বিস্মিত মুখের ছবি বড়ই চমৎকার। আমার দেখতে খুব ভালো লাগে।

তোহারি, তোমার জন্যে আমার সামান্য উপহার। উপহারটি কাজে লাগলে আমি খুশি হব।

লেখকরা খুব আবেগপ্রবণ হন, এই কথা বোধহয় মিথ্যা নয়। তোহারি 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড' 'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সবাই ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল। একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষকে জড়িয়ে ধরেছে, এই দৃশ্য তাদের কাছে খুব রুচিকর নয়।

নিজের আস্তানা ভুতুড়ে বাড়িতে ফিরছি, তবে ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করে ফিরছি। স্টিফান কিং-এর একটি ভৌতিক উপন্যাস কিনে নিয়েছি। বিষে বিষক্ষয়ের মতো ভূতে ভূতক্ষয়।

বাসায় ফিরে দেখি স্টিফান কিং-এর উপন্যাস কেনার দরকার ছিল না। ফিলিপাইনের ঔপন্যাসিক রোজেলিও সিকাটকে আমার এখানে দিয়ে গেছে। তিনিও দেরিতে এসেছেন বলে মে ফ্লাওয়ারে জায়গা হয় নি।

রোজেলিও সিকাটের বয়স পঞ্চাশ, তবে দেখায় তার চেয়েও বেশি। মাথার চুল সবই সাদা। দাঁত বাঁধানো। অল্প কিছু দাড়ি-গোঁফ আছে। মুখের গঠন অনেকটা আর্নেস্টি হেমিংওয়ের মতো। চেইন স্মোকার।

সিকাট ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপাইনের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। নিজ দেশে তাঁর খ্যাতি তুঙ্গস্পর্শী। তাঁকে অত্যন্ত বিরক্ত মনে হলো। আমাকে বললেন, এদের কারবারটা দেখলে ? এরা আমাকে মে ফ্লাওয়ারে জায়গা দেয় নি—এই বাড়িতে নির্বাসন দিয়েছে।

নির্বাসন বলছ কেন ?

নির্বাসন না তো কী ? সব লেখক দলবেঁধে মে ফ্লাওয়ারে আছেন, আর আমি কিনা এখানে।

বাড়িটা কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না ?

পছন্দ হবে না কেন ? পছন্দ হয়েছে। বাড়ি খুবই সুন্দর। কিন্তু প্রশ্নটা হলো নীতির। তুমি সম্ভবত জানো না, এর আগে চারজন লেখককে এই বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছিল। চারজনই অস্বীকার করেছেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ তাই। রোমানিয়ার কবি মির্চাকে (মির্চা কার্টেরেষকু) এই বাড়ি দেওয়া হলে তিনি ওদের মুখের উপর বলেছেন, এটা একটা Ghetto। এই Ghetto-তে আমি থাকব না। আমাকে আপনারা বুখারেস্টের প্লেনে তুলে দিন।

তুমিও ওদের তা-ই বলো।

অবশ্যই বলব। রাগটা ঠিকমতো উঠছে না। রাগ উঠলেই বলব। আমাকে দেখে মনে হয় না, কিন্তু আসলে আমি খুবই রাগী মানুষ। জার্মানিতে আমি একবার মারামারি পর্যন্ত করেছি।

সে-কি!

এক জার্মান যুবক আমাকে দেখে তামাশা করে কী সব বলছিল, দাঁত বের করে হাসছিল, গদাম করে তার পেটে ঘুষি বসিয়ে দিলাম। এক ঘুষিতে ঠান্ডা।

আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এখানে অবশ্য তেমন কিছু করা যাবে না।

করা যাবে না কেন ?

করা যাবে না, কারণ আসার আগে আমি আমার স্ত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—রাগারাগি করব না। আমি আবার তাকে খুবই ভালোবাসি।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ। সে বড়ই ভালো মেয়ে এবং রূপবতী।

একইসঙ্গে রূপবতী এবং ভালো মেয়ে সচরাচর হয় না—তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান।

বুঝলে হুমায়ূন, আমার স্ত্রীর এক ধরনের ইএসপি ক্ষমতা আছে। আমি যখন লেখালেখি করি তখন সে বুঝতে পারে—কখন আমি কফি চাই, কখন খাবার চাই। ঠিক সময়ে কফি উপস্থিত হয়। ঠিক সময়ে খাবার।

বড় চমৎকার তো!

একবার সে কী করল জানো ? তার সমস্ত জমানো টাকা ও গয়না বিক্রির টাকা একত্র করে ফিলিপাইনের পাহাড়ি অঞ্চলে পর্বতের মাথায় ছোট্ট একটা বাড়ি কিনল। যাতে ওই বাড়িতে বসে নিরিবিলি আমি সুন্দর লেখার কাজ চালিয়ে যেতে পারি। আমি প্রতি বছর ওই পাহাড়ি বাড়িতে একনাগাড়ে একা একা তিন মাস থাকতাম। নিজেই রান্না করে খেতাম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একনাগাড়ে লিখতাম।

তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে থাকত না ?

ও থাকবে কী করে ? ওর ঘর-সংসার আছে না ? ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ওদের কে দেখাশোনা করবে ?

ওই বাড়িটি কি এখনো আছে ?

না, বিক্রি করে দিয়েছি। একসময় খুব অভাবে পড়লাম, বিক্রি করে দিলাম। এখনো ওই বাড়ির জন্য আমার মন কাঁদে। অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করলাম। যাই এখন কাজ করি। আমি একটা জাপানি উপন্যাস টেগালগ ভাষায় অনুবাদ করছি—'Snow Country.' কাওয়াবাতার লেখা।

সিকাট টাইপ রাইটার নিয়ে বসলেন। তিনি টেগালগ ভাষায় লিখেন ঠিকই, ব্যবহার করেন ইংরেজি টাইপ রাইটার। কারণ টেগালগ ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তাদের ভরসা রোমান হরফ। একই ব্যাপার তোহারির বেলাতেও। তিনিও নিজের ভাষাতে লেখেন, ব্যবহার করেন ইংরেজি বর্ণমালা। অধিকাংশ আফ্রিকান দেশে এই অবস্থা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা আরও গভীর। তারা সরাসরি ইংরেজি বা ফরাসি ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করেন। সেনেগালের শিশুসাহিত্যিক লিখেন ফরাসি ভাষায়, কোনো আফ্রিকান

ভাষায় নয়। শ্রীলঙ্কার কবি জেন কখনো সিংহলি বা তামিল ভাষায় লিখেন নি। লিখেছেন ইংরেজিতে। নাইজেরিয়ার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাট্যকার ওলে সোয়েংকা (Woie Soyinka) লেখালেখি করেন ইংরেজি ভাষায়। নিজের ভাষায় না।

বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে আমি বড় ভাগ্যবান। অন্যের ভাষায় আমাকে লিখতে হচ্ছে না, অন্যের হরফ নিয়েও আমাকে লিখতে হচ্ছে না। আমার আছে প্রিয় বর্ণমালা। এই বর্ণমালা রক্ত ও ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবীর বুকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

৫

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারকে এখানে ক'জন বাংলাদেশি ছাত্র আছে জানতে চেয়ে একটি চিঠি লিখেছিলাম, ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার দু'দিন পরে চিঠি লিখে পাঁচজন বাংলাদেশি আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রের তালিকা পাঠিয়ে দিলেন। চিঠিতে লিখলেন—মোট ছ'জন বাংলাদেশি ছাত্র পড়াশোনা করে, তোমাকে পাঁচজনের নাম ও টেলিফোন নাম্বার পাঠানো হলো। ষষ্ঠজনের নাম পাঠালাম না, কারণ তার ব্যক্তিগত ফাইলে লেখা আছে তার সম্পর্কে কোনো তথ্য কাউকে জানানো যাবে না।

তালিকায় সবার প্রথম যার নাম তাকেই টেলিফোন করলাম। আহসান উল্লাহ আমান। আমি বাংলা ভাষায় বললাম, আমার নাম এই, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি—

সে নিখুঁত আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, আমি বাংলায় কথা বলা ভুলে গেছি—কাজেই ইংরেজিতে বলছি।

আমি হতভম্ব। বলে কী এই ছেলে! তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে বললাম, বাংলায় কথা বলা ভুলে গিয়েছ ?

ইয়েস, টোটেলি ফরগটন।

ভুলে যাওয়া বিচিত্র কিছু না—বড়ই কঠিন ভাষা। আশা করি ভুলতে তোমাকে খুব কষ্ট করতে হয় নি।

অনেক দিন বাইরে আছি তো, এইজন্যে ভুলে গেছি।

শুনে বড় ভালো লাগল।

আমি কি কিছু করতে পারি আপনার জন্য ?

না। তুমি কিছু করতে পারবে না। ভাবছিলাম আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পারি কি না। মনে হচ্ছে তাও সম্ভব নয়।

আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না। দয়া করে ইংরেজিতে বলুন।

আজ থাক, অন্য আরেক দিন বলব।

টেলিফোন নামিয়ে হতভম্ব হয়ে বসে আছি। সিকার্ট এসে বললেন, তোমার কী হয়েছে ?

কিছু হয় নি। কিছুক্ষণ আগে একজন বাংলাদেশি ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে, সে বলল সে বাংলা ভাষা ভুলে গেছে।

তুমি তার ঠিকানা জোগাড় করো। তারপর আমাকে নিয়ে চলো, আমি ঘুষি দিয়ে তার নাক ফাটিয়ে দিয়ে আসব। না না ঠাট্টা না, মারামারির ব্যাপারে আমি খুব এক্সপার্ট—জার্মানিতে কী করেছিলাম তোমাকে তো বলেছি, একেবারে হইচই পড়ে গেল। অ্যাম্বেসি ধরে টানাটানি।

আমি নানানভাবে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম—হয়তো এই ছেলের জন্ম হয়েছে এখানে, কোনোদিন বাংলায় কথা বলার সুযোগ হয় নি...হতেও তো পারে। বাংলাদেশের কোনো ছেলে কিছুদিন আমেরিকায় বাস করে নিজের ভাষাকে অস্বীকার করবে তা হতেই পাবে না।

কিংবা কে জানে, হয়তো পারে। এই দেশ খুব সহজেই মানুষকে বদলে দেয়। চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। নয়তো কেন এত এত শিক্ষিত ভদ্রঘরের চমৎকার ছেলেরা বাসন মেজে দিন পার করাতেই আনন্দ এবং জীবনের পরম লক্ষ্য খুঁজে পায়। কী আছে এ দেশে ? সাজানো-গোছানো শহর, চমৎকার মল, চোখ ধাঁধানো হাইওয়ে ? এই কি সব ?

একটি আমেরিকান পরিবারের জীবনচর্যা চিন্তা করলে কষ্ট হয়। ওরা কী হারাচ্ছে তা বুঝতে পারে না। আমরা যারা বাইরে থেকে আসি—বুঝাতে পারি কিংবা বোঝার চেষ্টা করি।

একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করা যাক।

সর্বাধুনিক একটি হাসপাতালে শিশুটির জন্ম হলো। বিশ্বের সেরা ডাক্তাররা জন্মলগ্নে শিশুটির পাশে থাকলেন। সে বাসায় ফিরল, কিন্তু মায়ের কোলে ফিরল না। তার আলাদা ঘর। আলাদা খাট। কেঁদে বুক ভাসালেও মা তাকে খাবার দেবেন না। ঘড়ি ধরে খাবার দেবেন। সে বড় হতে থাকবে নিজের আলাদা ঘরে। যাতে নাকি তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হবে।

শিশু একটু বড় হলো। বাবা-মা'র কাছে নয়, বেশিরভাগ সময় তাকে এখন থাকতে হচ্ছে বেবি কেয়ার কিংবা বেবি সিটারদের কাছে।

তার চার-পাঁচ বছর বয়স হওয়ামাত্র শতকরা ৮০ ভাগ সম্ভাবনা সে দেখবে তার বাবা-মা আলাদা হয়ে গেছেন। এই ঘটনায় তারা যেন বড় রকমের শক না পায় তার জন্যেও ব্যবস্থা করা আছে। স্কুলের পাঠ্যতালিকায় বাবা-মা আলাদা হয়ে যাওয়ার সমস্যা উল্লেখ করা আছে।

শিশুটির বয়স বারো পার হওয়ামাত্র স্কুল থেকে তাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। এটি নতুন হয়েছে। যাতে যৌন রোগে আক্রান্ত না হয় সেই ব্যবস্থা। বয়োঃসন্ধি কালে যখন তারা মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনে হতচকিত সেই সময়টা তাদের কাটাতে হবে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর খোঁজে, যাদের পরবর্তী সময়ে বিয়ে করবে। কী ভয়াবহ সেই অনুসন্ধান! একটি মেয়েকে অসংখ্য ছেলের মধ্যে ঘুরতে হবে যাতে সে পছন্দমতো কাউকে খুঁজে পায়। সময় চলে যাওয়ার আগেই তা করতে হবে। প্রতিযোগিতা—ভয়াবহ প্রতিযোগিতা।

উনিশ-কুড়ি বছর বয়স হলো—বেরিয়ে যেতে হবে বাড়ি থেকে। এখন বাঁচতে হবে স্বাধীনভাবে। নিজের ঘর চাই। নিজের গাড়ি চাই। কোনো একটি চাকরি দ্রুত প্রয়োজন।

চাকরি পাওয়া গেল। তাতেও কোনো মানসিক শান্তি নেই। চাকরি সবই অস্থায়ী। কাজ পছন্দ হলো না তো বিদায়। সংসার প্রতিপালন করতে হচ্ছে এক ধরনের

অনিশ্চয়তায়। অনিশ্চয়তায় বাস করতে করতে অনিশ্চয়তা চলে আসছে তাদের আচার-আচরণে। তাদের কোনোকিছুই একনাগাড়ে বেশিদিন ভালো লাগে না। কাজেই ইস্ট থেকে ওয়েস্ট। ওয়েস্ট থেকে নর্থ। এক স্ত্রীকেও বেশিদিন ভালো লাগে না। গাড়ির মতো স্ত্রী-বদল হয়।

এই কবতে করতে সময় ফুরিয়ে যায়। আশ্রয় হয় ওল্ড হোম। জীবনের পরিণতি। একসময় মৃত্যুবরণ করতে হয়। মৃত্যুর পর দেখা যায় তারা তাদের ধনসম্পদ উইল করে দিয়েছে প্রিয় বিড়ালের নামে, কিংবা প্রিয় কুকুরের নামে।

আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় যা বুঝেছি তা হলো, এদের প্রায় সবার চিন্তা-ভাবনা সীমাবদ্ধ। বস্তুকেন্দ্রিক। একটি মেয়ের জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হলো চিয়ার লিডার হবে। ফুটবল খেলার মাঠে স্কার্ট উঁচিয়ে নাচবে। স্কার্টের নিচে তার সুগঠিত পদযুগল দেখে দর্শকরা বিমোহিত হবে। এই তার সবচেয়ে বড় চাওয়া। একটি ছেলে চাইবে মিলিওনিয়ার হতে।

এই অতি সভ্য (?) দেশে আমি দেখি মেয়েদের কোনো সম্মান নেই। একজন মহিলাকে তারা দেখবে একজন উইম্যান হিসেবেই। একটি মেয়ের যে মাতৃরূপ আছে, যা আমরা সবসময় দেখি, ওরা তা দেখে না। একটি মেয়ে যত দিন পর্যন্ত শারীরিকভাবে আকর্ষণীয় তত দিন পর্যন্তই তার কদর।

যা কিছু হাস্যকর, তার সবই এদের ভাষায়—মেয়েলি, এফিমিনেট। শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, এই দেশে মেয়েরা একই যোগ্যতায় একই চাকরিতে পুরুষদের চেয়ে কম বেতন পান। বিমানের ক্যাপ্টেন যদি মহিলা হন, তাহলে বিমানের যাত্রীদের তা জানানো হয় না। ক্যাপ্টেন পুরুষ হলে তবেই শুধু বলা হয়—আমি অমুক, তোমাদের বিমানের ক্যাপ্টেন। মহিলা ক্যাপ্টেনের কথা বলা হয় না। কারণ মহিলা বিমানের দায়িত্বে আছেন জানলেই যাত্রীরা বেঁকে বসতে পারে। আমাদের দেশে মেয়েদের অবস্থা খারাপ, তবু একজন মহিলা ডাক্তার একজন পুরুষ ডাক্তারের মতোই বেতন পান। কম পান না।

আমরা আমাদের দেশে একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের কথা চিন্তা করতে পারি। ভাবতে পারি। ওরা তা পারে না। আসছে এক শ' বছরেও এই আমেরিকায় কোনো মহিলা প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে না। অতি সুসভ্য এই দেশ তা হতে দেবে না।

জাতির শরীর যেমন আছে, আত্মাও আছে। এই দেশের শরীরের গঠন চমৎকার। কিন্তু আত্মা? এর আত্মা কোথায়?

আজ থেকে ৭০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা এসেছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে চিঠি লিখছেন তাঁর আদরের কন্যা মীরা দেবীকে। সেই চিঠিতে আমেরিকার ব্যাপারে তাঁকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায়। তাঁর চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি...

> এখানে মানুষের জন্যে মানুষের চিন্তা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে উদ্বোধিত। এখানে টানাটানি-কাড়াকাড়ি

হট্টগোলের ভেতরও বিশ্বমানবের দর্শন পাওয়া যায়। সেই বিরাট পুরুষের দর্শনেই নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের আন্দোলনকে তুচ্ছ করে দেয়। আমাদের দেশে মানুষ অত্যন্ত ছোট হয়ে আছে কেবল যে তার জীবনের ক্ষেত্র ছোট তা নয়, তার চিন্তার আকাশ সংকীর্ণ..."

[পত্রাবলী মীরা দেবীকে লেখা, ১৯০৬-৩৭, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সনৎ কুমার বাগচি কর্তৃক সংকলিত।]

মজার ব্যাপার হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পনের বছর পরই আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর মত বদলান। তিনি তাঁর কন্যা মীরা দেবীকে আমেরিকা যেতে অনুৎসাহিত করে লিখেন—

কল্যাণীয়েষু,

মীরু, এখানে মেয়েদের বেশিদিন থাকার ক্ষতি আছে। তার কারণ এখানকার সমাজ সংকীর্ণ এবং যারা আছে তারা অনেকেই নিচের স্তরের মানুষ। এখানে লোকের সংসর্গ অল্প কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়াতে মানুষকে বিচার করবার আদর্শ নেবে যায় এবং লোক পরিচয়ের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। কলকাতায় সমাজের আদর্শ এখানকার চেয়ে প্রশস্ত এবং উপরের শ্রেণীর। যেটা খেলো এবং vulgar এখানে থাকতে থাকতে সেটা সয়ে যায় এবং তার হেয়তা বুঝতেই পারিনে। অল্প বয়সে, বিশেষত মেয়েদের পক্ষে এটা অত্যন্ত মুস্কিলের। এখানে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার সুবিধা আছে কিন্তু সামাজিক শিক্ষার জায়গা এটা নয়— অথচ যৌবনারম্ভে সেই শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। বুড়িকে নিয়ে যদি তুই এখানে দীর্ঘকাল থাকিস তাহলে তাতে বুড়ির ক্ষতি হবে, এখন সে কথা বুড়ি না বুঝতে পারলেও এর পরে তা অনুতাপের কারণ ঘটতে পারে। কলকাতায় আমাদের যে সমাজ সেই সমাজের সঙ্গে বুড়িকে মিলিয়ে দিতে হবেই, নইলে সে তার নিজের ও বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে জানবে না।

মাঝে শরীর খারাপ হয়েছিল, এখন সেরে উঠেছি। যেতে হবে দূরে, ঘুরতে হবে বিস্তর, ফিরতে মাসখানেক লাগবে—তার পরে কলকাতায় তোদের একবার দেখে আসব। আমার মাটির ঘরের ভিৎ দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠছে।

ইতি ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

বুড়িকে পদ্যে একটা চিঠি কিছুকাল পূর্বে লিখেছিলুম—পদ্যে সে তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা যেন না করে এই আমার সানুনয় অনুরোধ।

এই প্রসঙ্গে আরেকজনের উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। ইনি হচ্ছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মহান ঔপন্যাসিক আলেকজান্ডার সোলঝনিৎসিন। নিজ দেশ ছেড়ে গণতন্ত্রের স্বাধীন ভূমি আমেরিকাতে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭তম কমেন্সমেন্ট অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই বক্তৃতায় তিনি আমেরিকা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রসঙ্গে তাঁর মোহভঙ্গের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেন। পুরো বক্তৃতাটি তুলে দিতে পারলে ভালো হতো, আমি অল্পকিছু অংশ তুলে দিলাম—

> There are telltale symptoms by which history gives warning to a threatened or perishing society. Such are, for instance, a decline of the arts or a lack of great statesmen. Indeed, sometimes the warnings are quite explicit and concrete. The center of your democracy and of your culture is left without electric power for a few hours only, and all of a sudden crowds of American citizens start looting and creating hovoc. The smooth surface film must be very thin, then, the social system quite unstable and unhealthy.

৬

অধ্যাপক ক্লার্ক ব্লেইস দুপুরে তাঁর সঙ্গে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন। ভারতী মুখোপাধ্যায় ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরে এসেছেন—এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে। ক্লার্ক এসে নিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল বাড়ি দেখব। তা নয়, ছোট্ট বাড়ি। ভারতী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা হলো। শাড়ি পরা বাঙালি মেয়ে। এককালে ডাকসাইটে রূপসী ছিলেন তা বোঝা যায়। রূপের খানিকটা এখনো ধরে আছেন। তিনি নিজেও একজন ঔপন্যাসিক। সাহিত্য চর্চা করেন ইংরেজি ভাষায়। তাঁর লেখা একটা উপন্যাস *জেসমিন* আমেরিকায় বেস্ট সেলার হয়েছে। অবশ্যি এই উপন্যাসে তিনি ভারতকে ছোট করে দেখিয়ে পশ্চিমের জয়গান করেছেন।

ভেবেছিলাম মন খুলে কথাবার্তা বলা যাবে—তা সম্ভব হলো না। কারণ আমার সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন শ্রীলঙ্কার কবি জেন এবং তাঁর স্ত্রী-প্রতিভায় মুগ্ধ স্বামী। বলাই বাহুল্য জেন সঙ্গে করে একগাদা কবিতা নিয়ে এসেছেন এবং ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছেন। একসময় তিনি প্রাকৃতিক নিয়মেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলাম এইবার হয়তো কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে, তা পাওয়া গেল না। জেন-এর স্বামী তখন আসরে নামলেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর যে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে সেইসব বলতে লাগলেন। জেন স্বামীকে উস্কে দিচ্ছেন—'দেবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার গল্পটা বলো হানি।' 'হানি, প্রিকগনিশন ড্রিমের ওই অসাধারণ গল্পটা বলো।'

ভদ্রলোক অদ্ভুত সব গল্প শোনাতে লাগলেন। বিংশ শতাব্দীতে, আমেরিকায় বসে, এইসব গাঁজাখুরি গল্প শোনার কোনো মানে হয় না। কিন্তু যেহেতু আমরা সভ্য মানুষ—কান পেতে শুনে যাই। ভদ্রলোকের একটি কাহিনি হলো—দেবী সরস্বতীর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ। এক দুপুরে তিনি তাঁর গ্রামের রাস্তায় হাঁটছিলেন। বয়স খুবই কম—ন'-দশ। কোথাও লোকজন নেই। হাঁটতে হাঁটতে পুরনো এক মন্দিরের কাছে চলে এলেন। মন্দিরের কাছে এসেই মিষ্টি ফুলের গন্ধে চমকে উঠলেন। তারপর দেখেন মন্দিরের ভেতর থেকে দেবী সরস্বতী বের হয়ে হাত ইশারা করে তাঁকে ডাকছেন।

আমি গল্পের এক পর্যায়ে উঠে গিয়ে অধ্যাপক ক্লার্কের ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। সমস্ত ঘরভর্তি ছোট ছোট ফ্রেমে বাঁধানো প্রাচীন সব গ্রন্থের পৃষ্ঠা। ক্লার্ক বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোনটা কী। এর মধ্যে আছে মূল *শাহনামা* গ্রন্থের এক পৃষ্ঠা, যা তিনি তিন হাজার ডলার দিয়ে কানাডা থেকে কিনেছেন। দু'হাজার বছর আগের কোরআন শরিফের একটি পৃষ্ঠা। মোগল আমলের কিছু গ্রন্থের মলিন পাতা। সবই অতি যত্নে সংরক্ষিত।

খাওয়ার ডাক পড়ল।

আশা করেছিলাম, ভাত-ডাল-মাছ এইসব থাকবে। তা না, পিজা ডিনার। সেই পিজাও ঘরে বানানো নয়—দোকান থেকে কিনে আনা। পিজা খাচ্ছি এবং শ্রীলঙ্কার ভদ্রলোকের অলৌকিক গল্প শুনছি। জেনের কবিতার মতো উনার গল্পও অফুরান।

প্রফেসার ক্লার্ক একপর্যায়ে বললে, আমরা হুমায়ূনের গল্প শুনি।

আমি বললাম, আমার তো কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই, কী গল্প বলব!

আমেরিকা প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতার গল্প শুনি। ভেতর থেকে নিজেদের দেখা কঠিন। বাইরে থেকে দেখা সহজ। আমি এক বছর কলকাতায় ছিলাম। তার উপর ভিত্তি করে একটি বই লিখেছি—'Nights and Days and Calculta' তোমাকে একটা কপি দেব। এখন তুমি বলো, তুমি যে নর্থ ডাকোটায় ছিলে, কী দেখেছ? বরফ ছাড়া কী দেখেছ?

আমি নর্থ ডাকোটায় এক হাসপাতালে আমার মেজ মেয়ে শীলার জন্মের গল্পটি শুরু করলাম। তার জন্মমুহূর্তে আমাকে শীলার মা'র পাশে হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। শিশুজন্মের এই ভয়াবহ ব্যাপারটাই প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। আমি চলে গিয়েছিলাম একধরনের ঘোরের রাজত্বে। মনে হচ্ছিল চোখের সামনে যা দেখছি তা সত্যি নয়, স্বপ্ন। স্বপ্ন ভঙ্গ হলো গুলতেকিনের কথায়, তুমি এরকম করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাচ্চার কান্না শুনতে পাচ্ছ না? আজান দাও। আমি বিকট শব্দে আজান শুরু করলাম। ডাক্তার ও নার্সদের মধ্যে হইচই পড়ে গেল—এই বাঙাল কী করছে?

একটা মজার গল্প। যাদেরই এই গল্প করেছি তারাই প্রাণ খুলে হেসেছে। এখানে ভিন্ন ব্যাপার হলো। দেখি কবি জেন-এর চোখ ছলছল করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি কেঁদে ফেলবেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আমি এমন মানবিক গল্প এর আগে শুনি নি। আমি অভিভূত। এই নিয়ে একটি কবিতা না লেখা পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না। আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেছে। দেখো হুমায়ূন, দেখো।

তিনি তাঁর হাত আমার সামনে এগিয়ে দিলেন। সেই হাতে কোনো লোম নেই। কাজেই লোম খাড়া হলো কি হলো না তা বুঝতে পারলাম না। তবে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। একটা মজার গল্প বলে এ কী বিপদে পড়লাম।

এই ঘটনার দিন সাতেক পরের কথা। সন্ধ্যাবেলা প্রেইরি বুক স্টোরে কবিতাপাঠের আসর বসেছে। কবিতা শুনতে গিয়েছি। প্রথম কবিতা পাঠ করলেন পোলিশ কবি ও গল্পকার পিটার। তারপর উঠে দাঁড়ালেন জেন। গম্ভীর গলায় বললেন, আমি যে কবিতাটি পাঠ করব তা উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদকে। তাঁর একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প শুনে আবেগে অভিভূত হয়ে আমি কবিতাটি লিখি।

সব দর্শক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে আমাকে নড করতে হলো। জেন কবিতা পাঠ শুরু করলেন। আবার তাঁর চোখে পানি এসে গেল। এবং আশ্চর্য, আমার নিজের চোখও ভিজে উঠল। এই অতি আবেগপ্রবণ কবির কবিতাটি পাঠক-পাঠিকাদের জন্য হুবহু তুলে দিচ্ছি। একজন কবি আমার সামান্য একটি গল্প শুনে কবিতা লিখে আমাকে উৎসর্গ করেছেন, এই আনন্দও তো কম নয়।

DESH

(POEM FOR HUMAYUN)

Beside your wife's bed side awaiting the birth
Of your child you uttered the name of God

Many times
Allah-U-Akbar-
This was not your country
You were far away but is one ever apart
For those gods who are so intimate
A part of your life ?
You will never be alone here
Even in the snowy deserts of winter
Or when the trees shed all the leaves in Fall,
When you pray for the safety of mother of Child
Th gods have a way of following you
And you of taking them with you
Just as, over the oceans, you carry
A Little of the Desh, the earth of your
Country and when you are lonely, touch it
As you would its fields, its rivers and its trees
And feel that this is your home,
It is where you belong.
I also remember your words, friend,
"My mother told me, fill your palm
with some soil of the Desh
when my daughter was born
Or else, the baby will cry for the soil"

But those, tears won't they irrigate
The arid earth of our lives ?

৭

সন্ধ্যা থেকে টিভির সামনে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তুষার পড়ছে না, তবে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে নেমে গেছে। ঘরে হিটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। আমেরিকানরা একটি নির্দিষ্ট দিনে হিটিং চালু করে—সেই দিন আসার এখনো দেরি আছে। শীতে কাঁপছি, মনটাও খারাপ হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে বাসায় টেলিফোন করেছিলাম। ছোট মেয়ে টেলিফোন ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা, আম্মা আমাকে মেরেছে।

কেন মেরেছে মা ?

শুধু শুধু মেরেছে।

বলেই আমার অতি আদরের মেয়ে গলা ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তের হাজার মাইল দূরে। হাত বাড়িয়ে তাকে আদর করতে পারছি না। আমার নিজের চোখও ছলছল করতে লাগল। কোমল গলায় বললাম, তোমার জন্যে কী কী আনতে হবে আরেকবার বলো মা।

সে ধরা গলায় বলল, কিছু আনতে হবে না, তুমি এসে আমাকে আদর করো।

আমি মন খারাপ করে টেলিফোন রেখে টিভির সামনে এসে বসেছি। ভালো প্রোগ্রাম হচ্ছে—সিচুয়েশন কমেডি। কিন্তু মন দিতে পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে—কেন এলাম এই দেশে, কী প্রয়োজন ছিল ?

আমেরিকা দেখা ? আমেরিকা জানা ? কী হবে আমেরিকা দেখে ও জেনে ?

নিজের দেশ ও নিজের দেশের মানুষকে কি আমি ঠিকমতো জানতে পেরেছি ? বা সত্যিকার অর্থে জানার চেষ্টা করেছি ?

টেলিফোন বাজছে। উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম। ঢাকা থেকে গুলতেকিন টেলিফোন করেছে।

শোনো, বুঝতে পারছি মেয়ের সঙ্গে কথা বলে তোমার মন খারাপ হয়েছে। এই জন্যেই টেলিফোন করলাম। তোমার মেয়ে শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি তাকে সামান্য বকা দিয়েছিলাম। বড় যন্ত্রণা করে। মাঝে মাঝে ওদের বকা দেওয়ার অধিকার তো আমার আছে। আছে না ?

অবশ্যই আছে।

তোমার মন ভালো হয়েছে তো ?

হয়েছে। টেলিফোন করার জন্য ধন্যবাদ।

থাক, আমেরিকানদের মতো ফর্মাল হওয়ার দরকার নেই। খাওয়াদাওয়া করেছ ?

এখনো করি নি—রান্না শুরু করব।

আজকের মেনু কী ?

ভাত এবং ডিমভাজা।

তুমি তো মনে হচ্ছে আমেরিকান সব ডিম খেয়ে শেষ করে ফেলছ।

কী করব বলো, ডিম ছাড়া তো আর কিছু রাঁধতে পারি না।

আবার টিভির সামনে এসে বসলাম। এখন প্রোগ্রামগুলি ভালো লাগছে। ভাঁড়ামো ধরনের রসিকতাতেও প্রচুর হাসি পাচ্ছে। রাত দশটার দিকে ডিম ভাজতে গেলাম। এখানকার প্রোগ্রামের একটি বড় অংশ হচ্ছে নিজের সংসার গুছিয়ে নিজের মতো করে থাকা। ঘুরে বেড়ানো। মাঝে মাঝে লেখকদের প্যানেল ডিসকাশন। ইচ্ছে করলে সেখানে যাওয়া যায়, ইচ্ছে না করলে যাওয়ার দরকার নেই। লেখকরা নিজেদের লেখা সম্পর্কে বলেন, কবিতা পড়েন বা গল্প পড়ে শোনান। সবই খুব ঘরোয়া ভঙ্গিতে। কোনোদিন আসর বসে কফিশপে, কোনোদিন আইসক্রিম শপে, কোনোদিন পথের মোড়ে।

একদিন আমাদের বাড়ির লনে আসর বসল। বার্বিকিউ হচ্ছে, বিয়ার খাওয়া হচ্ছে—এর মধ্যেই গল্পপাঠের আসর। পাঠ করা হবে বাংলাদেশের গল্প। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয় কলায় পড়াশোনা করছে এমন একজনকে ঠিক করা হলো আমার ১৯৭১ উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে শোনানোর জন্য। সম্ভবত আমার পড়ার উপর ওদের আস্থা নেই। উপন্যাসটির অনুবাদ করেছেন ঢাকা কলেজের ইংরেজি ভাষার অধ্যাপিকা রহিমা খাতুন। খুব সুন্দর অনুবাদ। পাঠও খুব চমৎকার হলো। এত ভালো হবে আমি নিজেও ভাবি নি। আমি অবশ্যি সবসময়ই নিজের লেখার ভক্ত। আজ যেন আরও ভালো লাগছে।

সিকাট তার একটি এক অঙ্কের নাটক অভিনয় করে দেখালেন। একটিই চরিত্র। কুড়ি মিনিটের অভিনয়। মূল নাটক টেগালোগ ভাষায় লেখা। অভিনীত হলো ইংরেজি ভাষায়। সবাই খুব আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে দেখলেন। পলিটিক্যাল নাটক। লেখা হয়েছে মার্কোসের সময়কে বিদ্রূপ করে।

সিকাট অভিনয় শেষে মার্কোসের আমলের নৃশংসতার একটি গল্পও বললেন। ফিলিপাইনে একবার একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হবে। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা। মার্কোস হুকুম দিলেন, নতুন একটি ভবন তৈরি করতে হবে এবং তা করতে হবে এক মাসের মধ্যে। ভবন তৈরি শুরু হলো। দিনরাত কাজ হচ্ছে। এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ছাদ ধসে পড়ল। পঞ্চাশ জনের মতো শ্রমিক আটকা পড়ে গেল। বেশিরভাগই মারা গেল, তবে কিছু আহত হয়েও ভেতরে রইল। ওদের উদ্ধার করতে হলে আরও দিন সাতেক লাগবে। অথচ হাতে সময় নেই। মার্কোস হুকুম দিলেন, উদ্ধারের দরকার নেই। যথাসময়ে কাজ শেষ হওয়া চাই। হলোও তা-ই।

শিউরে উঠতে হয় গল্প শুনে। আমরা কোথায় আছি ? কোন জগতে বাস করছি ? এই কি আমাদের সভ্যতা ? আমরা মধ্যযুগীয় নৃশংসতার কথা বলি, এই যুগের নৃশংসতা কি মধ্যযুগের চেয়ে কিছু কম ? মনে তো হয় না।

পার্টি পুরোদমে চলছে। বার্বিকিউ হচ্ছে, বিয়ার খাওয়া হচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশের লেখকই কি পানীয়ের প্রতি বিশেষ মমতা পোষণ করেন ? অবস্থাদৃষ্টে তা-ই মনে হচ্ছে। ব্রাজিলের লেখক রেইমুণ্ড ক্যারেরো পুরো মাতাল হয়ে পড়েছেন বলে মনে হলো। আবোলতাবোল বকছেন এবং লাফালাফি করছেন। খানিকক্ষণ পর পর আমার দিকে তাকিয়ে হুংকার দিচ্ছেন, Bangladesh! Bangladesh! প্যালেস্টাইনের মহিলা কবিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। সেই বেচারির পুরো ব্যাপারটি হেসে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া কিছু করার রইল না। অন্য মহিলারাও খানিকটা শঙ্কিত বোধ করছেন।

ভারতীয় কবি গগন গিল আমার কাছে এগিয়ে এসে শুকনো গলায় বললেন, হুমায়ূন, খুব বিপদে পড়েছি।

কী বিপদ ?

ওই চেক কবি আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে। কী করব বুঝতে পারছি না।

কী ঝামেলায় ফেলেছে ?

ও বলছে, তোমার ড্রেস অসম্ভব সুন্দর। আমাকে তুমি এরকম একটা ড্রেস পরিয়ে দাও। ওই ড্রেস পরে আমি পরবর্তী পার্টিতে যাব। আমি তাকে বলেছি, এই ড্রেসটার নাম শাড়ি, এটা মেয়েদের পোশাক। তুমি পুরুষমানুষ। তোমার জন্যে নয়। সে মানছে না। সে বলছে, তোমরা মেয়েরা তো আমাদের শার্ট-প্যান্ট পরছ। আমরা তোমাদের একটা ড্রেস পরলে অসুবিধা কী ? তা ছাড়া পুরুষ-মেয়ের কোনো ভেদাভেদ আমার কাছে নেই।

এই অবস্থা হলে ওকে একটা শাড়ি পরিয়ে ছেড়ে দাও। প্রচুর ছবি তুলে দেশে নিয়ে যাও। ছবি দেখে সবাই মজা পাবে।

তুমি কি সত্যি তা-ই করতে বলছ ?

হ্যাঁ বলছি।

আমি নিজে কখনো মনে করি না একজন লেখক অন্য দশজনের চেয়ে আলাদা কিছু। কোনো লেখকই হয়তো তা মনে করেন না। তবে নিজেদের খানিকটা আলাদা করে দেখানোর ইচ্ছা তাদের থাকে না—তাও বোধহয় সত্যি না। সচেতনভাবে না হলেও অবচেতন একটি বাসনা বোধহয় থেকেই যায়। নিজেকে আলাদা করে দেখানোর এই প্রবণতাটি প্রকাশ পায় লম্বা চুলে, লম্বা দাড়িতে কিংবা বিচিত্র পোশাক-আশাকে। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাধর মানুষকেও আলখাল্লা বানিয়ে পরতে হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে আর্জেন্টিনার লেখক এনরিখে বুটির কথা বলি। চমৎকার মানুষ। মাথাভর্তি ঘনকালো চুল। হঠাৎ এক সকালে দেখি পুরো মাথা কামিয়ে বসে আছেন। কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতেই বললেন, কিছু করার ছিল না। ঘরে বসে বোর হচ্ছিলাম। কাজেই মাথাটা কামিয়ে ফেললাম।

দেখলাম তিনি মাথা পেতে বসে আছেন, অন্য লেখকরা কামানো মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন। এনরিখে বুটি বিমলানন্দে হাসছেন। পুরা ব্যাপারটায় মনে হলো তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

রাতে মে ফ্লাওয়ারের হলঘরে আমার লেখা ধারাবাহিক টিভি নাটক 'অয়োময়'-এর একটি পর্ব (চতুর্থ পর্ব, এক পাগলকে নৌকায় করে গ্রামের বাইরে ফেলে দিয়ে আসা হয়) দেখানো হলো। প্রজেকশন টিভির মাধ্যমে বড় পর্দায় সিনেমার মতো করে দেখা। সাবটাইটেল নেই, কাহিনি বোঝা খুব মুশকিল। অবশ্যি এটা বক্তৃতা ও লিখিতভাবে কী হচ্ছে না হচ্ছে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে, তবু মনে হলো অধিকাংশ দর্শক বেশ কনফিউজড। অনেকেই দুটি বউ নিয়ে অবাক। দু'জন বউ কী করে থাকে ? পাগলকে চিকিৎসা না করে গ্রামের বাইরে ফেলে দিয়ে আসার ব্যাপার কি সত্যি ঘটে ?

কিছু আমেরিকান ছাত্র—যারা লেখক নয়, তবে ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ের ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স নিচ্ছে কী করে লেখক হওয়া যায়—তারা অযোময়ে মির্জার দুই বউ নিয়ে আমাকে কঠিন আক্রমণ করল। তাদের ধারণা, এটা এসেছে মুসলিম কালচার থেকে। ইসলাম ধর্মে চার বিয়ের বিধান—কাজেই এই ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ে বহু বিবাহ ঢুকে পড়েছে। উঠে এসেছে তাদের সাহিত্যে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম, আমার তো মনে হয় প্রকৃতিই বহু বিবাহ সমর্থন করে। তাকিয়ে দেখো জীবজগতের দিকে—একটি পুরুষ নেকড়ে অনেক ক'টি মেয়ে নেকড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বন্য মহিষ, বাইসন, সিংহ, শেয়াল, সবার বেলায় এই নিয়ম। মানুষ তো এক অর্থে পশু, তার বেলাতেই হবে না কেন ? প্রকৃতি এটা চায় বলেই মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি। কূটতর্কে হারিয়ে দিলাম ঠিকই, কিন্তু আমি তো জানি তর্কে ফাঁক আছে। জীবজগতে অনেক প্রাণী আছে যাদের বেলায় উল্টো নিয়ম—একটি মেয়ে প্রাণীর পেছনে থাকে একঝাঁক পুরুষ। যেমন, রানি মৌমাছি।

তর্কে জেতার আনন্দ আছে, তবু মনটা একটু খারাপ হলো। কারণ অয়োময়ে বহু বিবাহকে সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থিত করা হয়েছে। তার জটিলতাকে তুলে ধরা হয় নি। এই নাটক দেখলে যে কোনো পুরুষ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতে পারেন—দুটি বউ থাকা তো মন্দ না!

একজন আধুনিক মানুষ হিসেবে এই জাতীয় ধারণাকে আমি অবশ্যই প্রশ্রয় দিতে পারি না।

৮

আমেরিকানরা খুব জরিপের ভক্ত।

সবকিছুরই জরিপ হয়ে যাচ্ছে। জরিপ চালাচ্ছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। টাকার বিনিময়ে তারা জরিপ করে দেবে। হেন বিষয় নেই যার উপরে তারা জরিপ করে নি। প্রেসিডেন্ট বুশ এই কাজটি করেছেন, এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ল না কমল ? কতটুকু বাড়ল বা কতটুকু কমল ? হয়ে গেল জরিপ। কিছু মজার জরিপের উদাহরণ দিচ্ছি।

(ক) শতকরা ৪ ভাগ আমেরিকান মহিলা প্যান্টি পরে না।[১]

(খ) শতকরা ৪ ভাগ আমেরিকান মহিলার কোনো ব্রা নেই।[২]

(গ) শতকরা ৫ ভাগ আমেরিকান রাতে একা বাড়িতে থাকতে ভয় পায়।[৩]

(ঘ) শতকরা ৬ ভাগ আমেরিকান মহিলা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘুমুতে যান।[৪]

(ঙ) শতকরা ১৬ ভাগ আমেরিকান মনে করে ফুসফুস হচ্ছে পরিপাক যন্ত্র।[৫]

(চ) শতকরা ২৫ ভাগ আমেবিকান মনে করে সূর্য হচ্ছে একটি গ্রহ।[৬]

(ছ) শতকরা ৮৩ ভাগ আমেরিকান মনে করে বাচ্চাদের শক্ত মার দিয়ে মাঝে মাঝে শাসন করা উচিত।[৭]

সবার ধারণা আমেরিকানরা খুব বকবক করে। এই ধারণা হয়েছে আমেরিকান ট্যুরিস্টদের দেখে। ট্যুরিস্টরা সত্যি সত্যি বকবক করে। এরা বাড়ি থেকে বের হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে 'ফান' করার জন্যে। এই বকবকানি সম্ভবত ফানের অংশ। ওদের নিজ ভূমিতে ওরা মুখবন্ধ জাতি। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়। অপ্রয়োজনে কোনো কথা বলবে না। বেশিরভাগ কথাবার্তাই 'আজকের আবহাওয়া অসাধারণ'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তর্ক করতে এরা তেমন পছন্দ করে না। কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার সময় হঠাৎ যদি ওরা কথা বন্ধ করে দেয় তাহলে বুঝতে হবে ওরা এই মত সমর্থন করছে না।

ওরা নিতান্ত আপনজনের কাছেও খুলে কিছু বলে না বলেই আমার ধারণা। একা একা থাকতে হবে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ করতে হবে। যৌথ বলে কিছু নেই। ব্যক্তিসত্তা নামক সোনার হরিণ খুঁজতে খুঁজতে একসময় ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার শিকার এদের হতে

১,২ এই দু'টি জরিপ করেছেন Fair Child সংস্থা। 'The Customer Speaks About Her Weardrobe', Fair Child Publication, 1978

৩ Public Opinion, February-March, 1986

৪ The Harper Index, 1987

৫ A Nantional Survey of Public Perceptions of Digestive Health and Diseaes. National Digestive Disease Education Program, 1984

৬ Contemporary Cosmological Beliefs Social Studies of scieva, 1987

৭ General Social Surveys, 1972-1987, University of Chicago.

হয়। দেখা দেয় মানসিক সমস্যা। ছুটে যায় কাউন্সিলরদের কাছে। কাউন্সিলর হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্ট। কাউন্সিলর কী করেন ? তেমন কিছুই করেন না। মন দিয়ে রোগীর কথা শোনেন এবং মোটা অংকের টাকা নেন। এতেই রোগীর রোগ সেরে যায়। কথা বলতে হয় টাকা দিয়ে। সাইকিয়াট্রিস্টদের ব্যবসা এই দেশে রমরমা। যতই দিন যাচ্ছে ব্যবসা বাড়ছে। সবারই সমস্যা।

সমস্যা হবে নাইবা কেন ?

আমাদের গোপন কথা বা দুঃখের কথা বলার কত অসংখ্য মানুষ আছে। মা-বাবা আছেন, খালা-খালু আছেন, চাচা-চাচি আছেন। বন্ধুবান্ধব তো আছেই। ওদের তো এসব কিছু নেই। নিজের বাড়িতেই এদের শিকড় নেই, আর খালার বাড়ি!

আমাদের একটি টিনএজ ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে আমরা তেমন মাথা ঘামাই না। কারণ আমরা জানি সে কোথায় গেছে। মামার বাড়ি গেছে, আর যাবে কোথায়! আসুক ফিরে, তারপর ধোলাই দেওয়া হবে।

ধোলাই দেওয়া হয় না। কারণ ওই ছেলে বাড়িতে একা ফিরে না, বড় মামাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে। যাতে শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে।

ছেলের মামা গম্ভীর গলায় বলেন, ছেলেমানুষ একটা অপরাধ করে ফেলেছে, বাদ দিন দুলাভাই।

ছেলের বাবা হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, না না, এইসব বলবে না। এই হারামজাদাকে আজকে আমি খুন করে ফেলব। কত বড় সাহস, বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়!

আহা থাক না—ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ বলবে না, পনের বছরের ধাড়ি কুলাঙ্গার। বলতে বলতে বাবা রাগ সামলাতে না পেরে ছেলের গালে চড় বসিয়ে দিলেন। ছুটে এলেন ছেলের মা, ছুটে এল বোনেরা। ভাইকে আগলে ধরল। ইতিমধ্যে খবর পৌঁছে গেছে। আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী জড়ো হচ্ছে। বিরাট কেতলিতে চা বসানো হয়েছে। বাবাকে দেখা যাচ্ছে অসময়ে কোট গায়ে দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন।

মা বললেন, এই অবেলায় কোথায় যাচ্ছ ?

বাবা জবাব দিলেন না, কারণ তিনি যাচ্ছেন নিউমার্কেটে। পাবদা মাছ কিনতে। টমেটো দিয়ে পাবদা মাছ তাঁর ছেলের বড়ই পছন্দ।

এ ধরনের মানবিক দৃশ্য কি এখানে কল্পনা করা যায় ?

কখনোই না। এখানে অসংখ্য ছেলে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে যায়। ন'বছর দশ বছর বয়স—অভিমানী শিশু। যাবে কোথায় ? যাওয়ার জায়গা নেই। কোনো পার্কে, কোনো শপিং মলের কোনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে থাকে। পথচারীরা তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। জিজ্ঞেস করলেও লাভ নেই—ক্রন্দনরত শিশু অপরিচিত কাউকে কিছুই বলবে না। কারণ অতি অল্প বয়সেই তাকে শেখানো হয়েছে—Never talk to strangers. অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলবে না।

একসময় পুলিশ আসে। অভিমানী শিশুকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। বাড়িতে যে দৃশ্যের অবতারণা হয় তা নিশ্চয়ই খুব সুখের নয়। অথচ শিশুদের জন্য আইনকানুন খুবই কড়া। শিশুদের মারধর করলে চাইল্ড অ্যাবিউজ আইনে বাবা-মা'র জেল-জরিমানা দুইই হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে চাইল্ড অ্যাবিউজ মামলার একটি গল্প বলি। ঘটনার স্থান—ওয়াশিংটনের সিয়াটল। একটি ভারতীয় পরিবার। তাদের সর্বকনিষ্ঠ শিশুটি খাট থেকে পড়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তাররা প্লাস্টার করে দিলেন।

কিছুদিন পর আবার বাচ্চাটিকে হাসপাতালে আনা হলো—সে গরম পাতিলে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে। চিকিৎসা করে সুস্থ করা হলো।

কিছুদিন পর আবার সমস্যা। শিশুটি দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছে।

ডাক্তাররা চিকিৎসা করে পা ঠিক করলেন, কিন্তু বাচ্চাটিকে বাবা-মা'র কাছে ফেরত দিলেন না। বললেন, তোমরা শিশু মানুষ করার জন্য উপযুক্ত নও। একে পালক দিয়ে দেওয়া হবে।

ফোস্টার প্যারেন্টস (পালক বাবা-মা) একে মানুষ করবে। সরকার থেকে মামলা দায়ের করা হলো।

এখানে আমি প্রায়ই গাড়ি দেখি যার পেছনে স্টিকার—'তুমি কি তোমার শিশুকে আজ জড়িয়ে ধরেছ?'

এই স্টিকারের তেমন কিছু মানে আছে কি?

আমেরিকায় শিশু-জন্মহার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে।

বাবা-মা'রা শিশু মানুষ করার কঠিন দায়িত্বে যেতে চাচ্ছেন না। শিশু মানুষ হয় পরিবারে, সেই পরিবারই ভেঙে পড়ছে—কে নেবে শিশুর যন্ত্রণা? জীবনকে উপভোগ করতে হবে। আনন্দ খুঁজে বেড়াতে হবে। শিশু মানেই বন্ধন।

বিয়ে এখানকার তরুণ সমাজে খুব আকর্ষণীয় কিছু নয়। কারণ সেখানেও বন্ধন। একটি মাত্র তরুণীর সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে—কী ভয়ংকর! তারচেয়ে অনেক ভালো লিভিং টুগেদার। একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে পছন্দের তরুণ-তরুণীরা একত্রে বসবাস। যদি কোনো কারণে বনিবনা না হয় জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে সরে পড়ো দু'দিকে। সাধু ভাষায় বলা চলে—'গল্প ফুরাইল। মোকদ্দমা হইল ডিসমিস।' এখানে সবাই দ্রুত মামলা ডিসমিস করতে চায়। মামলা বাঁচিয়ে রাখতে চায় না।

৯

আজ হ্যালোইন।

হ্যালোইন এদের একটি চমৎকার উৎসব। উৎসবের উৎপত্তি কোথায় জানি না।

কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছি, কিছু বলতে পারে নি। আমেরিকানদের সাধারণ জ্ঞান সীমাবদ্ধ। খুবই সীমাবদ্ধ। হ্যালোইন ব্যাপারটি কী জিজ্ঞেস করামাত্র অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলে, ও—হ্যালোইন হচ্ছে ফান নাইট। খুব ফান হয়। বাচ্চারা নানারকম ভূতের মুখোশ পরে বের হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে, 'Treat or tricks'. তখন ওদের চকলেট-লজেন্স এইসব দিতে হয়। বাড়ি সাজাতে হয়—কুমড়ো দিয়ে।

এর সবই জানি। আমার প্রশ্ন ছিল, এই উৎসবটা শুরু হলো কীভাবে? হঠাৎ আমেরিকানদের কেন মনে হলো, ভূতপ্রেতের জন্য একটা রাত থাকবে? কেউ জানে না।

বইপত্র ঘেঁটে দেখলাম, অক্টোবরের ৩১ তারিখে সন্ধ্যায় এই দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এটি একটি ধর্মীয় উৎসব, All saint's day (All hallows)-র পূর্ব দিবস। সব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে রসিকতা করা আমেরিকানদের মজ্জাগত। এই দিনটিকে ওরা রসিকতার দিন করে নিয়েছে। সেই রঙ্গ-রসিকতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তার উদাহরণ দেওয়া যাক—হ্যালোইনের ফান পরিপূর্ণ করার জন্য নিউইয়র্কে প্রতিবছর কিছু দরিদ্র মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। কিছু বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়। এই হলো ফানের নমুনা।

আমাদের বাড়িতে বাচ্চাকাচ্চারা ভূত সেজে আসবে তা মনে হয় নি, তবু কিছু চকলেট কিনে রেখে দিলাম। যদি আসে?

না-আসারই কথা। বাড়ির উঠোনে কোনো কুমড়ো সাজানো নেই। এর মানে এই বাড়িতে এমন কেউ থাকে যে হ্যালোইন সম্পর্কে জানে না।

তবু দেখি দুটি ছোট ছোট বাচ্চা এসে উপস্থিত। একজন সেজেছে কচ্ছপ, অন্যজন ডাইনী বুড়ি। প্রত্যেকের হাতে চকলেট সংগ্রহের জন্য তিনটি ব্যাগ। ব্যাগের রঙ লাল, সাদা ও সবুজ। ওরা গম্ভীর মুখে বলল, Treat or tricks. আমি চকলেট দিলাম। ওরা দু'জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ছোটজন বলল, কোন রঙের ব্যাগে নিব, সাদাটায়? বড়জন বলল, না লালটায়। জিজ্ঞেস করে জানলাম—সবুজ রঙের ব্যাগে ওরা নেয় পরিচিত মানুষদের দেওয়া চকলেট, যাদের খুব ভালো করে চেনে। যাদের অল্প চেনে তাদের চকলেট সাদা রঙের ব্যাগে। যারা একেবারেই অপরিচিত তাদেরগুলি থাকবে লাল রঙের ব্যাগে। এই ব্যাগের চকলেট খাওয়া যাবে না। বাবা-মা'রা প্রথমে পরীক্ষা করে দেখবেন। পরীক্ষার পর যদি বলেন, খাও—তাহলেই খাওয়া। অধিকাংশ সময়ই খেতে দেন না। ডাস্টবিনে উপুড় করে ফেলে দেন।

এই সাবধানতার কারণ—আমেরিকায় হলো বিচিত্র ও ভয়ংকর মানসিকতার লোকজনদের বাস। সাধারণ মানুষদের মধ্যে লুকিয়ে আছে পিশাচশ্রেণীর কিছু মানুষ। পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে ভাবছেন, পিশাচশ্রেণীব লোকজন শুধু আমেরিকায় থাকবে কেন ? সব দেশেই আছে। তয়াবহ ক্রাইম তো বাংলাদেশেও হয়। ওই তো 'বিরজাবালা' পরিবারকে হত্যা করা হলো। যে মানুষটি করল সে কি পিশাচ নয় ?

অবশ্যই পিশাচ।

তবে এখানে যেসব কাণ্ডকারখানা হয় তা সবরকম ব্যাখ্যার অতীত। পিশাচরাও এতে লজ্জা পেয়ে যায়।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে ঘটে গেছে এমন একটি ঘটনা বলি। ৯১১ নম্বরে একটি টেলিফোন এল। এটি পুলিশের নম্বর। এই নম্বরে টেলিফোন পেলেই পুলিশ সচকিত হয়ে ওঠে। এক ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে টেলিফোন করেছেন। তার শিশু বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দোলনায় ঘুমুচ্ছিল—হঠাৎ দেখা গেল সে নেই।

পুলিশ বলল, তোমার স্ত্রী কোথায় ?

এইখানেই আছে।

তোমরা কি সারাক্ষণ ঘরেই ছিলে ?

হ্যাঁ, ঘরেই ছিলাম। আমি টিভিতে বেইসবল দেখছিলাম। আমার স্ত্রী রান্নাঘরে রান্না করছিল। একসময় শোবার ঘরে গিয়ে দেখে বাচ্চা নেই।

ঘরে আর কেউ ছিল না ?

না। তবে...

তবে কী ?

আমাদের একটা বিশাল জার্মান শেফার্ড কুকুর আছে। আমার ধারণা...

থামলে কেন! বলো...

আমার ধারণা কুকুরটা বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলেছে।

কী বলছ তুমি ?

পুলিশ তৎক্ষণাৎ ছুটে এল। এক্সরে করে দেখা গেল, সত্যিই কুকুরটির পেটে বাচ্চাটির হাড়গোড় দেখা যাচ্ছে। কুকুরকে মেরে তার পেট কেটে হাড়গোড় বের করা হলো। সেইসব পাঠানো হলো পোস্ট মর্টেমের জন্য।

পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টে বলা হলো—হ্যাঁ, কুকুর বাচ্চাটিকে খেয়ে ফেলেছে। তবে কামড়ে কামড়ে খায় নি। বাচ্চাটিকে ধারালো ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে কুকুরটিকে খাওয়ানো হয়েছে।

বাচ্চাটির বাবা তখন অপরাধ স্বীকার করল।

সে বলল, বাচ্চাটি কেঁদে কেঁদে খুব বিরক্ত করছিল। কাজেই সে রাগ করে আছাড় দিয়েছে। এতে বাচ্চাটি মরে গেছে। তখন পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে কুচি কুচি করে কেটে কুকুর দিয়ে খাইয়ে ফেলেছে।

বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকা, এমন মানুষ কি আছে আমাদের দেশে ?

আরও একটি ঘটনা বলি, এটিও নিউইয়র্কের। একত্রিশ বছর বয়েসী একটি মেয়ে। বাবার সঙ্গে থাকে। কী কারণে বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া হলো। বাবা তাকে খুন করে ফেলল। এখানেই ঘটনার শেষ না—ঘটনার শুরু। খুন করার পর সে তার মেয়েকে কেটেকুটে রান্না করে ফেলল। পুলিশ যখন তাকে এসে ধরল তখন সে রান্না করা মেয়েকে খেয়ে প্রায় শেষ করে এনেছে।

এইসব ভয়ঙ্কর অপরাধীর বিচার কি এদেশে হয় না ? অবশ্যই হয়। তবে মৃত্যুদণ্ড প্রায় কখনোই হয় না। সভ্যদেশে মৃত্যুদণ্ড অমানবিক। আমেরিকার অল্প কিছু স্টেট ছাড়া সব স্টেটেই মৃত্যুদণ্ড নেই। সাধারণত জেল হয়। বেশিদিন জেল খাটতেও হয় না। পাঁচ বছর জেল খাটার পর প্যারোলে মুক্তি।

খুনিরা প্যারোলে মুক্তি পেয়ে জেলের বাইরে এসেই আবার খুন করে। ভয়ংকর সব খুনি এই দেশে প্রায় 'ন্যাশনাল হিরো'। একজন খুনি তের কি চৌদ্দটা মেয়েকে খুন করে নিজের বাড়ির বেইসমেন্টে পুঁতে রেখেছিল। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ামাত্র হইচই শুরু হয়ে গেল। নাগরিকরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল বের করল। বর্বর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলবে না। মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল করো।—ইত্যাদি। একটি সুন্দরী মেয়ে এই খুনির প্রেমে পড়ে গেল। তাদের বিয়েও হয়ে গেল। ন্যাশনাল টিভি খুনির নানান ধরনের ইন্টারভিউ প্রচার করল। কী বলব এদের ?

এরাই যখন আমাদের দেশ নিয়ে নাক সিঁটকে কথা বলে তখন রাগে গা জ্বলে যায়। জনি কার্সন বলে এক লোক আছে। গভীর রাতে সে টিভিতে 'টক শো' দেয়। অর্থাৎ মজার মজার কথা বলে লোক হাসায়। খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এই ব্যাটা বদমাশ প্রায়ই বাংলাদেশ নিয়ে রসিকতা করে। এনবিসি টিভিতে একটা রসিকতা করল। আবর্জনা ফেলা নিয়ে রসিকতা। আবর্জনা বোঝাই একটা জাহাজ তখন দু'মাস ধরে সমুদ্রে ঘুরছে। কোনো দেশ সেই জাহাজ বোঝাই আবর্জনা রাখতে রাজি নয়। জনি কার্সন বলল, 'এটা নিয়ে সবাই চিন্তিত কেন ? আবর্জনা বাংলাদেশে ফেলে দিয়ে এলেই হয়। এরা খুব আগ্রহ করেই আবর্জনা রাখবে।'

রসিকতা শুনে 'টক শো'তে উপস্থিত আমেরিকানরা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। বড় মজার রসিকতা।

জনি কার্সন সাহেব, আপনি খুবই রসিক মানুষ, কিন্তু দয়া করে জেনে রাখুন—আমরা আমাদের বাচ্চাদের কেটে কুচি কুচি করে কুকুরকে খাইয়ে ফেলি না। আমাদের দেশে কোনো এইডস নেই। সমকামিতা ব্যাপারটি ভয়াবহ ব্যাধি হিসেবে আমাদের দেশে উপস্থিত হয় নি। আমরা অতি দরিদ্র, এ কথা সত্য। দু'বেলা খেতে পারি না, এও সত্য। অভাবের কারণে জাল-জুয়াচুরি কেউ কেউ করে, এও সত্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য, আমরা আমাদের আত্মাকে হারাই নি। আমরা দুঃখে-কষ্টে জীবনযাপন করি এবং এর মধ্যেই আত্মাকে অনুসন্ধান করি। খাঁচার ভেতর যে অচিন পাখি আসা-যাওয়া করে সেই পাখিটাকে বোঝার চেষ্টা করি। বিশ্বাস করুন কার্সন সাহেব, আমরা করি।

১০

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার এলেকসি। উনিশ-বিশ বছরের যুবক। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই বয়সে আমেরিকান যুবকরা দৈত্যের মতো বিশাল হয়। এলেকসি সে রকম নয়—শিশু শিশু চেহারা, রোগা-পাতলা। লক্ষ করলাম, তার বাঁ কানে দুল। বাঁ কান ফুটা করে দুল পরার ব্যাপারটি এই বয়েসী আরও অনেক যুবকের মধ্যে লক্ষ করেছি। নতুন কোনো ফ্যাশান কি ? ফ্যাশানের ব্যাপারটি সাধারণত মেয়েদের মধ্যেই লক্ষ করা যায়—এবার দেখি ছেলেদেরও ধরেছে। সব ফ্যাশানের 'শানে নজুল' আছে। বাঁ কানে দুল পরার ফ্যাশানের শানে নজুল কী ? কয়েকজন আমেরিকানকে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলতে পারল না। বলতে না-পারারই কথা। আমেরিকানদের জিজ্ঞেস করা আর গাছকে জিজ্ঞেস করা একই ব্যাপার। এরা কিছুই জানে না। জানার ব্যাপারে তেমন আগ্রহও নেই।

একজন বলল, কানে দুল পরা এসেছে মিডিলইস্ট থেকে। মিডিলইস্টের যাযাবররা কানে দুল পরে।

অন্য একজন বলল, খুব সম্ভব এটা এসেছে রকস্টারদের কাছ থেকে। কোনো একজন রকস্টার হয়তো কানে দুল পরে শো করেছিল, এই থেকে চালু হয়ে গেছে। তুমি তো জানোই, রকস্টার হচ্ছে আমেরিকান যুবকদের সবচেয়ে বড় আইডল।

তৃতীয় একজন গলার স্বর নিচে নামিয়ে বলল, ওরা হোমোসেকসুয়েল। বাঁ কানে দুল হচ্ছে ওদের চিহ্ন। এই দেখে একজন অন্যজনকে চেনে।

এদের কারও কথাই বিশ্বাস হলো না। সরাসরি এলেকসিকে জিজ্ঞেস করলাম। সে হাসিমুখে বলল, তোমার কি কানে দুল পরা পছন্দ নয় ? আমাকে কি ভালো দেখাচ্ছে না ?

খুবই ভালো দেখাচ্ছে। দুটি কানে পরলে আরও ভালো লাগত। একটি কানে পরায় সিমেট্রি নষ্ট হয়েছে।

দু' কানে পরা নিয়ম নয়।

নিয়মটা এসেছে কোত্থেকে ?

জানি না।

কথা এর বেশি এগুল না। কে জানে সমকামিতার সঙ্গে বাঁ কানে দুল পরার কোনো সম্পর্ক আছে কি না। থাকতেও পারে।

আমেরিকান সমাজের যে ক'টি ভয়াবহ সমস্যা আছে সমকামিতা তার একটি। এইডস নামক ভয়াবহ ব্যাধি যার ফসল।

পনের বছর আগে লাসভেগাসে লেবারেচি নামের একজন প্রবাদপুরুষের একটি শো দেখেছিলাম। ভদ্রলোক হাতের দশ আঙুলে দশটি হীরার আংটি পরে স্টেজে

এলেন। কোন আংটি কে তাকে উপহার দিয়েছেন তা বললেন। [একটি ইরানের শাহ, একটি ইংল্যান্ডে রানী...] তারপর নানান রসিকতার ফাঁকে ফাঁকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনালেন। দু'ঘণ্টার অনুষ্ঠান—দু'ঘণ্টা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন। অনুষ্ঠান শেষে তাঁকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেওয়া হলো। সমস্ত দর্শক দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেন। আমিও তাদের একজন।

এবার এসে শুনি প্রবাদপুরুষ লেবারেচি এইডসে মারা গেছেন। ভদ্রলোক ছিলেন সমকামী।

আমি থাকতে থাকতেই বিশ্ব এইডস দিবস উদ্‌যাপিত হলো। মিউজিয়ামের পেইন্টিং কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। ভাস্কর্য মুড়ে দেওয়া হলো কাপড়ে। কারণ এইডস নামক ভয়াবহ ব্যাধির প্রধান শিকার শিল্পী, গায়ক, কবি-সাহিত্যিকরা। সমকামিতার ব্যাপারটি নাকি তাদের মধ্যেই বেশি। ক্রিয়েটিভিটির সঙ্গে যৌন বিকারের কোনো যোগ কি সত্যি আছে?

এই বিষয় নিয়ে লিখতে ভালো লাগছে না। লেখার মতো চমৎকার কোনো বিষয়ও পাচ্ছি না। এখানকার প্রোগ্রামের একটি দিক হচ্ছে—আইওয়াতে যেসব লেখা হয়েছে তার অংশবিশেষ পাঠ। কিছুই লিখতে না-পারার কারণে পাঠ করার মতো কোনো অংশই আমার কাছে নেই। আমি সম্ভবত একমাত্র লেখক, যে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

বিকেলে জামাকাপড় পরে বের হলাম। পরিকল্পনা করে নিলাম উদ্দেশ্যহীন হাঁটা হাঁটব। পুরোপুরি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত থামব না। সঙ্গে ম্যাপ থাকবে যাতে হারিয়ে না যাই। ক্যামেরা সঙ্গে নিতে গিয়েও নিলাম না। ক্যামেরা থাকে ট্যুরিস্টদের হাতে। সুন্দর কোনো দৃশ্য দেখলেই চোখের সামনে ক্যামেরা তুলে ধরে। ছবি তোলামাত্রই তার কাছে দৃশ্যটির আবেদন শেষ হয়ে যায়। যার হাতে ক্যামেরা থাকে না সে জানে—এই অপূর্ব দৃশ্য সে ধরে রাখতে পারবে না। সে প্রাণ ভরে দেখার চেষ্টা করে। আমিও তা-ই করব। প্রাণ ভরে দেখব।

ঘণ্টাখানিক হাঁটার পর মনে হলো শহরের বাইরে চলে এসেছি। একটি বাড়ি থেকে অন্য একটি বাড়ির দূরত্ব খানিকটা বেড়েছে। গাছপালাও মনে হলো বেশি। আবহাওয়াও চমৎকার। শীত সহনীয়। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য ডোবার আগের মায়াবী আলো পড়েছে ম্যাপল গাছের পাতায়। আরও খানিকটা এগিয়েই অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে সেইন্ট জোসেফ সিমেটিয়ারি। খ্রিষ্টান কবরস্থান। বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে নির্জন কবরখানা। ছোট ছোট নামফলক। বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার কারণ হলো—প্রতিটি নামফলকের সঙ্গে একগুচ্ছ টাটকা ফুল। ফুলে ফুলে পুরো জায়গাটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কত রকমারি ফুল—গোলাপ, টিউলিপ, কসমস, চন্দ্রমল্লিকা, মেরি গোল্ড। দিন শেষের আলো ফুলগুলিকে শেষবারের মতো ছুঁয়ে যাচ্ছে। এমন সুন্দর দৃশ্য অনেক দিন দেখি নি। হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হলো। আজ আর অন্য কিছু দেখার প্রয়োজন নেই। কিছু সময় কাটিয়ে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছে না।

ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল।

বাড়ির সামনে কালো কোট গায়ে কে যেন দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু কেন জানি চেনা চেনা লাগছে। আমি আরও কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ছায়ামূর্তি কোমল গলায় বলল, কেমন আছ?

এ-কি কাণ্ড! গুলতেকিন দাঁড়িয়ে আছে।

এটা কি স্বপ্ন? চোখের ভুল? কোনো বড় ধরনের ভ্রান্তি!

কী, কথা বলছ না কেন? কেমন আছ?

তুমি এইখানে কীভাবে?

আগে বলো, তুমি কি আমাকে দেখে খুশি হয়েছ?

ব্যাপারটা সত্যি না স্বপ্ন এখনো বুঝতে পারছি না।

অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। শীতে জমে যাচ্ছি। দরজা খোলো। কোথায় গিয়েছিলে?

আমি জীবনে অনেকবার বড় ধরনের বিস্ময়কর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি—কিন্তু এ ধরনের বিস্ময়ের মোকাবিলা করি নি। আমি তৃতীয়বারের মতো বললাম, এখানে কী করে এলে?

জানা গেল, সে আমাকে অবাক করে দেওয়ার জন্যে এই কাণ্ড করেছে এবং তার জন্যে তাকে খুব বেগ পেতে হয় নি। আমেরিকায় আসবার জন্য ভিসা চাইতেই ভিসা পেয়েছে। তার নিজস্ব কিছু ফিক্সড ডিপোজিট ছিল, সব ভাঙিয়ে টিকিট কেটে চলে এসেছে। কে বলে মেয়েরা 'অবলা'?

বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে অনেক সময় লাগল। গুলতেকিনকে অপরিচিত তরুণীর মতো লাগছে। তার হাত ধরতেও সংকোচ লাগছে। মনে হচ্ছে হাত ধরলেই সে কঠিন গলায় বলবে, এ-কি, আপনি আমার হাত ধরছেন কেন?

বাচ্চারা কেমন আছে গুলতেকিন?

ভালোই আছে। তুমি কেমন আছ?

ভালো।

তুমি চিঠিতে লিখেছিলে, বিশাল দোতলা বাড়িতে থাকি—এই বুঝি তোমার বিশাল দোতলা বাড়ি?

তোমার কাছে বিশাল মনে হচ্ছে না?

হ্যাঁ বিশাল। তবে তোমার চিঠি পড়ে আমি অন্যরকম কল্পনা করে রেখেছিলাম। তুমি লিখেছিলে তোমার সঙ্গে ফিলিপাইনের এক ঔপন্যাসিক থাকেন। উনি কোথায়?

উনি দু'দিনের জন্যে আমানা কলোনিতে গেছেন। চলে আসবেন। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করো। আমি রান্না করছি।

তুমি রান্না করবে?

হ্যাঁ, তুমি এখন আমার অতিথি।

ভাত, গোশত ও ডাল রান্না করলাম। ভাত গলে গিয়ে জাউয়ের মতো হয়ে গেল। গোশত পুরোপুরি সিদ্ধ হলো না। ডালে লবণ বেশি হয়ে গেল। তাতে কী ? সময় ও পরিস্থিতিতে অখাদ্য খাবারও অমৃতের মতো লাগে। আমি হাই ভি স্টোর থেকে এক প্যাকেট আইসক্রিম ও দুটো মোমবাতি কিনে নিয়ে এলাম। হোক একটা ক্যান্ডল লাইট ডিনার।

খেতে কেমন হয়েছে গুলতেকিন ?

চমৎকার।

আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললাম, আচ্ছা গুলতেকিন, আমাকে কি তোমার এই মুহূর্তে অপরিচিত কোনো যুবকের মতো লাগছে ?

গুলতেকিন বলল, অপরিচিত যুবকের মতো লাগবে কেন ? তুমি মাঝে মাঝে কী সব অদ্ভুত কথা যে বলো!

গুলতেকিনকে ঘুরে ঘুরে দেখাব এমন কিছু আইওয়াতে নেই। বড় বড় শপিং মল অবশ্যি আছে, সেসব তো আমেরিকার সব স্টেটেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কয়েকটি চমৎকার মিউজিয়াম আছে। সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে না। দেশের বাইরে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি।

কিছু দেখার নেই বলে ঘরে চুপচাপ বসে থাকার অর্থ হয় না। পরদিন তাকে নিয়ে বের হলাম। সে বলল, আমরা কী দেখতে যাচ্ছি ?

সেইন্ট জোসেফ সিমেটিয়ারি।

কবরখানা ?

হ্যাঁ, কবরখানা।

তের হাজার মাইল দূর থেকে কবরখানা দেখতে এসেছি ?

চলো না। তোমার ভালো লাগবে।

তোমার রুচির কোনো আগামাথা আমি এখনো বুঝতে পারলাম না। আশ্চর্য!

চলো আগে যাই, তারপর যা বলবে শুনব। আমার ধারণা তোমার ভালো লাগবেই।

তার ভালো লাগল। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, দেখো দেখো, প্রতিটি কবরের সামনে ফুলের গুচ্ছ। এরা কি রোজ এসে ফুল দিয়ে যায় ?

যায় নিশ্চয়ই। নয়তো ফুল আসবে কোত্থেকে ? কিংবা হয়তো কোনো ফুলের দোকানকে বলে দিয়েছে, তারা প্রতিদিন ফুল দিয়ে যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই খুব খরচান্ত ব্যাপার। রোজ একগুচ্ছ ফুল।

গুলতেকিনের এই কথায় খটকা লাগল। তাই তো, এমন খরচান্ত ব্যাপারে এরা যাবে ? মৃতদের প্রতি তাদের কি এতই মমতা ? বাবা-মা বুড়ো হলে যারা তাদের ফেলে দিয়ে আসে ওল্ড হোমে...। আমি এগিয়ে গেলাম এবং গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করলাম,

সবই প্লাস্টিকের ফুল। খুবই সুন্দর—আসল-নকলে কোনো ভেদ নেই, কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরি। একবার এসে রেখে গেছে, বছরের পর বছর অবিকৃত আছে। মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই চমৎকার ফুলে ফুলে সাজানো কবরখানা আসলে মেকি ভালোবাসায় ভরা। এরা যখন কোনো মেয়ের সঙ্গে ডেট করতে যায় তখন হাতে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে যায়। সেই ফুল আসল ফুল। প্লাস্টিকের ফুল নয়। কিন্তু মৃতদেহের বেলায় কেন প্লাস্টিকের ফুল ? আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

১১

পনের দিনের একটি ট্যুর প্রোগ্রামের শেষে লেখক সম্মেলনের ইতি। ট্যুর প্রোগ্রামটি চমৎকার। এই পনেরো দিনে লেখকরা যে যেখানে যেতে চান সেই ব্যবস্থা আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিস করবে। টিকিট কেটে দেবে, আগেভাগে হোটেলের ব্যবস্থা করে রাখবে। মোটামুটি রাজকীয় ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

আমি যেসব জায়গায় যেতে চেয়েছি সেগুলি হচ্ছে সানফ্রান্সিসকো, নিউ অর্লিন্স ও নিউইয়র্ক। সানফ্রান্সিসকো পছন্দ করার কারণ ঔপন্যাসিক স্টেইনবেক সানফ্রান্সিসকোর মানুষ। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের পটভূমি সেলিনাস ভ্যালি। নিউ অর্লিন্স পছন্দ করার কারণ—সেখানকার ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার। ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে উইলিয়াম ফকনার প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করেন। ও' হেনরির লেখকজীবনও শুরু হয় এইখানে। টেনেসি উইলিয়মসের বিখ্যাত লেখা 'A street car named desire' লেখা হয় নিউ অর্লিন্সের ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারে। এই ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারেই আংকেল টমস কেবিন উপন্যাসটির অকসান হয়। কাজেই অতি বিখ্যাত এই জায়গাটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

মুশকিল হলো গুলতেকিনকে নিয়ে। তার টিকিট কাটতে হবে আমাকে। সেটা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হলো টিকিট পাওয়া নিয়ে। অনেক কষ্টে আইওয়া থেকে সানফ্রান্সিসকোর ট্রেনের টিকিট পাওয়া গেল। ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায়। আমেরিকানরা ট্রেনের ভক্ত নয়। সমস্যা হলো বিমানের টিকিট নিয়ে। তার জন্য বাকি টিকিট পাওয়া গেল না। ঠিক করলাম সে সানফ্রান্সিসকোয় পাঁচ দিন থেকে চলে যাবে নিউজার্সিতে, ওখানকার টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। সে সেখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি আমার প্রোগ্রাম শেষ করে তার সঙ্গে যোগ দেব এবং তাকে নিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে বেড়াতে যাব।

এই পরিকল্পনা তার যে খুব পছন্দ হলো তা না, কিন্তু এর বেশি তো কিছু করার নেই।

আমার ভ্রমণ-পরিকল্পনা শুধু তার না, অনেকেরই পছন্দ হলো না। যে-ই শুনে সে-ই বলে তুমি দু'হাজার মাইল রাস্তা যাবে ট্রেনে করে? তোমার কি মাথাটা খারাপ হলো? আমেরিকান ট্রেনের সেই রমরমা এখন নেই। অ্যামট্রেকের নাভিশ্বাস উঠেছে। দু'দিন দু'রাত ট্রেনে থেকে বিরক্তিতেই তুমি মারা যাবে। খুবই অব্যবস্থা।

সবার কথা শুনে শুনে আমারও ধারণা হলো, ভুলই বুঝি করলাম। দু'দিন দু'রাত ট্রেনে কাটানো সহজ কথা না। অথচ শুরুতে ভেবেছি চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাব। ট্রেনের কামরা থেকে আমেরিকার একটা বড় অংশ দেখা হয়ে যাবে। গুলতেকিন বলল, আমেরিকান ট্রেনের জানালা খোলা যায়?

আমি বললাম, মনে হয় না। শীতের সময় জানালা খুলবে কীভাবে?

তাহলে আমরা শুধু শুধু ট্রেনে যাচ্ছি কেন? বন্ধ জানালার ভেতর দিয়ে কী দেখব? কাচের ভেতর দিয়ে কিছু দেখতে আমার ভালো লাগে না।

আমারও ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় নেই, টিকিট কাটা হয়ে গেছে।

দয়া করে স্বীকার করো যে, আবার একটা ভুল করেছ। তোমার কি উচিত না এইসব পরিকল্পনা করার আগে দশজনের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেওয়া?

খুবই উচিত।

যথাসময়ে আমরা ট্রেনে উঠলাম। গুলতেকিনের গম্ভীর মুখ ট্রেনে উঠেই পাল্টে গেল। সে পরপর তিন বার বলল, চমৎকার!

অ্যামট্রেক দোতলা ট্রেন। একতলায় টয়লেট, মালপত্র রাখার জায়গা। দো'তলায় বসার ব্যবস্থা। ট্রেনের দুটি বিশাল কামরা হলো অবজারভেশন ডেক। পুরো দেয়াল কাচের। ভেতরে রিভলবিং চেয়ার। এখানে বসে চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাওয়া যায়।

জোছনারাত। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। আমরা দু'জন অবজারভেশন ডেকে বসে আছি। প্রেইরি প্রান্তর ভেদ করে ট্রেন ছুটে চলেছে। তিনটি ইঞ্জিন ট্রেনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গুলতেকিন বলল, আমার মনে হচ্ছে এ জীবনে মনে রাখার মতো যা কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে—এই ট্রেনভ্রমণ হবে তার একটি।

আমি বললাম, আমারও তা-ই ধারণা।

সে লাজুক স্বরে বলল, আমি লক্ষ করেছি মাঝে মাঝে তুমি কোনোরকম চিন্তাভাবনা না করে একটা কাণ্ড করে বসো। যার ফল আবার কী করে কী করে যেন খুব ভালো হয়ে যায়। ভাগ্যিস তুমি কারও কথা না শুনে ট্রেনের টিকিট কেটেছিলে।

ট্রেন ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে। কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম রজনী নিঝুম। আমরা দু'জনে চুপচাপ বসে আছি। চোখের সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠের উপর ফিনিক ফোটা জোছনা।

ভোরবেলা দৃশ্যটাই বদলে গেল। ট্রেন ঢুকল রকি পবর্তমালায়। পাহাড় কেটে কেটে ট্রেন লাইন বসানো হয়েছে। কখনো ট্রেন ঢুকছে সুড়ঙ্গে, কখনো ট্রেন গভীর গিরিপর্বত পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। পাহাড়গুলিরইবা কী শোভা। মাথায় বরফের চাদর। পাহাড়ের শরীরে পাইন গাছের চাদর।

ট্রেন লাইনের পাশে পাশেই আছে পাহাড়ি কলারাডো নদী। সে দু' শ সত্তর মাইল আমাদের পাশে পাশে রইল। কী স্বচ্ছ তার পানি। ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়েছে তার গায়ে। পাহাড় ভেঙে নদী চলেছে আপন গতিতে। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, ইস যদি ওই পানি ছুঁয়ে দেখতে পারতাম!

মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। একটা লাল ইটের বাড়ি দেখলাম। ছবির বাড়িও এত সুন্দর থাকে না। আকাশের মেঘ ওই বাড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাড়ির উঠোনে কালো রঙের একটা ঘোড়া। লাল স্কার্ফ মাথায় জড়িয়ে বাচ্চা একটা মেয়ে দৌড়াচ্ছে। আহা তারা কী সুখেই না আছে! যদি এমন একটা বাড়ি আমার থাকত।

অন্ধকার গুহা থেকে বের হয়ে ট্রেন একবার চলে এল ফুলে ফুলে ভরা ভ্যালিতে—খুব পরিচিত ফুল, কাশফুল। চেনা ফুল অচেনা জায়গায়। কিছু নাম-না-জানা ফুলও আছে। কী ভালোই না লাগছে দেখতে!

I offen see flowers from a passing car
That are gone before I can tell what they are.
I want to get out of the tarin and go back
To see what they were beside the track...
Heaven gives its glimses only to those
Not in position to look too close

—Robert Frost

সানফ্রান্সিসকোতে আমাদের থাকার জায়গা ডাউনটাউনের বড় একটা হোটেলে। হোটেল বেডফোর্ড। চায়না টাউনের পাশে আকাশছোঁয়া বাড়ি। ঘুরে বেড়ানোয় গুলতেকিনের খুব আগ্রহ। সে ট্যুরিস্টদের কাগজপত্র ঘেঁটে নানান জায়গা বের করছে যা আমরা দেখব।

ফিশারম্যান ওয়ারফ
গোল্ডেন গেট
মুর উডস
নাপা ভ্যালি
ক্রুকেড স্ট্রিট

ফিশারম্যান ওয়ারফ প্রথম দেখতে গেলাম। আমেরিকান জেলেপল্লী। আহামরি কিছু নয়—বাংলাদেশের সদরঘাট। অসংখ্য ছোট ছোট মাছ ধরার বোট। খাবারের দোকান। এর বেশি কিছু না। ট্যুরিস্টরা মহানন্দে তা-ই দেখছে এবং পটাপট ছবি তুলছে। আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হওয়ার কিছুই পাচ্ছি না। অবশ্যি দুটি সিল মাছ কিছুক্ষণ পরপর মাথা তুলে বিকট শব্দ করছে। এই দৃশ্যটি খানিকটা আকৃষ্ট করল।

একটি ছবি তোলার পর সেই দৃশ্যের আবেদনও ফুরিয়ে গেল। আমি বললাম, গুলতেকিন, হোটেলে ফিরে গেলে কেমন হয়? সে অত্যন্ত আহত হলো বলে মনে হলো। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, হোটেলে ফিরে যাব মানে? হোটেলেই যদি বসে থাকবে তাহলে বেড়াতে আসার মানে কী?

আমি তো আর দেখার মতো কিছু পাচ্ছি না।

তুমি দেখার মতো কিছু পাচ্ছ না, তাহলে হাজার হাজার ট্যুরিস্ট কী দেখছে?

ট্যুরিস্টরা কী দেখছে সেও এক রহস্য। হাজার হাজার ট্যুরিস্ট ক্যামেরা কাঁধে মুগ্ধ চোখে ঘুরছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে, বিস্ময় ও আনন্দে তারা অভিভূত। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, আনন্দ পাওয়ার চমৎকার অভিনয় তারা কার জন্য করছে? নিজের জন্য? কেন করছে?

গুলতেকিনকে খুশি করার জন্য একটা ওয়াক্স মিউজিয়ামে ঢুকলাম। লন্ডনের মাদাম তুসোর ওয়াক্স মিউজিয়ামের নামডাক শুনেছি—দেখি এদেরটা কেমন। টিকিটের দাম ষোল ডলার। খুব খারাপ হওয়ার কথা না।

মাবুদে এলাহী, কিছুই নেই ভেতরে। ক্লিওপেট্রা নাম দিয়ে যে মূর্তি বানিয়ে রেখেছে তাকে দেখাচ্ছে ফর্সা বাঁদরের মতো। এক জায়গায় দেখলাম প্রেসিডেন্ট বুশকে বানিয়েছে, দেখাচ্ছে কঙ্কালের মতো। হাঁ করে আছে—মনে হচ্ছে কামড় দিতে আসছে।

আমি মিউজিয়ামের একজন কর্মকর্তাকে বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, এটা কি প্রেসিডেন্ট বুশের কঙ্কাল?

সে খুব আহত হলো বলে মনে হলো না। তার মানে আমার মতো আরও অনেকেই তাকে এই প্রশ্ন করেছে।

বিকেলে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে হোটেলে ফিরলাম। গুলতেকিন বলল, এখন কী করা যায়?

আমি বললাম, খানিকক্ষণ ঝগড়া করলে কেমন হয়?

তার মানে?

বাসায় বাচ্চারা থাকে, প্রাণখুলে ঝগড়া করা যায় না। এখানে চমৎকার নিরিবিলি। এসো দরজা বন্ধ করে প্রাণখুলে ঝগড়া করি।

পরদিন ভোরবেলা একজন এসকর্ট এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। বিদেশি অতিথিদের নিজের সঙ্গেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সানফ্রান্সিসকো দেখান। তাঁকে নাকি ওয়াশিংটন থেকে বলা হয়েছে আমাদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য। বেশ উৎসাহ নিয়েই আমরা তাঁর সঙ্গে বের হলাম। তিনি বিশাল গাড়ি নিয়ে এসেছেন। বেশ হাসিখুশি ধরনের মানুষ। সানফ্রান্সিসকোর নাড়িনক্ষত্র জানেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ করলাম, ভদ্রলোক কথা না বলে থাকতে পারেন না। অনর্গল কথা বলেন। গলার স্বরে কোনো ওঠানামা নেই। কথা বলার সময় অন্যরা কী ভাবছে কী বলছে কিছুই লক্ষ করেন না। প্রথম শ্রেণীর একজন রোবট। আমার মাথা ধরে গেল। এ-কি যন্ত্রণা!

সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার হলো, ভদ্রলোক এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন যেন আমি আফ্রিকার গহিন অরণ্য থেকে এই প্রথম শার্ট-প্যান্ট গায়ে দিয়ে সভ্য সমাজে এসেছি। আমি একফাঁকে গুলতেকিনকে বললাম, এই ব্যাটাকে তো আর সহ্য করা যাচ্ছে না, কী করা যায় বলো তো?

সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মাথার যন্ত্রণায় আমি মরে যাচ্ছি, কিছু একটা করো। আর পারছি না।

এই বিপদ থেকে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায় আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক এর মধ্যে কয়েক বারই বলেছেন, তিনি আমাদের নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরবেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকলে বিরক্তিতেই মৃত্যু হওয়া বিচিত্র না। মুক্তির সুযোগ ভদ্রলোক নিজেই করে দিলেন। একসময় বললেন, ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমি বি-ফিফটি টু বিমান চালাতাম। দু'বার আমাকে প্যারাসুট দিয়ে জাম্প করতে হয়েছিল। হোয়াট এন এক্সপেরিয়েন্স!

আমি বললাম, বি-ফিফটি টু বিমান। তার মানে বোমারু বিমান?

হ্যাঁ।

ভিয়েতনামে ভারী ভারী বোমার বেশ কিছু তাহলে তুমি ফেলেছ।

হ্যাঁ। এটা হচ্ছে পার্ট অব দি গেম।

তাহলে তো একটা সমস্যা হলো।

কী সমস্যা?

তুমি অনেক নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আর এদিকে আমি একজন অনুভূতিপ্রবণ লেখক। তোমার সঙ্গে থাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার মনের উপর চাপ পড়ছে। তুমি কি দয়া করে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে হোটেলে পৌঁছে দিবে?

ভদ্রলোক চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বললেন, তুমি হোটেলে ফিরে যেতে চাচ্ছ?

আমি সহজ গলায় বললাম, হ্যাঁ। আমাদের হোটেলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমার যদি অসুবিধা থাকে এখানেই নামিয়ে দাও। আমরা ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে যাব।

না, অসুবিধা নেই। চলো হোটেলে পৌঁছে দিচ্ছি।

গুলতেকিন বলল, তুমি এমন একটা কথা এ রকম কঠিনভাবে কী করে বললে?

আমি বললাম, আমেরিকানরা সরাসরি কথা বলা পছন্দ করে। ওরা যা বলার সরাসরি বলে। আমিও তা-ই বললাম।

সানফ্রান্সিসকো ঘুরে দেখার কাজ দু'জনে হাত ধরাধরি করে হেঁটে হেঁটেই সারলাম। খুব মজা লাগল চায়না টাউন দেখে। শহরের বিরাট একটা অংশ—সব চৈনিক। দোকানের সাইনবোর্ডগুলো পর্যন্ত চীনা ভাষায় লেখা। হাজার হাজার নাক চাপা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবস্থা অনেকটা আমাদের দেশের হাটের মতো। দরদাম হচ্ছে। যার দাম শুরুতে কুড়ি ডলার হাঁকা হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে সাত ডলারে। আমেরিকায় এই ব্যাপারটি অকল্পনীয়। দরদাম করার ব্যবস্থা আছে দেখে গুলতেকিন খুবই উৎসাহ পেয়ে গেল। তার এই উৎসাহের কারণে একগাদা অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমরা চায়না টাউন থেকে কিনে ফেললাম।

চায়না টাউনের এক অংশে আছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। ভেতরে কী হয় না-হয় জানি না, বাইরে কিছু সাইনবোর্ড থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। নমুনা দিচ্ছি—

> রোজিস প্লেস, অনিন্দ্যসুন্দরী নর্তকীরা নগ্নগায়ে নৃত্য করবে। উপস্থিত অতিথিদের সবার টেবিলের উপরও তারা নাচবে।

> মাত্র দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ নগ্ন তরুণীর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ। প্রতি মিনিট কথা বলার জন্যে এক ডলার পঞ্চাশ সেন্ট।

এই ব্যাপার আমেরিকার অনেক শহরে দেখেছি। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো বাধা-নিষেধ হয়তো নেই। ফ্রি কান্ট্রি, যার যা ইচ্ছে করতে পারে। যতদূর জানতাম নেভাদা স্টেট ছাড়া অন্য কোনো স্টেটে বেশ্যাবৃত্তি আইনসিদ্ধ নয়। সানফ্রান্সিসকোতে সন্ধ্যার পর পথে অনেক নিশিকন্যাকেই দেখা গেল। উগ্র প্রসাধন, তার চেয়ে উগ্র পোশাক। একেক জনের চেহারা এত সুন্দর যে ইচ্ছে করে কাছে গিয়ে আশা ও আনন্দের দু'একটা কথা বলি। ওদের বলি, পৃথিবীকে এই মুহূর্তে তাদের যত খারাপ লাগছে আসলে তত খারাপ নয়। এইসব নিশিকন্যাকে দেখলেই আমি নিজের ভেতর এক ধরনের বিষণ্নতা অনুভব করি। এই বিষণ্নতার জন্ম কোথায় আমি জানি না।

এই বিরাট শহরে প্রচুর গৃহহীন মানুষ দেখলাম। সাইনবোর্ড নিয়ে রাস্তায় মোড়ে মোড়ে বসে আছে—

'আমি গৃহহীন, আমাকে সাহায্য দাও।'

আমাদের দেশে দরিদ্র কৃষক যেমন ভূমিহীন হচ্ছে, এখানকার হতদরিদ্র আমেরিকানরা হচ্ছে গৃহহীন। একটি বাড়ি (নিজের বা ভাড়া) এ দেশে টিকিয়ে রাখা কষ্টকর। গত নভেম্বরে (১৯৯০) *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কথা বলি। নিউইয়র্কবাসী বৃদ্ধ এক আমেরিকানের স্বপ্নের কথা এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে। এই আমেরিকান বৃদ্ধ বয়সে সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে চার শ' সত্তর ডলার পান। চার শ' ডলার চলে যায় তাঁর এক রুমের কামরার ভাড়া বাবদ। সত্তর ডলারে বাকি মাস টেনে নিতে হয়। রাতে ও দুপুরে খাবারের জন্য একটা রেস্টুরেন্টে যান। রেস্টুরেন্টে খদ্দেরের উচ্ছিষ্ট খাবার তাঁকে দেওয়া হয়। সেই ব্যবস্থা করা আছে। কাজেই দু'বেলা খাবারের খরচ বেঁচে যায়। তাঁর একটা কফি মেশিন আছে। মাঝে মাঝে সেই কফি মেশিনে কফি বানিয়ে খান। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। তাদের অনেকেরই ছেলেপুলে আছে। কারও সঙ্গেই এই বৃদ্ধের যোগাযোগ নেই। কারণ যোগাযোগ থাকলেই বিভিন্ন উপলক্ষে গিফট পাঠাতে হবে। সেই সামর্থ্য তাঁর নেই। এই বৃদ্ধ তাঁর বর্তমান জীবন নিয়ে সুখী, কারণ তিনি গৃহহীন নন। একটা ছোট্টঘর তাঁর আছে। শীতের রাতে যে ঘরে তিনি আরাম করে ঘুমুতে পারেন। পার্কের বেঞ্চিতে বসে তাঁকে রাত কাটাতে হয় না। কাজেই তিনি ভাগ্যবান।

এক রাতে গুলতেকিনকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছি। গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান দেখলেই থামছি, যদি ভালো এলপি পাই কিনে নেব। পাচ্ছি না। এলপি উঠে গেছে, তার জায়গায় এসেছে সিডিপ্লেয়ার। এক দোকানে আমার পছন্দের কিছু ক্যাসেট পেলাম। কিংস্টোন ট্রায়োর 'Where have all the flowers gone...'। মন খারাপ করা গান। দু'জনে হাত ধরাধরি করে বাসায় ফিরছি। মনের ভেতরে গান বাজছে। শহরটা হয়ে গেছে অন্যরকম। এই রহস্যময় সময়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো—অত্যন্ত রূপবতী এক

তরুণী তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে রাস্তার পাশে বসে আছে। তাদের সামনে কাঠবোর্ডের একটি কাগজে লেখা—'আমি এবং আমার শিশুপুত্র গৃহহীন। আপনার থলেতে কি কিছু ভাঙতি পয়সা আছে?'

মেয়েটির বয়স খুব বেশি হলে আঠার-উনিশ। চোখ ধাঁধানো রূপ। তার ঘুমন্ত শিশুটিও মায়ের রূপের সবটুকু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। গুলতেকিন বিষণ্ন গলায় বলল, এ-কি! সে পাঁচ ডলারের একটি নোট নিয়ে পালিয়ে গেল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন রূপবতী একজনকে কেউ ভিক্ষা দিচ্ছে এই কষ্ট আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। কী দেখছি আজকের আমেরিকায়! 'Where have all the flowers gone...'

১২

সানফ্রান্সিসকো থাকার কাল শেষ হয়েছে, এখন যাচ্ছি নিউ অরলিন্স। গুলতেকিন আমার সঙ্গে যেতে পারছে না—তার টিকিট পাই নি। সে চলে যাবে নিউজার্সি। আমার জন্যে সেখানেই অপেক্ষা করবে। আমি নিউ অরলিন্সে এক সপ্তাহ কাটিয়ে চলে যাব তার কাছে।

আমি তাকে এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এলাম। খুবই খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে শেষ বিদায় দিতে এসেছি। আর দেখা হবে না। তার স্যুটকেস চেক ইন করে দিয়েছি—সে ঢুকবে সিকিউরিটি এলাকায়। খুব মন খারাপ করা মুহূর্ত। এই মুহূর্তে হঠাৎ আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে সে বলল, আমার এদেশের একটা জিনিস খুব ভালো লাগে। বিদায় মুহূর্তে এদের স্বামী-স্ত্রীরা কী সুন্দর শালীন ভঙ্গিতে চুমু খায়। তোমার কি এই দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে না?

আমি বললাম, হ্যাঁ ভালো লাগে।

আমার সবসময় মনের মধ্যে গোপন বাসনা ছিল—

গুলতেকিন তার কথা শেষ করল না। ক্লান্ত ভঙ্গিতে সিকিউরিটি এলাকায় ঢুকে গেল। আমি মন খারাপ করে নিউ অরলিন্স রওনা হলাম। মন খারাপ হলেই আমার শরীর খারাপ করে। প্লেনে ওঠার পরপর মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো। একসময় দেখি নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে।

নিউ অরলিন্সের ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের চমৎকার একটি হোটেলের তিনতলায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিলাম। একবারও ইচ্ছে করল না—শহরটা কেমন ঘুরে দেখি। ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার ব্যাপারটা কী? কী বিশেষত্ব এই জায়গার যে আমেরিকান সব প্রধান লেখকই তাদের জীবনের একটা বড় অংশ এখানে কাটিয়েছেন? কী আছে এখানে? হোটেলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের আনন্দ ও উল্লাসধ্বনি শুনি। পথে পথে হইচই হচ্ছে। জ্যাজ সঙ্গীত হচ্ছে। নাচ হচ্ছে। প্রতিটি কাফে সারা রাত খোলা। বার খোলা। মনে হয় এই পৃথিবীতে কোনো দুঃখ নেই।

আমি ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের মতো মজাদার জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি, এই খবর রটে গেল। আমার সঙ্গী লেখকরা সবসময় খোঁজখবর নিতে আসছেন। পঁয়তাল্লিশ জন লেখকের সবাই এখানে এসেছেন। তাঁরা এক ধরনের দায়িত্ব বোধ করেছেন—বাংলাদেশি ঔপন্যাসিকের কী হলো খোঁজ নেওয়া। খুবই বিরক্তিকর অবস্থা। অবশ্য তাঁদের কাছ থেকে কিছু মজার মজার খবরও পাচ্ছি। যেমন, ভারতীয় মহিলা কবি গগন গিল ডলার বাঁচানোর জন্য আলজেরীয় নাট্যকারের সঙ্গে একটা রুম শেয়ার করছেন। একজন অল্পবয়স্ক ভারতীয় মহিলা এরকম করবেন তা সহজভাবে গ্রহণ করতে একটু বোধহয় কষ্ট হয়। দেখলাম লেখকদের কেউ-ই ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারে নি।

পশ্চিম দেশিয় কোনো তরুণী শয্যাসঙ্গী হিসেবে অল্প পরিচিত কোনো পুরুষ গ্রহণ করতে হয়তো আপত্তি করবে না। কিন্তু রাতে ঘুমুবার জন্য একটি আলাদা ঘর চাইবে, প্রাইভেসি চাইবে। যাক এসব ক্ষুদ্রতা, অন্য কথা বলি। নিউ অরলিন্সের হোটেল বরবনে রাত্রিবাস আমার একেবারে বৃথা গেল না। মে ফ্লাওয়ার এখানেই লেখা শুরু করলাম। শারীরিক অসুস্থতা ভুলে থাকার এই একটি চমৎকার উপায়—লেখালেখিতে নিজেকে ব্যস্ত করে ফেলা। তা-ই করলাম। দরজা বন্ধ করে সারা দিন লেখার পর দেখি শরীরের ঘোর কেটে গেছে। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে।

রুমসার্ভিসকে কফি ও খবরের কাগজ দিতে বলেছি। সে *নিউইয়র্ক টাইমস* দিয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখি *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর শেষ পাতায় বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা খবর ছাপা হয়েছে। জনতার প্রবল দাবির মুখে প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করেছেন। বর্তমানে তাঁর পালকপুত্র ও পালক কন্যাসহ গৃহবন্দি আছেন।

বাংলাদেশে কী হচ্ছে না-হচ্ছে কিছুই জানতাম না। এই খবরে বিস্ময়ের সীমা রইল না। এত বড় একটা খবর, অথচ আমেরিকান পত্রিকায় এত ছোট করে ছাপা হয়েছে দেখেও খারাপ লাগল। ছাত্ররা এত ক্ষমতাবান একজন ডিক্টেটরকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ফেলেছে—এই ঘটনা চীনের তিয়েনমেন স্কয়ারের চেয়ে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ কত হেলাফেলার সঙ্গেই না খবরটি এরা ছাপাল। এরশাদের যে একজন পালক কন্যাও ছিল তা জানতাম না—নিউইয়র্ক টাইমসের কল্যাণে জানলাম। পালক পুত্রটির ছবি লক্ষ বার দেখেছি। পালক কন্যাকে কোনোদিন দেখি নি। এরশাদ নিশ্চয় বলে নি মেয়েটির ছবি ছাপা হোক, তাকে সবাই দেখুক।

কেন জানি ওই পালক কন্যাটিকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কেমন দেখতে ওই মেয়েটি ? কী তার নাম ?

১৩

নিউজার্সি শহরে আড়াই শ'র মতো বাঙালির বাস।

এই আড়াই শ'র একজন আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল। কাজ করে বেল ল্যাবরেটরিতে। নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। গবেষণার বিষয় ফাইবার অপটিকস বা এই ধরনের কিছু। তারচেয়ে বড় পরিচয়, সে বাংলা সাহিত্যের একজন লেখক এবং উঁচুমানের লেখক। তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি এবং শিশুদের জন্য লেখা গ্রন্থগুলি আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে পড়ি, মাঝে মাঝে খানিকটা ঈর্ষাও যে করি না তা না।

নিউ অরলিন্স থেকে সরাসরি তার বাসায় গিয়ে উঠলাম। তার দুই বাচ্চা নাবিল ও ইয়েসিম। দু'জনই এয়ারপোর্টে খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল—বড় চাচা আসবেন। তাদের ধারণা, বড় চাচা মানে সাইজে যিনি বড়। দু'জনই আমার আকৃতি দেখে মনঃক্ষুণ্ণ হলো। নাবিল নিখুঁত ইংরেজিতে বলল, তোমরা একে বড় চাচা কেন বলছ—He is small.

নাবিলের বয়স পাঁচ। ইংরেজি-বাংলা দুই-ই চমৎকার বলে। তার বোনের বয়স তিন, সে মিশ্র ভাষা ব্যবহার করে। উদাহরণ—'Give my জামা খুলি' অর্থাৎ আমার জামা খুলে দাও।

বাচ্চা দুটি একা একা থাকে। নিকট আত্মীয়স্বজনদের দেখা বড় একটা পায় না। আমাকে ও গুলতেকিনকে পেয়ে তাদের আনন্দের সীমা রইল না। তাদের আগ্রহ ও আনন্দের প্রধান কারণ, আমরা বাংলাদেশের। বাচ্চা দুটিকে তাদের বাবা-মা এমন এক ধারণা দিয়েছে যাতে তাদের কাছে বাংলাদেশ হচ্ছে স্বপ্নের দেশ। বাংলাদেশের মানুষ স্বপ্নের মানুষ। আমি তাদের সেই ধারণা উসকে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। ইয়েসিম যখন তার রান্নাবাটি খেলার কাগজের খাবার আমাকে এনে দিল আমি কপ কপ করে সেই কাগজ খেয়ে দুই ভাইবোনের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলাম।

ওদের বাবা-মা দেখি বাচ্চা দুটিকে খুবই আধুনিক নিয়মে বড় করার চেষ্টা করছে। বাবা-মা দু'জনই পিএইচডি ডিগ্রিধারী এবং দীর্ঘদিন আমেরিকা প্রবাসী হলে এই বোধহয় হয়। ঘরে বাচ্চাদের জন্য আইনকানুন লেখা। যেমন—

প্রথম আইন : কাঁদলে কোনো জিনিস পাওয়া যাবে না। কাজেই কেঁদে লাভ নেই।

দ্বিতীয় আইন : খেলনা কারও একার নয়। খেলনা শেয়ার করতেই হবে।

আমি ইকবালকে বললাম, তোর কায়দাকানুন তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনো একটা কিছু নিয়ে কেঁদে বাড়ি মাথায় না তুললে আর বাচ্চা কি! তোর নিয়মে তুই তো বাচ্চাদের বড় বানিয়ে ফেলেছিস।

সে হেসে বলল, অনেক ভেবেচিন্তে এটা করছি। এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট। তোমরা হঠাৎ দেখছ বলে অন্যরকম লাগছে।

তা-ই হয়তো হবে। তাদের এক্সপেরিমেন্টে আমি ও গুলতেকিন বাধা দিলাম না। তবে একবার বেশ খারাপ লাগল। এদের নিয়ে খেলনার দোকানে গিয়েছি—নাবিলের একটা খেলনা পছন্দ হলো। তার বাবা বলল, নাবিল তিন নম্বর আইনটি কী বলো তো ?

নাবিল গড়গড় করে বলল, মাসে একটির বেশি খেলনা পাওয়া যাবে না।

তুমি কি এই মাসে খেলনা পেয়েছ ?

হ্যাঁ।

তাহলে এটি চাচ্ছ কেন ?

আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

তিন নম্বর আইন কী বলে ? পছন্দ হলেই পাওয়া যাবে ?

না।

নাবিল ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

কাঁদলে লাভ হবে না ব্যাটা। এক নম্বর আইন কী বলে ?

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এক নম্বর আইন বলে—কাঁদলে কিছু পাওয়া যাবে না।

তাহলে কাঁদছ কেন ?

কান্না থামাতে পারছি না, তাই কাঁদছি।

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, বাংলাদেশের একটা কঠিন আইন আছে। সেই আইন বলে, বড় ভাইরা ইচ্ছা করলে ছোট ভাইদের আইন ভাঙতে পারে। সেই বাংলাদেশি বিশেষ আইনে তোমাদের প্রথম আইন ভঙ্গ করা হলো। এখন তোমাকে তোমার প্রিয় জিনিস কিনে দেওয়া হবে। এসো আমার সঙ্গে।

নাবিল আশা ও নিরাশা নিয়ে তাকাল তার বাবার দিকে। তার বাবা বলল, বাংলাদেশি বিশেষ আইনের উপরে তো আর কথা চলে না। যাও তোমার বড় চাচার সঙ্গে।

আমেরিকায় যা দেখে আমি সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছি তা হলো প্রবাসী বাঙালিদের ছেলেমেয়ে। তারা বড়ই নিঃসঙ্গ। হ্যাঁ, বাবা-মা তাদের আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, কিন্তু দু'কূল ভাসানো আদর কোথায় ? পরিষ্কার মনে আছে, আমার শৈশবের একটি বড় অংশ কেটেছে আত্মীয়স্বজনদের কোলে কোলে। আদরে মাখামাখি হয়ে। নানার বাড়ির কথা। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। মা'কে ডেকে তুলে বললাম, ঘুম আসছে না। কোলে করে মাঠে হাঁটলে ঘুম আসবে। মা বিরক্ত মুখে বললেন, কী যন্ত্রণা! দিব পাখা দিয়ে এক বাড়ি। খালারা চেঁচিয়ে উঠলেন—আহা আহা আহা। তিন মামা বের হয়ে এলেন কোলে নিয়ে মাঠে হাঁটার জন্যে। শুধু হাঁটলে হবে না। হাঁটতে হাঁটতে গল্প বলতে হবে। আকাশ ভরা ফকফকা জোছনা। মাঠভর্তি জোছনার ফুল। সেই শৈশব এরা কোথায় পাবে!

নিউজার্সির প্রবাসী বাঙালিদের ছেলেমেয়েদের অবস্থা অবশ্যি তত খারাপ নয়। এরা একসঙ্গে হেসে-খেলেই বড় হচ্ছে। বাংলা শেখার স্কুল আছে, নাচের স্কুল আছে। গানের স্কুল আছে। প্রবাসী বাঙালিদের বৃদ্ধ বাবা-মা দেশ থেকে নাতি-নাতনিদের দেখতে যাচ্ছেন। তিন মাস, তিন মাস করে থাকছেন।

প্রবাসী বাঙালিদের অভিমত হলো—প্রথম জেনারেশনেই শুধু প্রবাসে থাকার কষ্ট ভোগ করবে। দ্বিতীয় জেনারেশনে এরা শুধু যে বাবা-মা পাবে তা-ই না, খালা-খালু চাচা-চাচি সবই পেয়ে যাবে।

আমি তাদের যুক্তি মেনে নিলাম, অবশ্যি মনে মনে বললাম, সবই পাবে। শুধু পাবে না দেশ।

পরে ভেবে দেখলাম আমার এই কথাও তো ঠিক নয়। দেশ কেন পাবে না ? দেশ হবে আমেরিকা। তাতে ক্ষতি কী! আসলে আমরা কি বিশ্ব নাগরিক নই ? পৃথিবী হচ্ছে আমাদের জন্মভূমি—এটা ভাবলেই সব সমস্যার সমাধান।

যখন বয়স কম ছিল তখন বিদেশে থেকে যাওয়া বাংলাদেশিদের কথা ভাবলে খানিক মন খারাপ হতো। এখন হয় না। এখন মনে হয় কর্ম ও জীবিকার খাতিরে দেশত্যাগে ক্ষতি কী ? বাংলাদেশের মানুষ ছড়িয়ে পড়ুক পৃথিবীময়। জনসংখ্যার ভারে পর্যুদস্ত বাংলাদেশের এতে লাভ বই ক্ষতি হবে না। প্রবাসী ইহুদিদের কল্যাণেই তো আজ ইসরাইল এত ক্ষমতাবান একটি দেশ। বাংলাদেশর ক্ষেত্রেও তা-ই হবে।

আমি নিউ জার্সিতে তার লক্ষণও দেখলাম। 'বাংলাদেশ সমিতি' নামে নিউ জার্সির যে সমিতি তা দেশের জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। দেশের যে-কোনো বিপদে যে পরিমাণ অর্থ তারা দান করছে তার পরিমাণ শুনলে মাথা ঘুরে যায়। একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথাও তো আজ আমাদের জানতে বাকি নেই।

প্রসঙ্গক্রমে প্রবাসী বাঙালি পরিবারের একজনের কথা বলি। তিনি ছেলের জন্মদিন করবেন। দাওয়াতের চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে লেখা—'আমার ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে উপহার কেনা বাবদ যে পরিমাণ অর্থ আপনি বরাদ্দ করে রেখেছিলেন দয়া করে সেই অর্থ বাংলাদেশ সাহায্যকল্পে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে দান করুন।'

বাংলাদেশ সোসাইটি শিল্প-সাহিত্যের ধারাটি তাদের মধ্যে প্রবাহিত রাখার অংশ হিসেবে দেশের নামি কবি-সাহিত্যিক দাওয়াত করে নিয়ে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠান করছেন। এই তো কিছুদিন আগে ঘুরে গেলেন কবি শামসুর রাহমান।

আমি থাকতে থাকতেই সঙ্গীত অনুষ্ঠান হলো কাদেরী কিবরিয়ার। সবার মধ্যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ।

ষোলই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উৎসব হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলছে তার রিহার্সেল। কত না উত্তেজনা সবার মধ্যে। দেখে বড় ভালো লাগল। অসহায় বাংলা মা'কে এরা ভুলেন নি, এই জীবনে ভুলতে পারবেনও না। বাংলাদেশ আর কিছু পারুক না-পারুক, একদল পাগল ছেলে তৈরি করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছে। যারা বাংলাদেশ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পাবে না।

১৪

বন্দরের কাল হলো শেষ।

এখন ফিরে যাওয়ার পালা। যেসব স্মৃতি নিয়ে ফিরছি তার বেশিরভাগই সুখস্মৃতি নয়। তবু জানি প্লেনে ওঠামাত্র মনে হবে কিছু চমৎকার সময় আমেরিকায় কাটিয়ে গেলাম। পাখি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যায়, কিন্তু ফেলে যায় তার একটি পালক।

দেশে রওনা হওয়ার দুদিন আগে ভ্রাতৃবধূ ইয়াসমিন বলল, দাদাভাই, চলুন আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাই যার স্মৃতি অনেক দিন আপনার মনে থাকবে।

কোন জায়গা বলো তো ?

ওয়াশিংটন ডিসির স্মিথসোনয়ান ইনস্টিটিউট।

আগে একবার দেখেছি।

চাঁদের মাটি দেখেছেন ?

চাঁদের মাটি তো বাংলাদেশেই দেখেছি। উনিশ শ সত্তর সালে আমেরিকান অ্যাম্বাসি চন্দ্রশীলা নিয়ে এসেছিল।

চাঁদের মাটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেছেন ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, চাঁদের মাটি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখা যায়!

হ্যাঁ যায়। মিউজিয়ামে সেই ব্যবস্থা আছে। যাবেন ?

অবশ্যই যাব। চাঁদের মাটি স্পর্শ করা তো চাঁদকে স্পর্শ করা। এই সুযোগ পাওয়া যাবে, তা-ই তো কখনো কল্পনা করি নি।

আনন্দে আমার চোখ ঝলমল করতে লাগল। ইয়াসমিন হাসতে হাসতে বলল, আমি জানতাম চন্দ্রশিলা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় শুনে আপনি খুব এক্সাইটেড ফিল করবেন। এই কারণেই সবার শেষে আপনার জন্যে এই প্রোগ্রাম রেখে দিয়েছি।

১৫

সারা দিন গাড়ি চালিয়ে বিকেলে পৌঁছলাম মিউজিয়ামে। অনেক কিছুই দেখার আছে সেখানে—রাইট ব্রাদার্সের তৈরি প্রথম বিমান, যে লুনার মডিউল চাঁদে নেমেছিল—সেই লুনার মডিউল, আরও কত কী...।

কিছুই দেখলাম না, এগিয়ে গেলাম চন্দ্রশীলার দিকে।

উঁচু একটি আসনে চাঁদের মাটি সাজানো। উপরে লেখা—'এই চন্দ্রশীলা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে।'

আমি ও গুলতেকিন একসঙ্গে চাঁদের পাথরে হাত রাখলাম। আমার রোমাঞ্চ বোধ হলো। গভীর আবেগে চোখে পানি এসে গেল। কত না পূর্ণিমার রাত মুগ্ধচোখে এই চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় ও আবেগে অভিভূত হয়েছি। সেই চাঁদ আজ স্পর্শ করলাম। আমার এই মানবজীবন ধন্য।

আমেরিকার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধে মন দ্রবীভূত হলো। আমেরিকানদের অনেক দোষত্রুটি, তবু তো এরা আমাকে এবং আমার মতো আরও অসংখ্য মানুষকে রোমাঞ্চ ও আবেগে অভিভূত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ধরাছোঁয়ার বাইরের যে চাঁদ তাকে নিয়ে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। এই শতক শেষ হওয়ার আগেই তারা যাত্রা করবে মঙ্গল গ্রহের দিকে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে আবারও অভিভূত করবে। আমেরিকা আমি পছন্দ করি না, তবু চন্দ্রশিলায় হাত রেখে মনে মনে বললাম, তোমাদের জয় হোক।

ইয়াসমিন ক্যামেরা হাতে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। কোমল গলায় বলল, দাদাভাই হাসুন, আপনাদের ছবি তুলে রাখি। আপনি চাঁদের মাটিতে হাত দিয়ে এমন মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

হোটেল গ্রেভার ইন

এলেম নতুন দেশে। লরা ইঙ্গেলস ওয়াইল্ডারের প্রেইরী ভূমি, ডাকোটা রাজ্য। ভোর চারটায় পৌঁছলাম, বাইরে অন্ধকার, সূর্য এখনো ওঠে নি, হেক্টর এয়ারপোর্টের খোলামাঠে হু-হু করে হাওয়া বইছে। শীতে গা কাঁপছে। যদিও শীত লাগার কথা নয়। এখন হচ্ছে 'ফল', শীত আসতে দেরি আছে।

আমার মন খুব খারাপ।

দেশ ছেড়ে দীর্ঘদিনের জন্যে বাইরে যাওয়ার উৎসাহ আমি কখনো বোধ করি নি। বর্ষাকালে বৃষ্টির শব্দ শুনব না, ব্যাঙের ডাক শুনব না, চৈত্র মাসের রাতে খোলা ছাদে পাটি পেতে বসব না, শীতের দিনে গ্রামের বাড়িতে আগুনের কাছে হাত মেলে ধরব না, এটা হতে পারে না।

অনেকের পায়ের নিচে সর্ষে থাকে। তারা বেড়াতে ভালোবাসেন। বিদেশের নামে তাঁদের রক্তে বাজনা বেজে ওঠে। আমার কাছে ভ্রমণের চেয়ে ভ্রমণকাহিনি ভালো লাগে। একটা বই হাতে, নিজের ঘরে নিজের চেনা জায়গাটায় বসে থাকব, পাশে থাকবে চায়ের পেয়ালা, অথচ আমি লেখকের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লেখক হয়তো সুন্দর একটা হ্রদের বর্ণনা দিচ্ছেন, আমি কল্পনায় সেই হ্রদ দেখছি। সেই হ্রদের জল নীল। জলে মেঘের ছায়া পড়েছে। আমার কল্পনাশক্তি ভালো। লেখক তাঁর চোখে যা দেখছেন আমি আমার কল্পনার চোখে তার চেয়ে ভালো দেখতে পাচ্ছি। কাজেই কষ্ট করে যাযাবরের মতো দেশ-বিদেশ দেখার প্রয়োজন কী?

প্রেইরী ভূমি সম্পর্কে আমি ভালোই জানি। লরা ইঙ্গেলস-এর প্রতিটি বই আমার অনেকবার করে পড়া। নিজের চোখে এই দেশ দেখার কোনো আগ্রহ আমার নেই। আমি এসেছি পড়াশোনা করতে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কেমিস্ট্রির মতো রসকষহীন একটি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি নিতে হবে। কত দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী কেটে যাবে। ল্যাবরেটরিতে, পাঠ্যবইয়ের গোলকধাঁধায়। মনে হলেই হৃৎপিণ্ডের টিকটিক খানিকটা হলেও শ্লথ হয়ে যায়। হেক্টর এয়ারপোর্টের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়ার মতো বুকের ভেতরটাও হু-হু করে।

মন খারাপ হওয়ার আমার আরেকটি বড় কারণও আছে। দেশে সতের বছর বয়সী আমার স্ত্রীকে ফেলে এসেছি। তার শরীরে আমাদের প্রথম সন্তান। ভালোবাসাবাসির প্রথম পুষ্প। ঢাকা এয়ারপোর্টে আরও অনেকের সঙ্গে সে-ও এসেছিল। সারাক্ষণই সে একটু দূরে দূরে সরে রইল। এই বয়সেই সন্তান ধারণের লজ্জায় সে ম্রিয়মাণ। কালো একটা চাদরে শরীরটা ঢেকেঢুকে রাখার চেষ্টাতেই তার সময় কেটে যাচ্ছে। বিদায়ের আগমুহূর্তে সে বলল, আমাদের প্রথম বাচ্চার জন্মের সময় তুমি পাশে থাকবে না?

আমার চোখে প্রায় পানি এসে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। ইচ্ছে করল টিকিট ও পাসপোর্ট ছুড়ে ফেলে তার হাত ধরে বলি—চলো, বাসায় যাই।

অল্প কিছুদিন আমাদের আয়ু। এই অল্পদিনের জন্যে আমাদের কত আয়োজন— পাস, ডিগ্রি, চাকরি, প্রমোশন, টাকাপয়সা, ঘরবাড়ি। কোনো মানে হয় ? কোনোই মানে হয় না।

আমাব মনের অবস্থা সে টের পেল। মুহূর্তের মধ্যে কথা ঘুরিয়ে বলল, যদি ছেলে হয় নাম রাখব আমি। আর যদি মেয়ে হয় নাম রাখবে তুমি। কেমন ?

প্লেনে আসতে আসতে সারাক্ষণ আমি আমার মেয়ের নাম ভেবেছি। কত লক্ষ লক্ষ নাম পৃথিবীতে, কিন্তু কোনোটিই আমার মনে ধরছে না। কোনোটিই যেন মায়ের গর্ভে ঘুমিয়ে থাকা রাজকন্যার উপযুক্ত নাম নয়। এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নামটি আমাকে আমার মেয়ের জন্যে খুঁজে বের করতে হবে। আজ থেকে আঠার, উনিশ বা কুড়ি বছর পর কোনো-এক প্রেমিকপুরুষ এই নামে আমাব মেয়েকে ডাকবে। ভালোবাসার কত না গল্প সে করবে। হেক্টর এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে এইসব ভাবছি। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। পৃথিবীটা এমন যে বেশিরভাগ ইচ্ছাই কাজে খাটানো যায় না। আমি বসে বসে ভোর হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছি। এত ভোরে কেউ আমাকে নিতে আসবে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রতিবছর হাজারখানেক বিদেশি ছাত্র নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে আসে। কার এত গরজ পড়েছে এদের এয়ারপোর্ট থেকে খাতির করে ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়ার ?

তুমি বাংলাদেশের ছাত্র—আহামাদ ? আমি তাঁর দিকে তাকালাম। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যে মহিলা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যায়। অপূর্ব রূপবতী। যে পোশাক তাঁর গায়ে তার উদ্দেশ্য সম্ভবত শরীরের সুন্দর অংশগুলোর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি জবাব না দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা আবারও বললেন, তুমি কি বাংলাদেশের ছাত্র আহামাদ ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

আমার নাম টয়লা ক্রেইন। আমি হচ্ছি নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার। আমি খুবই লজ্জিত যে দেরি করে ফেলেছি। চলো, রওনা হওয়া যাক। তোমার সঙ্গের সব জিনিসপত্র কি এই ?

ইয়েস।

আমাব সব জবাব এক শব্দে, ইয়েস এবং নো-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইংরেজিতে একটা পুরো বাক্য বলার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে একটা পুরো বাক্য বললেই এই ভদ্রমহিলা হা হা করে হেসে উঠবেন।

আহামাদ, তুমি কি রওনা হওয়ার আগে এক কাপ কফি খাবে ? বাইরে বেশ ঠান্ডা। হঠাৎ কেন জানি ঠান্ডা পড়ে গেছে। কফি আনব ?

না।

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি পূর্বদেশীয় ছাত্রছাত্রীদের কোনো কিছু খাওয়ার কথা বললেই তারা প্রথমে বলে 'না'। অথচ তাদের খাওয়ার ইচ্ছা আছে। আমি

শুনেছি 'না' বলাটা তাদের ভদ্রতার একটা অংশ। কাজেই আমি আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি কফি খেতে চাও?

চাই।

ভদ্রমহিলা কাগজের গ্লাসে দু'কাপ কফি নিয়ে এলেন। এর চেয়ে কুৎসিত কোনো পানীয় আমি এই জীবনে খাই নি। কষা তিতকুটে একটা জিনিস। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার জোগাড়। ভদ্রমহিলা বললেন, হট কফি ভালো লাগছে না? আমি মুখ বিকৃত করে বললাম, খুব ভালো।

টয়লা ক্রেইন হেসে ফেলে বললেন, আহামাদ, তোমাকে আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি। আমেরিকায় পূর্বদেশীয় ভদ্রতা অচল। এদেশে সবকিছু তুমি সরাসরি বলবে। কফি ভালো লাগলে বলবে—ভালো। খারাপ লাগলে কফির কাপ 'ইয়াক' বলে ছুড়ে ফেলবে ডাস্টবিনে।

আমি ইয়াক বলে একটা শব্দ করে ডাস্টবিনে কফির কাফ ছুড়ে ফেললাম। এই হচ্ছে আমেরিকায় আমেরিকানদের মতো আমার প্রথম আচরণ।

টয়লা ক্রেইনের গাঢ় লাল রঙের গাড়ি ডাউনটাউন ফারগোর দিকে যাচ্ছে। আমি ঝিম ধরে পেছনের সিটে বসে আছি। আশপাশের দৃশ্য আমাকে মোটেই টানছে না। টয়লা ক্রেইন একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। প্রতিটি শব্দ খুব স্পষ্ট করে বললেন। তাতে বুঝতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। আমেরিকানদের ইংরেজি বোঝা যায়। ব্রিটিশদেরটা বোঝা যায় না। ব্রিটিশরা অর্ধেক কথা বলে, অর্ধেক পেটে রেখে দেয়। যা বলে তা-ও বলার আগে মুখে অনেকক্ষণ রেখে গার্গল করে বলে আমার ধারণা।

আহামাদ, তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি 'হোটেল গ্রেভার ইন'-এ। হোটেল গ্রেভার ইন পুরোদস্তুর একটা হোটেল। তবে হোটেলের মালিক গত বছর এই হোটেল স্টেট ইউনিভার্সিটিকে দান করে দিয়েছেন। বর্তমানে ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা হোটেলটা চালাচ্ছে। অনেক গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এই হোটেলে থেকেই পড়াশোনা করে। তুমিও ইচ্ছা করলে তা করতে পারো। হোটেলের সব সুযোগ-সুবিধা এখানে আছে। বার আছে, বলরুম আছে, সাওয়ানা আছে। একটাই অসুবিধা, হোটেলটা ইউনিভার্সিটি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। তোমাকে বাসে যাতায়াত করতে হবে। এটা কোনো সমস্যা হবে না, হোটেল থেকে দু'ঘণ্টা পরপর ইউনিভার্সিটির বাস যায়। আমি কী বলছি বুঝতে পারছ তো?

পারছি।

তুমি এসেছ একটা অড টাইমে, স্প্রিং কোয়ার্টার শুরু হতে এখনো এগার দিনের মতো বাকি। সামারের ছুটি চলছে। এই ক'দিন বিশ্রাম নাও। নতুন দেশের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতেও কিছু সময় লাগে। তাই না?

ইয়েস।

টয়লা ক্রেইন হেসে বললেন, ইয়েস এবং নো—এই দুটি শব্দ ছাড়াও তোমাকে আরও কিছু শব্দ শিখতে হবে। দুটি শব্দ সম্বল করে কথাবার্তা চালানো বেশ কঠিন।

তিনি আমাকে হোটেলের রিসিপশনে নিয়ে অতিদ্রুত কী সব বলতে লাগলেন ডেস্কে বসে থাকা পাথরের মতো মুখের মেয়েটিকে। সেইসব কথার একবর্ণও আমি বুঝলাম না। বোঝার চেষ্টাও করলাম না। আমি তখন একটা দীর্ঘ বাক্য ইংরেজিতে তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। বাক্যটা বাংলায় এরকম—মিসেস টয়লা ক্রেইন, আপনি যে এই ভোররাতে আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনার জন্যে নিজে গিয়েছেন এবং নিজে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

বাক্যটা মনে মনে যখন প্রায় গুছিয়ে এনেছি তখন টয়লা ক্রেইন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাই! বলেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমার আর ধন্যবাদ দেওয়া হলো না। এই মহিলার আচার-ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছিল উনি একজন অত্যন্ত কর্মঠ, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হাসিখুশি ধরনের মহিলা। পরে জানলাম ইনি একজন খুবই ইনএফিসিয়েন্ট মহিলা। তাঁর অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার জন্যে পরের বছরই তাঁর চাকরি চলে যায়।

হোটেলে প্রেতার ইনে আমার জীবন শুরু হলো।

তিনতলা একটা হোটেল। পুরনো ধরনের বিল্ডিং। এর সবই পুরনো, কার্পেট পুরনো, ঘরের বাতাসে পর্যন্ত এক শ' বছর আগের গন্ধ। আমেরিকানরা ট্রাডিশনের খুব ভক্ত এটা বলা ঠিক হবে না। তবে ডাকোটা স্টেটের অনেক জায়গাতেই দেখেছি ওয়াইল্ড ওয়েস্ট ধরে রাখার একটা চেষ্টা। পুরনো হোটেলগুলোকে পুরনো করেই রাখা হয়েছে। দেয়ালে বাইসনের বড় বড় শিং। ঝুলিয়ে রাখা আগের আমলের পাইপ গান, বারুদের থলে। মেঝেতে বিছানো ভারী কার্পেটের রঙ বিবর্ণ। আমেরিকানরা হয়তোবা এসব দেখে নস্টালজিক হয়। আমি হলাম বিরক্ত। কোথায় এরা আমাকে এনে তুলল?

আমার ঘরটা দোতলায়। বিরাট ঘর। দুটো খাট পাশাপাশি বিছানো। ঘরের আসবাবপত্র কোনোটাই আমার মন কাড়ল না। তবে দেয়ালজোড়া পুরনো কালের আয়নাটা অপূর্ব। যেন বাংলাদেশের দিঘির কালো জলকে জমিয়ে আয়না বানিয়ে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছে। এরকম চমৎকার আয়না এ যুগে তৈরি হয় কি না আমি জানি না।

আমার পাশের ঘরে থাকেন নব্বই বা এক শ' বছরের একজন বুড়ি। এই হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়াও বাইরের গেস্টরা ভাড়া দিয়ে থাকতে পারেন। লক্ষ করলাম গেস্টদের প্রায় সবাই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা শ্রেণীর। পরে জেনেছি, এদের অনেকেই জীবনের শেষের দিকে বছরের পর বছর হোটেলে কাটিয়ে দেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্যে নির্মিত ওল্ডহোমগুলো তাঁদের পছন্দ নয়। ওল্ড হোমগুলোতে তাঁরা হসপিটাল হসপিটাল গন্ধ পান। লোকজনও ওল্ড হাউসগুলোকে দেখে করুণার চোখে, এর চেয়ে হোটেলই ভালো।

পাশের ঘরের বৃদ্ধার নাম মনে পড়ছে না—সুসিন বা সুজি জাতীয় কিছু হবে। দেখতে অবিকল 'পথের পাঁচালি'র সত্যজিতের ছবির ইন্দিরা ঠাকরুনের মতো। মাথার চুল সেইরকম ছোটছোট করে কাটা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীর। শুধু পরনে শতছিন্ন

শাড়ির বদলে স্কার্ট, ঠোঁটে লিপস্টিক। এই বৃদ্ধা, হোটেলে ঢোকার এক ঘণ্টার মধ্যে আমার দরজায় নক করলেন। দরজা খোলামাত্র বললেন, সুপ্রভাত। তোমার কাছে কি ভারতীয় মুদ্রা আছে ?

না।

স্ট্যাম্প আছে ?

না, তা-ও নেই।

ও আচ্ছা। আমি মুদ্রা এবং স্ট্যাম্প দুটাই জমাই। এটা আমার হবি।

বৃদ্ধা বিমর্ষ মুখে চলে গেলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই মহিলা জীবনের শেষ কটি দিন স্ট্যাম্প বা মুদ্রা জমিয়ে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারলাম না। অন্য কোনো সঞ্চয় কি তাঁর জীবনে নেই ? বৃদ্ধা চলে যাওয়ার পরপরই হোটেলের লন্ড্রির লোক ঢুকল। কালো আমেরিকান। এর নাম জর্জ ওয়াশিংটন। নিগ্রোদের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের নাম অনুসারে নাম রাখার একটা প্রবণতা আছে। এই জর্জ ওয়াশিংটন সম্ভবত আমার গায়ের কৃষ্ণবর্ণের কারণে আমার প্রতি শুরুতেই গভীর মমতা দেখাতে শুরু করল। গম্ভীর মুখে বলল, প্রথম এসেছ আমেরিকায় ?

হ্যাঁ।

পড়াশোনার জন্যে ?

হ্যাঁ।

নিজেদের দেশে পড়াশোনা হয় না যে এই পচা জায়গায় আসতে হয় ?

আমি নিশ্চুপ। সে গলা নামিয়ে বলল, বুড়িগুলোর কাছ থেকে সাবধানে থাকবে, এরা বড় বিরক্ত করে। মোটেই পাত্তা দেবে না।

ঠিক আছে।

মদ্যপান করো ?

না।

মাঝে মধ্যে করতে পারো, এতে দোষের কিছু নেই। তবে মেয়েদের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। হুকার (বেশ্যা)-দের নিয়ে বিছানায় যাবে না—অসুখ-বিসুখ হবে। তা ছাড়া হুকারদের বেশিরভাগই হচ্ছে চোর। টাকাপয়সা, ঘড়ি এইসব নিয়ে পালিয়ে যাবে। হুকার কী করে চিনতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।

আচ্ছা।

খাওয়াদাওয়া কোথায় করবে ? হোটেলে ?

হুঁ।

খবরদার, এই হোটেলের রেস্টুরেন্টে খাবে না। রান্না কুৎসিত, দামও বেশি। দুই ব্লক পরে একটা হোটেল আছে, নাম—বীফ এন্ড বান।

বীফ এন্ড বান ?

হ্যাঁ। ওইখানে খাবার ভালো, দামেও সস্তা।

তোমাকে ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। বিয়ে করেছ ?

হ্যাঁ।

বউয়ের ছবি আছে ?

আছে।

দেখাও।

আমি ছবি বের করে দেখালাম। জর্জ ওয়াশিংটন নানা ভঙ্গিতে ছবি দেখে বলল, অপূর্ব সুন্দরী। তুমি অতি ভাগ্যবান।

আমেরিকানদের অনেক কুৎসিত অভ্যাসের পাশে পাশে অনেক সুন্দর অভ্যাসও আছে। যার একটি হচ্ছে, ছবি দেখে মুগ্ধ হওয়ার ভান করা। আমি লক্ষ করেছি, অতিসামান্য পরিচয়েও এরা বলে—ফ্যামিলির ছবি সঙ্গে আছে ? দেখি কেমন ?

ছবিতে যদি তাড়কা রাক্ষসীর মতো কোনো দাঁত বের করা মহিলাও থাকে, এরা বলবে, অপূর্ব! তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, লাকি ডগ।

এরা মানিব্যাগে ক্রেডিট কার্ডের পাশে নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ছবি রাখে। এর কোনো ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না বলেই আমার ধারণা। অবশ্যি স্ত্রী বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ছবিও বদলায়। নতুন স্ত্রীকে দিনের মধ্যে একশবার মধুর কণ্ঠে 'হানি' ডাকে। সেই 'হানি' একসময় 'হেমলক' হয়ে যায়, তখন খোঁজ পড়ে নতুন কোনো হানির। মানিব্যাগে আবার ছবি বদল হয়।

জর্জ ওয়াশিংটন চলে গেল। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত একা একা নিজের ঘরে বসে রইলাম। কিছুই ভালো লাগে না। ঘরে চিঠি লেখার কাগজপত্র আছে। চিঠি লিখতে ইচ্ছে করল না। সঙ্গে একটিমাত্র বাংলা বই—রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ*। ভেবেছিলাম—একাকিত্বের জীবন, গল্পগুলো পড়তে ভালো লাগবে। আমার প্রিয় গল্পের একটি পড়তে চেষ্টা করলাম—

> সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি এবং বউ বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন এবং আমাদের দুইজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, আহা দুটিতে বেশ মানায়...

আমার এত প্রিয় গল্প, অথচ পড়তে ভালো লাগল না। ইচ্ছে হলো হোটেলের জানালা খুলে নিচে লাফিয়ে পড়ি।

রাতে খেতে গেলাম 'বীফ এন্ড বান' রেস্টুরেন্টে। আলো ঝলমল ছোটখাটো একটা রেস্টুরেন্ট। বিমানবালাদের মতো পোশাকের তিনটি ফুটফুটে তরুণী খাবার দিচ্ছে। অর্ডার নিচ্ছে। মাঝে মাঝে রসিকতা করছে। এদের চেহারা যেমন সুন্দর কথাবার্তাও তেমনি মিষ্টি। আমেরিকান সুন্দরীরা কেমন তা দেখতে হলে এদের বার রেস্টুরেন্টে উঁকি দিয়ে ওয়েট্রেসদের দেখতে হয়।

আমি কোনার দিকে একটি টেবিলে বসলাম। আমার পকেটে আছে মাত্র পনের ডলার। উনিশ শ' সাতাত্তর সালের কথা, তখন দেশের বাইরে কুড়ি ডলারের বেশি নেওয়া যেত না। আমি কুড়ি ডলার নিয়েই বের হয়েছিলাম। পথে লোভে পড়ে এক কার্টন মার্লবোরো সিগারেট কিনে ফেলায় ডলারের সঞ্চয় কমে গেছে। মেনু দেখে আঁতকে উঠলাম। সব খাবারের দাম আট ডলার নয় ডলার। স্টেকজাতীয় খাবারগুলোর দাম আরও বেশি। বেছে বেছে সবচেয়ে কমদামি একটা খাবারের অর্ডার দিলাম—ফ্রেঞ্চ টোস্ট। দামে সস্তা, তা ছাড়া চেনা খাবার। ওয়েট্রেস অবাক হয়ে বলল, এটাই কি তোমার ডিনার ? আমি বললাম, ইয়েস।

সঙ্গে আর কিছু নেবে না ?

কোল্ড ড্রিংক কিংবা কফি ?

নো।

রাতের খাবার শেষ করে একা একা হোটেলের লাউঞ্জে বসে রইলাম। লাউঞ্জ প্রায় ফাঁকা। এক কোনায় দুইজন বুড়োবুড়ি ঝিম মেরে বসে আছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে জীবনের বাকি দিনগুলো কী করে কাটাবে এরা এই নিয়েই চিন্তিত। ওদের চেয়ে আমি নিজেকে আলাদা করতে পারলাম না।

পাশের ঘরেই হোটেলের বার। সেখানে উদ্দাম গান হচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নারীপুরুষ জড়াজড়ি করে নাচছে। গানের কথাগুলো পরিষ্কার নয়। একটি চরণ বারবার ফিরে ফিরে আসছে—Whom do you want to love yea ? Yea শব্দটির মানে কী কে জানে!

রাতে ঘুম এল না ভয়ে—ভূতের ভয়।

এই ভূতের ভয়ের মূল কারণ, আমার ঘরে রাখা হোটেল গ্রেভার ইন সম্পর্কিত একটি তথ্যপুস্তিকা। সেখানে আছে, এই পাথরের হোটেলটি কে প্রথম বানিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে তথ্য। বিখ্যাত ব্যক্তি কারা কারা এই হোটেলে ছিলেন তাঁদের নাম-ধাম। সেইসব বিখ্যাত ব্যক্তির কাউকেই চিনতে পারলাম না, তবে এই হোটেলে একটি ভৌতিক কক্ষ আছে জেনে আঁতকে উঠলাম। রুম নম্বর ৩০৯-এ একজন অশরীরী মানুষ থাকেন বলে এক শ' বছরের জনশ্রুতি আছে। যিনি এখানে বাস করেন তাঁর নাম জন পাউল। পেশায় আইনজীবী ছিলেন। এই হোটেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরও হোটেলের মায়া কাটাতে পারেন নি। পুস্তিকায় লেখা এই বিদেহী আত্মা অত্যন্ত শান্ত ও ভদ্র স্বভাবের। কাউকে কিছুই বলেন না। গভীর রাতে পাইপ হাতে হোটেলের বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেড়ান।

হোটেলের তিন শ' নয় নম্বর কক্ষটিতে কোনো অতিথি রাখা হয় না। বছরের পর বছর এটা খালি থাকে, তবে রোজ পরিষ্কার করা হয়। বিছানার চাদর বদলে দেওয়া হয়। বাথরুমে নতুন সাবান, টুথপেস্ট দেওয়া হয়। ঘরের সামনে একটা সাইনবোর্ড আছে, সেখানে লেখা—'মি. জন পাউলের ঘর। নীরবতা পালন করুন। জন পাউল নীরবতা পছন্দ করেন।'

পুরো ব্যাপারটা একধরনের রসিকতা কিংবা আমেরিকানদের ব্যবসা-কৌশলের একটা অংশ, তবু রাত যতই বাড়তে লাগল মনে হতে লাগল এই বুঝি জন পাউল এসে আমার দরজায় দাঁড়িয়ে বলবেন, তোমার কাছে কি আগুন আছে ? আমার পাইপের আগুন নিতে গেছে।

এমনিতেই ভয়ে কাঠ হয়ে আছি, তার উপর পাশের ঘরের বৃদ্ধা বিচিত্র সব শব্দ করছেন। এই খকখক করে কাশছেন, এই চেয়ার ধরে টানাটানি করছেন, গানের সিকি অংশ শুনছেন, দরজা খুলে বেরুচ্ছেন আবার ঢুকছেন। শেষরাতের দিকে মনে হলো দেশ-গাঁয়ের মেয়েদের মতো সুর করে বিলাপ শুরু করেছেন।

নিঃসঙ্গ মানুষের অনেক ধরনের কষ্ট থাকে।

পুরোপুরি না ঘুমিয়ে কেউ রাত কাটাতে পারে না। শেষরাতের দিকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ঘুম আসে। কিন্তু আমার এল না। পুরো রাত চেয়ারে বসে কাটিয়ে দিলাম। ভোরবেলা আমার ছোটভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল টেলিফোন করল ওয়াশিংটন সিয়াটল থেকে। সে আমার আগে এদেশে এসেছে। পিএইচডি করছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে। পরিষ্কার লজিকের ঠান্ডা মাথার একটা ছেলে। ভাবালুতা কিংবা অস্থিরতার কিছুই তার মধ্যে নেই। জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে সে অসম্ভব সুন্দর কিছু লেখা লিখে ফেলেছে—*কপোট্রনিক সুখ দুঃখ, দীপু নাম্বার টু, হাতকাটা রবীন*। প্রসঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছি, তবু বলার লোভ সামলাতে পারছি না। জাফর ইকবালের লেখা পড়লে ঈর্ষার সূক্ষ্ম খোঁচা অনুভব করি। এই ক্ষমতাবান প্রবাসী লেখক দেশে তাঁর যোগ্য সম্মান পেলেন না, এই দুঃখ আমার কোনোদিন যাবে না।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ইকবাল টেলিফোন করে খাস ময়মনসিংহের উচ্চারণে বলল, দাদাভাই, কেমন আছ ?

আমি বললাম, তুই আমার টেলিফোন নাম্বার কোথায় পেলি ?

আমেরিকায় টেলিফোন নাম্বার পাওয়া কোনো সমস্যা না। তুমি কেমন আছ বলো ?

তোর কাছে ডলার আছে ?

তোমাকে এক শ' ডলারের একটা ড্রাফট পাঠিয়ে দিয়েছি। আজই পাবে।

এক শ' ডলারে হবে না। তুই আমাকে একটা টিকিট কেটে দে আমি দেশে চলে যাব।

আমার কথায় সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। সহজ গলায় বলল, যেতে চাও কোনো অসুবিধা নেই, টিকিট কেটে দেব। কয়েকটা দিন যাক। একটু ঘুরে ফিরে দেখো। এখানে বাংলাদেশি ছেলে নেই ?

বাংলাদেশি ছেলের আমার কোনো দরকার নেই। তুই টিকিট কেটে পাঠা।

আচ্ছা পাঠাব। তুমি কি পৌঁছার সংবাদ দেশে দিয়েছ ? তাবিকে চিঠি লিখেছ ?

চিঠি লেখার দরকার কী! আমি নিজেই তো যাচ্ছি।

তা ঠিক। তবু লিখে দাও। যেতে যেতেও তো সময় লাগবে। আজই লিখে ফ্যালো। আর শোনো, তোমার যে খুব খারাপ লাগছে, দেশে চলে যেতে চাচ্ছ, এইসব না লিখলেই ভালো হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। ইকবাল বলল, রাতে তোমাকে আবার টেলিফোন করব। আর আমি তোমাদের ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারকেও ফোন করে বলে দিচ্ছি যাতে তিনি বাংলাদেশি ছেলেদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দেন।

সেই সময় ফার্গো শহরে আর একজন মাত্র বাঙালি ছিলেন। সুফী সাহেব। তিনি এসেছেন এগ্রোনমিতে পিএইচডি করতে। তাঁর সঙ্গে আমার কোনোরকম যোগাযোগ হলো না। দিনের বেলাটা ইউনিভার্সিটিতে খানিকক্ষণ ঘুরলাম। চারদিক বড় বেশি ঝকঝকে, তকতকে। বড় বেশি গোছানো। বিশ্ববিদ্যালয় সামারের বন্ধ থাকলেও কিছু কিছু ক্লাস হচ্ছে। একটা ক্লাসরুমে উঁকি দিয়ে দেখি অনেক ছেলেমেয়ের হাতে কফির কাপ কিংবা কোল্ড ড্রিংকের বোতল। আরাম করে খাওয়াদাওয়া করতে করতে অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনছে। পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ আছে। এক ধরনের কাছে বিদেশের সবকিছুই ভালো লাগে, অন্যদের কিছুই ভালো লাগে না। আমি দ্বিতীয় দলের। আমার কাছে কিছুই ভালো লাগে না। যা দেখি তাতেই বিরক্ত হই।

রাতে আবার খেতে গেলাম বীফ এন্ড বানে। সেই পুরাতন খাবার। ফ্রেঞ্চ টোস্ট। রুটিনটি হলো এরকম : সকালবেলা ইউনিভার্সিটি এলাকায় যাই। একা একা হাঁটাহাঁটি করি। যা দেখি তা-ই খারাপ লাগে। সন্ধ্যায় হোটেলে ফেরত আসি। রাতে খেতে যাই বীফ এন্ড বানে। ফ্রেঞ্চ টোস্টের অর্ডার দেই। অন্যকিছু খেতে ইচ্ছে করে না। ডলারের অভাব এখন আর আমার নেই। ইউনিভার্সিটি আমাকে চার শ' ডলার অগ্রিম দিয়েছে। সিয়াটল থেকে পাঠানো ছোট ভাইয়ের চেকটাও ভাঙিয়েছি। টাকার অভাব নেই। বীফ এন্ড বানে খাবারেরও অভাব নেই। কিন্তু কোনো খাবারই খেতে ইচ্ছা করে না। খেতে গেলেই চোখের সামনে ভাসে এক প্লেট ধবধবে সাদা ভাত। একটা বাটিতে সর্ষেবাটা দিয়ে রাঁধা ইলিশ। ছোট্ট পিরিচে কাঁচা লঙ্কা, আধখান কাগজি লেবু। আমার প্রাণ হু-হু করে। ওয়েট্রেস যখন অর্ডার নিতে আসে, আমি বলি, ফ্রেঞ্চ টোস্ট। সে অবাক হয়ে তাকায়। হয়তো ইতিমধ্যে এই রেস্টুরেন্টে আমার নামই হয়ে গেছে 'ফ্রেঞ্চ টোস্ট'। আমি লক্ষ করছি, আমাকে দেখলেই ওয়েট্রেসরা নিজেদের মধ্যে চাওয়া-চাওয়ি করে এবং একসময় এসে কোমল গলায় বলে, সে-ই খাবার ?

আমি বলি, ইয়েস।

ছটি দীর্ঘ রজনী কেটে গেল। তারপর চমৎকার একটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটল। ঘটনাটা বিশদভাবে বলা দরকার। এই ঘটনা না ঘটলে হয়তো আমি আমেরিকায় থাকতে পারতাম না। সব ছেড়েছুড়ে চলে আসতাম।

যথারীতি রাতে খাবার খেতে গিয়েছি। ওয়েট্রেস অর্ডার নিতে আমার কাছে আর আসছে না। আমার কেন জানি মনে হলো দূর থেকে সবাই কৌতূহলী ভঙ্গিতে আমাকে দেখছে। ফিসফাস করছে। তাদের দোষ দিচ্ছি না। দিনের পর দিন ফ্রেঞ্চ টোস্ট খেয়ে

খেয়ে আমিই এই অবস্থাটা তৈরি করেছি। একা অনেকক্ষণ বসে থাকার পর অর্ডার নিতে একটি মেয়ে এল। আমাকে অবাক করে দিয়ে বসল আমার সামনের চেয়ারে। যে কথাগুলো সে আমাকে বলল তা শোনার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েটি নিচু গলায় বলল, দ্যাখো আহামাদ, আমরা জানি তোমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। দিনের পর দিন তুমি একটা কুৎসিত খাবার মুখ বুজে খেয়ে যাচ্ছ। টাকাপয়সার কষ্টের মতো কষ্ট তো আর কিছুই হতে পারে না। তবু বলছি, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। দুঃসময় একদিন অবশ্যই কাটবে।

আমি একবার ভাবলাম বলি, তোমরা যা ভাবছ ব্যাপারটা সেরকম নয়। পরমুহূর্তেই মনে হলো—এটা বলার দরকার নেই। এটা বলা মানেই এদের ভালোবাসার অপমান করা। আমি তা হতে দিতে পারি না।

মেয়েটি বলল, আজ তোমার জন্যে আমরা ভালো একটা ডিনারের ব্যবস্থা করেছি। এর জন্যে তোমাকে কোনো পয়সা দিতে হবে না। তুমি আরাম করে খাও এবং মনে সাহস রাখো।

সে উঠে গিয়ে বিশাল ট্রেতে করে টি বোন স্টেক নিয়ে এল। সঙ্গে নানান ধরনের টুকিটাকি। কফি এল, আইসক্রিম এল। ওয়েট্রেসরা সবাই একবার করে দেখে গেল আমি ঠিকমতো খাচ্ছি কি না। আমি খুব আবেগপ্রবণ ছেলে, আমার চোখে পানি এসে গেল। এরা এত মমতা একজন অচেনা অজানা ছেলের জন্যে রেখে দিয়েছিল? মেয়েগুলো আমার চোখের জল দেখতে পেলেও ভান করল যেন দেখতে পায় নি।

গভীর আনন্দ নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরে এলাম। রিসিপশনে বসে থাকা গোমরা মুখের মেয়েটাকে আজ অনেক ভালো লাগল। আমি হাসিমুখে বললাম, হ্যালো।

সেও হাসিমুখে বলল, হ্যালো।

গ্রেভার ইন বারের উদ্দাম গান আজ শুনতে ভালো লাগল। ইচ্ছে করল ভেতরে ঢুকে খানিকক্ষণ শুনি।

আমার পাশের বৃদ্ধার ঘরে নক করে তাঁকে বললাম, আমার কাছে দুটো বাংলাদেশি মুদ্রা আছে, তুমি কি নেবে?

অনেক রাতে স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসলাম। সেই চিঠিটা খুব অদ্ভুত ছিল। কারণ চিঠিতে তুষারপাতের একটা বানানো বর্ণনা ছিল। তুষারপাত না দেখেই আমি লিখলাম—'আজ বাইরে খুব তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তাঘাট ঢেকে গেছে সাদা বরফে। সে যে কী অপূর্ব দৃশ্য তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি হোটেলের জানালার কাছে বসে বসে লিখছি। তুমি পাশে থাকলে দুজন হাত ধরাধরি করে তুষারের মধ্যে দাঁড়াতাম।'

যে তিনজন তরুণী আমেরিকা প্রসঙ্গে আমার ধারণাই বদলে দিল আজ তাঁদের কথা গভীর মমতা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে আজ আমরা বিভক্ত। কত দেশ, কত নাম—কিন্তু মানুষ একই আছে। আসছে লক্ষ বছরেও তা-ই থাকবে।

ডানবার হলের জীবন

নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটির ক্লাসগুলো যেখানে হয় তার নাম ডানবার হল। ডানবার হলের তেত্রিশ নম্বর কক্ষে ক্লাস শুরু হলো। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্লাস। কোর্স নাম্বার ৫২৯।

কোর্স নাম্বারগুলি সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিয়ে নেই। টু হানড্রেড লেভেলের কোর্স হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েটের নিচের দিকের ছাত্রদের জন্যে। থ্রি হানড্রেড লেভেল হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েটের উপরের দিকের ছাত্রদের জন্যে। ফোর হানড্রেড এবং ফাইভ হানড্রেড লেভেল হচ্ছে গ্রাজুয়েট লেভেল।

ফাইভ হানড্রেড লেভেলের যে কোর্সটি আমি নিলাম সে সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পকিছু কোয়ান্টাম মেকানিক্স পড়েছি। একেবারে কিছুই যে জানি না তাও না। তবে এই বিষয়ে আমার বিদ্যা খুবই ভাসাভাসা। জলের ওপর ওড়াউড়ি, জল স্পর্শ করা নয়।

একাডেমিক বিষয়ে নিজের মেধা এবং বুদ্ধির ওপর আমার আস্থাও ছিল সীমাহীন। রসায়নের একটি বিষয় আমি পড়ে বুঝতে পারব না, তা হতেই পারে না।

আমাদের কোর্স কো-অর্ডিনেটর আমাকে বললেন, ফাইভ হানড্রেড লেভেলের এই কোর্সটি যে তুমি নিচ্ছ, ভুল করছ না তো? পারবে?

আমি বললাম, ইয়েস।

তখনো ইয়েস এবং নো-র বাইরে তেমন কিছু বলা রপ্ত হয় নি। কোর্স কো-অর্ডিনেটর বললেন, এই কোর্স নেবার আগে কিন্তু ফোর হানড্রেড লেভেলের কোর্স শেষ করো নি। ভালো করে ভেবে দেখো, পারবে?

ইয়েস।

কোর্স কো-অর্ডিনেটরের মুখ দেখে মনে হলে তিনি আমার ইয়েস শুনেও বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন না।

ক্লাস শুরু হলো। ছাত্র সংখ্যা পনের। বিদেশি বলতে আমি এবং ইন্ডিয়ান এক মেয়ে— কান্তা। ছাত্রদের মধ্যে একজন অন্ধ ছাত্রকে দেখে চমকে উঠলাম। সে তার ব্রেইলি টাইপ রাইটার নিয়ে এসেছে। ক্লাসে ঢুকেই সে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমি বক্তৃতা টাইপ করব। খটখট শব্দ হবে, এজন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আমি হতভম্ব। অন্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এটা আমি জানি। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু অন্ধ ছাত্রছাত্রী আছে, তবে তাদের বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা বা দর্শন। কিন্তু থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রিও কেউ পড়তে আসে আমার জানা ছিল না।

আমাদের কোর্স টিচারের নাম মার্ক গর্ডন। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মস্তান লোক। থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রির লোকজন তাঁর নাম শুনলে চোখ কপালে তুলে ফেলে। তাঁর খ্যাতি প্রবাদের পর্যায়ে চলে গেছে।

লোকটি অসম্ভব রোগা এবং তালগাছের মতো লম্বা। মুখভর্তি প্রকাণ্ড গোঁফ। ইউনিভার্সিটিতে আসেন তালুকের মতো বড় একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে। তিনি যখন ক্লাসে যান কুকুরটা তাঁর চেয়ারে পা তুলে বসে থাকে।

মার্ক গর্ডন ক্লাসে ঢুকলেন একটা টি-শার্ট গায়ে দিয়ে। সেই টি-শার্টে যা লেখা তার বঙ্গানুবাদ হলো, সুন্দরী মেয়েরা আমাকে ভালোবাসা দাও।

ক্লাসে ঢুকেই সবার নামধাম জিজ্ঞেস করলেন। সবাই বসে বসে উত্তর দিল। একমাত্র আমি দাঁড়িয়ে জবাব দিলাম। মার্ক গর্ডন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন ? বসে কথা বলতে কি তোমার অসুবিধা হয় ?

আমি জবাব দেওয়ার আগেই কান্তা বলল, এটা হচ্ছে ভারতীয় ভদ্রতা।

মার্ক গর্ডন বললেন, হুমায়ূন, তুমি কি ভারতীয় ?

না। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি।

ও আচ্ছা, আচ্ছা। বাংলাদেশ। বসো। এর পর থেকে বসে বসে কথা বলবে।

আমি বসলাম। মানুষটাকে ভালো লাগল এই কারণে যে, সে শুদ্ধভাবে আমার নাম উচ্চারণ করেছে। অধিকাংশ আমেরিকান যা পারে না কিংবা শুদ্ধ উচ্চারণের চেষ্টা করে না। আমাকে যেসব নামে ডাকা হয় তার কয়েকটি হচ্ছে—হামায়ান, হিউমেন, হেমীন।

মার্ক গর্ডন টেবিলে পা তুলে বসলেন এবং বললেন, ক্লাস শুরু করার আগে একটা জোক বলা যাক। আমি আবার ডার্টি জোক ছাড়া অন্যকিছু জানি না। যারা ডার্টি জোক শুনতে চাও না, তারা দয়া করে কান বন্ধ করে ফেলো।

গল্পটি হচ্ছে এক ফরাসি তরুণীকে নিয়ে, যার একটি স্তন বড় অন্যটি ছোট। বিয়ের রাতে তার স্বামী...

গল্পটি চমৎকার, তবে এ দেশে তা আমার পক্ষে লেখা সম্ভব না বলে শুধু শুরুটা বললাম। গল্প শেষ হওয়ার পর হাসি থামতে পাঁচ মিনিটের মতো লাগল। শুধু কান্তা হাসল না, মুখ লাল করে বসে রইল। যেন পুরো রসিকতাটা তাকে নিয়েই করা হয়েছে।

মার্ক গর্ডন লেকচার শুরু করলেন। ক্লাসের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন, সহজ ব্যাপারগুলি নিয়ে আজ কথা বললাম, প্রথম ক্লাস তো তাই।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কিচ্ছু বুঝতে পারি নি। তিনি ব্যবহার করছেন গ্রুপ থিওরি, যে গ্রুপ থিওরির আমি কিছুই জানি না।

আমি আমার পাশে বসে থাকা আমেরিকান ছাত্রটিকে বললাম, তুমি কি কিছু বুঝতে পারলে ?

সে বিস্মিত হয়ে বলল, কেন বুঝব না, এসব তো খুবই এলিমেন্টারি ব্যাপার। এক সপ্তাহ চলে গেল। ক্লাসে যাই, মার্ক গর্ডনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিছু বুঝতে

পারি না। নিজের মেধা এবং বুদ্ধির ওপর যে আস্থা ছিল তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রচুর বই জোগাড় করলাম। রাতদিন পড়ি। কোনো লাভ হয় না। এই জিনিস বোঝার জন্যে ক্যালকুলাসের যে জ্ঞান দরকার তা আমার নেই। আমার ইনসমনিয়ার মতো হয়ে গেল। ঘুমুতে পারি না। গ্রেভার ইনের লবিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি। মনে মনে বলি কী সর্বনাশ!

আমার পাশের ঘরের বৃদ্ধা আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, তোমার কী হয়েছে বলো তো? তুমি কি অসুস্থ? স্ত্রীর চিঠি পাচ্ছ না?

দেখতে দেখতে মিডটার্ম পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার পরপর যে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে তা ভেবে হাত-পা পেটের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার জোগাড় হলো। মার্ক গর্ডন যখন দেখবে বাংলাদেশের এই ছেলে পরীক্ষার খাতায় কিছুই লেখে নি তখন তিনি কী ভাববেন? ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানই বা কী ভাববেন?

এই চেয়ারম্যানকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সভাপতি প্রফেসর আলি নওয়াব আমার প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে লিখেছেন—'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ যে অল্প সংখ্যক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র তৈরি করেছে, হুমায়ূন আহমেদ তাদের অন্যতম।'

অসাধারণ মেধাবী ছাত্রটি যখন শূন্য পাবে তখন কী হবে? রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

মিডটার্ম পরীক্ষায় বসলাম। সব মিলিয়ে পাঁচটি প্রশ্ন। এক ঘণ্টা সময়ে প্রতিটির উত্তর করতে হবে। আমি দেখলাম একটি প্রশ্নের অংশবিশেষের উত্তর আমি জানি, আর কিছুই জানি না। অংশবিশেষের উত্তর লেখার কোনো মানে হয় না। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। এক ঘণ্টা পর সাদা খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে এলাম।

পরদিনই রেজাল্ট হলো। এ তো আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় যে, পনেরটি খাতা দেখতে পনের মাস লাগবে।

তিনজন এ পেয়েছে। ছ'জন বি। বাকি সব সি। বাংলাদেশের হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছে শূন্য। সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে অন্ধ ছাত্রটি। [এ ছেলেটির নাম আমার মনে পড়ছে না। তার নামটা মনে রাখা উচিত ছিল।]

মার্ক গর্ডন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বিস্মিত গলায় বললেন, ব্যাপারটা কী বলো তো?

আমি বললাম, কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না। এই হায়ার লেভেলের কোর্স আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছ না, তাহলে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? ঝুলে থাকার মানে কী?

আমি ছাড়তে চাই না।

তুমি বোকামি করছ। তোমার গ্রেড যদি খারাপ হয়, যদি গড় গ্রেড সি চলে আসে তাহলে তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হবে। গ্রাজুয়েট কোর্সের এ-ই নিয়ম।

এই নিয়ম আমি জানি।

জেনেও তুমি এই কোর্সটা চালিয়ে যাবে ?

হ্যাঁ।

তুমি খুবই নির্বোধের মতো কথা বলছ।

হয়তো বলছি। কিন্তু আমি কোর্সটা ছাড়ব না।

কারণটা বলো।

একজন অন্ধ ছাত্র যদি এই কোর্সে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতে পারে আমি পারব না কেন ? আমার তো চোখ আছে।

তুমি আবারও নির্বোধের মতো কথা বলছ। সে অন্ধ হতে পারে, কিন্তু তার এই বিষয়ে চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। সে আগের কোর্স সবগুলি করেছে। তুমি করো নি। তুমি আমার উপদেশ শোনো। এই কোর্স ছেড়ে দাও।

না।

আমি ছাড়লাম না। নিজে নিজে অংক শিখলাম। গ্রুপ থিওরি শিখলাম, অপারেটর এলজেব্রা শিখলাম। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই, এই প্রবাদটি সম্ভবত ভুল নয়। একসময় অবাক হয়ে লক্ষ করলাম কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুঝতে শুরু করেছি।

ফাইনাল পরীক্ষায় যখন বসলাম তখন আমি জানি আমাকে আটকানোর কোনো পথ নেই। পরীক্ষা হয়ে গেল। পরদিন মার্ক গর্ডন একটি চিঠি লিখে আমার মেইল বক্সে রেখে দিলেন। টাইপ করা একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে :

> তুমি যদি আমার সঙ্গে থিওরেটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে কাজ করো তাহলে আমি আনন্দিত হব এবং তোমার জন্যে আমি একটি ফেলোশিপ ব্যবস্থা করে দেব। তোমাকে আর কষ্ট করে টিচিং অ্যাসিসটেন্টশিপ করতে হবে না।

একটি পরীক্ষা দিয়েই আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত হয়ে গেলাম। বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিজের উদ্যোগে ব্যবস্থা করে দিলেন যেন আমি আমার স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে আসতে পারি।

পরীক্ষায় কত পেয়েছিলাম তা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। পাঠক-পাঠিকারা আমার এই লোভ ক্ষমার চোখে দেখবেন বলে আশা করি। আমি পেয়েছিলাম ১০০তে ১০০!

বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি পড়াই। ক্লাসের শুরুতে ছাত্রদের এই গল্পটি বলি। শ্রদ্ধা নিবেদন করি ওই অন্ধ ছাত্রটির প্রতি, যার কারণে আমার পক্ষে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।

আরেকটি কথা, আমি কিন্তু মার্ক গর্ডনের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হই নি। এই বিষয়টি নিয়ে আর কষ্ট করতে ইচ্ছা করছিল না, তা ছাড়া আমার খানিকটা কুকুরভীতি আছে। মার্ক গর্ডনের ভালুকের মতো কুকুরটিকে পাশে নিয়ে কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না।

বাংলাদেশ নাইট

ভোর চারটার সময় টেলিফোন বেজে উঠল, অসময়ে টেলিফোন মানেই রিসিভার না নেওয়া পর্যন্ত বুকে ধড়ফড়। নির্ঘাৎ বাংলাদেশের কল। একগাদা টাকা খরচ করে কেউ যখন বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় কল করে তখন ঘটনা খারাপ ধরেই নিতে হবে। নিশ্চয়ই কেউ মারা টারা গেছে।

তিনবার রিং হওয়ার পর আমি রিসিভার তুলে ভয়ে ভয়ে বললাম, হ্যালো।

ওপার থেকে ভারী গলা শোনা গেল, হুমায়ূন ভাই, খিচুড়ি কী করে রান্না করতে হয় জানেন ?

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। টেলিফোন করেছে মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির মিজানুল হক। সেখানকার একমাত্র বাঙালি ছাত্র। অ্যাকাউন্টিং-এ আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স করছে।

হ্যালো হুমায়ূন ভাই, কথা বলছেন না কেন ? খিচুড়ি কী করে রান্না করতে হয় জানেন ?

না।

তাহলে তো বিগ প্রবলেম হয়ে গেল।

আমি চুপ করে রইলাম। মিজানুল হক হড়বড় করে বলল, কাচ্চি বিরিয়ানির প্রিপারেশন জানা আছে ?

আমি শীতল গলায় বললাম, ক'টা বাজে জানো ?

ক'টা ?

রাত চারটা।

বলেন কী ? এত রাত হয়ে গেছে ? সর্বনাশ!

করছিলে কী তুমি ?

বাংলাদেশের ম্যাপ বানাচ্ছি। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন হুমায়ূন ভাই। সকালে টেলিফোন করব, বিরাট সমস্যায় পড়েছি।

মিজানুল হক খট করে টেলিফোন রেখে দিল। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। পার্কোলেটরে কফি বসিয়ে দিলাম। আমার ঘুমাবার চেষ্টা করা বৃথা। মিজানুল হকের মাথার ঠিক নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার টেলিফোন করবে। অন্য কোনো খাবারের রেসিপি জানতে চাইবে।

এ ব্যাপারটা গত তিনদিন ধরে চলছে। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অন্যান্য দেশের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে বাংলাদেশ

নাইট। এই অঞ্চলে বাংলাদেশের একমাত্র ছাত্র হচ্ছে মিজান, আর আমি আছি নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। মিজানের একমাত্র পরামর্শদাতা। আশপাশে সাত শ' মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় বাঙালি নেই।

কফির পেয়ালা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিজানের টেলিফোন।

হ্যালো, হুমায়ূন ভাই ?

হ্যাঁ।

প্ল্যান-প্রোগ্রাম নিয়ে আপনার সঙ্গে আরেকবার বসা দরকার।

এখনো তো দেরি আছে।

দেরি আপনি কোথায় দেখলেন ? এক সপ্তাহ মাত্র। শালাদের একটা ভেলকি দেখিয়ে দেব। বাংলাদেশ বললে চিনতে পারে না, হা করে তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছা করে চড় মেরে মুখ বন্ধ করে দেই। এইবার শালারা বুঝবে বাংলাদেশ কী জিনিস। ঠিক না হুমায়ূন ভাই ?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

শালাদের চোখ ট্যারা হয়ে যাবে দেখবেন। আমি আপনার এখানে চলে আসছি।

মিজান টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমি আরেকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। এই ছেলেটিকে আমি খুবই পছন্দ করি। তার সমস্যা একটাই, সারাক্ষণ মুখে—বাংলাদেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন একটা খোলার চেষ্টা করেছিল। একজন ছাত্র থাকলে এসোসিয়েশন হয় না বলে সেই চেষ্টা সফল হয় নি। অন্য স্টেট থেকে বাংলাদেশি ছাত্র আনার চেষ্টাও করেছে, লাভ হয় নি। এই প্রচণ্ড শীতের দেশে কেউ আসতে চায় না। শীতের সময় এখানকার তাপমাত্রা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি নিচে নেমে যায়, কে আসবে এইরকম ভয়াবহ ঠান্ডা একটা জায়গায় ?

মিজান এই ব্যাপারে বেশ মনমরা হয়েছিল। বাংলাদেশ নাইট-এর ব্যাপারটা এসে পড়ায় সেই দুঃখ খানিকটা কমেছে। এই বাংলাদেশ নাইট নিয়েও বিরাট কাণ্ড। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার মিজানকে বলল, তুমি এক কাজ করো—তুমি বাংলাদেশ নাইট পাকিস্তানিদের সঙ্গে করো।

মিজান হুঙ্কার দিয়ে বলল, কেন ?

এতে তোমার সুবিধা হবে। ডবল ডেকোরেশন হবে না। এক খরচায় হয়ে যাবে। তুমি একা মানুষ।

তোমার এত বড় সাহস, তুমি পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাকে বাংলাদেশ নাইট করতে বলছ ? তুমি কি জানো, ওরা কী করেছে ? তুমি কি জানো ওবা আমাদের কতজনকে মেরেছে ? তুমি কি জানো... ?

কী মুশকিল, তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?

তুমি আজেবাজে কথা বলবে, তুমি আমার দেশকে অপমান করবে, আর আমি তোমার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলব ?

মিজান ফরেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারের সামনের টেবিলে প্রকাণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল। টেবিলে রাখা কফির পেয়ালা উল্টে পড়ল। লোকজন ছুটে এল। প্রচণ্ড হইচই।

এরকম মাথা গরম একটা ছেলেকে সবসময় সামলে-সুমলে রাখা মুশকিল। তবে ভরসা একটাই—সে আমাকে প্রায় দেবতার পর্যায়ে ফেলে রেখেছে। তার ধারণা আমার মতো জ্ঞানী-গুণী মানুষ শতাব্দীতে এক-আধটা জন্মায়। আমি যা বলি, শোনে।

মিজান তার ভাঙা মরিস মাইনর নিয়ে ঝড়ের গতিতে চলে এল। সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাপ নিয়ে এসেছে। সেই ম্যাপ দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। যে কটা রঙ পাওয়া গেছে সব ক'টাই সে লাগিয়েছে।

জিনিসটা দাঁড়িয়েছে কেমন বলুন তো?

রঙ একটু বেশি হয়ে গেল না?

ওরা রঙ-চঙ একটু বেশি পছন্দ করে হুমায়ূন ভাই।

তাহলে ঠিকই আছে।

এখন আসুন প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলা যাক। বাংলাদেশি খাবারের নমুনা হিসাবে খিচুড়ি খাওয়ানো হবে। খিচুড়ির শেষে দেওয়া হবে পান-সুপারি।

পান-সুপারি পাবে কোথায়?

শিকাগো থেকে আসবে। ইন্ডিয়ান শপ আছে—ওরা পাঠাবে। ডলার পাঠিয়ে চিঠি দিয়ে দিয়েছি।

খুব ভালো।

দেশ সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেওয়া হবে। বক্তৃতার শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব। সবার শেষে জাতীয় সঙ্গীত।

জাতীয় সঙ্গীত গাইবে কে?

কেন, আমি আর আপনি।

তুমি পাগল হয়েছ? জীবনে আমি কোনোদিন গান গাই নি।

আর আমি বুঝি হেমন্ত? এইসব চলবে না, হুমায়ূন ভাই। আসুন গানটা একবার প্র্যাকটিস করি।

মিজান, মরে গেলেও তুমি আমাকে দিয়ে গান গাওয়াতে পারবে না। তা ছাড়া এই গানটার আমি কথা জানি না, সুর জানি না।

কথা-সুর তো আমিও জানি না হুমায়ূন ভাই। চিন্তা নেই, একটা ব্যবস্থা হবেই।

উৎসবের দিন ভোরবেলাতে আমরা প্রকাণ্ড সসপ্যানে খিচুড়ি বসিয়ে দিলাম। চাল, ডাল, আনাজপাতি সেদ্ধ হচ্ছে। দুটো মুরগি কুচি কুচি করে ছেড়ে দেওয়া হলো। এক পাউন্ডের মতো কিমা ছিল, তাও ঢেলে দিলাম। যত ধরনের গরম মসলা ছিল সবই দিয়ে দিলাম। জ্বাল হতে থাকল।

মিজান বলল, খিচুড়ির আসল রহস্য হলো মিক্সিংয়ে। আপনি ভয় করবেন না। জিনিস ভালোই দাঁড়াবে।

সে একটা খুন্তি দিয়ে প্রবল বেগে নাড়াতে শুরু করল। ঘণ্টা দুয়েক পর যা দাঁড়াল তা দেখে বুকে কাঁপন লাগে। ঘন সিরাপের মতো একটা তরল পদার্থ। উপরে আবার দুধের সরের মতো পড়েছে। জিনিসটার রঙ দাঁড়িয়েছে ঘন কৃষ্ণ। মিজান শুকনো গলায় বলল, কালো হলো কেন বলুন তো হুমায়ূন ভাই। কালো রঙের কিছুই তো দেই নি।

আমি সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। মিজান বলল, টমেটো পেস্ট দিয়ে দেব নাকি ?

দাও।

টমেটো পেস্ট দেওয়ায় রঙ আরও কালচে মেরে গেল। মিজান বলল, লাল রঙের কিছু ফুড কালার কিনে এনে ছেড়ে দেব ?

দাও।

তাও দেওয়া হলো। এতে কালো রঙের কোনো হেরফের হলো না। তবে মাঝে মাঝে লাল রঙ ঝিলিক দিতে লাগল। দু'জনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। জাতীয় সঙ্গীতেরও কোনো ব্যবস্থা হলো না। মিজানের গানের গলা আমার চেয়েও খারাপ। যখন গান ধরে মনে হয় গলায় সর্দি নিয়ে পাতিহাঁস ডাকছে। শিকাগো থেকে পানও এসে পৌঁছল না।

অনুষ্ঠান সন্ধ্যায়। বিকেলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হলো। অবাক হয়ে দেখি দূর দূর থেকে গাড়ি নিয়ে বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করেছে। শুনলাম মিজান নাকি আশপাশের যত ইউনিভার্সিটি আছে সব ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশ নাইটের খবর দিয়ে চিঠি দিয়েছিল। দেড় হাজার মাইল দূরে মন্টানো স্টেট ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে একটি মেয়ে গ্রে হাউন্ড বাসে করে একা একা চলে এসেছে। মিনেসোটা থেকে এসেছে দশজনের একটা বিরাট দল। তারা সঙ্গে নানান রকম পিঠা নিয়ে এসেছে। গ্রান্ড ফোকস থেকে এসেছেন করিম সাহেব, তাঁর ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রী। এই অসম্ভব কর্মঠ মহিলাটি এসেই আমাদের খিচুড়ি ফেলে দিয়ে নতুন খিচুড়ি বসালেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে সাউথ ডাকোটার ফলস স্প্রিং থেকে একদল ছেলেমেয়ে এসে উপস্থিত হলো।

মিজান আনন্দে লাফাবে না চেঁচাবে কিছুই বুঝতে পারছে না। চুপচাপ বসে আছে, মাঝে মাঝে গম্ভীর গলায় বলছে, দেখ শালা বাংলাদেশ কী জিনিস। শালা দেখে যা।

অনুষ্ঠান শুরু হলো দেশাত্মবোধক গান দিয়ে।

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...।

অন্যান্য স্টেট থেকে মেয়েরা যারা এসেছে তারাই শুধু গাইছে। এত সুন্দর গাইছে। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে গান শুনে দেশের জন্যে আমার বুক হুহু করতে লাগল। চোখে জল এসে গেল। কেউ যেন তা দেখতে না পায় সেজন্যে মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

পরদিন কার্গো ফোরম পত্রিকায় বাংলাদেশ নাইট সম্পর্কে একটা খবর ছাপা হলো। খবরের অংশবিশেষ এরকম—

> একটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ জাতির অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় দেশের গান দিয়ে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, গান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশি ছেলেমেয়েরা সব কাঁদতে শুরু করল। আমি আমার দীর্ঘদিনের সাংবাদিকতা জীবনে এমন মধুর দৃশ্য দেখি নি...।

•

কিসিং বুথ

আমেরিকানদের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার গল্প বলার সময় কিসিং বুথের গল্পটা আমি খুব আগ্রহ করে বলি। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শোনে। যুবক বয়েসীরা গল্প শেষ হওয়ার পর মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হয়তোবা ভাবে, আহা, তারা কী সুখেই না আছে!

গল্পটা বলা যাক।

আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'হোম কামিং' বলে একটি উৎসব হয়। এই উৎসবে আনন্দমিছিল হয়, হইচই গানবাজনা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সুন্দরী ছাত্রীটিকে হোম কামিং কুইন নির্বাচিত করা হয়। এই হোম কামিং রানিকে ঘিরে সারা দিন ধরে চলে আনন্দ-উল্লাস।

আমার আমেরিকাবাসের প্রথম বর্ষে হোম কামিং কুইন হলো আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসের এক ছাত্রী। স্পেনিশ আমেরিকান, রূপ ফেটে পড়ছে। কিছুক্ষণ এই মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে বুকের মধ্যে একধরনের হাহাকার জমে উঠতে থাকে, জগতসংসার তুচ্ছ বোধ হয়। সম্ভবত এই শ্রেণীর রূপবতীদের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, 'মুনীগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল'।

মেয়েটিকে নিয়ে ভোর এগারোটার দিকে একটা মিছিল বের হলো। আমার ইচ্ছা করল মিছিলে ভিড়ে যাই। শেষ পর্যন্ত লজ্জা লাগল। ল্যাবরেটরিতে চলে এলাম। অনেকগুলি স্যাম্পল জমা হয়েছে। এদের এক্সরে ডিফ্রেকশান প্যাটার্ন জানাতে হবে। ডিফ্রেকশান মেশিনটা ভালো কাজ করছে না। ছবি পরিষ্কার আসছে না। দুপুর একটা পর্যন্ত কাজ করলাম। ঠিক করে রাখলাম লাঞ্চ সারার জন্যে আধঘণ্টার বিরতি দেব।

মেমোরিয়াল ইউনিয়নে লাঞ্চ খেতে গিয়েছি। লক্ষ করলাম মেমোরিয়াল ইউনিয়নের দোতলায় অস্বাভাবিক ভিড়। কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেলাম।

জটলা আমাদের হোম কামিং কুইনকে ঘিরেই। এই রূপবতী বড় বড় পোস্টার সাজাচ্ছে। পোস্টারগুলিতে লেখা :

'নীল তিমিরা আজ বিপন্ন। নীল তিমিদের বাঁচান।'

জানা গেল এই হোম কামিং কুইন নীল তিমিদের বাঁচাও সংঘের একজন কর্মী। সে আজ নীল তিমিদের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করবে।

নীল তিমিদের ব্যাপারে আমি তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করলাম না। মানুষই যেখানে বিপন্ন সেখানে নীল তিমি নিয়ে লাফালাফি করার কোনো অর্থ হয় না। তবু দাঁড়িয়ে আছি। রূপবতী মেয়েটির আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি দেখতে ভালো লাগছে।

আমি লক্ষ করলাম, কাঠগড়ার মতো একটা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে লাল

কালিতে ঠোঁটের ছবি এঁকে নিচে লেখা হলো 'কিসিং বুথ' (চুম্বন কক্ষ)। তার নিচে লেখা চুমু খাওয়ার নিয়মকানুন।

১. জড়িয়ে ধরবেন না, মুখ বাড়িয়ে চুমু খান।

২. চুমু খাওয়ার সময় খুবই সংক্ষিপ্ত।

৩. প্রতিটি চুমু এক ডলার।

৪. চেক গ্রহণ করা হবে না। ক্যাশ দিতে হবে।

৫. বড় নোট গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যাপারটা কী কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার পাশে দাঁড়ানো আমেরিকান ছাত্র বুঝিয়ে দিল।

হোম কামিং কুইন কিসিং বুথে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যরা তাকে চুমু খাবে এবং প্রতিটি চুমুতে এক ডলার করে দেবে। সেই ডলার চলে যাবে নীল তিমি বাঁচাও ফান্ডে।

আমি হতভম্ব।

প্রথমে মনে হলো পুরো ব্যাপারটাই হয়তো একধরনের রসিকতা। আমেরিকানরা রসিকতা পছন্দ করে। এটাও বোধহয় মজার রসিকতা।

দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়। মেয়েটি কিসিং বুথে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে লাইন। এক একজন এগিয়ে আসছে, ডলার দিচ্ছে, মেয়েটিকে চুমু খেয়ে সরে যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে দ্বিতীয়জন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি।

মেয়েটির মুখ হাসি হাসি। তার নীল চোখ ঝকমক করছে। যেন পুরো ব্যাপারটায় সে খুবই আনন্দ পাচ্ছে। আনন্দ ছেলেরাও পাচ্ছে। একজনকে দেখলাম দশ ডলারের একটা নোট দিয়ে পরপর দশবার চুমু খেল। এতেও তার স্বাদ মিটল না। মানিব্যাগ খুলে বিশ ডলারের আরেকটি নোট বের করে উঁচু করে সবাইকে দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাততালি, যার মানে—চালিয়ে যাও।

ইউনিভার্সিটির মেথর, ঝাড়ুদার এরাও ডলার নিয়ে এগিয়ে এল। এরা বেশ গম্ভীর। যেন কোনো পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে। চুমু খেল খুবই শালীন ভঙ্গিতে। মন্দিরের দেবীমূর্তিকে চুমু খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে হয়তো এভাবেই খাওয়া হতো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় ছাত্ররা চলে এল। এরা চুমু খাওয়ার লাইনে দাঁড়াল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকাতে লাগল। এ ওকে ঠেলাঠেলি করছে। কেউ যেতে চাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত একজন এগিয়ে এল, এর নাম উমেশ। বোম্বের ছেলে। মানুষ যে বানর থেকে এসেছে এটা উমেশকে দেখলেই বোঝা যায়। তার জন্যে ডারউইনের বই পড়তে হয় না। উমেশ চুমু খাওয়ার পরপরই অন্য ভারতীয়দের লজ্জা ভেঙে গেল। তারাও লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি ল্যাবরেটরিতে চলে এলাম। আমার প্রফেসর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই এক্সরের কাজ কী হচ্ছে তার খোঁজ নিতে এলেন। ডিফ্রেকশন প্যাটার্ন দেখতে দেখতে বললেন, তুমি কি ওই মেয়েটিকে চুমু খেয়েছ?

আমি বললাম, না।

না কেন ? মাত্র এক ডলারে এমন রূপবতী একটি মেয়েকে চুমু খাওয়ার সুযোগ নষ্ট করা কি উচিত ?

আমি বললাম, এভাবে চুমু খাওয়াটা আমাদের দেশের নীতিমালায় বাধা আছে।

বাধা কেন ? চুমু হচ্ছে ভালোবাসার প্রকাশ। তুমি যদি তোমার শিশুকন্যাকে প্রকাশ্যে চুমু খেতে পার তাহলে একটি তরুণীকে চুমু খেতে পারবে না কেন ? মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ভালোবাসা।

আমি বললাম, এই মেয়েটির ব্যাপারে তো ভালোবাসার প্রশ্ন আসছে না।

তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, আসবে না কেন ? এই মেয়েটিকে তুমি হয়তো ভালোবাসছ না, কিন্তু তার রূপকে তুমি ভালোবাসছ। বিউটি ইজ ট্রুথ। তাই নয় কি ?

আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, একটি নির্জন দ্বীপে যদি তোমাকে ওই মেয়েটির সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হতো তাহলে তুমি কী করতে ? চুপ করে বসে থাকতে ?

আমি নিচু গলায় বললাম, মুনীগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল।

অধ্যাপক বিরক্ত গলায় বললেন, এর মানে কী ?

আমি ইংরেজিতে তাঁকে ব্যাখ্যা করে দিলাম। অধ্যাপক পরম প্রীত হলেন।

আমি বললাম, তুমি কি চুমু খেয়ে এসেছ ?

না। এখন ভিড় বেশি। ভিড়টা কমলেই যাব।

বিকেল চারটায় একরে টেকনিশিয়ান ছুটে এসে বলল, বসে আছ কেন ? এক্ষুনি মেমোরিয়েল ইউনিয়নে চলে যাও। কুইক কুইক।

কেন ?

চারটা থেকে চারটা ত্রিশ, এই আধঘণ্টার জন্যে চুমুর দাম কমানো হয়েছে। এই আধঘণ্টার জন্যে ডলারে দুটো করে চুমু।

টেকনিশিয়ান যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিল তেমনি ঝড়ের গতিতেই চলে গেল। আমি গেলাম দেখতে। লাইন এখনো আছে। লাইনের শুরুতেই উমেশকে দেখা গেল। সে মনে হয় লাইনে লাইনেই আজকের দিনটা কাটিয়ে দিচ্ছে। আমার প্রফেসরকেও দেখলাম। এক ডলারের একটা নোট হাতে দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে দেখে হাত ইশারা করে ডাকলেন।

গল্পটা আমি এই জায়গাতে শেষ করে দেই। শ্রোতারা ব্যাকুল হয়ে জানতে চায়, আপনি কী করলেন ? দাঁড়ালেন লাইনে ?

আমি তাদের বলি, আমি লাইনে দাঁড়ালাম কি দাঁড়ালাম না, তা মূল গল্পের জন্যে অনাবশ্যক।

অনাবশ্যক হোক আর না হোক, আপনি দাঁড়ালেন কি না বলুন।

আমি কিছুই বলি না। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসি। যে হাসির দু'রকম অর্থই হতে পারে।

প্রথম তুষারপাত

ভিসকোমিটারটা ঠিকমতো কাজ করছিল না। একেক সময় একেক রকম রিডিং দিচ্ছে। আমার সঙ্গে কাজ করে পল রেইমেন। ভিসকোমিটার কাজ করছে না শুনে সে কোত্থেকে লম্বা একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে এল এবং পটপট করে ভিসকোমিটারের সব অংশ খুলে ফেলল। আমি মনে মনে বললাম, বাহ্ বেশ ওস্তাদ ছেলে তো। এত জটিল যন্ত্র অথচ কী অবলীলায় খুলে ফেলল।

আমি বললাম, পল! তুমি কি এই যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জানো?

পল বলল, না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, জানো না তাহলে এটা খুলে ফেললে যে?

দেখি ব্যাপারটা কী?

পল ভিসকোমিটারের স্প্রিং খুলে বের করে আনল এবং দু'হাতে কিছুক্ষণ টানাটানি করে বলল, এটা গেছে। বলেই স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে উঠে চলে গেল। আমি টেবিলের ওপর একগাদা যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। কী করব কিছু বুঝতে পারলাম না।

আমেরিকানদের এই বিচিত্র অভ্যাসটি সম্পর্কে বলা দরকার। আমি এর নাম দিয়েছি স্ক্রু ড্রাইভার প্রেম। সব আমেরিকানের পকেটে কয়েক সাইজের স্ক্রু ড্রাইভার থাকে বলে আমার ধারণা। প্রথম সুযোগেই এরা সবকিছু খুলে ফেলবে।

যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের ভীতি আছে। ভীতির কারণ আমাদের শৈশব। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। বাড়িতে হয়তো একটা রেডিও আছে। ছোট ছেলে রেডিও ধরতে গেল। বাবা চেঁচিয়ে উঠবেন, খবরদার হাত দিবি না। মা চেঁচাবেন, খোকন হাত দিও না, ব্যথা পাবে। ছোট্ট খোকনের মনের ভেতর ঢুকে গেল যন্ত্রপাতিতে হাত দেওয়া যাবে না। হাত দিলেই খারাপ কিছু ঘটে যাবে। বড় হওয়ার পরেও শৈশবের স্মৃতি থেকেই যায়। ঘরের ফিউজ কেটে গেলেও আমরা একজন মিস্ত্রি ডেকে আনি।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। টেবিলে যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে বসে আছি। মনটা খারাপ, এইসব খুঁটিনাটি জোড়া লাগাব কীভাবে তা-ই ভাবছি। তখন পল আবার ঘরে ঢুকল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, তাড়াতাড়ি বাইরে যাও, তুষারপাত হচ্ছে।

আমাদের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে বর্ষা। মেঘমেদুর আকাশ। শ্রাবণের ধারা। আষাঢ়ের পূর্ণিমা। তেমনি ইংরেজি সাহিত্যে আছে তুষারপাত। বিশেষ করে বছরের প্রথম তুষারপাতের বর্ণনা। বছরের প্রথম বৃষ্টি বলে আমাদের কিছু নেই। সারা বছরই বৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষাকালে বেশি, অন্যসময় কম।

এদেশে তুষারপাতের নির্দিষ্ট সময় আছে। সামারে তুষারপাত হবে না। স্প্রিং বা ফলেও হবে না। তুষারপাত হবে শীতের শুরুতে। এবং প্রথম তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে

শুরু হবে দীর্ঘ শীতের প্রস্তুতি। ফায়ারিং প্লেস ঠিক করতে হবে। হিটিং সিস্টেম ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। শীতেব দিনের খাবারদাবারের ব্যবস্থা দেখতে হবে। দিনেব পর দিন ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হবে, তার জন্যেও প্রস্তুতি দরকার। ব্লিজার্ড হতে পারে। ব্লিজার্ড হলে ছ'সাত দিন একনাগাড়ে গৃহবন্দি থাকতে হবে। তারও প্রস্তুতি আছে। দেখতে হবে সেলারে প্রচুর মদের বোতল আছে কি না। পছন্দসই বিয়ারের পেটি ক'টা আছে। শীতের সিজনে স্কিইং করার পরিকল্পনা থাকলে তার জন্যেও প্রস্তুতি দরকার। অনেক কাজ। সব কাজের শুরুর ঘটা হচ্ছে বছরের প্রথম তুষার।

তুষারপাত দেখার জন্যে ডানবার হলের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। আকাশ ঘোলাটে। বইপত্রে পড়েছি পেঁজা তুলার মতো তুষাব পড়ে। এখন সেরকম দেখলাম না, পাউডারের কণার মতো গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার পড়ছে। গায়ে পড়ামাত্রই তা গলে যাচ্ছে। খুব যে একটা অপরূপ দৃশ্য তা নয়। তবুও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি।

দেখতে দেখতে পটপরিবর্তন হলো। শিমুল তুলার মতো তুষার পড়ছে। মনে হচ্ছে মেঘের টুকরো। এই টুকরোগুলি গায়ে পড়ামাত্র গলে যাচ্ছে না। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকছে। চেনা এই জায়গা মুহূর্তের মধ্যে অচেনা হয়ে গেল, যেন এটা ডানবার হলের সামনের জায়গা নয়। এটা ইন্দ্রলোকের কোনো-এক মেঘপুরী।

মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ে সমস্ত ফার্গো শহর তুষারে ঢেকে পড়ে গেল। চারদিক সাদা। এই সাদা রঙের কী বর্ণনা দেব? তুষারের সাদা রঙ অন্য সাদার মতো নয়। এই সাদা রঙে একটা হিম-ভাব থাকে যা ঠিক কাছে টানে না, একটু যেন দূরে সরিয়ে দেয়। তুষারের শুভ্রতার সঙ্গে অন্য কোনো শুভ্রতার তুলনা চলে না। এই শুভ্রতা অপার্থিব।

ল্যাবরেটরি বন্ধ করে সকাল সকাল হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরছি। বাস নিলাম না। তুষারের রূপ দেখতে দেখতে যাব। মাইল দুয়েক পথ। কতক্ষণ আর লাগবে?

পথে নেমেই বুঝলাম খুব বড় বোকামি করেছি। রাস্তা অসম্ভব পিছল। পা ফেলা যায় না, তার ওপর ঠান্ডা। টেম্পারেচার দ্রুত নেমে যাচ্ছে। গায়ে সেই অনুপাতে গরম কাপড় নেই। ঠান্ডায় প্রায় জমে যাচ্ছি। তবু ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী বরফের চাদরে ঢাকা। নিজেকে মনে হচ্ছে ক্যাপটেন স্কট—এগুচ্ছি মেরুবিন্দুর খোঁজে। চারদিকের কী অপরূপ দৃশ্য! সুন্দর! সুন্দর! সুন্দর! আবেগে ও আনন্দে আমার চোখ ভিজে উঠল।

"Winter for a moment takes the mind; the snow
Falls past the archlight; icicles guard a wall;
The wind moans through a crack in the window
A keen sparkle of frost is on the sill"

জননী

ছোটবেলায় আমার ঘর-পালানো রোগ হয়েছিল।

তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। স্কুলের নাম কিশোরীমোহন পাঠশালা। থাকি সিলেটের মীরাবাজারে। বাসার কাছেই স্কুল। দুপুর বারোটায় স্কুল ছুটি হয়ে যায়। বাকি দীর্ঘসময় কিছুতেই আর কাটে না। আমার বোনেরা তখন রান্নাবাটি খেলে। ওদের কাছে পাত্তা পাই না। মাঝে মাঝে অবশ্যি খেলায় নেয়, তখন আমার ভূমিকা হয় চাকরের। আমি হই পুতুল খেলা সংসারের চাকর। ওদের ফাইফরমায়েশ খাটি। ওরা আমার সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলে। কাজেই ওদের পুতুল খেলায় খুব উৎসাহ বোধ করি না।

ঘর-পালানো রোগ তখন হলো। এক ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। চমৎকার অভিজ্ঞতা। হাঁটতে হাঁটতে অদ্ভুত সব কল্পনা করা যায়। মজার মজার দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ানো যায়। কারও কিছু বলার থাকে না।

আমি রোজই তা-ই করি। সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় ফিরে আসি। আমার মা নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তাঁর ছেলে যে সারা দুপুর রোদে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাও তিনি জানেন না। আর জানলেও যে ভয়ঙ্কর কিছু করতেন তাও মনে হয় না। তাঁর দিবানিদ্রায় আমি ব্যাঘাত করছি না—এই আনন্দটাই তাঁর জন্যে অনেকখানি ছিল বলে আমার ধারণা।

যাই হোক, একদিনের ঘটনা বলি। হাঁটতে হাঁটতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে একটা বাড়ির বারান্দায় এসে বসলাম। কালো সিমেন্টের বারান্দা। দেখলেই ইচ্ছে করে খালি গায়ে শুয়ে পড়তে। চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ বাড়ির দরজা খুলে গেল। ঘুমঘুম চোখে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। নরম গলায় বললেন, কী চাও খোকা?

আমি বললাম, কিছু চাই না।

বাসা কোথায়?

আমি জবাব দিলাম না। বাসা কোথায় তা এই মহিলাকে বলার কোনো অর্থ হয় না। তিনি চলে গেলেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখে গভীর বিস্ময় এবং কৌতূহল। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তিনি বললেন, তুমি চলে যেয়ো না, আমি আসছি।

তিনি ঘরের ভেতের চলে গেলেন এবং মিনিট তিনেক পর আবার উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে কী-একটা খাবার। তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন—নাও, খাও।

অপরিচিত কেউ কিছু খেতে দিলে বলতে হয়—খাব না। ক্ষিদে নেই। আমি তা বলতে পারলাম না। জিনিসটা হাতে নিলাম। খেতে গিয়ে বুঝতে পারলাম ওই খাদ্য এই পৃথিবীর খাদ্য নয়। স্বর্গীয় কোনো অমৃত।

জিনিসটা হচ্ছে জেলি মাখানো এক টুকরো পাউরুটি। এরকম সুখাদ্য পৃথিবীতে আছে এবং তা অপরিচিত কাউকে দেওয়া যায় তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, আরেকটা দেব ?

আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম, তবে তা করতে বড় কষ্ট হলো। ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন এবং আরও এক টুকরা পাউরুটি নিয়ে ফিরে এলেন।

আমি দ্বিতীয়টিও নিঃশব্দে খেয়ে ফেললাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, তোমার নাম কী, খোকা ?

আমি নাম বললাম না। এক দৌড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম। তিনি নিশ্চয়ই আমার এই অদ্ভুত ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছিলেন, তবে তিনি হয়তোবা তার চেয়েও অবাক হলেন যখন দেখলেন পরের দিন আমি আবার উপস্থিত হয়েছি।

তিনি আমাকে দেখে খুব হাসলেন। তারপরই খাবার নিয়ে এলেন। ব্যাপারটা রুটিনের মতো হয়ে গেল—আমি রোজ যাই, ভদ্রমহিলা খাবার দেন, আমি খাই এবং চলে আসি।

তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করেন বলে মনে হয়। বারান্দায় এসে বসামাত্র দরজা খুলে বের হয়ে আসেন।

একদিনের কথা বলি। মেঘলা দুপুর। চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ভদ্রমহিলার বারান্দায় পা দেওয়ামাত্র বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল।

তিনি দরজা খুলে বললেন, বারান্দায় বৃষ্টির ছাঁট আসবে, ভেতরে এসো খোকা।

আমি ভয়ে ভয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালাম। কী চমৎকার সাজানো বাড়ি। যেন ছবি আঁকা। মানুষের বাড়ির ভেতরটা এত সুন্দর হয় আমার জানা ছিল না।

খোকা, বসো।

আমি ভয়ে ভয়ে সোফায় বসলাম। তিনি বললেন, আজ থেকে তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে, কেমন ? তুমি মা ডাকবে, আমি তোমাকে খুব মজার মজার খাবার খাওয়াব। আচ্ছা ?

আমি কিছু বললাম না।

তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে মা ডাকছ এটা কাউকে বলার দরকার নেই। এটা তোমার এবং আমার গোপন খেলা।

আমি ভদ্রমহিলার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তিনি নাশপাতি কিংবা নাশপাতির মতো দেখতে কোনো-একটা ফল কেটে দিলেন। বললেন, এসো, তুমি আমার কোলে বসে খাও। তার আগে মিষ্টি করে আমাকে মা ডাকো তো।

আমি মা ডাকতে পারলাম না। বিচিত্র এক ধরনের ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠল। শিশুদের মনের গভীরে অনেক ধরনের ভয় লুকানো থাকে। তারই কোনো-একটা বের হয়ে এসে আমাকে অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে বের হয়ে গেলাম। বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় পৌঁছলাম।

ওই রহস্যময় বাড়িতে আর কোনোদিন যাই নি। মানুষের জীবনে কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রহস্যময় প্রকৃতি মানুষকে একই পরিস্থিতিতে বারবার ফেলে মজা দেখেন বলে আমার ধারণা। সিলেটের ওই বাড়ির মহিলার মতো এক মহিলার দেখা পেলাম খোদ আমেরিকায়। আমার বয়স তখন সাতাশ।

শীতের শুরু।

বরফ পড়া আরম্ভ হয়েছে। হোটেল গ্রেভার ইন থেকে বাসে ইউনিভার্সিটিতে আসতে খুব কষ্ট হয়। বাসের ভেতর হিটিংয়ের ব্যবস্থা আছে, তবু শীতে জমে যাওয়ার মতো কষ্ট পাই। বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্যে অপেক্ষা করার কষ্টও অকল্পনীয়। আমার ভারতীয় বন্ধু উমেশ আমার জন্যে ইউনিভার্সিটির কাছে একটা ঘর খুঁজে দিল।

আমেরিকান এক ভদ্রমহিলা তার বাড়ির কয়েকটা ঘর বিদেশি ছাত্রদের ভাড়া দেন। ভাড়া খুবই সস্তা, মাসে চল্লিশ ডলার। তবে খাওয়াদাওয়া করতে হবে বাইরে। আমি বাড়িওয়ালির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর নাম লেভারেল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, আমি খুব বেছে বেছে রুম ভাড়া দেই। যাদের দেই তাদের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন নিয়ম দুটি হচ্ছে, রাত দশটার পর কোনো বান্ধবীকে ঘরে আনা যাবে না। এবং উঁচু ভলুমে স্টেরিও বাজানো যাবে না।

আমি বললাম, বান্ধবী এবং স্টেরিও—দুটোর কোনোটিই আমার নেই।

তিনি বললেন, এখন নেই, দুদিন পর হবে। সেটা দোষের নয়। তবে আমার নিয়ম তোমাকে বললাম। পছন্দ হলে রুম নিতে পারি।

আমি রুম নিয়ে নিলাম। প্রথম মাসের ভাড়া বাবদ চল্লিশ ডলার দেওয়ার পর তিনি একটি ছাপানো কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। সেই কাগজে আরও সব শর্ত লেখা। প্রথম শর্ত পড়েই আমার আক্কেল গুড়ুম। লেখা আছে : এই বাড়ির কোনো অগ্নিবীমা নেই। কাজেই এই বাড়ির অধিবাসীদের কেউ ধূমপান করতে পারবে না।

সব নিয়ম মানা সম্ভব, কিন্তু এই নিয়ম কী করে মানব? মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। একবার ভাবলাম ডলার ফেরত নিয়ে হোটেল গ্রেভার ইনে ফিরে যাব। আবার ভাবলাম, বাসায় তো আর বেশিক্ষণ থাকব না, কাজেই তেমন অসুবিধা হয়তো হবে না।

অসুবিধা হলো।

ঘুমুতে যাওয়ার আগে আগে সিগারেটের তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। আমি গরম কাপড় গায়ে দিলাম। গায়ে পার্কা চড়ালাম। মাফলার দিয়ে নিজেকে পেঁচিয়ে মাংকিক্যাপ মাথায় দিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে সিগারেট ধরালাম।

দৃশ্যটা অদ্ভুত। বরফ পড়ছে। এই বরফের মধ্যে জোব্বা-জাব্বা গায়ে এক ছেলে সিগারেট টানার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

দিন সাতেক পরের কথা। লেভারেল আমার ঘরে ঢুকে কঠিন গলায় বলল, এগারটা-বারোটার সময় বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানো, তাই না?

হ্যাঁ।

ধূমপান যারা করে তাদের আমি বাড়ি ভাড়া দেই না।

আমি সামনের মাসে চলে যাব।

খুবই ভালো কথা। মাসের এই ক'টা দিন দয়া করে ঘরে বসেই সিগারেট খাবে। ঠান্ডার মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে অসুখ-বিসুখ বাঁধাও তা আমি চাই না।

ধন্যবাদ।

শুকনো ধন্যবাদের আমার দরকার নেই। আমি পনের বছরে এই প্রথম একজনকে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি দিলাম।

থ্যাংক ইউ।

লেভারেল উঠে চলে গেল। তবে যাওয়ার আগে হঠাৎ বলল, তোমার অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। তুমি আমাব এখানেই থাকবে। আমি তোমার সিগারেটের অভ্যাস ছাড়িয়ে দেব।

ভদ্রমহিলা এরপর আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। আমার সিগারেটের প্যাকেট তাঁর কাছে জমা রাখতে হলো। তিনি গুনেগুনে আমাকে সিগারেট দেন। তাঁর সামনে বসে খেতে হয়। তিনি নানান উপদেশ দেন, ধোঁয়া বুকের ভিতর নিয়ো না। পাফ করে ছেড়ে দাও।

সিগারেট খাওয়ার সময় একজন অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, এটা অসহ্য।

এছাড়াও তিনি আরও সব সমস্যা করতে লাগলেন। আমার ওজন খুব কম, কাজেই তিনি ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। বলতে গেলে রোজ রাতে তার সঙ্গে ডিনার খেতে হয়। তিনি আমার কাপড় ধুয়ে দেন। ঘর ঝাঁট দিয়ে দেন। একদিন তুষারঝড় হচ্ছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ঠিকমতো ফিরতে পারব না ভেবে নিজেই ইউনিভার্সিটিতে হাজির হলেন। আমি বরফের ওপর দিয়ে ঠিকমতোই হাঁটতে পারছি, তবু তিনি হাত ধরে আমাকে নিয়ে এলেন।

বরফের ওপর দিয়ে দুজন আসছি; হঠাৎ উনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, হুমায়ূন [ইনিই একমাত্র আমেরিকান যিনি শুদ্ধভাবে আমার নাম উচ্চারণ করতেন] তুমি কি দয়া করে এখন থেকে আমাকে মা ডাকবে?

আমি স্তম্ভিত।

বলেন কী এই মহিলা!

আমি চুপ করে রইলাম। লেভারেল শান্ত গলায় বললেন, তুমি আমাকে মা ডাকলে আমার খুব ভালো লাগবে। সবসময় ডাকতে হবে না। এই হঠাৎ হঠাৎ।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। আমাদের মধ্যে আর কোনো কথা হলো না।

আমি বিরাট সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলাম।

ভদ্রমহিলার আদরযত্নে খুব অস্বস্তি বোধ করি। কেউ আমার প্রতিটি ব্যাপার লক্ষ রাখছে তাও আমার ভালো লাগে না।

আমি পড়াশোনা করি, তিনি চুপচাপ পাশে বসে থাকেন। বারবার জিজ্ঞেস করেন, আমি পাশে বসে থাকায় কি তোমার অসুবিধা হচ্ছে? আমি ভদ্রতা করে বলি, না।

ঠান্ডা লেগে একবার খানিকটা জ্বরের মতো হলো। তিনি তাঁর নিজের ইলেকট্রিক ব্ল্যাংকেট আমাকে দিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে একটা কার্ড, সেখানে লেখা: তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো। তোমার মা—লেভারেল।

ভদ্রমহিলার এখানে বেশিদিন থাকতে হলো না। ইউনিভার্সিটি আমাকে বাড়ি দিল। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বিদায়ের সময় তিনি শিশুদের মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। ভদ্রমহিলার স্বামী বিরক্ত হয়ে বারবার বললেন, এসব কী হচ্ছে? ব্যাপারটা কী আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। লেভারেল, তুমি এত আপসেট কেন?

আমার হৃদয় খুব সম্ভব পাথরের তৈরি। এই দুজনের কাউকেই আমি মুখ ফুটে মা ডাকতে পারি নি।

এই পরবাসে

অকর্মা লোক খুব ভালো চিঠি লিখতে পারে বলে একটা প্রবচন আছে। অকর্মাদের কাজকর্ম নেই, ইনিয়ে বিনিয়ে দীর্ঘ চিঠি তাদের পক্ষেই লেখা সম্ভব।

আমি নিজেও এইসব অকর্মার দলে। গুছিয়ে লিখবার ব্যাপারে আমার জুড়ি নেই। পাঠকরা হয়তো ভুরু কুঁচকে ভাবছেন—এই লোকটা দেখি খুব অহংকারী।

তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আমি আসলেই অহংকারী, তবে লিখিতভাবে সেই অহংকার কখনো প্রকাশ করি নি। আজ করলাম। আমি যে চমৎকার চিঠি লিখতে পারি তার একটি প্রমাণ দেব। আমার ধারণা, যেসব পাঠক এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে ছিলেন, প্রমাণ দাখিলের পর তাঁদের মুখের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

প্রবাস জীবনের সাতমাস পার হয়েছে। আমার স্ত্রী গুলতেকিন আমার সঙ্গে নেই। সে আছে দেশে। হলিক্রস কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষা দেবে। কোমর বেঁধে পড়াশোনা করছে। পরীক্ষার আর মাত্র মাসখানেক দেরি। এই অবস্থায় আমি আমার বিখ্যাত চিঠিটি লিখলাম। চার পাতার চিঠিতে একা থাকতে যে কী পরিমাণ খারাপ লাগছে, তার প্রতি যে কী পরিমাণ ভালোবাসা জমা করে রেখেছি এইসব লিখলাম। চিঠির শেষ লাইনে ছিল—'আমি এনে দেব তোমার উঠানে সাতটি অমরাবতী।'

এই চিঠি পড়ে সে খানিকক্ষণ কাঁদল। পরীক্ষা-টরীক্ষার কথা সব ভুলে গিয়ে সাতমাস বয়েসী শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে চলে এল আমেরিকায়। আমি আমার চিঠি লেখার ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত। পরীক্ষা-টরীক্ষা সব ফেলে দিয়ে চলে আসায় আমি খানিকটা বিরক্ত। দুমাস অপেক্ষা করে পরীক্ষা দিয়ে এলেই হতো।

গুলতেকিন চলে আসায় আমার জীবনযাত্রা বদলে গেল। দেখা গেল সে একা আসে নি, আমার জন্যে কিছু সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে, সে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটি আমাকে একটা বাড়ি দিল।

দোতলা বাড়ি। একতলায় রান্নাঘর, বসার ঘর এবং স্টাডি রুম। দোতলায় দুটি শোবার ঘর। এত বড় বাড়ির আমার প্রয়োজন ছিল না। ওয়ান বেডরুমই যথেষ্ট ছিল। তবে নর্থ ডাকোটা স্টেটের নিয়ম হচ্ছে বাচ্চার জন্যে আলাদা শোবার ঘর থাকতে হবে। বাচ্চাদের মধ্যে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে হলে তাদের জন্যে আলাদা আলাদা শোবার ঘর থাকতে হবে। তবে দু'জনই ছেলে বা মেয়ে হলে একটি শোবার ঘরেই চলবে।

আমরা নতুন বাড়িতে উঠে এলাম। বলতে গেলে প্রথমবারের মতো আমরা সংসার শুরু করলাম। এর আগে থেকেছি মা-র সংসারে। আলাদা সংসারের আনন্দবেদনার কিছুই জানি না। প্রবল উৎসাহে আমরা ঘর সাজাবার কাজে লেগে পড়লাম। রোজই দোকানে যাই। যা দেখি তা-ই কিনে ফেলি। এমন অনেক জিনিস আমরা দু'জনে মিলে

কিনেছি যা বাকি জীবনে একবারও ব্যবহার হয় নি। এই মুহূর্তে দুটি জিনিসের নাম মনে পড়ছে—টুল বক্স, যেখানে করাত ফরাত সবই আছে। এবং ফুট বাথ নেওয়ার জন্যে প্লাস্টিকের গামলা জাতীয় জিনিস। .

গুলতেকিন প্রবল উৎসাহে রান্নাবান্না নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাত মাছ ছাড়াও নানান পরীক্ষামূলক রান্না হতে লাগল। অতি অখাদ্য সেইসব খাদ্যদ্রব্য মুখে নিয়ে আমি বলতে লাগলাম, অপূর্ব।

খুব সুখের জীবন ছিল আমাদের। সাত মাস বয়সের পুতুলের মতো একটি মেয়ে যে কাউকে বিরক্ত করে না, আপন মনে খেলে। মাঝে মাঝে তার মনে গভীর ভাবের উদয় হয়, সে তার নিজস্ব ভাষায় গান গায়—

গিবিজি গিবিজি, গিবিজি গিবিজি
গিবি॥
গিবিজি গিবিজি গিবিজি গিবিজি
গিবি॥

আহা, সে বড় সুখের সময়।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই দেশে প্রবাসী ছাত্রদের স্ত্রীরা ভয়াবহ জীবনযাপন করেন। এদের কিছুই করার থাকে না। স্বামী কাজে চলে যায়, ফেরে গভীর রাতে। এই দীর্ঘসময় বেচারিকে কাটাতে হয় একা একা। এরা সময় কাটায় টিভির সামনে বসে থেকে কিংবা শপিংমলে ঘুরে ঘুরে।

রাতে স্বামী যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে তখন অতি অল্পতেই খিটিমিটি লেগে যায়। স্ত্রী বেচারির ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। আমি এক ভদ্রলোককে জানতাম যিনি রাত একটায় তাঁর স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। একবারও ভাবেন নি এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আত্মীয়-পরিজনহীন শহরে মেয়েটি কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে।

যাক ওসব, নিজের গল্পে ফিরে আসি। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলাম, প্রবাস জীবনে আমি কখনো আমার স্ত্রীর ওপর রাগ করব না। কখনো তাকে একাকিত্বের কষ্ট পেতে দেব না।

আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আঠার বছরের এই মেয়ে আমেরিকান জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে খুব সহজেই মানিয়ে নিচ্ছে। অতি অল্প সময়ে সে চমৎকার ইংরেজি বলা শিখল। সুন্দর একসেন্ট। আমি অবাক হয়ে বললাম, এত চমৎকার ইংরেজি কোথায় শিখলে ?

সে বলল, টিভি থেকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চৌদ্দ ঘণ্টা টিভি খোলা থাকে। ইংরেজি শিখব না তো করব কী ?

একদিন বাসায় এসে দেখি ফুটফুটে চেহারার দুটি আমেরিকান বাচ্চা আমার মেয়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছে। অবাক হয়ে বললাম, এরা কারা ?

গুলতেকিন হাসিমুখে বলল, বেবি সিটিং শুরু করেছি।

সে কী !

অসুবিধা তো কিছু নেই। আমাব নিজের বাচ্চাটিকে তো আমি দেখছি, এই সঙ্গে এই দু'জনকেও দেখছি। আমার তো সময় কাটাতে হবে।

গুলতেকিন খুবই অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ে। ওদের ধানমণ্ডির বাসায় আমি প্রথম কাপড় ধোয়া এবং কাপড় শুকানোর যন্ত্র দেখি। ওদের পরিবারে ম্যানেজার জাতীয় একজন কর্মচারী আছে, তিনজন আছে কাজের মানুষ। ড্রাইভার আছে, মালি আছে। এদের প্রত্যেকের আলাদা শোবার ঘর আছে। এরা যেন নিজেরা রান্নাবান্না করে খেতে পারে সেজন্যে আলাদা রান্নাঘর এবং বাবুর্চি আছে।

সেই পরিবারের অতি আদরের একটি মেয়ে বেবি সিটিং করছে। ভাবতেও অবাক লাগে। কাজটা হচ্ছে আয়ার। এই জাতীয় কাজের মানসিক প্রস্তুতি নিশ্চয়ই তার ছিল না। বিদেশের মাটিতে সবই বোধহয় সম্ভব। বেবি সিটিংয়ের কাজটি সে চমৎকারভাবে করতে লাগল। বাসা ভরতি হয়ে গেল বাচ্চায়। সবাই গুলতেকিনকে বেবি সিটার হিসেবে পেতে চায়।

মাঝে মাঝে দুপুরে বাসায় খেতে এসে দেখি পুরোদস্তুর স্কুল বসে গেছে। বাড়িভর্তি বাচ্চা। তারা আমার মেয়ের দেখাদেখি গুলতেকিনকে ডাকে আম্মা, আমাকে ডাকে আব্বা।

মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে আমেরিকান দম্পতি দুপুররাতে তাদের বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত। লজ্জিত গলায় বলছে, আমার বাচ্চাটা চেঁচামেচি করছে রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুবে। কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। আমরা খুবই লজ্জিত। কী করব বুঝতে পারছি না।

গুলতেকিন হাসিমুখে বলল, বাচ্চাকে রেখে যান।

এর জন্যে আমি তোমাকে পে করব।

পে করতে হবে না। রাতেরবেলা তোমার বাচ্চা আমার গেস্ট।

গুলতেকিন শুয়েছে, একদিকে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে আমাদের নিজের মেয়ে নোভা। অন্যদিকে আমেরিকান বাচ্চা। চমৎকার দৃশ্য।

টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে আমি যত টাকা পেতাম সে তারচেয়ে অনেক বেশি পেতে লাগল। আমবা চমৎকার একটা গাড়ি কিনলাম—ডজ কোম্পানির পোলারা।

ছুটির দিনগুলিতে গাড়ি করে ঘুরে বেড়াই। প্রায়ই মনে হয় আমি আমাব জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়টা কাটাচ্ছি।

টাকাপয়সা নিয়ে আমরা যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করি, সুখের উপকরণগুলির মধ্যে টাকাপয়সার ভূমিকাটা বেশ বড়। যতই দিন যাচ্ছে ততই তা বুঝতে পারছি। কিংবা কে জানে, ধনবাদী এই সমাজ আমার চিন্তাভাবনাকে পাল্টে দিতে শুরু করেছে কি না।

পরবাসে আমার রুটিনটা হলো এরকম : ভোরবেলা ল্যাবরেটরিতে চলে যাই। সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি। ঘরে পা দেওয়ার পর ক্লাসের বইপত্র ছুঁয়েও দেখি না। টিভি চালিয়ে দেই, গান শুনি, লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা গাদা গাদা গল্পের বইয়ের পাতা উল্টাই। নোভাকে বাংলা শেখাতে চেষ্টা করি। গ্লাসের পানি দেখিয়ে বলি—এর নাম পানি। বলো,পানি।

সে বলে, গিবিজি।

গিবিজি নয়। বলো পানি প-া-ন-ই..

গিবিজি, গিবিজি।

মেয়েটিকে নিয়ে তার মা খুব দুশ্চিন্তায় ভোগে। শুধুমাত্র গিবিজি শব্দ সম্বল করে সে এই পৃথিবীতে এসেছে কি না কে জানে। তার দেড় বছর বয়স হয়ে গেছে, এই বয়সে বাচ্চারা চমৎকার কথা বলে। অথচ সে শুধু বলে, গিবিজি। আমি নিজেও খানিকটা চিন্তিত বোধ করলাম।

দু'বছর বয়সে হঠাৎ করে সে কথা বলতে শুরু করল। ব্যাপারটা বেশ মজার, কারণ সে কথা বলা শুরু করল ইংরেজিতে। একটা দুটা শব্দ নয়, প্রথম থেকে বাক্য। এবং বেশ দীর্ঘ বাক্য। বাসায় দুটো ভাষা চালু ছিল—ইংরেজি ও বাংলা। আমরা নিজেরা বাংলা বলতাম। যেসব বাচ্চা সারা দিন বাসায় থাকত তারা বলত ইংরেজি। সে দুটি ভাষাই দীর্ঘদিন লক্ষ করেছে। বেছে নিয়েছে একটি। ভাষা বিজ্ঞানীদের জন্যে এই তথ্যটি সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ।

আমার দীর্ঘ সাত বছরের প্রবাস জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের গল্প আছে। সবই ব্যক্তিগত গল্প। তার থেকে দু'একটি বলা যেতে পারে।

একদিনের কথা বলি। সন্ধ্যা মিলিয়েছে [বলে রাখা ভালো সামারে সন্ধ্যা হয় রাত নটার দিকে]। আমি পোর্চে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ করলাম ন'দশ বছরের একটি বালিকা আমার বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। মেয়েটির চেহারা ডল পুতুলের মতো। ফ্রকের হাতায় সে চোখ মুছছে। আমি বললাম, কী হয়েছে খুকি ?

সে বলল, কিছু হয় নি। আমি কি তোমার বাসার সামানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি ?

অবশ্যই পার। ভেতরে এসেও বসতে পার।

না। আমার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে।

রাত সাড়ে দশটায় খাবার শেষ করে বাইরে এসে দেখি মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, এখনো দাঁড়িয়ে আছ ?

সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি তো তোমাকে বিরক্ত করছি না। শুধু দাঁড়িয়ে আছি।

ব্যাপারটা কি তুমি আমাকে বলবে ?

মেয়েটি ঘটনাটা বলল।

তার মা একজন ডিভোর্সি মহিলা। মেয়েকে নিয়ে থাকে। সম্প্রতি একটি ছেলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ছেলেটিকে নিয়ে সে ডেটিংয়ে যায়। মেয়েটিকে একা বাড়িতে রেখে যায়। সন্ধ্যা মেলাবার পর মেয়েটির একা একা ভয় করতে থাকে। সে তখন ঘর বন্ধ কবে বাইরে এসে দাঁড়ায়। মায়ের জন্যে অপেক্ষা করে। আমাব ঘরের সামনে এসে দাঁড়ানোর কারণ হচ্ছে, আমার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত বাতি জ্বলে। সে লক্ষ করেছে আমি খুব রাত জাগি।

মেয়েটির কষ্টে আমাব চোখে পানি এসে গেল। আমি বললাম, খুকি, তুমি আমার ঘরে এসে মার জন্যে অপেক্ষা করো।

সে কঠিন গলায় বলল, না।

সেবারের পুরো সামারটা আমাব নষ্ট হয়ে গেল। মেয়েটি রোজ গভীর রাত পর্যন্ত আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার মার জন্যে অপেক্ষা করে। ভদ্রমহিলা মধ্যরাতে মাতাল অবস্থায় ফেরেন। আমার ইচ্ছা করে চড় দিয়ে এই মহিলার সব কটি দাঁত ফেলে দেই। তা করতে পারি না। কান পেতে শুনি মহিলা তার মেয়েকে বলছেন, আর কখনো দেরি হবে না। তুমি কি খুব বেশি ভয় পাচ্ছিলে ?

না।

আমি তোমাকে ভালোবাসি, মা।

আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

আই লাভ ইউ—কথাটি একজন আমেরিকান তাঁর সমগ্র জীবনে কত লক্ষ বার ব্যবহার করেন আমার জানতে ইচ্ছে করে। এই বাক্যটির আদৌ কি কোনো অর্থ তাদের কাছে আছে ?

আরেকটা ঘটনা বলি।

আমাব স্ত্রী জেনি লী নামের একটি মেয়ের বেবি সিটিং করত। মেয়েটির বয়স সাত-আট বছর। মেয়েটির মা একজন ডিভোর্সি মহিলা, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে সমাজবিদ্যার ছাত্রী। সে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পথে মেয়েটিকে রেখে যায়। ফেরার পথে নিয়ে যায়। একদিন ব্যতিক্রম হলো, সে মেয়েকে নিতে এল না। রাত পার হয়ে গেল। পরদিন ভোরে তার বাসায় গিয়ে দেখি বিরাট তালা ঝুলছে। খুব সমস্যায় পড়লাম। মহিলা গেলেন কোথায় ? তিন দিন কেটে গেল কোনো খোঁজ নেই। আমরা পুলিশে খবর দিলাম। মহিলার মার ঠিকানা বের করে তাঁকে লং ডিসটেন্স টেলিফোন করলাম। ভদ্রমহিলা কঠিন গলায় বললেন, এইসব ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হব। আমাব মেয়ের সঙ্গে গত সাত বছর ধরে কোনো যোগাযোগ নেই। নতুন করে যোগাযোগ হোক তা আমার কাম্য নয়। জীবনের শেষ সময়টা আমি সমস্যা ছাড়া বাঁচতে চাই।

আমাদেব মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তবে জেনি লী নির্বিকার। সে বেশ সহজ ভঙ্গিতে বলল, আমার মা আমাকে তোমাদের ঘাড়ে ডাম্প করে পালিয়ে গেছে। সে আর আসবে না।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বললাম, অবশ্যই আসবে।

না, আসবে না। আমি না থাকলেই তার সুবিধা। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব।

কথাগুলি বলবার সময় মেয়েটির গলা একবারও ধরে এল না। চোখের কোণে অশ্রু চিকচিক করল না। একমাত্র শিশুরাই পারে নির্মোহ হয়ে সত্যকে গ্রহণ করতে।

জেনি লীর মা চারদিন পর ফিরে আসে। সে তার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে লং ডিসটেন্স ড্রাইভে দশ হাজার মাইল দূর মন্টানার এক পাহাড়ে চলে গিয়েছিল।

আমেরিকা কীভাবে বিদেশি ছাত্রদের জীবনে প্রভাব ফেলতে থাকে তার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েই এই গল্প শেষ করব।

শীতের সময়কার ঘটনা।

এখানকার শীত মানে ভয়াবহ ব্যাপার। ঘর থেকে বেরুনো বন্ধ। আমি ইউনির্ভাসিটিতে যাই। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে আসি। জীবন এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল।

আমেরিকানদের মতে এই সময়টা স্বামী-স্ত্রীদের জন্যে খুব খারাপ। সবার মধ্যেই তখন থাকে—'কেবিন ফিবার'। দিনের পর দিন ঘরে বন্দি থেকে মেজাজ হয় রুক্ষ। ঝগড়াঝাটি হয়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ডিভোর্সের শতকরা ৭৬ ভাগ হয় শীতের সময়টায়।

আমেরিকানদের কেবিন ফিবারের ব্যাপারটা যে কত সত্যি তার প্রমাণ হাতে হাতে পেলাম। অতি সামান্য ব্যাপার নিয়ে কুৎসিত একটা ঝগড়া করলাম গুলতেকিনের সঙ্গে। সে বিস্মিত গলায় বারবার বলতে লাগল, তুমি এরকম করে কথা বলছ কেন? এসব কী? কেন এরকম করছ?

আমি চেঁচিয়ে বললাম, ভালো করছি।

তুমি খুবই বাজে ব্যবহার করছ। কেউ এরকমভাবে আমার সঙ্গে কথা বলে না।

কেউ না বলুক, আমি বলি।

আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।

চলে যেতে চাইলে যাও। মাই ডোর ইজ ওপেন। দখিন দুয়ার খোলা।

সে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর নোভাকে চুমু খেয়ে একবস্ত্রে বের হয়ে গেল। আমি মোটেই পাত্তা দিলাম না। যাবে কোথায়? তাকে ফিরে আসতেই হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, সে ফিরে এল না। একদিন এবং একরাত কেটে গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। নোভা ক্রমাগত কাঁদছে, কিছুই খাচ্ছে না। আমি কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছি না। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজ করলাম। কেউ কিছু বলতে পারে না। পুলিশে খবর দিলাম।

ফার্গো শহরে 'অসহায় মহিলাদের রক্ষা সমিতি' বলে একটি সমিতি আছে। সেখানেও খোঁজ নিলাম। আমার প্রায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

দ্বিতীয় দিন পার হলো। রাত এল। আমি ঠিক করলাম রাতের মধ্যে যদি কোনো খোঁজ না পাই তাহলে দেশে খবর দেব।

রাত আটটায় একটা টেলিফোন এল। একজন মহিলা এটর্নি আমাকে জানালেন যে, আমার স্ত্রী গুলতেকিন আহমেদ আমার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েছেন। তিনি ডিভোর্সের মামলা করতে চান।

আমি বললাম, খুবই উত্তম কথা। সে আছে কোথায়?

সে তার এক বান্ধবীর বাড়িতে আছে। সেই ঠিকানা তোমাকে দেওয়া যাবে না। আমি কি মামলার বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব?

মামলার বিষয়ে কথা বলার কিছুই নেই। আমাদের বিয়ের নিয়মকানুন খুব সহজ। এই নিয়মে আমার স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করার অধিকার দেওয়া আছে। এই অধিকার বলে সে যে-কোনো মুহূর্তে আমাকে ত্যাগ করতে পারে। তার জন্যে কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

তোমাদের দেশের নিয়মকানুন তোমাদের দেশের জন্যে। আমেরিকায় এই নিয়ম চলবে না।

তোমার বকবকানি শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না। তুমি কি দয়া করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দেবে?

আমি তোমার অনুরোধের কথা তাকে বলতে পারি। যোগাযোগ করার দায়িত্ব তার।

বেশ তাই করো।

আমি টেলিফোন নামিয়ে সারা রাত জেগে রইলাম—যদি গুলতেকিন টেলিফোন করে। সে টেলিফোন করল না। বিভীষিকাময় একটা রাত কাটল। ভোরবেলা সে এসে হাজির।

যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে সে রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের কেতলি বসিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। কিছুই বলছি না। সে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দু'কাপ চা বানিয়ে এক কাপ আমার সামনে রেখে বলল, তোমাকে আমি একটা শিক্ষা দিলাম। যাতে ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে আর খারাপ ব্যবহার না করো। যদি করো আমি কিন্তু ফিরে আসব না।

আমি বললাম, আমেরিকা তোমাকে বদলে দিয়েছে।

হ্যাঁ; দিয়েছে। এই বদলানোটা কি খারাপ?

না।

না বলার সৎ সাহস যে তোমার হয়েছে সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তবে যে বিদ্রোহ এখানে আমি করতে পারলাম দেশে থাকলে তা কখনো করতে পারতাম না। দিনের পর দিন অপমান সহ্য করে পশুশ্রেণীর স্বামীর পায়ের কাছে পড়ে থাকতে হতো।

আমি কি পশুশ্রেণীর কেউ ?

হ্যাঁ। নাও চা খাও। তোমার চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন ? এই দুদিন কিছুই খাও নি বোধহয় ?

বলতে বলতে পশুশ্রেণীর একজন মানুষের প্রতি গাঢ় মমতায় তার চোখে জল এসে গেল।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি জানি এরপরেও তুমি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে, তবুও আমি বারবার তোমার কাছেই ফিরে আসব। এই দুদিন আমি একবারও আমার মেয়ের কথা ভাবি নি। শুধু তোমার কথাই ভেবেছি।

আমি মনে মনে বললাম, 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন মিছে এ ভালোবাসা'।

ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। না জন্মালে ভাব প্রকাশে আমাদের বড় অসুবিধা হতো।

ম্যারাথন কিস

চুমু প্রসঙ্গে আরেকটি গল্প বলি। গল্পের নায়ক আমার ছাত্র—বেন ওয়ালি। টিচিং অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে আমি এদের প্রবলেম ক্লাস নেই। সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টা থার্মোডিনামিক্সের অংক করাই এবং ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেই।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আন্ডার গ্রাজুয়েটে যেসব আমেরিকান পড়তে আসে, তাদের প্রায় সবাই গাধা টাইপের। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে হা করে তাকিয়ে থাকে। প্রবল বেগে মাথা চুলকায়। অংক করতে দিলে শুকনো গলায় বলে, আমার ক্যালকুলেটরের ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে।

আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়াশোনা এদের তেমন জরুরি নয়। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্যে হাইস্কুলের শিক্ষাই যথেষ্ট। এদের কাছে ইউনিভার্সিটির ফুটবল টিম, বেসবল টিম পড়াশোনার চেয়ে অনেক জরুরি। মেয়েদের লক্ষ্য থাকে ভালো একজন স্বামী জোগাড় করার দিকে। এই কাজটি তাদের নিজেদেরই করতে হয় এবং এর জন্যে যে পরিমাণ কষ্ট এক একজন করে তা দেখলে চোখে পানি এসে যায়।

আমার সঙ্গে রুথ কোয়ান্ডাল বলে এক আমেরিকান ছাত্রী পিএইচডি করত। এই মেয়েটি কোনো স্বামী জোগাড় করতে পারে নি। ভবিষ্যতেও যে পারবে এমন সম্ভাবনাও নেই। মেয়েটি মৈনাকপর্বতের মতো। সে আমাকে দুঃখ করে বলেছিল, আমার যখন সতের-আঠার বছর বয়স ছিল তখন আমি এত মোটা ছিলাম না। চেহারাও ভালোই ছিল। তখন থেকে চেষ্টা করছি একজন ভালো ছেলে জোগাড় করতে। পারি নি। কতজনের সঙ্গে যে মিশেছি। এদের ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখার জন্যে কত কিছু করতে হয়েছে। আগেকার অবস্থা তো নেই, এখন ছেলেরা ডেটিংয়ের প্রথম রাতেই বিছানায় নিয়ে যেতে চায়। না করি না। না করলে যদি বিরক্ত হয়। আমাকে ছেড়ে অন্য কোনো মেয়ের কাছে চলে যায়। এত কিছু করেও ছেলে জুটাতে পারলাম না।

কেন পারলে না?

পারলাম না, কারণ আমি অতিরিক্ত স্মার্ট। সারা জীবন 'A' পেয়ে এসেছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রীদের একজন। ছেলেরা এরকম স্মার্ট মেয়ে পছন্দ করে না। তারা চায় পুতুপুতু ধরনের ত্যাদা টাইপের মেয়ে। তুমি বিদেশি, আমাদের জটিল সমস্যা বুঝতে পারবে না।

আমি আসলেই বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় এদের কোথায় যেন কী-একটা হয়েছে। সবার মাথার স্ক্রু-র একটা প্যাঁচ কেটে গেছে। উদাহরণ দেই। এটি আমার নিজের চোখে দেখা।

পুরোদমে ক্লাস হচ্ছে। দেখা গেল ক্লাস থেকে দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে বের হয়ে গেল। সবার চোখের সামনে এরা সমস্ত কাপড় খুলে ফেলল। এইভাবেই সমস্ত

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটা চক্কর দিয়ে ফেলল। এর নাম হচ্ছে স্ট্রিকিং। এরকম করল কেন? এরকম করল কারণ এরা পৃথিবী জুড়ে যে আণবিক বোমা তৈরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল।

এদের এইসব পাগলামি সাধারণত ফাইনাল পরীক্ষার আগে আগে দেখা দেয়। আমার ছাত্র বেন ওয়ালির মাথায় এরকম পাগলামি ভর করল। স্প্রিং কোয়ার্টারের শেষে ফাইনালের ঠিক আগে আগে আমাকে এসে বলল সে একটা বিশেষ কারণে টার্ম ফাইনাল পেপারটা জমা দিতে পারছে না।

আমি বললাম, বিশেষ কারণটা কী?

চুমুর দীর্ঘতম রেকর্ডটা ভাঙতে চাই। গিনিস বুকে নামটা যেন ওঠে।

আমি বেনের মুখে দিকে তাকিয়ে রইলাম। বলে কী এই ছেলে!

আমি বললাম, টার্ম ফাইনালের পরে চেষ্টা করলে কেমন হয়? তখন নিশ্চিন্ত মনে চালিয়ে যেতে পারবে। টার্ম ফাইনাল পেপার জমা না দিলে তো এই কোর্সটায় কোনো নম্বর পাবে না।

বেন বিরস মুখে চলে গেল। দু'দিন পর পেপার জমা দিয়ে দিল। আমি ভাবলাম মাথা থেকে ভূত নেমে গেছে। কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। যন্ত্রণা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ভূত কিন্তু নামল না। আমেরিকানদের ঘাড়ের ভূত খুব সহজে নামে না। ভূতগুলিও আমেরিকানদের মতোই পাগলা। কাজেই এক বৃহস্পতিবার রাতে অর্থাৎ উইক-এন্ড শুরু হওয়ার আগে আগে বেন রেকর্ড ভাঙার জন্যে নেমে পড়ল। সঙ্গে স্বাস্থ্যবতী এক তরুণী—যার পোশাক খুবই উগ্র ধরনের। এই পোশাক না থাকলেই বরং উগ্রতাটা কম মনে হতো।

চুমুর ব্যাপারটা হচ্ছে মেমোরিয়াল ইউনিয়নের তিনতলায়। যথারীতি পোস্টার পড়েছে—ম্যারাথন চুমু। দীর্ঘতম চুম্বনের বিশ্বরেকর্ড স্থাপিত হতে যাচ্ছে।... ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখলাম ব্যাপারটায় আয়োজনও প্রচুর। দুজন আছে রেকর্ড কিপার, স্টপওয়াচ হাতে সময়ের হিসাব রাখছে। একজন আছেন নোটারি পাবলিক। যিনি সার্টিফিকেট দেবেন যে, দীর্ঘতম চুম্বনে কোনো কারচুপি হয় নি। এই নোটারি পাবলিক সারাক্ষণই থাকবেন কি না বুঝতে পারলাম না। এদের মতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এরকম একটা ফালতু জিনিস নিয়ে কী করে সময় নষ্ট করে বুঝতে পারলাম না।

বেন এবং মেয়েটিকে নাইলনের দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কেউ সে বেষ্টনীর ভেতর যেতে পারছে না। বাজনা বাজছে। সবই নাচের বাজনা—ওয়াল্টজ। বাজনার তালে তালে এরা দু'জন নাচছে।

আমি মিনিট দশেক এই দৃশ্য দেখে চলে এলাম। এই জাতীয় পাগলামির কোনো মানে হয়?

পরদিন ভোরে আবার গেলাম। ম্যারাথন চুমু তখনো চলছে। তবে পাত্র-পাত্রী দুজন এখন সোফায় শুয়ে আছে। ঠোঁটে ঠোঁট লাগানো। বাজনা বাজছে। সেই বাজনার তালে

তালে সমবেত দর্শকদের অনেকেই সঙ্গী অথবা সঙ্গিনী নিয়ে খানিকক্ষণ নাচছে। রীতিমতো উৎসব।

আমি আমার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটিকে বললাম, ক্ষিধে পেলে ওরা করবে কী? ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে খাওয়াদাওয়া তো করা যাবে না।

তরল খাবার খাবে স্ট্র দিয়ে। কিছুক্ষণ আগেই স্যুপ খেয়েছে।

আমি ইতস্তত করে বললাম, বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন যখন হয় তখন কী করবে?

জানি না। বাথরুমের জন্যে কিছু সময় বোধহয় অফ পাওয়া যায়। কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। ওদের জিজ্ঞেস করো।

আমার আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করল না। ততক্ষণে জোরে উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। একজোড়া বুড়োবুড়ি উদ্দাম নৃত্যে মেতেছে। ভয়াবহ লাফ-ঝাঁপ। তালে তালে হাততালি পড়ছে। জমজমাট অবস্থা।

জানতে পারলাম এই বুড়োবুড়ি হচ্ছে বেন ওয়ালির বাবা এবং মা। তারা সুদূর মিনেসোটা থেকে ছুটে এসেছেন ছেলেকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে। ছেলের গর্বে তাঁদের চোখমুখ উজ্জ্বল।

বেন ওয়ালি দীর্ঘতম চুম্বনের বিশ্বরেকর্ড ভাঙতে পারে নি। তবে সে খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল।

লাস ভেগাস

দিনটা ছিল বুধবার। জুন মাসের ষোল বা সতের তারিখ। ডানবার হলের এক্সরে রুমে বসে আছি। আমাব সামনে গাদাখানিক রিপোর্ট। আমি রিপোর্ট দেখছি এবং ঠান্ডা ঘরে বসেও রীতিমতো ঘামছি। কারণ গা দিয়ে ঘাম বের হওয়ার মতো একটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। পলিমার ক্লে ইন্টারেকশনের এমন একটা ব্যাপার পাওয়া গেছে যা আগে কখনো লক্ষ করা হয় নি। আবিষ্কারটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৮০ ভাগ।

আমি দেখিয়েছি যে, পলিমারের মতো বিশাল অণু ক্লের লেয়ারের ভেতর ঢুকে তার স্ট্রাকচার বদলে দিতে পারে। সব পলিমার পারে না, কিছু কিছু পারে। কোনো কোনো পলিমার ক্লে লেয়ারের ফাঁক বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কেউ আবার কমিয়ে দেয়। অত্যন্ত অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার।

সন্ধ্যাবেলা আমি আমার প্রফেসরকে ব্যাপারটা জানালাম। তিনি খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। ঝিম ভাঙবার পর বললেন, গোল্ড মাইন।

অর্থাৎ তিনি একটি স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়েছেন। রাত দশটার দিকে তিনি বাসায় টেলিফোন করে বললেন, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির ৫৭তম অধিবেশন হবে নাভাদার লাস ভেগাসে। সেই অধিবেশনে আমরা আমাদের এই আবিষ্কারের কথা বলব।

আমি বললাম, খুবই ভালো কথা। কিন্তু এখনো ব্যাপারটা আমরা ভালোমতো জানি না। আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির মতো অধিবেশনে তাড়াহুড়া করে কিছু...

প্রফেসর আমার কথা শেষ করতে দিলেন না, ঘট করে টেলিফোন রেখে দিলেন।

পরদিন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে খুব চেষ্টা করলাম প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলতে। তিনি সেই সুযোগ দিলেন না। লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত। যতবার কথা বলতে চাই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলেন, দেখছ একটা কাজ করছি, কেন বিরক্ত করছ। আমার কাজ নয়। এটা তোমারই কাজ।

সন্ধ্যাবেলা প্রফেসরের সেই কাজ শেষ হলো। তিনি তাঁর সমস্ত ছাত্রদের ডেকে গম্ভীর গলায় বললেন, আমার ছাত্র আহাম্মদ নাভাদার লাস ভেগাসে তার আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করবে। সে একটা পেপার দেবে। পেপারের খসড়া আমি তৈরি করে ফেলেছি।

আমার মাথা ঘুরে গেল। ব্যাটা বলে কী ? পৃথিবীর সব বড় বড় রসায়নবিদরা জড়ো হবেন সেখানে। এইসব জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে আমি কেন ? এক অক্ষর ইংরেজি আমার মুখ দিয়ে বের হয় না। যা বের হয় তার অর্থ কেউ বুঝে না। আমি এ কী বিপদে পড়লাম!

প্রফেসর বললেন, আহামাদ, তোমার মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেন জানতে পারি ?

আমি বক্তৃতা দিতে পারি না।

এটা খুবই সত্যি কথা।

আমি ইংরেজি বললে কেউ তা বুঝতে পারে না।

কারেক্ট। আমি এতদিন তোমার সঙ্গে আছি, আমি নিজেই বুঝি না। অন্যরা কী বুঝবে।

আমি খুবই নার্ভাস ধরনের ছেলে। কী বলতে কী বলব।

দেখো আহামাদ, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে কথা বলতে পারার সৌভাগ্য সবার হয় না। তোমার হচ্ছে।

এই সৌভাগ্য আমার চাই না।

বাজে কথা বলবে না। কাজটা তুমি করেছ। আমি চাই সম্মানের বড় অংশ তুমি পাও। কেন ভয় পাচ্ছ ? আমি তোমার পাশেই থাকব।

আমি মনে মনে বললাম, ব্যাটা তুই আমাকে এ কী বিপদে ফেললি।

পনের দিনের মধ্যে চিন্তায় চিন্তায় আমার দু' পাউন্ড ওজন কমে গেল। আমার দুশ্চিন্তার মূল কারণ হচ্ছে কাজটা আধাখেচড়াভাবে হয়েছে। কেউ যদি কাজের ওপর জটিল কোনো প্রশ্ন করে বসে জবাব দিতে পারব না। এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় এত বড় বিজ্ঞান অধিবেশনে যাওয়া যায় না। ব্যাটা প্রফেসর তা বুঝবে না।

প্রফেসর তার গাড়িতে করে আমাকে লাস ভেগাসে নিয়ে গেলেন। মরুভূমির ভেতর আলো ঝলমল একটি শহর। জুয়াখেলার তীর্থভূমি। নাইট ক্লাব এবং ক্যাসিনোতে ভরা। দিনেরবেলা এই শহর ঝিম মেরে থাকে। সন্ধ্যার পর জেগে ওঠে। সেই জেগে ওঠাটা ভয়াবহ।

আমার প্রফেসরেরও এই প্রথম লাস ভেগাসে আগমন। তিনিও আমার মতোই ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছেন। হা হয়ে দেখছেন রাস্তায় অপূর্ব সুন্দরীদের ভিড়। প্রফেসর আমার কানে কানে বললেন, এই একটি জায়গাতেই প্রসটিটিউশন নিষিদ্ধ নয়। যাদের দেখছ, তাদের প্রায় সবাই ওই জিনিস। দেখবে পৃথিবীর সব সুন্দরী মেয়েরা এসে টাকার লোভে এখানে জড়ো হয়েছে।

কিছুদূর এগুতেই এক সুন্দরী এগিয়ে এসে বলল, সান্ধ্যকালীন কোনো বান্ধবীর কি প্রয়োজন আছে ?

আমি কিছু বলবার আগেই প্রফেসর বললেন, না, ওর কোনো বান্ধবীর প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি নীল চোখ তুলে শান্ত গলায় বললেন, তোমাকে তো জিজ্ঞেস করি নি। তুমি কথা বলছ কেন ?

আমি বললাম, তোমায় ধন্যবাদ, আমার বান্ধবীর প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি বলল, সুন্দর সন্ধ্যাটা একা একা কাটাবে? একগ্লাস বিয়ারের বদলে আমি তোমার পাশে বসতে পারি।

আমরা কথা না বলে এগিয়ে গেলাম। পথে আরও দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা হলো। এদের একজন মধুর ভঙ্গিতে বলল, তোমাদের কি ডেট লাগবে? লাগলে লজ্জা করবে না।

আমার প্রফেসর মুখ গম্ভীর করে আমাকে বুঝালেন, এরা ভয়াবহ ধরনের প্রস্টিটিউট। তোমার কাছ থেকে টাকাপয়সা নেবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে দেবে না। পত্রপত্রিকায় এদের সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হয়েছে।

প্রফেসরের ভাব এরকম যে গায়ে হাত দিতে দিলে তিনি রাজি হয়ে যেতেন।

রাতের খাবার খেতে আমরা যে রেস্টুরেন্টে গেলাম তা হচ্ছে টপলেস রেস্টুরেন্ট। অর্থাৎ ওয়েট্রেসদের বুকে কোনো কাপড় থাকবে না। বইপত্রে এইসব রেস্টুরেন্টের কথা পড়েছি। বাস্তবে এই প্রথম দেখলাম। আমার লজ্জায় প্রায় মাথা কাটা যাওয়ার মতো অবস্থা। মেয়েগুলিকে মনে হলো আড়ষ্ট ও প্রাণহীন। এদের মুখের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না, সবাই তাকাচ্ছে বুকের দিকে। কাজেই তারা খানিকটা প্রাণহীন হবেই। চোখের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। চোখের ওপর চোখ রেখে আমরা সেই ভাষায় কথা বলি। এইসব মেয়ে চোখের ভাষা কখনো ব্যবহার করতে পারে না। এরা বড় দুঃখী।

প্রফেসর বিরক্ত মুখে আমাকে বললেন, আমাদের এই টেবিলে বসাটাই ভুল হয়েছে। এই টেবিলের ওয়েট্রেসদের বুকের দিকে তাকিয়ে দেখো। ছেলেদের বুক এরচেয়ে অনেক ডেভেলপড় হয়। এর বুক দেখে মনে হচ্ছে প্রেইরীর সমতল ভূমি।

রাতের খাবারের পর আমরা একটা শো দেখলাম। প্রায় নগ্ন কিছু নারী-পুরুষ মিলে গান বাজনা নাচ করল। একটি জাপানি মেয়ে সারা শরীর পালকে ঢেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দর্শকদের কাছে আসছে, দর্শকরা একটা করে পালক তুলে নিচ্ছে। তার গা ক্রমশ খালি হয়ে আসছে। সর্বশেষ পালকটি তার গা থেকে খুলে নেওয়ার পর সে স্টেজে চলে গেল এবং চমৎকার একটি নাচ দেখাল। যে মেয়ে এত সুন্দর নাচ জানে তার খালি গা হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

রাত বারোটায় শো শেষ হওয়ার পর আমার প্রফেসর বললেন, লাস ভেগাসে রাত শুরু হয় বারোটার পর। এখন হোটেলে গিয়ে ঘুমুবার কোনো মানে হয় না।

আমি বললাম, তুমি কী করতে চাও?

জুয়া খেলবে নাকি?

জুয়া কী করে খেলতে হয়, আমি জানি না।

আমিও জানি না। তবে স্লট মেশিন জিনিসটা বেশ মজার। নিকেল, ডাইম কিংবা কোয়ার্টার (বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা) মেশিনের ফোকরে ফেলে একটা হাতল ধরে টানতে হয়। ভাগ্য ভালো হলে কম্বিনেশন মিলে যায়, ঝুনঝুন শব্দে প্রচুর মুদ্রা বেরিয়ে আসে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের দুজনের নেশা ধরে গেল। মুদ্রা ফেলি আর স্লট মেশিনের হাতল ধরে টানি। দেখা গেল প্রফেসরের ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। জ্যাক পট পেয়ে গেলেন। এক কোয়ার্টারে প্রায় এক শ' ডলার। তার সামনে মুদ্রার পাহাড়।

ক্যাসিনো থেকে কিছুক্ষণ পরপর বিনামূল্যে শ্যাম্পেন খাওয়ানো হচ্ছে। ক্যাসিনো যেন বিরাট এক উৎসবের ক্ষেত্র। আমি মুগ্ধ চোখে ঘুরে ঘুরে দেখলাম—ক্যাসিনোর এক একটা টেবিলে কত লক্ষ টাকারই না লেনদেন হচ্ছে। কত টাকাই না মানুষের আছে।

রাত তিনটার দিকে আমরা হোটেলে ফিরলাম। এর মধ্যে আমার প্রফেসর দু শ' ডলার হেরেছেন। আমার কাছে ছিল সত্তর ডলার, তার সবটাই চলে গেছে। আমাকে প্রফেসরের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হবে এবং তা করতে হবে আজ রাতের মধ্যেই। কারণ আমার ধারণা এই লোক আবার ক্যাসিনোতে যাবে এবং তাঁর শেষ কপর্দকও স্লট মেশিনে চলে যাবে।

রাতে একফোঁটা ঘুম হলো না। সমস্ত দিনের উত্তেজনার সঙ্গে যোগ হয়েছে আগামী দিনের সেশনের দুশ্চিন্তা।

হোটেলের যে ঘরে আমি আছি তা আহামরি কিছু নয়। দুটি বিছানা। একটিতে আমি অন্যটিতে থাকবে আমাদের ইউনিভার্সিটিরই এক ছাত্র, জিম। সে এখনো ফেরে নি। সম্ভবত কোনো ক্যাসিনোতে আটকা পড়ে গেছে। রাতে আর ফিরবে না।

আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরল। চোখের সামনে পুরো দিগম্বর হয়ে সটান পাশের বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমেরিকানদের এই ব্যাপারটা আমাকে সবসময় পীড়া দেয়। একজন পুরুষের সামনে অন্য একজন পুরুষ কাপড় খুলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

ডরমিটরি গোসলখানায় একসঙ্গে অনেকে নগ্ন হয়ে স্নানপর্ব সারে। ব্যবস্থাই এরকম। হয়তো এটাকেই এরা অগ্রসর সভ্যতার একটা ধাপ বলে ভাবছে। এই প্রসঙ্গে ওদের সঙ্গে আমি কোনো কথা বলি নি। বলতে ইচ্ছা করে নি।

কেমিক্যাল সোসাইটির মিটিংয়ে গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম। যা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। উৎসব ভালো। পেপারের চেয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাই প্রধান। আলাপের বিষয় একটাই—কেমিস্ট্রি।

এই বিষয়ের বড় বড় সব ব্যক্তিত্বকেই দেখলাম। রসায়নে দুই বছর আগে নোবেল পুরস্কার পাওয়া এক বিজ্ঞানীকে দেখলাম লালরঙের একটা গেঞ্জি পরে এসেছেন—সেখানে লেখা 'আমি রসায়নকে ঘৃণা করি'।

অধিবেশনটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একসঙ্গে অনেক অধিবেশন চলছে। যার যেটি পছন্দ সে সেখানে যাচ্ছে।

আমাদের অধিবেশনে পঞ্চাশজনের মতো বিজ্ঞানীকে দেখা গেল। আমার আগে বেলজিয়ামের লিয়েগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী পেপার পড়লেন। তাঁকে এমনভাবে চেপে ধরা হলো যে, ভদ্রলোক শুধু কেঁদে ফেলতে বাকি রাখলেন। আমি ঘামতে ঘামতে এই জীবনে যতগুলি সূরা শিখেছিলাম সব মনে মনে পড়ে ফেললাম। আমার মনে হচ্ছিল বক্তৃতার মাঝখানেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এম্বুলেন্স করে আমাকে হাসপাতালে নিতে হবে। আমার বক্তৃতার ঠিক আগে আগে প্রফেসর উঠে বাইরে চলে গেলেন। এই

প্রথম বুঝলাম চোখে সর্ষে ফুল দেখার উপমাটি কত খাঁটি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, কোনোরকম বাধা ছাড়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হলো। প্রথম প্রশ্ন শুনে আমার পিলে চমকে গেল। আমি যখন বলতে যাচ্ছি—এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, ঠিক তখনই আমার প্রফেসর উদয় হলেন এবং প্রশ্নের জবাব দিলেন। ঝড়ের মতো প্রশ্ন এল, ঝড়ের মতোই উত্তর দিলেন প্রফেসর গ্লাস। আমি মনে মনে বললাম, ব্যাটা বাঘের বাচ্চা, পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছে।

সেশন শেষে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, আমার বক্তৃতা কেমন হয়েছে ?

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, এত চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে এত বাজে বক্তৃতা আমি এই জীবনে শুনি নি।

বলেই হেসে ফেললেন এবং হাসতে হাসতে যোগ করলেন, তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ কাজটাই প্রধান, বক্তৃতা নয়।

কীভাবে সেলিব্রেট করব ?

শ্যাম্পেন দিয়ে।

আর কীভাবে ?

এক বোতল শ্যাম্পেন কেনা হলো। ব্যাটা পুরোটা গলায় ঢেলে দিয়ে গুনগুন করে গান ধরল—

`Pretty girls are everywhere
If you call me I will be there...'

শীলার জন্ম

আমার দ্বিতীয় মেয়ে শীলার জন্ম আমেরিকায়। জন্ম এবং মৃত্যুর সব গল্পই নাটকীয়, তবে শীলার জন্মমুহূর্তে যে নাটক হয়, তাতে আমার বড় ভূমিকা আছে বলে গল্পটি বলতে ইচ্ছা করছে।

তারিখটা হচ্ছে ১৫ জানুয়ারি।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। বরফে বরফে সমস্ত ফার্গো শহর ঢাকা পড়ে গেছে। শেষরাত থেকে নতুন করে তুষারপাত শুরু হলো। আবহাওয়া দপ্তর জানাল—'নিতান্ত প্রয়োজন না হলে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হবে না।'

আমার ঘরের হিটিং ঠিকমতো কাজ করছিল না। ঘর অস্বাভাবিক ঠান্ডা। দু-তিনটি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছি। এরকম দুর্যোগের দিনে ইউনিভার্সিটিতে কী করে যাব তা-ই ভাবছি। দেশে যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টি বাদলার দিনে রেইনি ডে-র ছুটি হয়ে যেত, এখানে স্নো ডে বলে তেমন কিছু নেই। চার ফুট বরফে শহর ঢাকা পড়ে গেছে, অথচ তারপরও ইউনিভার্সিটির কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে।

সকালবেলার ঘুমের মতো আরামের ব্যাপার এই জগতে খুব বেশি নেই। সেই আরাম ভোগ করছি, ঠিক তখন গুলতেকিন আমাকে ডেকে তুলে ফ্যাকাশে মুখে বলল, আমার যেন কেমন লাগছে।

আমি বললাম, ঠিক হয়ে যাবে।

বলেই আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, এটা মনে হচ্ছে ওই ব্যাপার।

ওই ব্যাপার মানে?

মনে হচ্ছে...

মেয়েরা ধাঁধা খুব পছন্দ করে। আমি লক্ষ করেছি, যে কথা সরাসরি বললেও কোনো ক্ষতি নেই সেই কথাও তারা ধাঁধার মতো বলতে চেষ্টা করে। তার ব্যথা উঠেছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, এটা বুঝতে আমার দশ মিনিটের মতো লাগল। যখন বুঝলাম তখন স্পাইন্যাল কর্ড দিয়ে হিমশীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। কী সর্বনাশ!

আমি শুকনো গলায় বললাম, ব্যথা কি খুব বেশি?

না, বেশি না। কম। তবে ব্যথাটা ঢেউয়ের মতো আসে, চলে যায়, আবার আসে। এখন ব্যথা নেই।

তাহলে তুমি রান্নাঘরে চলে যাও, চা বানাও। চা খেতে খেতে চিন্তা করি প্ল্যান অব অ্যাকশন।

চিন্তা করার কী আছে ? তুমি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে—ব্যস।

কথা না বাড়িয়ে চা বানাও। আবার ব্যথা শুরু হলে মুশকিল হবে।

সে রান্নাঘরে চলে গেল। আমি প্ল্যান অব অ্যাকশন ভাবতে বসলাম। গুলতেকিন পুরো ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছে, এটা মোটেই তত সহজ না। প্রধান সমস্যা, এই প্রচণ্ড দুর্যোগে তাকে হাসপাতালে নিয়ে পৌঁছানো। এছাড়াও ছোটখাটো সমস্যা আছে, যেমন নোভাকে কোথায় রেখে যাব ? কে তার দেখাশোনা করবে ? হাসপাতালে গুলতেকিনকে কতদিন থাকতে হবে ? এই দিনগুলিতে নোভাকে সামলাব কীভাবে ?

নাও, চা খাও। চা খেয়ে দয়া করে কাপড় পরো।

নোভাকে কী করব ?

কিছু করতে হবে না। আমি ফরিদকে টেলিফোন করে দিয়েছি, সে এসে পড়বে।

ডাক্তারকেও তো খবর দেওয়া দরকার।

খবর দিয়েছি।

কাজ তো দেখি অনেক এগিয়ে রেখেছ।

হ্যাঁ, রেখেছি। প্লিজ, চা-টা তাড়াতাড়ি শেষ করো।

চা শেষ করার আগেই ফরিদ এসে পড়ল। সে কানাডা থেকে এমএস করে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে এসেছে। এই ছেলেটি পাকিস্তানি। পাকিস্তানি কারও সঙ্গে নীতিগতভাবেই আমি কোনো যোগাযোগ রাখি না। একমাত্র ব্যতিক্রম ফরিদ। পৃথিবীতে একধরনের মানুষ জন্মায় যাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে পরের উপকার করা। পরের উপকার করার সময়টাতেই তারা খানিকটা হাসিখুশি থাকে, অন্যসময় বিমর্ষ হয়ে থাকে। আমি আমার চল্লিশ বছরের জীবনে ফরিদের মতো ভালো ছেলে দ্বিতীয়টি দেখি নি, ভবিষ্যতে দেখব সেই আশাও করি না।

নোভাকে ফরিদের কাছে রেখে আমি হাসপাতালের দিকে রওনা হলাম। বরফঢাকা রাস্তায় আমার ডজ পোলারা গাড়ি চলছে। পেছনের সিটে গুলতেকিন কাত হয়ে শুয়ে আছে, মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে কাতরাচ্ছে। আমি বললাম, ব্যথা কি খুব বেড়েছে ?

তুমি গাড়ি চালাও। কথা বলবে না। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমার মনে হচ্ছে বেশি দেরি নেই।

কী সর্বনাশ! আগে বলবে তো।

আমি একসিলেটরে পা পুরোপুরি দাবিয়ে দিলাম। গাড়ি চলল উল্কার গতিতে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলেই অ্যাকসিডেন্ট না করে সেইন্ট লিউক হাসপাতালে পৌঁছতে পারলাম।

নার্স এসে দেখেশুনে বলল, এক্ষুনি ডেলিভারি হবে, চলো ওটি-তে যাই।

গুলতেকিনের চিকিৎসকের নাম ডা. মেলয়। ডেলিভারি তিনিই করাবেন। আমেরিকান ডাক্তারদের সবার কাছেই ওয়াকিটকি জাতীয় একটি যন্ত্র থাকে। তিনি

যেখানেই থাকেন তাঁর সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করা যায়। হাসপাতাল থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। তিনি বললেন, এক মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি।

আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যখন সিগারেট ধরিয়েছি তখন হাসপাতালের মেট্রন বলল, তুমি চলো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

অপারেশন থিয়েটারে।

কেন?

তুমি তোমার স্ত্রীর পাশে থাকবে। তাকে সাহস দেবে।

ও খুবই সাহসী মেয়ে। ওকে সাহস দেওয়ার কোনো দরকার নেই।

বাজে কথা বলবে না। তুমি এসো আমার সঙ্গে। ডেলিভারির সময় আমরা কাউকে ঢুকতে দেই না। শুধু স্বামীকে থাকতে বলি। এর প্রয়োজন আছে।

আমি তেমন কোনো প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছি না।

যা ঘটতে যাচ্ছে তার অর্ধেক দায়ভার তোমার। তুমি এরকম করছ কেন?

আমি মেট্রনের সঙ্গে রওনা হলাম। ওটি-তে ঢোকার প্রস্তুতি হিসেবে আমাকে মাস্ক পরিয়ে দিল। অ্যাপ্রন গায়ে চড়িয়ে দিল। এক ধরনের বিশাল মোজায় পা ঢেকে দেওয়া হলো। আমি ওটি-তে ঢুকলাম। অপারেশন থিয়েটারটি তেমন আলোকিত নয়। আমার কাছে অন্ধকার অন্ধকার লাগল। ঘরটা ছোট এবং যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। ফিনাইলের যে কটু গন্ধ হাসপাতালে পাওয়া যায় তেমন গন্ধও পেলাম না, তবে নেশা ধরানোর মতো মিষ্টি সৌরভ ঘরময় ছড়ানো।

গুলতেকিনকে বিশেষ ধরনের একটা টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার দুপাশে দুজন নার্স। ডা. মেলয় এসে পড়েছেন, তিনি ছুরি কাঁচি গুছিয়ে রাখছেন। তাদের প্রত্যেকের মুখে মাস্ক থাকার জন্যে তাদের দেখাচ্ছিল কু ক্লাক্স ক্লান-এর সদস্যদের মতো। তাদের ঠিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল তারা যেন একদল রোবট। আমি গুলতেকিনের হাত ধরে দাঁড়ালাম।

ডেলিভারি পেইনের কথাই শুধু শুনেছি, এই ব্যথা যে কত তীব্র, কত তীক্ষ্ণ এবং কত ভয়াবহ সেই সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। এই প্রথম ধারণা হলো। ঘামে আমার সমস্ত শরীর ভিজে গেল। থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। গলাকাটা কোরবানির পশুর মতো গুলতেকিন ছটফট করছে। একসময় আমি ডাক্তারকে বললাম, আপনি দয়া করে পেইন কিলার দিয়ে ব্যথা কমিয়ে দিন। ডাক্তার নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, পেইন কিলার দেওয়া যাবে না। পেইন কিলার দেওয়ামাত্র কন্ট্রাকশনের সমস্যা হবে। আর মাত্র কিছুক্ষণ।

সেই কিছুক্ষণ আমার কাছে অনন্তকাল বলে মনে হলো। মনে হলো আমি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমার স্ত্রীর হাত ধরে প্রতীক্ষা করছি।

একসময় প্রতীক্ষার অবসান হলো, জন্ম হলো আমার দ্বিতীয় কন্যা শীলার। হাত পা ছুড়ে সে কাঁদছে, সরবে এই পৃথিবীতে তার অধিকার ঘোষণা করছে। যেন সে বলছে, এই পৃথিবী আমার, এই গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য আমার, এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি আমার।

গুলতেকিন ক্লান্ত গলায় বলল, তুমি চুপ করে আছ কেন, আজান দাও। বাচ্চার কানে আল্লাহর নাম শোনাতে হয়।

আমি আমার ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললাম, আল্লাহু আকবর...

নার্সের হাতে একটা ট্রে ছিল। ভয় পেয়ে সে ট্রে ফেলে দিল। ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, What is happening?

তাদের কোনো কথাই আমার কানে ঢুকছে না। আমি অবাক হয়ে দেখছি আমার শিশুকন্যাকে। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। পৃথিবীর রূপরসগন্ধ হয়তোবা ইতিমধ্যেই তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। আমি প্রার্থনা করলাম, যেন পৃথিবী তার মঙ্গলময় হাত প্রসারিত করে আমার কন্যার দিকে। দুঃখ-বেদনার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রগাঢ় আনন্দ বারবার আন্দোলিত করে আমার মামণিকে।

পাখি

উইন্টার কোয়ার্টার শুরু হয়েছে। শীত এখনো তেমন পড়ে নি। ওয়েদার ফোরকাস্ট হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যে প্রথম তুষারপাত হবে। এ বছর অন্যসব বছরের চেয়ে প্রচণ্ড শীত পড়বে, এরকম কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। প্রাচীন মানুষেরা আকাশের রঙ দেখে শীতের খবর বলতে পারতেন। স্যাটেলাইটের যুগেও তাদের কথা কেমন করে জানি মিলে যায়।

ভোরবেলা ক্লাসে রওনা হয়েছি। ঘর থেকে বের হয়ে মনে হলো আজ ঠান্ডাটা অনেক বেশি। বাতাসের প্রথম ঝাপটায় মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি ফিরে এসে পার্কা গায়ে দিয়ে রওনা হলাম। পার্কা হচ্ছে এমন এক শীতবস্ত্র যা পরে শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি নিচেও দিব্যি ঘোরাফেরা করা যায়।

হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি পায়ের সামনে চড়ুই পাখির মতো কালো রঙের একটা পাখি 'চিকু চিকু' ধরনের শব্দ করছে। মনে হলো শীতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আমি পাখিটিকে হাতে উঠিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার আঙুলে ঠোঁট ঘষতে লাগল। আমার মনে হলো পাখিদের কায়দায় সে বলল, তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তাকে নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। উদ্দেশ্য, আমার কন্যাকে পাখিটা দেব। সে জীবন্ত খেলনা পেয়ে উল্লসিত হবে। শিশুদের উল্লাস দেখতে বড় ভালো লাগে।

আমার কন্যা পাখি দেখে মোটেই উল্লসিত হলো না। ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগল। মুগ্ধ হলো মেয়ের মা। সে বারবার বলতে লাগল, ও মা কী সুন্দর পাখি! ঠোঁটগুলো দেখো, মনে হচ্ছে চব্বিশ ক্যারেট সোনার তৈরি। সে পাখিকে পানি খেতে দিল, ময়দা গুলে দিল। পাখি কিছুই স্পর্শ করল না। একটু পরপর বলতে লাগল 'চিকু চিকু'। ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছিল, আমি ক্লাসে চলে গেলাম। পাখির কথা আর মনে রইল না।

বিকেল তিনটার দিকে আমার কাছে একটা টেলিফোন এল। এক আমেরিকান তরুণী খুবই পলিশড গলায় বলল, মি. আমেদ, তুমি কি কোনো পাখি কুড়িয়ে পেয়েছ?

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এই খবর জানলে কোত্থেকে?

আমার বস আমাকে বললেন, আমি ফারগো পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির অফিস থেকে বলছি।

আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, পাখিকে বাসায় নিয়ে যাওয়া কি বেআইনি?

না, বেআইনি নয়। আমরা তোমার পাখিকে পরীক্ষা করতে চাই। মনে হচ্ছে ওর ডানা ভেঙে গেছে।

আমি কি পাখিকে নিয়ে আসব?

তোমাকে আসতে হবে না, আমাদের লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। তোমার অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বার বলো।

আমি নাম্বার বললাম। এবং মনে মনে ভাবলাম, এ-কী যন্ত্রণায় পড়া গেল!

বাসায় এসে দেখি পাখিটির জন্যে আমার স্ত্রী কার্ডবোর্ডের একটা বাসা বানিয়েছে। নানান খাদ্যদ্রব্য তাকে দেওয়া হচ্ছে। সে কিছু কিছু খাচ্ছেও। তবে আমার কন্যার ভয় ভাঙে নি। সে মার কোল থেকে নামছে না। পাখির কাছে নিয়ে গেলেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে।

আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম পাশের অ্যাপার্টমেন্টের এক মহিলা এসেছিলেন বেড়াতে, পাখি দেখে তিনিই টেলিফোন করেন।

পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির লোক এসে সন্ধ্যার আগে পাখি নিয়ে গেল। রাত আটটায় টেলিফোন করে জানাল যে পাখিটার ডানা ভাঙা। এক্সরেতে ধরা পড়েছে। তাকে পশু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ডানা জোড়া লাগানো যায়। যদিও এসব ক্ষেত্রে চেষ্টা সাধারণত ফলপ্রসূ হয় না।

আমি মনে মনে ভাবলাম, এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণা হলো। মুখে বললাম, আমি খুবই আনন্দিত যে পাখিটার একটা গতি হচ্ছে। পাখি নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

সাতদিন কেটে গেল। পাখির কথা প্রায় ভুলতে বসেছি, তখন টেলিফোন এল হাসপাতাল থেকে। ডাক্তার সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, ডানা জোড়া লেগেছে।

আমি বললাম, ধন্যবাদ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পাখিটি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আমার মেয়ে এই পাখি ঠিক পছন্দ করছে না। সে উলের কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে পাখিটাকে মেরে ফেলতে পারে বলে আমার ধারণা।

তাহলে তো বিরাট সমস্যা হলো।

কী সমস্যা?

দেখো, এটা হচ্ছে মাইগ্রেটরি বার্ড। শীতের সময়ে গরমের দেশে উড়ে চলে যায়। সমস্যাটা হলো ফারগোতে শীত পড়ে গেছে। এই গোত্রের পাখি সব উড়ে চলে গেছে। একমাত্র তোমার পাখিটিই যেতে পারে নি।

এখন করণীয় কী?

ছ'মাস পাখিটাকে পালতে হবে। গোটা শীতকালটা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি তোমাকে আগেই বলেছি আমার পক্ষে সম্ভব না।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, কোন কুক্ষণে না জানি এই পাখি ঘরে এনেছিলাম।

একদিন পর আবার পশুপখি ক্লেশ নিবারণ সমিতির বড়কর্তার টেলিফোন, আমেদ, তুমি নাকি তোমার পাখি নিতে রাজি হচ্ছ না?

এটা আমার পাখি না। বনের পাখি। খানিকক্ষণের জন্যে বাসায় নিয়ে গিয়েছিলাম।

পাখিটির এই দুঃসময়ে তুমি তার পাশে দাঁড়াবে না? এই মাইগ্রেটরি পাখি যাবে কোথায়?

আমি খাঁটি বাংলা ভাষায় বললাম, জাহান্নামে যাক।

তুমি কী বললে ?

বললাম যে তোমরা একটা ব্যবস্থা করো। আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার মেয়ে পাখি পছন্দ করে না। আমি বরং এই ছ'মাস পাখিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে যা খরচ হয় তা দিতে রাজি আছি।

ভদ্রলোক বললেন, দেখি কী করা যায়।

বাকি দিনগুলি আতঙ্কের মধ্যে কাটতে লাগল। টেলিফোন বাজলেই চমকে উঠি, ভাবি, এই বুঝি পশুপাখিওয়ালারা নতুন ঝামেলা করছে।

দিন দশেক পার হলো। আমি হাঁপ ছেড়ে ভাবলাম, যাক আপদ চুকেছে। তখন আবার টেলিফোন। সেই পশুপাখি ক্লেশ নিবারণ সমিতি। তবে এবার তাদের গলায় আনন্দ ঝরে পড়ছে।

আমেদ, সুসংবাদ আছে।

কী সুসংবাদ ?

তোমার পাখির একটা গতি করা গেছে।

তাই নাকি ? বাহ, কী চমৎকার!

আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সিয়াটল ওয়াশিংটনে এই পাখি এখনো আছে। সিয়াটলে শীত এখনো তেমন পড়ে নি। কাজেই পাখিরা মাইগ্রেট করে নি।

বলো কী ?

আমরা তোমার পাখিটি সিয়াটলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সিয়াটলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, সে অন্য পাখিদের সঙ্গে মিশে মাইগ্রেট করবে।

অসাধারণ।

আগামী মঙ্গলবার পাখিটি সিয়াটল যাচ্ছে। তুমি বেলা তিনটায় গ্রেহাউন্ড বাস স্টেশনে চলে আসবে। শেষবারের মতো তোমার পাখিটাকে 'হ্যালো' বলবে।

অবশ্যই বলব।

সিয়াটল ফার্গো থেকে তিন হাজার মাইল দূরে। পাখিটাকে খাঁচায় করে গ্রে হাউন্ড বাসের ড্রাইভারের হাতে তুলে দেওয়া হলো। আমি হাত নেড়ে পাখিটাকে বাই জানালাম।

মনে মনে বললাম, এই আমেরিকানরাই মাই লাই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। বোমা ফেলে হিরোশিমা নাগাশিকিতে। কী করে তা সম্ভব হয় কে জানে!

ক্যাম্পে

আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল আমেরিকানরা জাতি হিসেবে আধাপাগল। এদের রক্তে পাগলামি মিশে আছে। এমনসব কাণ্ডকারখানা করে যা বিদেশি হিসেবে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার থাকে না। যেমন ওদের ক্যাম্পিংয়ের ব্যাপারটা ধরা যাক। আগে ক্যাম্পিং বিষয়ে কিছুই জানতাম না। কেউ আমাকে কিছু বলেও নি। নিজেই লক্ষ করলাম, সামারের ছুটিতে দলবল নিয়ে এরা কোথায় যায়। ফিরে আসে কাকতাড়ুয়া হয়ে, গায়ের চামড়া খসখসে, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চুল উস্কুখুস্কু। ওজনও অনেক কমে গেছে। সেই কারণেই হয়তো সবাইকে খানিকটা লম্বা দেখায়। কোথায় গিয়েছিলে জিজ্ঞেস করলে বলে, ক্যাম্পে।

সেটা কী ?

ক্যাম্পিং কী তুমি জানো না ?

না।

আমার 'না' শুনে তারা এমন একটি ভঙ্গি করে—যেন আমার মতো জংলি এ দেশে কেন এল তা তারা বুঝতে পারছে না।

খোঁজ নিয়ে জানলাম প্রতিটি আমেরিকান পরিবার বছরে খানিকটা জঙ্গলে কাটায়। তাঁবুটাবু নিয়ে কোনো-এক বিজন বনে চলে যায়। একে তারা বলে প্রকৃতির কাছাকাছি চলে যাওয়া।

ল্যাবরেটরিতে আমার সঙ্গে কাজ করে কোয়াভাল। সে তার ছেলেবন্ধুকে নিয়ে ক্যাম্পিংয়ে গেল। ফিরে এল হাতে এবং পায়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন নিয়ে। গিজলি বিয়ার (প্রকাণ্ড ভালুক) নাকি তাদের তাঁবু আক্রমণ করেছিল। ভয়াবহ ব্যাপার। অথচ রুথ কোয়াভাল এমন ভাব করছে যেন জীবনে এরকম ফান হয় নি। আমি মনে মনে বললাম, বদ্ধ উন্মাদ।

উন্মাদ রোগ সম্ভবত ছোঁয়াচে, কারণ পরের বছর আমি নিজেও ক্যাম্পিংয়ে যাব বলে ঠিক করে ফেললাম। দেখাই যাক ব্যাপারটা কী। আমার দ্বিতীয় মেয়েটির বয়স তখন তিন মাস। ফার্গো শহরে যে কটি বাঙালি পরিবার সে সময় ছিল সবাই আমাকে আটকাবার চেষ্টা করল। তাদের যুক্তি—এত বাচ্চা একটা মেয়ে নিয়ে এরকম পাগলামির কোনো মানে হয় না। মানুষের উপদেশ আমি খুব মন দিয়ে শুনি, তবে উপদেশমতো কখনো কিছু করি না। কাজেই চল্লিশ ডলার দিয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে একটা তাঁবু ভাড়া করলাম, একটা এলুমিনিয়ামের নৌকা ভাড়া করলাম, আর ভাড়া করলাম ক্যাম্পিংয়ের জিনিসপত্র। সেইসব জিনিসপত্রের মধ্যে আছে কুড়াল, ফার্স্ট এইড বক্স, সাপে কাটার ওষুধ এবং কী আশ্চর্য একটা হারিকেন। খোদ আমেরিকাতেও যে কেরোসিনের হারিকেন পাওয়া যায় কে জানত।

যথাসময়ে গাড়ির ছাদে নৌকা বেঁধে রওয়ানা হয়ে গেলাম। গায়ে ক্যাম্পিংয়ের পোশাক—হাফপ্যান্ট ও বস্তার মতো মোটা কাপড়ের ফ্ল্যাপ দেওয়া শার্ট, মাথায় ক্রিকেট আম্পায়ারদের টুপির মতো ধবধবে সাদা টুপি। গাড়ি চলছে ঝড়ের গতিতে। বনে যাওয়ার এই হচ্ছে নিয়ম। স্পীডিংয়ের জন্যে পুলিশ অবশ্যই গাড়ি থামাবে, তবে যখন বুঝবে এই দল ক্যাম্পিংয়ে যাচ্ছে তখন কিছু বলবে না। ক্যাম্পিংয়ের প্রতি সবারই কিছুটা দুর্বলতা আছে।

ফার্গো শহর থেকে দু শ' দশ কিলোমিটার দূরে একটা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে গাড়ি থামালাম। সমস্ত আমেরিকা জুড়ে অসংখ্য ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে ঢোকা যায়। সেখানে ছোটখাটো একটা অফিস থাকে। বিজন জংলি জায়গা হলেও অফিসটা খুব আধুনিক হয়। টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকে, ছোটখাটো বার থাকে, গ্রোসারি শপ এবং বেশ কিছু ভেন্ডিং মেশিন থাকে। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী মিলে অফিস ও দোকানপাট দেখাশোনা করেন।

আমার গাড়ি ঢোকামাত্রই ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডের ওয়ার্ডেন বিশালদেহী এক আমেরিকান বের হয়ে এল এবং অনেকটা মুখস্থ বক্তৃতার মতো বলল, তুমি চমৎকার একটি জায়গায় এসেছ। এর চেয়ে ভালো ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড নর্থ আমেরিকায় আর নেই। আমরা তুলনামূলকভাবে টাকা বেশি নিই, তবে একরাত কাটালেই বুঝতে পারবে কেন নিই। এমন অপূর্ব দৃশ্য তুমি কোথাও পাবে না। তোমার সামনে সন্ট হ্রদের নীল জলরাশি, পেছনে গভীর বন। এছাড়াও তুমি পাচ্ছ আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ, যেমন খবরের কাগজ এবং ফ্ল্যাশ টয়লেট...

ভদ্রলোকের বক্তৃতার মাঝখানেই আমি বললাম, কত দিতে হবে?

দেখা গেল টাকার পরিমাণ আসলেই অনেক বেশি। হ্রদে নৌকা ভাসানোর জন্যে ফি দিতে হলো, মাছ কেনার জন্যে পারমিট কিনতে হলো... নানান ফ্যাকড়া।

ঝামেলা মিটিয়ে রওয়ানা হলাম জায়গা বাছতে। কোথায় তাঁবু ফেলব সেই জায়গা। ওয়ার্ডেনের স্ত্রী (উনার সাইজও কিংকং-এর মতো) আমাকে সাহায্য করতে নিজেই এগিয়ে এলেন। হ্রদের পাশে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল। কাচের মতো স্বচ্ছ জল। দশ ফুট নিচের পাথরের খণ্ডটিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হ্রদ যত না সুন্দর পেছনের অরণ্য তার চেয়েও সুন্দর। যে-কোনো সুন্দর জিনিসের সঙ্গে খানিকটা বিষণ্নতা মেশানো থাকে। আমার মন বিষণ্ন হয়ে গেল। গুলতেকিন বলছে, এত সুন্দর! এত সন্দুর!

হ্রদের কাছাকাছি তাঁবু খাটাবার জায়গা ঠিক করে কিংকং ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানালাম। ভদ্রমহিলা যাওয়ার আগে বলে গেলেন, ক্যাম্পিংয়ের যাবতীয় জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে তাদের কাছে ভাড়া পাওয়া যাবে। তবে তারা চেক গ্রহণ করেন না। পেমেন্ট হবে ক্যাশে।

সকাল এগারটার মতো বাজে। ঝকঝকে রোদ উঠেছে, বাতাসে ঘাসের বিচিত্র গন্ধ, চারদিক নিঝঝুম। ফ্ল্যাক্সভর্তি করে চা এনেছিলাম। চা শেষ করে প্রবল উৎসাহে তাঁবু খাটাতে লেগে গেলাম। তাঁবুর সঙ্গে একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়েল আছে। কোন খুঁটি

কীভাবে পুঁততে হয়, তাঁবুর কোন আংটা কোন খুঁটিতে যাবে সব পরিষ্কার করে লেখা। কাজটা খুবই সহজ মনে হলো। ঘণ্টাখানেক পার হওয়ার পর বুঝলাম কাগজপত্রে কাজটা যত সহজ মনে হচ্ছিল আসলে তত সহজ নয়। তাঁবুর একটা দিক যখন কোনোমতে দাঁড়ায় তখন অন্যদিক ঝুলে পড়ে। সেইটা ঠিক করতে যখন যাই তখন গোটা তাঁবু মাটিতে শুয়ে পড়ে। আমার স্ত্রী এই দু'ঘণ্টায় পঞ্চাশবারের মতো ঘোষণা করল যে, আমার মতো অকর্মণ্য মানুষ সে আর দেখে নি। সে হলে দশ মিনিটের মাথায় নাকি তাঁবু ঠিক কবে ফেলত। আমি তাকে তার প্রতিভা প্রমাণ করার সুযোগ দিলাম। এবং আবও এক ঘণ্টা নষ্ট হলো। দেখা গেল তাঁবু খাটানোয় তার প্রতিভা আমাব মতোই।

আমাদের তাঁবু কেমন খাটানো হয়েছে দেখার জন্যে ওয়ার্ডেনের স্ত্রী বিকেলের দিকে এলেন এবং বললেন, সামান্য ফিসের বিনিময়ে তাঁবু খাটানোর কাজটা তাঁরা করে দেন।

ফি দেওয়া হলো এবং চমৎকার তাঁবু তারা খাটিয়ে দিল। দুপুরে আমাদের কিছু খাওয়া হয় নি। খিদেয় প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। বন থেকে কুড়াল দিয়ে কাঠ কেটে এনে আগুনে মাংস ঝলসে খাওয়াই হচ্ছে নিয়ম।

কাঠ যোগাড় হলো, কিন্তু কিছুতেই আগুন ধরানো গেল না। কেরোসিন ঢেলে দিলে আগুন জ্বলে ওঠে, খানিকক্ষণ জ্বলে তারপর আর নেই। আমি ওয়ার্ডেনের স্ত্রীকে (মিসেস সিমসন) গিয়ে বললাম, আপনি কি সামান্য ফিসের বিনিময়ে আমাদের চুলাটা ধরিয়ে দিবেন?

ভদ্রমহিলা আমার রসিকতায় খুবই বিরক্ত হলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, কেরোসিন কুকার পাওয়া যায়। তার একটি নিতে পার।

দশ ডলার দিয়ে কোরোসিন কুকার ভাড়া করলাম। দুপুরে লাঞ্চ শেষ হলো সন্ধ্যার আগে আগে। আমাদের মতো প্রচুর ক্যাম্পযাত্রী এখানে এসেছে, তবে তারা সবাই চলে গেছে বনের দিকে। জলের দেশের মানুষ বলে আমরাই একমাত্র জলের কাছাকাছি আছি। বনের চেয়ে জল আমাকে বেশি আকর্ষণ করে।

সন্ধ্যায় নৌকায় খানিকক্ষণ বেড়ালাম। আমেরিকান নিয়ম অনুযায়ী সবার জন্যে লাইফ জ্যাকেট ভাড়া করতে হলো, আরও কিছু টাকা পেলেন মিসেস সিমসন। নৌকায় থাকতে থাকতে চাঁদ উঠে গেল। বিশাল চাঁদ। পঞ্জিকা দেখে রওয়ানা হই নি। পাকেচক্রে পূর্ণিমার মধ্যে পড়ে গেছি। হ্রদের নিস্তরঙ্গ জলে চাঁদের ছায়া, দূরে বনরাজি, পাখপাখালির ডাক, অদ্ভুত পরিবেশ। আমি চিরকাল শহরবাসী, কাজেই পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। বারবার মনে হচ্ছে স্বর্গের যেসব বর্ণনা ধর্মগ্রন্থগুলিতে আছে সেই স্বর্গ কি এর চেয়েও সুন্দর?

তাঁবুতে ফিরলাম সন্ধ্যা মিলাবার অনেক পরে। গুলতেকিন রাতের খাবার রাঁধতে বসল। আমি বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বের হলাম। সে বলল, এই বনে কি বাঘ আছে?

আমি বললাম, আছে।

সে বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, বাঘ আমাদের কখন খেয়ে ফেলবে বাবা ?

জগতের সত্যগুলি শিশুরা খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। কখনোই তেমন বিচলিত হয় না। শিশুদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে।

দূর্বাঘাসের চাদরে আদিগন্ত ঢাকা। বড় গাছগুলির অধিকাংশের নাম আমি জানি না। উইলী, ওক এবং ইউক্লিপটাস চিনতে পারছি। চাঁদের আলোয় চেনা গাছগুলিকেও অচেনা লাগছে।

একসময় আমাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার জন্যে আমার প্রাচ্যদেশীয় চোখ প্রস্তুত ছিল না। একদল তরুণ-তরুণী বনের ভেতর ছোটাছুটি করছে। তাদের গায়ে কাপড়ের কোনো বালাই নেই।

আমি শুনেছি আমেরিকানরা গভীর বনে প্রবেশ করার পর সভ্যতার শিকল—কাপড়চোপড় খুলে ফেলে। ফিরে যায় আদম এবং হাওয়ার যুগে। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা যার নাম। এই দৃশ্য নিজের চোখে কখনো দেখব তা ভাবি নি।

দৃশ্যটি আমার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক বা অশ্লীল মনে হলো না। বরং মনে হলো এটাই স্বাভাবিক, এটাই হওয়া উচিত।

আমার মেয়ে বলল, বাবা, ওদের কি খুব গরম লাগছে ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চলো আমরা ফিরে যাই।

আমি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম। কত রাত তা জানা হলো না, ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করল না। মেয়ে দুটি তাঁবুতে ঘুমুচ্ছে। আমি এবং গুলতেকিন তাঁবুর বাইরে বসে আছি। স্বামী-স্ত্রীরা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ভালোবাসাবাসির কথা কখনো বলে না। সেই রাতে আমরা বিয়ের আগের সময়ে কেমন করে যেন ফিরে গেলাম। পাশে বসা তরুণীটিকে অচেনা মনে হতে লাগল। বারবার মনে হচ্ছিল—এত আনন্দ আছে পৃথিবীতে!

ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখা আমার কখনো হয়ে ওঠে না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, অনেক রাতে ঘুমুতে যাওয়ার পরেও জেগে উঠলাম সূর্য ওঠার আগে।

সূর্যোদয়ের দৃশ্যটি এত সুন্দর কখনো ভাবি নি। আগে জানতাম না, সূর্যটাকে ডিমের কুসুমের মতো দেখায়, জানতাম না ভোরবেলায় সূর্য এত বড় থাকে। এই সূর্য আকাশে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, তাও জানা ছিল না।

সকালে নাশতা হলো দুধ এবং সিরিয়েলের। নাশতার পর দলবল নিয়ে মাছ ধরতে বের হলাম। আমেরিকায় বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে চাইলে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছ থেকে লাইসেন্স করতে হয়। লাইসেন্সের ফি পনের ডলার। লাইসেন্স করা ছিল, তারপরও বুড়ি সিমসনকে পাঁচ ডলার দিতে হলো। এটা নাকি লেক রক্ষণাবেক্ষণের ফি। বড়শি ফেলে মূর্তির মতো বসে থাকার কাজটি খুব আনন্দদায়ক হবে মনে করার কোনো কারণ নেই—

তবু যেহেতু লাইসেন্স করেছি কাজেই বসে রইলাম। শুনেছিলাম আমেরিকান লেকভর্তি মাছ, টোপ ফেলতে হয় না, সুতা ফেললেই হয়, সুতা কামড়ে মাছ উঠে আসে। বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটল না। আমি পুরো পরিবার নিয়ে মাছ ধরার আশায় ঝাঁ ঝাঁ রোদে তিনঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। মাছের দেখা নেই। একসময় বুড়ি সিমসন এসে উদয় হলেন এবং গম্ভীর গলায় বললেন, লেকের কোন জায়গায় মাছ টোপ খায় এবং কখন কীভাবে বড়শি ফেলতে হয় সেই বিষয়ে তাদের একটি বুকলেট আছে, সামান্য অর্থের বিনিময়ে তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কী ভয় ? কিনলাম বুকলেট এবং সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ। বিশাল এক নরদার্ন পাইক ধরে ফেললাম। এই আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ মৎস্য শিকার। আমার বড় মেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, বাবা, এটা কি তিমি মাছ ? বাবা, আমরা কি একটা তিমি মাছ ধরে ফেলেছি ?

দুপুরে লাঞ্চ হলো সেই মাছ। ওয়েস্টার্ন ছবির কায়দায় আগুনে ঝলসিয়ে লবণ ছিটিয়ে খাওয়া। অন্যসময় এই মাছ আমি মুখেও দিতে পারতাম না। কিন্তু পরিবেশের কারণে সেই আগুনে ঝলসানো অখাদ্যকেও মনে হলো স্বর্গের কোনো খাবার।

লাঞ্চ শেষ হওয়ার আগেই একটা দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। জানা গেল ন'বছর বয়সী একটা ছেলে দলছুট হয়ে বনে হারিয়ে গেছে। ছেলেটির বাবা-মা ভাইবোন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। বনে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন কিছু না।

টিভি এবং খবরের কাগজে প্রায়ই এরকম খবর আসে। গত বছর উনিশ বছর বয়সী একটা মেয়ে মন্টানার এক বনে হারিয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করা হয় তের দিন পরে। সে এই তের দিন ব্যাঙ, সাপখোপ লতাপাতা খেয়ে বেঁচে ছিল। কেউ কেউ ইচ্ছে করেই বনে থেকে যায়। তেত্রিশ দিন পর হারিয়ে যাওয়া এক দম্পতিকে খুঁজে বের করার পর তারা বলেন, নাগরিক সভ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা বনে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা ভালোই আছেন। শহরে ফিরতে চান না।

ন' বছর বয়সী শিশুটির নিশ্চয়ই এরকম কোনো সমস্যা নেই। সে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে। ক্যাম্পে সাজসাজ রব পড়ে গেল। স্টেট পুলিশকে খবর দেওয়া হলো। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে দুটি হেলিকপ্টার বনের উপর দিয়ে চক্রাকারে উড়তে লাগল। হেলিকপ্টার থেকে জানানো হলো বাচ্চাটিকে দেখা যাচ্ছে। একটা ফাঁকা জায়গায় আছে, নিজের মনে খেলছে। ভয়ের কিছু নেই।

বাচ্চাটিকে যখন উদ্ধার করা হলো, সে গম্ভীর গলায় বলল, আমি হারাব কেন ? আমার পকেটে তো কম্পাস আছে।

দুদিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছিলাম, এক সপ্তাহ থেকে গেলাম। মিসেস সিমসন একদিন এসে বললেন, তোমরা আর থেকো না। বেশিদিন থাকলে নেশা ধরে যাবে। আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না। এই আমাদের দেখো, বছরের পর বছর এই জায়গায় পড়ে আছি। ঘণ্টাখানিকের জন্যেও শহরে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মিসেস সিমসন বললেন, সতের বছর আগে আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে ক্যাম্পিংয়ে এই জায়গায় এসেছিলাম। এতই ভালো লাগল যে, লিজ নিয়ে ক্যাম্পিং স্পট বানালাম। তারপর থেকে এখানেই আছি। বছরে তিনটা মাস লোকজনের দেখা পাই, তারপর দুজনে একা একা কাটাই।

কষ্ট হয় না?

না। বনের অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে। তোমরা যারা দু'একদিনের জন্যে আসো, তারা তা ধরতে পার না। আমরা পারি। পারি বলেই...

মিসেস সিমসন তাঁর কথা শেষ করলেন না। আমি বললাম, রহস্যময় ব্যাপারগুলি কী?

ওই সব তোমরা বিশ্বাস করবে না। ওই প্রসঙ্গ বাদ থাক।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বনের দিকে তাকালেন। রহস্যময় বন হয়তো কানে কানে তাকে কিছু বলল। দেখলাম তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মিসেস সিমসন বললেন, একটা মজার ব্যাপার কী জানো? সমুদ্র মানুষকে আকর্ষণ করে। এত যে সুন্দর সমুদ্র তার পাশেও তিন-চার দিনের বেশি মানুষ থাকতে পারে না। আর বন মানুষকে আকর্ষণ করে। মানুষকে সে চলে যেতে দেয় না। পুরোপুরি গ্রাস করতে চেষ্টা করে। কাজেই তোমরা চলে যাও।

আমরা চলে গেলাম।

সব মিলিয়ে সাত দিন ছিলাম। মিসেস সিমসন তিন দিনের ভাড়া রাখলেন। শান্ত গলায় বললেন, তোমরা তিন দিন থাকতে এসেছিলে সেই তিন দিনের রেন্ট-ই আমি রেখেছি। বাকি দিনগুলি কাটিয়েছ অতিথি হিসেবে। বনের অতিথি। বন তোমাদের আটকে রেখেছে। কাজেই সেই চার দিনের ভাড়া রাখার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

নামে কী-ইবা আসে যায়

'সামার হলিডে' শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সবার মনই এই সময় খানিকটা তরল অবস্থায় থাকে। অত্যন্ত কঠিন অধ্যাপককেও এই সময় নরম এবং আদুরে গলায় কথা বলতে দেখা যায়।

আমার অধ্যাপকের নাম জোসেফ এডওয়ার্ড গ্লাস। গ্লাস নামের সার্থকতা বুঝানোর জন্যেই হয়তো ভদ্রলোক কাচের মতো কঠিন এবং ধারালো। সামার হলিডের তারল্য তাঁকে স্পর্শ করে নি। ভোর ন'টায় ল্যাবে এসে দেখি সে একটা বিকারে কপার সালফেটের সল্যুসন বানিয়ে খুব ঝাঁকাচ্ছে। নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, ভোরবেলা গ্লাসের সঙ্গে দেখা হলে সারাটা দিন খারাপ যাবে।

গ্লাসকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রবাদের কারণে নয়। মন খারাপ হলো কারণ ব্যাটার আজ থেকে ছুটিতে যাওয়ার কথা। যায় নি যখন তখন বুঝতে হবে সে এই সামারে ছুটিতে যাবে না। ছুটির তিন মাস আমাকে জ্বালাবে। কারণ, জ্বালানোর জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ল্যাবে নেই। সবাই ছুটি নিয়ে কেটে পড়েছে।

আমি প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে নিষ্প্রাণ গলায় বললাম, হাই।

গ্লাস আনন্দে সব ক'টা দাঁত বের করে বলল, তুমি আছ তাহলে। থ্যাংকস। এসো দু'জনে মিলে এই সল্যুশানটার ডিফারেনশিয়েল রিফ্রেকটিভ ইনডেক্স বের করে ফেলি।

আমি বললাম, এটা সম্ভব না। আমি আমার নিজের কাজ করব। এর মধ্যে তুমি আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হব।

বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকারা আমার জবাব শুনে হয়তো আঁতকে উঠেছেন। আমার পিএইচডি গাইড বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রায় ঈশ্বরের মতো ক্ষমতাবান একজন অধ্যাপকের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলা যায় কি না তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে না, তবে আমেরিকান চরিত্র সম্পর্কে যাদের কিছুটা ধারণা আছে, তারাই বুঝবেন আমার জবাব হচ্ছে যথাযথ জবাব।

প্রফেসর গ্লাস খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে বলল, হামাদ, এটা সামান্য কাজ। এক ঘন্টাও লাগবে না।

আমি বললাম, আমাকে হামাদ ডাকছ কেন? আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ। হামাদটা তুমি পেলে কোথায়?

নাম নিয়ে তুমি এত যন্ত্রণা করো কেন হামাদ? নামে কী-ইবা যায় আসে? আমি একজন ওল্ডম্যান। তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি কাজটা করে দিতে। আর তুমি নাম নিয়ে যন্ত্রণা শুরু করে দিলে।

আমি ডিফারেনসিয়েল রিফ্রেকটিভ ইনডেক্স বের করে দিলাম। ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা লাগল। কোনোকিছুই হাতের কাছে নেই। সবাই ছুটিতে। নিজেকে ছোটাছুটি করে প্রত্যেকটি জিনিস জোগাড় করতে হয়েছে।

প্রফেসর গ্লাস আমার পাশেই চুরুট হাতে বসে খুব সম্ভব আমাকে খুশি রাখবার জন্যেই একের পর এক রসিকতা করছে। রসিকতাগুলোর সাধারণ নাম হচ্ছে ডার্টি জোকস। ভয়াবহ ধরনের অশ্লীল।

বিকেল পাঁচটায় ল্যাব বন্ধ করে বাসায় ফেরার আগে আগে গ্লাসের কামরায় উঁকি দিলাম। গ্লাস হাসিমুখে বলল, কিছু বলবে হামাদ ?

হ্যাঁ, বলব। আগেও কয়েকবার বলেছি। আজও বলব।

তোমার নামের উচ্চারণের ব্যাপার তো ?

হ্যাঁ।

উচ্চারণ করতে পারি না বলেই তো একটু এলোমেলো হয়ে যায়। এতে এত রাগ করার কী আছে ? আমেরিকানদের জিহ্বা শক্ত।

আমেরিকানদের জিহ্বা মোটেই শক্ত নয়। অনেক কঠিন উচ্চারণ এরা অতি সহজেই করে। তোমরা যখন কোনো ফরাসি রেস্টুরেন্টে যাও তখন খাবারের ফরাসি নামগুলো খুব আগ্রহ করে উচ্চারণ করো না ?

গ্লাস গম্ভীর চোখে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না।

আমি বললাম, এসো আমার সঙ্গে চেষ্টা করো, বলো হুমায়ূন।

গ্লাস বলল, হেমেন।

আমি বললাম, হলো না, আবার বলো হুমায়ূন। হু-মা-য়ূ-ন।

গ্লাস বলল, মায়ান।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। আমেরিকায় পা দেওয়ার পর থেকে যে জিনিসটি আমাকে পীড়া দিচ্ছে সেটা হচ্ছে শুদ্ধভাবে এরা বিদেশিদের নাম বলতে চায় না। ভেঙেচুরে এমন করে যে রাগে গা জ্বলে যায়। মোরহেড স্টেট ইউনিভার্সিটির মিজানুল হককে বলে হাকু। হাকু পারলে হক বলতে অসুবিধা কোথায় ? অন্য বিদেশিরা এই ব্যাপারটি কীভাবে নেয় আমি জানি না। আমার অসহ্য বোধ হয়।

হংকংয়ের চাইনিজ ছাত্রদের দেখেছি এ ব্যাপারে খুবই উদার। তারা আমেরিকানদের উচ্চারণ সাহায্য করার জন্যে নিজেদের চাইনিজ নাম পাল্টে পড়াশোনার সময়টার জন্যে একটা আমেরিকান নাম নিয়ে নেয়। যার নাম চ্যান ইয়েন সে হয়তো খণ্ডকালীন একটা নাম নিল, মি. ব্রাউন। দীর্ঘ চার বছরের ছাত্রজীবনে সবাই ডাকবে মি. ব্রাউন। যদিও তার আসল নাম চ্যান ইয়েন। হংকংয়ের চাইনিজগুলো এই কাজটি কেন করে কে জানে। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে দার্শনিকের মতো বলল, ভুল উচ্চারণে আসল নাম বলার চেয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে নকল নাম বলা ভালো। তা ছাড়া নাম

আমেরিকানদের কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা হচ্ছে ফাজিলের দেশ। নামের মধ্যেও এরা ফাজলামি করে। তাই না ?

নাম নিয়ে যে এরা যথেষ্ট ফাজলামি করে সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নেই। এরা পশুর নামে নাম রাখে। যেমন, Mr. Fox, Mr. Lion, Mr. Lamb। এরা কীটপতঙ্গের নামে নাম রাখে। যেমন, Mr. Beetle (গুবরে পোকা)। একটা নাম পেয়েছিলাম যার বাংলা মানে—ষাঁড়ের গোবর (Mr. Bull dung Junior)। অবশ্যি বাংলা ভাষাতেও খাদু, গেদা ধরনের নাম রাখা হয়। তবে সেসব নাম নিয়ে আমরা বড়াই করি না। আমেরিকানরা করে। আমি একজন আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র পেয়েছিলাম, সে খুবই বড়াই করে বলল, আমার নাম Back Bison (বাইসনের পাছা)।

ধরাকে সরা জ্ঞান করার একটা প্রবণতা আমেরিকানদের আছে। ঢাকা শহরে একবার এক আমেরিকানকে খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছি। গাড়িতে একজন বাঙালি তরুণী এবং দুইজন বাঙালি যুবক। আমি জানি না, তবে আমার বিশ্বাস, আমেরিকানটির খালি গায়ে গাড়ি চালানোর যুক্তি বোধহয় এদেশে গরম। আমাদের প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতায় এই আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়, এটা তারা জেনেও এই কাজ করবে। ভাবটা এরকম, আমরা কোনো কিছুই পরোয়া করি না। এরা যখন আমাদেব দেশে আসবে তখন আমাদের আচার-আচরণকে সম্মান করবে, এটা আমার বিশ্বাস, আশা করব। তারা যখন তা করবে না তখন মনে করিয়ে দেব যে তারা যা করছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা প্রায় কখনোই তা করি না। সাদা চামড়া দেখলে এখনো আমাদের হুঁশ থাকে না। যাক পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

আমি খুব যে একজন বিপ্লবী ধরনের ছেলে তা নয়। বড় বড় অন্যায় দেখি কিন্তু তেমন কোনো সাড়াশব্দ করি না। সবসময় মনে হয় প্রতিবাদ অন্যেরা করবে, আমার ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই। তবু বিকৃত উচ্চারণে বিদেশিদের নাম বলাটা কেন জানি শুরু থেকেই সহ্য হলো না। একটা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম, যাতে আমেরিকনারা শুদ্ধ নামে ডাকার একটা চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরের কাগজে চিঠি লিখলাম, আমার যুক্তি আমেরিকানরা ইচ্ছে করে বিদেশিদের ভুল উচ্চারণে ডাকে। উদাহরণ হচ্ছে, শীলা। নামটা সঠিক উচ্চারণ না করতে পারার কোনোই কারণ নেই। এর কাছাকাছি নাম তাদের আছে। কিন্তু যেই তারা দেখবে এই নামটা একজন বিদেশির, অমনি উচ্চাবণ করবে—শেইলা (Sheila), এর মানে কী ?

সাত বছর ছিলাম আমেরিকায়। এই সাত বছর অনেক চেষ্টা করলাম ওদের দিয়ে শুদ্ধভাবে আমার নামটা বলাতে। পারলাম না। ফল এই হলো যে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রটে গেল 'হামাম' নামের এই ছেলের মাথায় খানিকটা গণ্ডগোল আছে। তবে ছেলে ভালো।

বিদেশের পড়াশানো শেষ করে দেশে ফিরে আসছি। আমার দেশে ফিরে যাওয়া উপলক্ষে প্রফেসর গ্লাস তার বাড়িতে একটা পার্টি দিল। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, এই

পার্টিতে প্রথমবারের মতো সে শুদ্ধ উচ্চারণ করল। আমার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের সুন্দর পরিণতি। আমার ভালো লাগার কথা। আনন্দিত হওয়ার কথা। কেন জানি ভালো লাগল না।

গ্লাস গাড়িতে করে আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে।

আমি বললাম, এই তো সুন্দর করে তুমি আমার নাম বলতে পারছ। আগে কেন বলতে পারতে না?

গ্লাস খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, বিদেশিদের আমরা একটু আলাদা করে দেখি। আমরা তাদের রহস্যময়তা ভাঙতে চাই না। তাদের অন্যরকম করে ডাকি। অন্য কিছু না।

অধ্যাপক গ্লাসের কথা কতটুকু সত্যি আমি জানি না। সে যেভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছে অন্যরাও সেভাবে দেখেছে কি না তাও জানি না। গ্লাসের কথা আমার ভালোই লাগল। আমি হাসিমুখে বললাম, তুমি আমাকে তোমার মতো করেই ডাকো।

বিদায় নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গ্লাস বলল, হামান, ভালো থেকো এবং আগলি আমেরিকানদের কথা মনে রেখো।